অখণ্ড

বেদ-জ্ঞান

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ একত্রে

যোগাচার্য শ্রীমৎ রামানন্দ সরস্বতী

অখণ্ড বেদ-জ্ঞান

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ একত্রে

যোগাচার্য শ্রীমৎ রামানন্দ সরস্বতী

২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জুন, ২০১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ :
ডিসেম্বর, ২০১৮
তৃতীয় সংস্করণ :
জানুয়ারি, ২০২২

প্রকাশক :
শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ২২৪১-৫৪৬৮/৯৬৭৪৯২১৭৫৮/৯৮৩০৬০৮৭০২
Website : www.girijalibrary.com
Email : info@girijalibrary.com

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীসঞ্জয় মাইতি

বর্ণ সংস্থাপনায় :
বর্ণায়ন
২বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ :
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রা: লি:
কলকাতা-৭০০ ০১৬

মূল্য ঃ ৪৫০ টাকা

উৎসর্গ

সকল বেদানুরাগী পাঠকের হাতে
তুলে দিলাম 'অখণ্ড বেদ-জ্ঞান'।

—রামানন্দ

আমাদের প্রকাশনায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

- রোগ নিবারণে যোগাসন
- দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতায় প্রাণায়াম-মুদ্রা-ধ্যান
- উমাচলের মহাযোগী (বিশ্ববন্দিত যোগী স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর জীবনী)
- গল্পে গল্পে কৃষ্ণকথা

প্রকাশকের কথা

আমাদের হিন্দুধর্মের মূল স্তম্ভ হল 'বেদ'। ভারতীয় তথা বিশ্বের নানা ভাষায় অনূদিত। বেদ না জানলে নিজের ধর্মকে, সংস্কৃতিকে, দেশকে, নিজেকে জানা হয় না। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই বেদ প্রকাশের সুপ্ত ইচ্ছে বহুদিনের। কিন্তু সমগ্র বেদ তো সমুদ্রের মতোই অন্তহীন। আজকের এই জেট-যুগে ইচ্ছে থাকলেও তা পড়ারই বা পাঠকের সময় কোথায়! এই কথা ভেবে তাই সমগ্র বেদের মূল নির্যাসটি সহজ-সরল ভাষায় একটিমাত্র খণ্ডে প্রকাশ করা হল যাতে এই গ্রন্থটি পড়লেই পাঠক সমগ্র বেদপাঠের রস আস্বাদন করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বেদ সম্পর্কে তাঁর মনে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে।

কলকাতা-৯
মে, ২০১৭

গ্রন্থকারের নিবেদন

ছাত্রাবস্থা থেকে শুনে আসছি পরম পবিত্র বেদ হিন্দু তথা আর্যধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান উৎস। বৈদিক জ্ঞানের আলোয় ভারত তথা সারা বিশ্ব আলোকিত। বেদই বিশ্বশান্তি, বিশ্বমৈত্রীত্ব, বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বকল্যাণের প্রথম উদঘোষক ও অগ্রদূত। মানবজীবনের উপযোগী বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য ও অনন্ত ভাণ্ডার ভারতের বেদ। ফলে স্বভাবতই বেদকে জানার জন্যে একটা কৌতূহল মনের মধ্যে জেগে ওঠে। বেদ-গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাংলায় প্রকাশিত সানুবাদ বেদগ্রন্থ সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করি—কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয় না। অনেক গ্রন্থে মূল মন্ত্র এবং অনুবাকও সঠিক ভাবে দেওয়া হয়নি। এছাড়াও বাংলার যে-সকল বেদজ্ঞ বেদকে অবলম্বন করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই গ্রন্থ সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করলাম, তবুও হৃদয় রয়ে গেল অতৃপ্ত। বেদ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা কোথাও পেলাম না। এমতাবস্থায় কলকাতার গিরিজা লাইব্রেরীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন বললেন, "রামানন্দবাবু, আপনাকে বেদের উপর একটি প্রামাণ্য বই লিখতে হবে। আমাদের প্রকাশনা থেকে প্রকাশ করব।" প্রশান্তবাবুর কথা শুনে আমার হৃদয় পবিত্র আনন্দে ভরে উঠল এবং একই সঙ্গে নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে বিষাদের মেঘও হৃদয়কে আবৃতকরল। ভারতীয় প্রাচীন ঋষি-মুনিরা যা কঠোর তপস্যার বলে লাভ করেছেন, সেই পরম ঐশ্বরিক অনন্ত জ্ঞানের আধার বেদ নিয়ে গ্রন্থ লিখব—সে যোগ্যতা আমার কোথায়? এ যেন আমার কাছে প্রদীপের আলোয় সূর্যকে দেখানোর বাতুল প্রয়াস। জনৈক সন্তের ভাষায়—"বরগদ কি করতে হ্যায় বাঁতে, গমলু পর উগলু।" অর্থাৎ বনসাই গাছ গামলা বা টবে থেকে বটগাছের কথা বলে। আমার বুদ্ধি, ভাবনা-অনুভূতি টবের বনসাই গাছের মতো। ভারতের প্রাচীন ঋষি মুনিদের কঠোর তপোলব্ধ ঈশ্বরীয় জ্ঞান 'বেদ' এক অনন্ত বটবৃক্ষ বিশেষ।

বেদ নিয়ে গ্রন্থ লিখব কি লিখব না এই নিয়ে মনের গভীরে শুরু হয় দোলাচল। সহসা মনে পড়ল একবিন্দু শিশিরের বুকেও তো দূর গগনের সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়ে ধরা দেন। আমার বুদ্ধিরূপ শিশিরবিন্দুতে বেদের জ্ঞানরূপ সূর্য কি প্রতিবিম্বিত হয়ে ধরা দেবেন না? এই ভাবনায় সাহসের সঞ্চার হয় মনে—শুরু হয় বেদ নিয়ে একদিকে লেখা, অন্যদিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন। আমার বামন হয়ে চাঁদ ধরার প্রয়াসকে জ্ঞানী ও গুণীজনেরা 'অমৃতং বালভাষিতম্' জ্ঞানে ক্ষমা করবেন। জানি বামন হয়ে চাঁদের নাগাল কোনওদিনই পাব না—তবুও লাফাতে দোষ কি? এতে আর কিছু না হোক মাটিতে পড়ে যেখানে গড়াগড়ি খাব, সেখানে চাঁদ না থাকলেও চাঁদের আলোয় স্নান তো করতে পারব। শুধু এইটুকু মনে রেখে সদ্‌গুরুর পদধূলি মাথায় নিয়ে বেদ-গ্রন্থ প্রণয়নরূপ দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হলাম। সন্ত কবীর বলেছেন—

"অলখ পুরুষ কী আরসী সাধুকা হি দেহ।
লখা জো চাহে অলখ কো ইস্থী মে তুলখ লে।।"

অর্থাৎ পরমাত্মা বা ভগবানের সাথে একরূপ হয়ে যাওয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী মহাপুরুষের দেহ এক দর্পণ বিশেষ। যার মাধ্যমে আমাদের মতো ভজনহীনেরা পরমাত্মা বা ভগবানকে দর্শন করতে সমর্থ হয়। সংসার বা জগতের সত্যিকারের কল্যাণ এঁরাই করেন। আমার আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলতেন, "শুধুমাত্র দুটি ফলছাড়া সংসাররূপ বৃক্ষের সব ফলই বিষময়। সংসার-বৃক্ষের যে দুটি ফল জীবকে অমৃত প্রদান করে তা হল সৎসঙ্গ ও সৎগ্রন্থ।" ঈশ্বরীয় জ্ঞানগ্রন্থ বেদ একই সঙ্গে সৎসঙ্গ ও সৎগ্রন্থ। সৎসঙ্গরূপী এই সৎগ্রন্থের সান্নিধ্যে এলে যে সত্যটি হৃদয়ে ফুটে ওঠে তা হল, জনৈক সন্তের ভাষায়—

"সাচ্চা ফকির কে পাশ আ যায় তো কঙ্কর
ওহ্ বানা দেঙ্গে মোতি নয়ন সে নিকলি নীর।
সওয়া বরস্ তক ইবাদত সে শ্রেষ্ঠ হ্যায় দো পলকা ফকীর।।"

অর্থাৎ, সত্যিকারের সাধু-সন্ত বা ফকিরের নিকট কাঁকর বা কঙ্কর যদি আসে, তিনি তাকে নয়ন থেকে অশ্রু বের করে মোতি বা মুক্তোয় রূপান্তরিত করেন। শতবৎসর ধরে উপাসনার চেয়ে, দু-মুহূর্তের ত্যাগী সন্ত-ফকির অনেক শ্রেষ্ঠ।

বেদ-মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষররূপ মুক্তোয় এই সত্য সূত্রাকারে গ্রথিত। 'মনুসংহিতায়' মহর্ষি মনু বলেছেন, 'সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ'। অর্থাৎ, বেদে সর্ব বিদ্যার সূত্র বিদ্যমান। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, আচার-ব্যবহার শিক্ষা, আয়ুর্বেদ, রাজনীতিশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি সর্ববিধ বিষয়ক জ্ঞান বেদে প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান। বেদ ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, সর্বাধিক প্রশংসিত পূজ্য বাঙ্ময় কাব্য সংকলন। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতাদি গ্রন্থও ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু বেদের ভাবভূমি এইসকল গ্রন্থের চেয়ে অনেক উচ্চে অবস্থিত। ভারতে প্রচলিত সমস্ত প্রাচীন ধর্ম ও সম্প্রদায়, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধার্মিক সিদ্ধান্তের মূলরূপে বেদকেই গণ্য করেন। যোগ, ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত ইত্যাদি সকল দর্শনই বেদকে প্রামাণ্য হিসাবে মান্যতা প্রদান করেন। উপনিষদের বিচারধারাও বেদের সিদ্ধান্তকে পরিপুষ্ট করে। স্মৃতি গ্রন্থগুলিও বেদানুসারী। রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থও বেদ-কথিত সত্যকে নানা আখ্যানের মাধ্যমে মনোরম ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, বেদে আছে কী? উত্তরে বলি, কী নেই বেদে! আসুন একবার এক নজরে দেখে নিই বেদে কী আছে—

১। বেদ-মন্ত্রে সুস্থ নীরোগ, সুখী ও সন্তুষ্ট জীবন অতিবাহিত করার পথ-নির্দেশ আছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে না যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া আছে।

২। বেদে ব্রহ্মচর্যের কথা বলা হয়েছে—কিন্তু সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ বেদে নেই। বিবাহের বিধান দেওয়া আছে। বংশবৃদ্ধির জন্য নিয়ন্ত্রিত কাম উপভোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৩। আপনার সমকক্ষ থেকে এগিয়ে যাওয়ার মহৎ-আকাঙ্ক্ষাকে বেদে প্রশংসা করা হয়েছে।

৪। শত্রুকে ধ্বংস বা বিনাশ করার কাজ কোনও দিব্য বা অলৌকিক শক্তির উপর অর্পণ না করে, নিজেদেরকেই এ ব্যাপারে পূর্ণভাবে সচেষ্ট বা সক্রিয় হতে হবে। (শত্রু অর্থাৎ দেশ ও জনগণের শত্রু, মানবতার শত্রু)।

৫। অহিংসার প্রদর্শন সজ্জনের প্রতি, হিংসার আচরণ আততায়ীর প্রতি এটাই বেদের আদেশ।

৬। বেদে দেবতার পূজা এবং অসুরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ দেবাসুর সংগ্রামে, দেবপক্ষের সমর্থনে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

৭। বেদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, জুয়া খেলা নিষেধ। বিনা পরিশ্রমে ধন প্রাপ্তির প্রবৃত্তি যেন কারও না থাকে।

৮। আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান বেদের মুখ্য বিষয়। সৃষ্টি কিভাবে নির্মিত হল? কেন হল? ঈশ্বর, ব্রহ্ম, জীব প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিটি মানুষের চিন্তাভাবনা করা উচিত। এর দ্বারা মানুষ পাপ থেকে পরিত্রাণ পায়।

৯। সূর্য, অগ্নি, বায়ু, জল, বনস্পতিসমূহ , বিদ্যুৎ, চন্দ্র, পৃথিবী আদি হচ্ছে দিব্যশক্তি সমূহ। এঁদের উপযোগ বা প্রয়োগ সবার কল্যাণের জন্য বা নিজের মঙ্গলের জন্যে হওয়া উচিত। এটাই এঁদের পূজা বা উপাসনা। এঁরা আমাদের উর্জা বা শক্তি প্রদান করেন—এঁরা সবাই দেবী বা দেবতা।

১০। দারিদ্রতা, ধনাভাব কখনই ভালো নয়। প্রতিটি মানুষের উচিত সৎভাবে ধন বা অর্থ উপার্জন করা। সুপাত্রে দান করার সামর্থ্যকে বেদে প্রশংসা করা হয়েছে।

১১। ধন বা অর্থ কেবল পরিশ্রম বা বুদ্ধি দ্বারাই মেলে না, দিব্য বা দৈবীশক্তির অনুকম্পাতেও মেলে। দিব্যশক্তির অনুকম্পা বা কৃপা না পেলে ধন লুঠ হয়েও যেতে পারে— অতএব ধনের জন্যে প্রার্থনা করা উচিত।

১২। ধনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সদ্‌বুদ্ধি। কু-বুদ্ধি মানুষকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, এই কারণে দিব্যশক্তি বা দৈবীশক্তির নিকট সদ্‌বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা উচিত। একথা উক্ত হয়েছে বেদমন্ত্রে।

১৩। বৈদিক যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য পরহিত, পরকল্যাণ ও সেবা। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভও বৈদিক যজ্ঞের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য। এজন্য বেদে যজ্ঞ করার কথা বলা হয়েছে।

১৪। জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করার কথাও বেদে বলা হয়েছে।

১৫। ঐহিক, পারলৌকিক সর্ববিধ সুখ-সমৃদ্ধির কথাও বেদে উল্লেখিত হয়েছে।

বেদ অধ্যয়ন করতে করতে মনে হয়েছে, বেদের প্রতিটি মন্ত্র যেন এক-একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড। এই হীরকখণ্ড নিয়ে যেসব জহুরীরূপ বেদ-মনীষীরা কারবার করেন তাঁরাই জানেন অনন্ত জ্ঞানরূপী হীরকখণ্ডে সমৃদ্ধ বেদের মূল্য কি ও কতখানি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে এক সন্তের কথা যিনি প্রায়ই বলতেন—

"বো বড়া কভী না করে বড়াই, কভী না বোলে বোল্।
হীরা কভী না কহে আপনা কিতনা মোল্।।"

অর্থাৎ, যে বড় বা মহান সে কখনও নিজের মহত্ব নিয়ে গর্ব করে না, নীরব থাকে। হীরক তার মূল্য কত কখনও বলে না। বেদ ও বেদমন্ত্রের গভীরে যে অনুপম জ্ঞান বিদ্যমান আছে, বেদ কখনও তা গর্ব করে অন্যের কাছে প্রকাশ করে না। বেদজ্ঞ বা বেদরসিক জ্ঞানীজনই বেদ-এর মূল্য নিরূপণের সম্যক অধিকারী।

ব্রহ্মচর্য, সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, শুচিতা, সন্তোষ, তপ, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ বৈদিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বেদ হতেই, বেদ পরবর্তী সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি গ্রহণ করেছে।

সাধকের দৃষ্টিতে বেদের দুই বিভাগ— প্রমাণ বিভাগ ও নির্মাণ বিভাগ। জীবের যথার্থ স্বরূপ কী এই জ্ঞান যে সাধনপ্রণালীর দ্বারা উপলব্ধ হয় তার নাম বেদান্ত। একে বেদের প্রমাণ বিভাগ বলা হয়। সাধারণ জীবের পক্ষে 'নেতি-নেতি' পথের বেদান্ত সাধনা সম্ভব নয়।

সাধন, ভজন, যজ্ঞ, ব্রত, দান, স্মরণ-মনন, ভগবৎনাম কীর্তন, পরহিত, স্বাধ্যায়, আচার্য বা গুরু উপাসনা, ইষ্ট উপাসনা ইত্যাদি যেসব সাধনকর্ম যা সাধকের শুদ্ধ অন্তঃকরণ নির্মাণে সহায়তা করে তাকে বেদের নির্মাণ বিভাগ বলা হয়। যে সাধকের শুদ্ধ অন্তঃকরণ নির্মিত হয়নি, সে বেদের প্রমাণ বিভাগ বুঝতে সমর্থ হয় না। সৎকর্ম, সাধন-ভজন, ভগবৎ-নামকীর্তন শ্রবণ-মনন, আচার্য বা গুরু উপাসনা, ইষ্ট উপাসনা ইত্যাদি অনুশীলন করতে করতে প্রমাণ বিভাগের অধিকারী হয়। বেদের নির্মাণ বিভাগের সিঁড়ি বেয়ে সাধক প্রমাণ বিভাগে আরোহণ করেন। বেদের ঋষি চেয়েছেন—আমরা যেন অসৎ থেকে সৎস্বরূপে, অসত্য থেকে সত্যে, খণ্ড থেকে অখণ্ডে, মৃত্যু থেকে অমৃতে উপনীত হই। ঋষির এই চাওয়া তখনই হবে সার্থক যখন আমাদের সবার মধ্যে বেদের জ্ঞান মূর্ত হয়ে উঠবে। বৈদিক জ্ঞানের প্রভায় সবার জীবন ভাস্বর হয়ে উঠুক।

ভারতীয় ঋষিগণের তপোলব্ধ অমূল্য সম্পদের সকলে যোগ্য উত্তরাধিকারী হোন —এই আশা বুকে নিয়েই এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—'অনন্তা বৈ বেদাঃ'। বেদ অনন্ত, বেদের জ্ঞানও অনন্ত। এই অনন্ত জ্ঞান-সাগরের কয়েকটি বিন্দু আমি বেদানুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের করকমলে নিবেদন করলাম। এর আস্বাদনে যদি পাঠকের কিঞ্চিত জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত হয়, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। পাঠকের কাছে আমার বেদের জ্ঞানকে তুলে ধরার যে-সীমিত প্রয়াস, সে প্রয়াস আমার অনুভবে কী রকম, সে-সম্পর্কে

শেষ কথাটি বলি—সমুদ্রের তীরে খেলা করছিল দু'টি ছেলে। খেলতে খেলতে হঠাৎ দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। একজন অন্য জনের পরনের জামা ছিঁড়ে দেয়। ছেলেটি খুব গরীব। তাই জামাটি ছিঁড়ে দেওয়ায় সে কাঁদতে থাকে। এমন সময় একজন যোগীপুরুষ সেখানে উপস্থিত হন। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করেন—'এই বাচ্চা, কাঁদছো কেন?' ছেলেটি বলে—'খেলতে খেলতে বন্ধু আমার জামা ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়েছে। বাড়ি গেলে মা মারবে—তাই কাঁদছি।' যোগী বলেন—'কেঁদো না, আমার কাছে সাধনার সিদ্ধি আছে, আমি ওই যোগসিদ্ধির দ্বারা তুমি যা চাইবে তা-ই এনে হাজির করে দেব।' যোগীর কথা শুনে ছেলেটির কান্না বন্ধ হয়ে গেল। সে শান্ত হয়ে যোগীকে জিজ্ঞাসা করলো—'যা চাইব তাই দেবে?'

যোগী বলেন—'হ্যাঁ তাই দেব'। ছেলেটি তখন তার প্যান্টের পকেট থেকে একটি পেয়ালা বের করে বলল—'যোগীবাবা, সামনে ওটা কি দেখছো?' যোগী বলেন, 'সমুদ্র!' ছেলেটি বলে—'এই পেয়ালার মধ্যে ওই সমুদ্রটা ভরে দাও তো দেখি।'

যোগী ছেলেটির চাওয়া দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন—'এ তুই কি চাইলি বেটা!'

ছেলেটি বলে—'যদি তোমার দেওয়ার থাকে তো এই পেয়ালার মধ্যে সমুদ্রটা ভরে দাও।'

যোগী বলেন—'যে-রহস্য আমার কাছে শাস্ত্রগ্রন্থ উন্মোচন করতে পারেনি, বেটা তুই আমার কাছে সে-রহস্য প্রকাশ করে দিলি! তোকে আমার হাজার হাজার প্রণাম। এখন আমার অনুভব হল পেয়ালায় সাগর ভরা যায় না।'

বেদ অনন্ত—তাঁর জ্ঞানও অনন্ত সাগর সদৃশ। আমার বুদ্ধি হল পেয়ালা। বুদ্ধির পেয়ালায় বেদ-এর জ্ঞানসাগরের বর্ণনা কি কখনও সম্ভব?

অলমতি বিস্তারেণ—
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণম্

স জয়তি সিন্ধুরবদনো দেবো যৎ পাদ পঙ্কজ স্মরণম।
বাসর মনিরিব তমসাং রাশীন্নাশয়তি বিঘ্নানাম্।।১
সুমুখশ্চৈকদন্তশ্চ কপিলো গজকর্ণকঃ।
লম্বোদরশ্চ বিকটো বিঘ্ননাশো বিনায়কঃ।।২
ধূম্রকেতুর্গণাধ্যক্ষো ভালচন্দ্র গজাননঃ।
দ্বাদশৈতানি নামানি যঃ পঠেচ্ছৃনুয়াপি।।৩
বিদ্যারম্ভে বিবাহে চ প্রবেশে নির্গমে তথা।
সংগ্রামে সঙ্কটে চৈব বিঘ্নস্তস্য ন জায়তে।।৪
শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্ন বদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।।৫
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম।
পরাশর আত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্।।৬
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মানিধয়ে বাসিষ্ঠায় নমো নমঃ।।৭
অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুর পরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।।

অনুবাদ ঃ সূর্য যেমন আঁধার নাশ করে, তদ্রূপ যাঁর চরণপদ্ম স্মরণে সম্পূর্ণ বিঘ্ননাশ হয়, সেই গণপতি দেবতার জয় হোক।১

যে ব্যক্তি বিদ্যারম্ভে, বিবাহে, গৃহপ্রবেশে ও গৃহ হতে নির্গমনে, সংগ্রামে অথবা সংকটের সময়ে সুমুখ, একদন্ত, কপিল, গজকর্ণ, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্ননাশন, বিনায়ক, ধূমকেতু, গণাধ্যক্ষ, ভালচন্দ্র এবং গজানন— এই দ্বাদশ নাম পাঠ বা শ্রবণ করে তার কোনও প্রকার বিঘ্ন হয় না।২-৪

যিনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিত যাঁর বর্ণ চন্দ্রের ন্যায় এবং যিনি প্রসন্ন আনন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান গণপতিকে সকল বিঘ্ননাশের জন্য ধ্যান করি।৫

শ্রীবশিষ্ঠের প্রপৌত্র, শ্রীশক্তির পৌত্র, শ্রীপরাশরনন্দন এবং শুকদেব-এর জনক নিষ্পাপ তপোনিধি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসকে আমি বন্দনা করি।৬

বিষ্ণুরূপ ব্যাস অথবা ব্যাসরূপ শ্রীবিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি।

বশিষ্ঠ বংশোদ্ভূত ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ শ্রীব্যাসদেবকে জানাই বারংবার প্রণাম।৭

ভগবান বেদব্যাস হলেন চতুর্মুখরহিত ব্রহ্মা, দ্বিবাহু সমন্বিত দ্বিতীয় বিষ্ণু এবং ললাটের তৃতীয় নয়নরহিত সাক্ষাৎ মহাদেব।৮

সরস্বতী বন্দনা

যা কুন্দেন্দুতুষার হার ধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণা বরদণ্ড মণ্ডিতকরা যা শ্বেত পদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা।।

শুক্লাং ব্রহ্মবিচারসার পরমামাদ্যাং জগদ্ব্যাপিনীম্
বীণা পুস্তকধারিণীমভয়দাং জাড্যান্ধকারাপহাম।
হস্তে স্ফটিক মালিকাং চ দধতীং পদ্মাসনে সংস্থিতাম্
বন্দে তাং পরমেশ্বরীং ভগবতীং বুদ্ধিপ্রদাং শারদাম্।।

অনুবাদ ঃ যিনি কুন্দকুসুম, চন্দ্র এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণা, যিনি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করেন, যাঁর হস্ত বীণায় উত্তম সুশোভিত, যিনি শ্বেত কমলাসনে উপবেশন করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি দেবগণ যাঁর সর্বদা স্তুতি করেন এবং যিনি সর্বপ্রকার জড়তা হরণ করেন, সেই ভগবতী সরস্বতী আমাকে পালন করুন। যিনি শ্বেতবর্ণা, ব্রহ্মবিচারের পরমতত্ত্ব, যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, হস্তে বীণা ও পুস্তক ধারণ করে আছেন, অভয়দান করেন, মুর্খতারূপ অন্ধকার দূর করেন। হস্তে স্ফটিক মালা, কমলাসনা, বুদ্ধি প্রদায়িণী, সেই আদ্যা পরমেশ্বরী ভগবতী সরস্বতীর আমি বন্দনা করি।

।। অথ মঙ্গলাচরণম্ সমাপ্তম্।।

বেদমাতার মন্দিরে

হে সনাতন বৈদিক ভারতের মহান ঋষিগণ, আমি আপনাদের আকুল হৃদয়ে আহ্বান করি। আপনারা আগমন করে আমার রিক্ত হৃদয়ের সশ্রদ্ধ প্রণাম পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন। আপনাদের সবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি বেদমাতার রহস্যময় বিশাল মন্দিরে প্রবেশ করতে চাই। আমার একার পক্ষে ওই মন্দিরে প্রবেশ তো দূরের কথা, নিকটে যেতেও ভয় করে। হে মহান ঋষিগণ, আপনারা কৃপা করে আমার হাত ধরে, আমাকে ওই মন্দিরে বেদমাতার দর্শনের জন্য নিয়ে চলুন—আমি আপনাদের শরণাগত। আপনারা আমার বেদমাতার মন্দির দর্শনের সহায় হোন। দেব ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা দুটোতেই আমি অজ্ঞ। তবু আমার হৃদয়ের ইচ্ছা আমি বেদমাতার মন্দির দর্শন করি। বেদমাতার গুণকীর্তন করি। আপনারা বেদমায়ের সুযোগ্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিত—আমি আপনাদের সবার চরণে 'আনত শিরে' প্রার্থনা করি আপনারা আমার সহায় হোন। আপনাদের কৃপায় আমি পঙ্গু হয়েও বেদ-জ্ঞানরূপ গিরি লঙ্ঘন করতে চাই—বোবা হয়েও বাঙ্‌ময়ী বেদ-মাতার মহিমা কীর্তন করতে চাই—আপনারা আমাকে পথ প্রদর্শন করুন।

জ্ঞানের ধার বা পাণ্ডিত্যের ভার কোনওটাই আমার নেই। আপনাদের সকলের কৃপা-প্রসাদে বেদমাতার প্রসন্ন দৃষ্টি কি আমার উপর বর্ষিত হবে না? মূর্খ অজ্ঞান বলে কি আমি পেতে পারি না আপনাদের অনুগ্রহে ওই মায়ের করুণা? একদিন এই ভারতের তপোবনের শান্ত শীতল ছায়ায় নিভৃত পর্বত কন্দরে ধ্যানাসনে সমাসীন আপনাদের তপস্যাপূত ত্যাগ মাধুর্যমণ্ডিত হৃদয়কন্দরে বেদমাতার যে দিব্যবাণী অনুরণিত হয়েছিল, বাঙ্‌ময়ী মূর্তিরূপে যিনি অনন্তরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন আপনাদের নির্মল হৃদয়াকাশে—বাঙ্‌ময়ী সেই বেদমাতার অনন্তরূপের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিন। মায়ের দিব্যরূপের রহস্যটি আমার কাছে উন্মোচিত করে দিন। আপনাদের শ্রীমুখে

শুনেছি মা আমার জ্ঞান স্বরূপিণী, পরম করুণাময়ী অনন্তা। আমি শান্ত সীমায় বদ্ধ। হে ভারতাত্মা ঋষিগণ, আপনারা বেদমাতাকে বলুন—আমার অজ্ঞান অন্ধকারের সীমিত গণ্ডীতে অসীম ভাব বক্ষে ধারণ করে সসীম হয়ে প্রকাশ হতে। যেমন একবিন্দু শিশিরের বুকে ধরা দেয় সূর্য সহ আকাশ, তেমনি ব্রহ্মস্বরূপিণী বেদজননী আমার মলিন চেতনা বিন্দুতে প্রকাশিত হোন।

আমার মলিনতা ধুয়ে যাক বেদমাতার জ্যোতির্ময়ী প্রকাশে।

হে বেদমাতা, আমার কি অধিকার নাই তোমার মহিমা গুণকীর্তন করার। মাগো, তুমি যে যজুর্বেদের ঋষি-হৃদয়ে প্রকট হয়ে বলেছিলে—

"ওঁ যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভাং শূদ্রায়চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ।।
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ,
ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু।।
(যজুর্বেদ, ২৬/২)।

অর্থাৎ, হে মনুষ্যগণ আমি যেরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য সমস্ত জনগণকে এই কল্যাণদায়িনী পবিত্র বেদবাণী বলছি, তোমরাও সেইরূপ করো।

মা, তোমার বাণীতে জ্ঞাত হলাম, তোমার বক্ষ-ধৃত পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণে সকলেরই সমান অধিকার আছে—তবে আমি কেন বঞ্চিত থাকব ওই মন্ত্র-সকলের গুণকীর্তনে?

সাধু সন্তের মুখে শুনেছি, হে বেদমাতা, তুমি কোনও পাপ স্বীকার কর না। শুধুমাত্র ভ্রান্তিকে মান্য করো। মা, তোমার মতে মানুষের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি নিজেকে দুর্বল ও পাপী মনে করা। তাই সাহস করে ঋষিদের হাত ধরে তোমার মন্দিরের দুয়ারের সামনে এসে উপনীত হয়েছি। মাগো, দ্বার খুলে দাও, ভেতরে ডেকে নাও। দেখাও তোমার অনন্ত জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার। আমাকে মাধ্যম করে তোমার ওই জ্ঞান-রত্ন ভাণ্ডারের প্রসাদ তোমার অগণিত-সন্তানের কাছে পৌঁছে দাও। বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে তোমার মন্দিরের দ্বার খোলার সামর্থ আমার নেই। তাই তোমার অতীত ও বর্তমানের সকল মহান সন্তানদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, তোমার শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা করি—দ্বার খুলে দাও মা।

মুক্তির আলো আসুক, সত্য শান্তির সৌরভ নিয়ে, তোমার গর্ভগৃহ হতে—আমার তমসাবৃত দুই নয়নে। নয়নপথে ওই আলো পৌঁছে যাক আমার মলিন মন বুদ্ধিকে বিধৌত করে বাসনা-মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে। যেখানে আত্মরূপী সূর্য বাসনা-মেঘে আছে আবৃত। তোমার মুক্তির আলোর পরশে হৃদয়াকাশে বাসনার মেঘে আবৃত আত্মসূর্যের বন্দীদশার অবসান হোক। তোমার মুক্ত জ্ঞানদৃপ্ত বাণীর আলোয় স্নান করে আমার বন্দী আত্মার হোক নির্বাণ।

তুমি তপস্বীর পূতঃ তপস্যা, জ্ঞানী হৃদয়ের জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, কর্মীর কর্ম, অন্ধকারের আলো, জীবন্মৃত-র অমৃত অভয়, বিষণ্ণ হৃদয়ের প্রসন্ন-নির্মল প্রসাদ। তোমার প্রসাদে ধন্য হোক জীবন। শুরু হোক তার নব যাত্রা অনন্তের অভিমুখে নিত্য মিলনের আকাঙ্ক্ষায়।

এসো মা, হৃদয়ে বসো—আলোর ধারায় হৃদয়ের মলিনতা বিধৌত করে তোমার বসার আসন তুমি নিজেই পেতে নাও। হৃদয়খানি আলোয় আলোয় ভরে দাও। বুদ্ধির ঘরে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যে জমাট অন্ধকার তার হোক চিরনির্বাসন—তোমার জ্যোতির্ময়ী আবির্ভাবে।

হে বেদমাতা প্রসন্না হও—কৃপা করো তোমার সন্তানকে। তুমি শুধু সন্তানের জনয়িত্রীই নও—তুমি তার নিত্যকালের পাঠশালা। তোমার ওই পাঠশালার ছাত্র করে নাও আমাকে। 'মা' থেকে 'গুরুমা'তে অবতরিতা হও তুমি। আমি সন্তানের ভূমিকা থেকে নেমে আসি শিষ্য অথবা ছাত্রের ভূমিকায়, বসি তোমার শ্রীচরণতলে। তোমার চরণে গুরুদক্ষিণা আমার মনবুদ্ধি অহংকার। তোমার শিক্ষার আলো পেয়ে এরা হোক অলংকার। মা, তোমার শিক্ষার দিব্যমন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করো। তোমার কৃপাপ্রাপ্ত মহান সন্তান মহামুনি যাস্ক বলেছেন—

"বেদের সত্য অর্থের সাক্ষাৎকার হয় ধ্যান ও তপস্যার দ্বারা।"। যাঁরা ধ্যান ও তপস্যার অনুশীলনকারী, তোমার রহস্য বোঝার জন্য তাঁদের অন্য সহায়তার প্রয়োজন হয় না। আমি ধ্যানীও নই, তপস্বীও নই—আমার কী উপায় হবে মা? আমি তোমার দুর্বল অসহায়, অজ্ঞানী সন্তান বলে, তুমি কি মুখ ফিরিয়ে নেবে? পরমকারুণ্যে, বাৎসল্যে একবারও কি দেবে না তোমার জ্ঞানামৃত পানের অধিকার? মা, আমার সর্বাঙ্গের ধুলো-ময়লা মুছে একবার তোমার

ওই অমৃত-অভয় অঙ্কে তুলে নাও—স্নেহসিক্ত জ্ঞান-পীযূষ পান করাও। শান্ত হোক আমার জন্ম-জন্মান্তরের তৃষিত হৃদয়ের অতৃপ্ত জ্ঞানক্ষুধা।

মা, তোমার অমৃত পান করে আমার শরীর-মন-বুদ্ধি পুষ্ট হোক। সেই অন্তরে তুমি স্বমহিমায় উদ্ভাসিতা হও। তোমার মহিমাসূর্যের কিরণ আমার হৃদয়াকাশকে অবলম্বন করে জগদ্বাসী তোমার সকল সন্তানের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ুক। অজ্ঞানের রূপান্তর ঘটুক জ্ঞানে। অসত্যের আবরণ ভেদ করে সত্য প্রকাশিত হোক আপন মহিমায় বিশ্বের সকল হৃদয়ে। মা, তুমি শুধু জ্ঞানরূপাই নও, তুমি যজ্ঞরূপাও। যজ্ঞ তোমার কর্ম, তোমার ধর্ম—তোমার মর্মবাণী। সাম বেদ মুখে তুমি বলেছ—

"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃনানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি।। (সাম বেদ, ১/১/১)।

অর্থাৎ হে প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মন। আমাদের জ্ঞান ও অন্নাদি প্রদানের জন্যে উপদেষ্টা ও শুভগণের দাতারূপে যজ্ঞভূমিতে প্রকট হও।

মা, তোমার নামের এক অর্থ যেমন জ্ঞান বা শ্রুতি তেমনি অন্য অর্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপে তুমি আমার হৃদয়ক্ষেত্ররূপ যজ্ঞভূমিতে উপদেষ্টারূপে বিবেকের বাণী-প্রেরণ করো। তোমার ওই বাণী শ্রবণে যদি আমি সমর্থ হই—তাহলে বুঝব, হে জননী, তুমি তোমার কৃপার প্রসাদ দিয়ে আমার হৃদয়ক্ষেত্ররূপ যজ্ঞভূমিতে আর্বিভূতা হয়েছ। উপদেষ্টারূপে আমার হৃদয়ে উপবেশন করে তুমি শোনাও তোমার আলোক বাণী—আমি শুনি আর শোনাই তোমার সকল সন্তানকে। মায়ের প্রসাদ সকলে মিলে ভাগ করে খাই আনন্দে। মা, এবার তোমার মহিমার কথা বলো। সাগ্রহে অপেক্ষায় আছি আমিও সকলের সাথে। তোমার কথার দিব্য ছন্দে মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠুক। মঙ্গলারতির ধূপ-ধূনার গন্ধের সাথে, পুষ্প সৌরভের সাথে, মঙ্গলময় শঙ্খধ্বনির মেঘমন্দ্র মিশে ছড়িয়ে পড়ুক আকাশে-বাতাসে, ধরণীর ধূলাতে, দিক হতে দিগন্তে।

ওঁ নমঃ জ্ঞানস্বরূপিনী, ব্রহ্মস্বরূপিনী শ্রুতিমাতৃকা দৈব্যৈঃ নমঃ।

হে বেদমাতা, এবার তোমার বাঙ্‌ময়ী জ্ঞানচেতনা আমার আত্মচেতনায় মিলিয়ে তুমি হও যন্ত্রী আমি হই যন্ত্র। তুমি লেখাও, আমি লিখি।

প্রবেশের পূর্বে

ঋষি মহাত্মাগণের ও বেদমাতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শুরু করছি বেদের গুণকীর্তন। বর্তমানে 'বেদ' এই শব্দটির সাথে অনেকের পরিচয় থাকলেও, মূল বেদের সাথে পরিচয় আছে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। আবার এমন অনেক লোকও আছেন যাঁরা 'বেদ' নামে একটি গ্রন্থ আছে একথা হয়তো শুনেছেন। কিন্তু গ্রন্থটি কেমন, কী এর বিষয়বস্তু তা পড়েও দেখেননি, এমন কি তাঁদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থটিকে চোখেও দেখেননি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, বেদ হচ্ছে প্রাচীন ভারতের মানুষের ধর্মের ও সমাজ-জীবনের ইতিহাস। তাঁদের ভাবনায় বেদ হচ্ছে—'কৃষকের বা চাষার গান, শিশুর মুখের প্রথম কাকলি' কিংবা প্রাচীন ভারতবাসীর 'আদিমকালের গাথা' সংগ্রহ। সৃষ্টির আদিম লগ্নে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে বাস করত তখন প্রকৃতির রুদ্ররোষে, অর্থাৎ ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদির কবলে পড়লে ভয় পেত। তারা প্রকৃতির এইসব ক্রিয়ার অন্তরালে কোনও অশরীরী দেবশক্তি অথবা অসুরশক্তির উপস্থিতি আছে এমন মনে করত।

ফলত এইসব শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা গান-ছড়ার আকারে যেসব প্রার্থনা করত তাই হচ্ছে বেদ বা বেদের মন্ত্র।

অদৃশ্য দেবশক্তি অথবা অসুরশক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা আরও একটি বিশেষ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করত, যার নাম 'যজ্ঞ'। শুকনো ঘাস, কাঠ দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত হতো যজ্ঞের বেদী—তাতে সকলে মিলে আগুন জ্বেলে ঘি-দধি ও মদ্য বা সোমরস নিবেদন করত এবং যজ্ঞান্তে সকলে মিলে তা পান করত। তাদের নিবাস ছিল শৈত্য-প্রবণ এলাকায়, এই জন্য 'অগ্নির' পূজা বা উপাসনাই ছিল তাদের একমাত্র প্রধান অনুষ্ঠান। অগ্নিই ছিলেন তাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা।

জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা গাভী ও অশ্ব পালন করত। কখনও বা শত্রুর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো। তারা ছিল বহিরাগত আর্য, ভারতের প্রাচীন অধিবাসী অনার্যরা ছিল তাদের শত্রু।

বেদের জ্ঞান সম্পর্কে এই হচ্ছে পাশ্চাত্যের ভাবনা। বেদ জ্ঞানের এই যদি স্বরূপ হয় তাহলে আমরা কোন মুখে বলব ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে

বেদ? ভারতের বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা এবং এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্তর্মুখীনতা। এই অন্তর্মুখীনতা বহির্জগতকে অস্বীকার করে নয়। বরং বহির্জগতকে অন্তর্জগতের রঙে রাঙিয়ে নিয়ে কিভাবে জীবনপথে চলতে হয় তা সে জগৎকে শিখিয়েছে।

পাশ্চাত্য মত, বা সিদ্ধান্ত সামনে রেখে যদি কেউ বেদ বুঝতে যান, তবে তিনি 'রাজ মহিষী' শব্দের অর্থ রাজার পালিত স্ত্রী-মহিষই বুঝবেন, রাজরাণী বুঝবেন না। পাশ্চাত্যবাসীরা বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বলা বাহুল্য, সেই ব্যাখ্যার ব্যাখ্যাকার এদেশীয় বেদ-পণ্ডিত বা বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য। সায়নাচার্যের বেদ-ব্যাখ্যার উপর ভর করেই পাশ্চাত্যরা বলেছেন—'বেদ হচ্ছে কৃষকের বা চাষার গান'। 'আদিম কালের গাথা সংগ্রহ'। 'শিশুর মুখের প্রথম কাকলি।' যদিও সায়নাচার্য বেদের ঋষিদের আদিম প্রকৃতির মানুষ বা শিশু বলে নির্দেশ করেননি। বেদের নৈসর্গিক ব্যাখ্যার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উদাসীন। তিনি বেদকে ব্যাখ্যা করেছেন যজ্ঞের পটভূমি থেকে। এর ফলেই অনেক স্থলে শিব তৈরি করতে গিয়ে বাঁদর তৈরি হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যবাসীর চোখে বেদ মনুষ্য রচিত একটি গ্রন্থমাত্র। প্রাচীন ভারতের আর্য জাতির জীবন-যাপন প্রণালী কেমন ছিল, তাদের সমাজ কীরূপ ছিল, তার সঙ্গে ভাসাভাসা পরিচিত হওয়ার জন্য, তারা সায়নাচার্যের বেদভাষ্য অবলম্বন করে বেদকে বুঝতে চেয়েছিল। বেদ-রহস্যের গহণ অরণ্যে প্রবেশ করতে হলে যে বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন তা তাদের ভাবনাতেও ছিল না।

এখন প্রশ্ন, বেদ বোঝার উত্তম উপায় কী? এর প্রথম উত্তর বেদের মূলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু এখানেও সমস্যা, বেদের টীকাকার, ভাষ্যকার, বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক—এরা সকলে মিলে মূল বেদের উপর এমন জাল রচনা করেছেন যা ভেদ করে বেদ-রহস্য জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অনুসন্ধিৎসু মন রহস্য জানার আগেই জালে জড়িয়ে যায়। ভেতরে প্রবেশে সমর্থ হয় না। বস্তুত বেদের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় তা বাইরের পরিচয় বা গৌণ পরিচয়। বেদকে বুঝতে হলে, জানতে হলে আগে আমাদের বেদের মূল ভাবটি কী তা জানতে হবে। বেদের মূল ভাবটির প্রতি বৈদিক ঋষিদের অনুভবী দৃষ্টিভঙ্গী কীরূপ ছিল তাও আমাদের অনুধাবন করে দেখতে হবে।

অন্যথায় বৈদিক জ্ঞানের আলোর যথার্থ স্বরূপটি আমাদের কাছে অধরা রয়ে যাবে। আবার প্রশ্ন জাগে মনে, বেদের মূলভাবটির সাথে পরিচিত হওয়ার উপায় কী? তা হচ্ছে আঁধার থেকে আলোর অভিমুখে যাত্রা করা। আমরা যা জানি বা বুঝি, সেই জানা ও বোঝা থেকে এক অজানা অ-বোঝার দিকে চলা বা যাত্রা করা, ওই অজানাকে জানার জন্য, অ-বোঝাকে বোঝার জন্য, অধরাকে ধরার জন্য। বেদে এমন সব মন্ত্র বা বাণী আছে যার অর্থ বোঝা খুব কষ্ট নয়। যেগুলো শুধু প্রাচীন বা বর্তমান কালেই নয়, সর্বকালেই সকলের পক্ষে বোঝার উপযোগী। সেখানে অর্থ সুগন্ধি কুসুমের মতো স্বতই ফুটে উঠেছে বা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই অর্থকে প্রাচীন ভেবে দূরে সরিয়ে না রেখে উদার মনে স্বীকার করে নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। তাকে প্রাচীন ভেবে সহজ অর্থ পরিহার করে নিজের মতো কল্পিত অর্থ আরোপ করে নিজে বোঝা এবং অপরকে বোঝানোর চেষ্টা না করাই শ্রেয়। যেমন—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম।। (ঋগ্বেদ, ১/২২/২০), অর্থাৎ জ্ঞানীরা দ্যুলোকের বিশাল চক্ষু সূর্যের ন্যায় সর্বব্যাপক পরমাত্মার সেই পরমপদ দর্শন করেন। জগতের সমস্ত প্রাণী যেমন সূর্যের সাহায্যে চক্ষুদ্বারা প্রকাশমান পদার্থকে দর্শন করে, জ্ঞানী বিদ্বানেরা তদ্রূপ শুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা নিজের মধ্যে পরমাত্মার পরমপদ দর্শন করেন। আবার অন্য একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি-অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।। (ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/২০)। অর্থাৎ একটি বৃক্ষে সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট দুইটি পাখি বন্ধুরূপে বিরাজ করছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি বৃক্ষের ফল আস্বাদন বা ভক্ষণ করছে—অন্যটি চুপচাপ বসে শুধু দেখছে। এর রহস্যার্থ হচ্ছে—বৃক্ষটি হচ্ছে শরীর। পাখি দুটির একটি জীব বা জীবাত্মা, অন্যটি বৃক্ষ বা পরমাত্মা। জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই অনাদি। উভয়ই সখাস্বরূপ। জীব সংসারে পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ফলভোগ না করে শুধুমাত্র সাক্ষী রূপে বর্তমান থাকে। আবার ঋগ্বেদের অন্য একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে—

"অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরোবাবৃধুঃ সৌভগায়।

যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা পৃশ্নি-সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ।।(ঋগ্বেদ, ৫/৬০/৫)।

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কেউ বড়, কেউ ছোট নয়। সকলেই ভাই ভাই। সৌভাগ্য লাভের জন্য সকলেই প্রয়াস করে। এদের পিতা শুভঙ্কর ঈশ্বর এবং মাতা দুগ্ধবতী প্রকৃতি। প্রকৃতি মাতা ক্রন্দনহীন পুরুষার্থী বা উদ্যোগী সন্তানকেই সুদিন প্রদান করেন।

এইরূপ অথর্ব বেদের একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে—

"মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুতস্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া।। (অথর্ব বেদ, ৩/৩০/৩)।

অর্থাৎ ভ্রাতা ভ্রাতাকে দ্বেষ করবে না। ভগ্নী ভগ্নীকে দ্বেষ করবে না। তোমরা সকলে সমমতাবলম্বী ও সমকর্মাবলম্বী হয়ে সৎভাবে বার্তালাপ করবে। সুধী পাঠক, এই সকলমন্ত্রে বেদকে 'আদিম মানুষের গাথা', 'চাষার বা কৃষকের গান,' 'শিশুর মুখের প্রথম কাকলি' বলে মনে হচ্ছে কি?

উক্ত মন্ত্রগুলির মধ্যে পাই পরিশীলিত বা মার্জিত মনের, জ্ঞানদীপ্ত বোধিজাত প্রজ্ঞার আলো। কথা-সুর-ছন্দ সবই ওই আলোকে আলোকিত। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য যজ্ঞের পটভূমিতে বেদ ব্যাখ্যা করলেও তিনি কোথাও এমন কথা বলেননি যে, বেদের অন্য ব্যাখ্যা হতে পারে না। আমাদের মনে রাখা দরকার, বেদ শুধুমাত্র একখানা প্রাকৃত বৌদ্ধিক চর্চার গ্রন্থ নয়। বেদ হচ্ছে উত্তুঙ্গ অধ্যাত্ম-সাধনার দিব্যমন্ত্রাবলী। যা ঋষিরা, মহর্ষিরা ধ্যানাবিষ্ট বা সমাধিস্থ অবস্থায় আপন হৃদয়াকাশে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বেদোক্ত জ্ঞানতত্ত্বকে বোঝার রহস্যটি এখানেই নিহিত।

অধ্যাত্ম-সাধন যার বিন্দুমাত্র নেই তার পক্ষে বেদার্থ বোঝার চেষ্টা একান্তই অনধিকার চর্চা। শূদ্রের বেদের বা বেদ পাঠের অধিকার নেই কেন—তার কারণও এখানেই বিদ্যমান। বৈদিক দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম-সাধনাহীন মানুষই শূদ্র। বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে তর্ক করার ক্ষমতা আয়ত্ত হলেই বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। বেদার্থের আলোয় স্নাত হওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্তঃকরণের শুদ্ধি। প্রয়োজন সংযম ও তপস্যার। ঋষি অরবিন্দের ভাবধারার অনুগামী শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'বেদরহস্য' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—"আমরা তর্ক-বিতর্ক করিয়া বেদের ভাষার অর্থ বাহির করিতে যাই, কিন্তু সেই ভাষা যে অন্তরঙ্গভাবের অভিব্যক্তি, তাঁহার খোঁজ কেমন করিয়া পাইতে হয়, তাহা জানি না। তাহার চেষ্টাও করি না। যে সাধনার উপর বেদের তথ্য প্রতিষ্ঠিত, সেই সাধনা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, সুতরাং তর্কবুদ্ধি যে আমাদের অপথে বিপথে লইয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্যের কি?...ফলত আমরা যাহা বলিতে চাই, তাহা এই, বেদ হইতেছে তাত্ত্বিক জ্ঞানের, অধ্যাত্ম-উপলব্ধির, যোগলব্ধ অনুভূতির কথা।" অর্থাৎ বেদ বুঝতে হলে চাই ত্যাগ-তপস্যামণ্ডিত শুদ্ধ অন্তঃকরণ। প্রাকৃত ভোগবুদ্ধির আলোয় বেদার্থ করার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। জগৎ-জীবন, সৃষ্টি-প্রকৃতি পরমাত্মা বা সত্য সম্পর্কে ঋষি-মহর্ষির যে তপোলব্ধ সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে যদি আমরা আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গী মিলিয়ে বেদ বিচার করতে যাই— তাতে বুদ্ধির খানিকটা কসরৎ হয় বটে, কিন্তু সত্যটি রয়ে যায় অধরা। যদিও মহর্ষি মনু, তাঁর 'মনুস্মৃতি'তে বলেছেন— "সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ"—লৌকিক অলৌকিক সমস্ত জ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকাশক বেদ।

বেদের এই সার্বিক জ্ঞানের স্বরূপটি অনুভব করার জন্য প্রয়োজন তপস্যার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। তপস্যায় উত্তীর্ণ হলেই জীবন হয়ে ওঠে বেদময় (জ্ঞানময়)। বেদময় জীবনেই বেদার্থ প্রকট হয়। ভারতীয় ঋষিদের মতে, বেদ শুধুমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থই নয়—স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্ম। শাস্ত্রমতে শব্দ ব্রহ্মেরই রূপ। ব্রহ্মানুভূতি বিনা বেদরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বৈদিক 'নিরুক্ততে' বলা হয়েছে—"অথাপি প্রত্যক্ষকৃতা স্তোতারো ভবন্তি"—অর্থাৎ বেদব্রহ্মের সাক্ষাৎকর্তাই বেদ ব্যাখ্যার অধিকারী। ঋক্ বেদের মন্ত্রেও বলা হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞানীই বেদমন্ত্রের অর্থকে প্রত্যক্ষ করতে পারে—ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বেদমন্ত্র চর্চায় কোনও লাভ নেই। কারণ ঋক্ বেদের ১/১৬৪/৩৯, মন্ত্রে বলা হয়েছে যে—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্ তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্ বিদুস্ত ইমে সমাসতে।।"

অর্থাৎ মন্ত্র বা ঋচার প্রতিপাদ্য অক্ষরে ব্যোমসদৃশ পরমাত্মায় সকল দেবগণ বিরাজ করেন। যে এরূপ না জানে মন্ত্র বা ঋচা তার কী করবে? মন্ত্র বা ঋচাটির ভাবার্থ হচ্ছে তপঃপূত সত্য যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই বেদ ব্রহ্মের সত্যকে দর্শন করতে সমর্থ হন।

এখন সুধী পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন— আপনি যে বেদ ব্যাখ্যা করছেন আপনি কি ব্রহ্মজ্ঞানী? পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে অকপট অন্তরে স্বীকার করি, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী নই। যদি প্রশ্ন—তাহলে লিখছেন কেন? উত্তরে বলি, বেদমাতারই কথা—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ—প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৩ মন্ত্র)।

অর্থাৎ দেবতার প্রতি যে পরমভক্তি, ঠিক সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি যদি শরীর গ্রহণকারী ব্রহ্মবিদ গুরুর প্রতিও থাকে, তবে শিষ্যের হৃদয়াকাশে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়রূপে পরমাত্মা পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বা বেদজ্ঞান আপনা-আপনি উদ্ভাসিত হয়। তাছাড়া গীতা মতে— "হৃদয়ের মধ্যে যে ঈশ্বর বিরাজ করেন তিনিই সকল জ্ঞানের উৎস"। যথা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ মন্ত্র—

"সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্"—অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি আমি—আমা হতেই স্মৃতি ও জ্ঞান। গুরু-গোবিন্দের শ্রীচরণকমলের কৃপাই লেখককে বেদকথা লেখার সাহস যুগিয়েছে। গুরু-গোবিন্দের কৃপায় বোবাও বাগ্মী হয়। পঙ্গু গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়। গীতার ধ্যান মন্ত্রেও সেরূপ বলা হয়েছে—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।।

প্রথম অধ্যায়

চতুর্বেদ পরিচয়

ঋষি আপস্তম্ভ তাঁর 'শ্রৌতসূত্র'-এ বলেছেন—'মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'—অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইয়ের নাম বেদ। বেদ কথাটির মধ্যেই বেদের অর্থ নিহিত আছে। বিদ ধাতু হতে বেদ শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। বিদ ধাতুর চার প্রকার অর্থ হয়, যথা—জ্ঞান, বিচার, সত্তা ও লাভ। সহজ কথায় যে গ্রন্থে সত্য বিষয়ক সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যমান, যে গ্রন্থ দ্বারা সব সত্যবিদ্যার জ্ঞানলাভ হয়, যে গ্রন্থে বিবিধ বিষয়ের বিচার বিবেচনা করা হয়েছে, সেই গ্রন্থের নাম বেদ। ধর্ম-অধর্ম কী? কর্তব্য-অকর্তব্য কী? এইসব বিষয়ের জ্ঞান বা বোধ যে গ্রন্থের মাধ্যমে হয় তার নাম বেদ। বেদের বিবিধ্ নাম যথা,—শ্রুতি, ত্রয়ী, নিগম ও ব্রহ্ম (বাঙ্ময় ব্রহ্ম)। বেদ পূর্বে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হওয়ায়, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শুনে শুনে মনে রাখতে হতো—এই জন্য এর নাম 'শ্রুতি', কোনও কোনও বেদ-বেত্তার মতে এটা শ্রুতি শব্দের গৌণ ব্যাখ্যা। বেদের অপর নাম শ্রুতি হওয়ার মুখ্য কারণ, তপোনিষ্ঠ ঋষিরা তাঁদের বেদ বা জ্ঞান, মন্ত্ররূপে দিব্যকর্ণে শ্রবণ করেছিলেন। সত্যের বাঙ্ময় বিগ্রহ বেদের দিব্যবাণী তাঁরা ধ্যানে দর্শন করেছিলেন, তাই তাঁদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলা হয় এবং কর্ণে শুনে ওই মন্ত্র হতে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেই লব্ধ জ্ঞানের নাম শ্রুতি। বেদকে ত্রয়ীও বলা হয়। বৈদিক মন্ত্র সমূহকে ক্রিয়ার ক্রমানুসারে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনভাগে ভাগ করা হয়—চার বেদই এই ভাগের অন্তর্গত। এই জন্যেই মণ্ডুক উপনিষদে বলা হয়েছে—

"ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো অথর্ববেদঃ।" বৃহদারণ্যক উপনিষদেও উল্লেখ করা হয়েছে—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ।" অর্থাৎ মহান পরমেশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি প্রকট হওয়ার সাথে সাথে ঋক্ বেদ, যজুর্বেদ, সাম বেদ এবং অথর্ব বেদ নিঃশ্বাসের ন্যায়

সহজেই বাইরে প্রকট হল—তাৎপর্য্য পরমাত্মার নিঃশ্বাসই বেদ। এই জন্যই সায়নাচার্য তাঁর বেদভাষ্যে বলেছেন—"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যো অখিলং জগত্।" ভাবার্থ—বেদ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস, বেদ পরমেশ্বর দ্বারা নির্মিত। বেদ হতেই সমস্ত জগতের নির্মাণ হয়েছে। চতুর্বেদকে ত্রয়ী বলার কারণ—মন্ত্র পাদবদ্ধ বা চরণবদ্ধ এবং ছন্দোময় হলে হয় ঋক। গীত হলে হয় সাম। গদ্যবদ্ধ হলে হয় যজুঃ। সহজ কথায় ঋক্ পদ্য, যজুঃ গদ্য এবং সাম গান। বেদমন্ত্রে এই তিন শৈলীর প্রয়োগের জন্যেই বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হয়।

বেদের মরমি ভাষ্যকার ঋষি অনির্বাণের মতে, "ঋকেই সুর দিয়ে সাম রচিত হতো।" সুতরাং ঋক্ সংহিতার সূক্তগুলিতে আমরা পাই গীতিকাব্যের প্রাচীনরূপ। অথর্ব সংহিতায় আমরা যে মন্ত্রগুলি পাই তাদের অধিকাংশই পাদ ও ছন্দে বদ্ধ, তখন মীমাংসকের লক্ষণ অনুসারে তারাও সামান্যত ঋক্। এমনিতর সামান্যবাচী ঋক্ সংজ্ঞার ব্যবহার ঋক্ সংহিতাতেও দুর্লভ নয়।" ঋষি অনির্বাণের মতে, "অথর্ববেদ ঋক্ বেদের পরিপূরক। এই দুটি বেদই (ঋক্ ও যজু ঃ) বেদবিদ্যার উৎস।" বেদকে 'নিগম'ও বলা হয়। নিগম শব্দের অর্থ নিশ্চিতরূপে গমন করানো। যে শাস্ত্রের অধ্যায়ন ও মনন সাধককে নিশ্চিতরূপে শ্রীভগবানের নিকট গমন করায় বা নিয়ে যায় সেই শাস্ত্রের নামই নিগম বা বেদ। বেদকে ব্রহ্ম নামেও অভিহিত করা হয়। বৈদিক বিচারে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের সর্বোত্তম নাম—ওঁ। ওঁকার ব্রহ্মের বাচক (বোধক/অর্থপ্রকাশ) ও ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। ওঁকারের মধ্যে অ, উ ও ম্ এই তিনবর্ণ বিদ্যমান। এছাড়াও এক চতুর্থ বর্ণও ওঁকারের মধ্যে আছে। যার নাম অর্ধমাত্রা। ওঁকারের এই চার বর্ণ ব্রহ্মের চতুষ্পাদকে নির্দেশ করে। যথা—'অ' = অব্যয় পুরুষ, উ = অক্ষর পুরুষ, ম = ক্ষর পুরুষ এবং অর্ধমাত্রা ঁ = পরাৎপর পুরুষ। ঐতরেয় আরণ্যকের মতে—"অকারো বৈ সর্বাবাক"। অর্থাৎ 'অ'কার হতে সর্ব বর্ণের উৎপত্তি। 'অ'কারের এই মহত্বের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দশম অধ্যায়ের তেত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন—"অক্ষরানামকারোঽস্মি।" অর্থাৎ অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি (ভগবান) 'অ' কার। 'অ' বর্ণ অসঙ্গ এই জন্য অ-কারকে অব্যয় পুরুষরূপে মান্য করা হয়। 'উ'কার উচ্চারণে মুখমণ্ডল সংকুচিত হয়। এই জন্য 'উ'কারকে সঙ্গ-অসঙ্গের

মিশ্রণ বলা হয়। 'উ'কার অক্ষর পুরুষের বাচক। 'ম'কার উচ্চারণে মুখমণ্ডল সবসময়ই সংকুচিত হয়। 'ম'কার ক্ষরপুরুষ বাচক। 'ঁ' অর্ধমাত্রা পরাৎপর ব্রহ্মসূচক। বেদের প্রতিটি মন্ত্র-এর প্রারম্ভে 'ওঁ'কার উচ্চারিত হয়। 'ওঁ'কার বেদরূপ ব্রহ্মের বাচক—এই জন্যই বেদের অপর নাম ব্রহ্ম।

শিবপুরাণে বলা হয়েছে—ওঁকারের 'অ', 'উ', 'ম' ও অর্ধমাত্রা 'ঁ' (সূক্ষ্মনাদ) থেকে যথাক্রমে চতুর্বেদ নিঃসৃত হয়েছে। যেহেতু ওঁ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের রূপ তাই বেদের আর এক নাম ব্রহ্ম।

'আর্যবিদ্যা-সুধাকর' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

"বেদো নামো বেদ্যন্তে জ্ঞাপ্যন্তে ধর্মার্থকাম মোক্ষা।

অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা চতুবর্গজ্ঞান সাধনভূতো গ্রন্থ বিশেষঃ।।

অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বিষয়ক সম্যক জ্ঞান হওয়ার জন্য সাধনভূত গ্রন্থবিশেষের নামই বেদ। বেদ ভাষ্যকার সায়নাচার্যের ভাষায়—

"ইষ্ট প্রাপ্ত্যনিষ্ট পরিহারয়োর লৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থ বেদয়তি স বেদঃ" অর্থাৎ ইষ্ট বা ইচ্ছিত ফল প্রাপ্তির জন্য, আর অনিষ্ট বস্তু পরিহার বা ত্যাগের জন্য অলৌকিক উপায় (মানববুদ্ধির অতীত) যে জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ শেখায়-বোঝায় তাকেই বেদ বলা হয়। এই বেদ সৃষ্টির প্রথমে আদি পুরুষ ভগবান ব্রহ্মা যখন পরমাত্মচিন্তায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে কল্যাণময় পরমেশ্বর বা পরমাত্মার ইচ্ছায় একটি অস্ফুট নাদ ধ্বনি প্রকাশ পায়। সেই নাদ ধ্বনি হতে সর্ববেদের বীজরূপী ব্রহ্মনাম 'ওঁ' অভিব্যক্ত হয়। পরে এই 'ওঁ'কাররূপী নাদধ্বনি হতে স্বর-ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশি একে একে অভিব্যক্ত হয়। তখন ভগবান ব্রহ্মা সেই বর্ণরাশির সাহায্যে যে শব্দসমূহ উচ্চারণ করলেন, তা জগতে বেদ নামে প্রসিদ্ধ হয়। অনন্তর ভগবান ওই দিব্য বেদবিদ্যার প্রচার ইচ্ছায় মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে তা শিক্ষা দিলেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে বৈদিক জ্ঞান বা বেদবিদ্যা জগতে প্রসার লাভ করে। পরে গুরুশিষ্য পরম্পরায় তা যুগান্তর ধরে চলতে থাকে। ক্রমে দ্বাপর যুগ এল—মানুষের স্মৃতি ও মেধাশক্তি হ্রাস হয়ে পড়ল। তখন পরাশরনন্দন ব্যাসদেব বেদকে চারভাগে বিভক্ত করে তা প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত শিক্ষার মাধ্যমে স্বীয় শিষ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে পৈলকে দিলেন ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে দিলেন যজুর্বেদ, জৈমিনীকে সাম বেদ এবং

সুমন্তকে দিলেন অথর্ব বেদ। পরবর্তীকালে তাঁরাও স্বীয় স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর মাধ্যমে চতুর্বেদকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কালক্রমে এইভাবে বেদ বহুশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বেদব্যাস প্রথমে বেদকে চারভাগে বিভক্ত করলেন। তারপর যজ্ঞে ব্যবহার্য এক-এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহকে এক-এক স্থানে সংগ্রহ করে তাদের ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদরূপে গ্রন্থাকারে বিভক্ত করলেন, এবং যজ্ঞে ব্যবহার্য নয় যেসব অবশিষ্ট মন্ত্র তা যে গ্রন্থভাগে সন্নিবিষ্ট করলেন, তার নাম অথর্ব বেদ।

অনেক বিদ্বান ব্যক্তির ধারণা অথর্ব বেদ—"বেদ নহে—ইহা বেদ বহির্ভূত।" কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। অথর্ব বেদও বেদ, তবে এই বেদধৃত মন্ত্র সাধারণত যজ্ঞ-কার্যে ব্যবহৃত হয় না। ঋষি অনির্বাণের মতে—"সংহিতা বা সংগ্রহ হিসাবে বেদ চারখানি, কিন্তু মন্ত্রের রকমারি হিসাবে বেদ তিনখানি।"

প্রতিটি বেদ আবার দুইভাগে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতা। আবার মন্ত্র বা সংহিতাভাগের ওপর যে ব্যাখ্যান (বিবরণ, কথন, অর্থপ্রকাশ) তা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের তিনভাগ—শুদ্ধব্রাহ্মণ, তার সঙ্গে যুক্ত আরণ্যক, অবশেষে উপনিষদ। ব্রাহ্মণ কর্মকাণ্ডের বাচক। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ড বাচক। আরণ্যক উভয়ের মাঝামাঝি। সংহিতায় প্রধানত যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধি-নিষেধ, মন্ত্র ও অর্থবাদ (নিন্দা ও স্তুতি) প্রভৃতি বিষয় সমূহের কথা বলা হয়েছে। আবার সংহিতাভাগের যেসকল অংশে মন্ত্রের গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, সেই সকল অপ্রকাশিত অর্থ শ্রুতি বা বেদ নিজেই যে অংশে প্রকাশ করেছেন, সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্ম' শব্দ হতে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম অর্থ বৃহতের চেতনা ও শক্তি। মন্ত্রের চেতনা, মন্ত্রের শক্তি ও মন্ত্রের সাধন— এই তিন বিষয়ই প্রধান আলোচ্য। মন্ত্রের চেতনা ও শক্তির কথা সংহিতায়, সাধনার কথা ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানত স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বিষয়ের বর্ণনা। এই অংশ গদ্যে রচিত। এই ব্রাহ্মণ অংশের বিশেষ অংশকে আরণ্যক বলা হয়। "অরণ্যে উক্তিমিতি আরণ্যকম্।" যা অরণ্যে উক্ত হয়েছে, তা-ই আরণ্যক। আরণ্যকে দ্রব্যযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞে রূপান্তরিত। অরণ্যব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রে আছে তা আরণ্যক নামে অভিহিত। বানপ্রস্থ আশ্রমের অরণ্যবাসীরা এই অংশ পাঠ করত। বানপ্রস্থ

হচ্ছে বৈদিক চতুরাশ্রমের তৃতীয় আশ্রম। বৈদিক চতুরাশ্রম হচ্ছে যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বানপ্রস্থ আশ্রমে অরণ্যবাসীদের পক্ষে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। কারণ যজ্ঞে যেসব দ্রব্য সম্ভারের প্রয়োজন হয়, তা অরণ্যে থেকে অরণ্যবাসীদের পক্ষে সংগ্রহ করা ছিল দুরূহ। উচ্চস্তরের অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের জন্য তাঁদের হৃদয় ব্যাকুল হওয়ায় আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান লাভের অভিপ্রায়ে ধ্যান জপ প্রার্থনা উপাসনা ছিল তাঁদের মুখ্য কর্ম। বেদের সর্বশেষ ও সর্বোত্তম অংশ হচ্ছে উপনিষদ। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাই বিশেষভাবে আখ্যাত (কথিত) হয়েছে। উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডার। ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সারবস্তু। এই সারবস্তু উপনিষদ অংশে আখ্যাত হয়েছে বলেই উপনিষদের আর এক নাম 'বেদান্ত'। আবার অজ্ঞান নিবৃত্তির অন্তে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় বলে বেদান্তেরও অপর নাম উপনিষদ। আরণ্যকে যে অধ্যাত্মবিদ্যার সূচনা—উপনিষদে তা উত্তুঙ্গ সীমায় আরোহিত। সকল উপনিষদই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত।

সংহিতা বা মন্ত্রভাগের সঙ্গে যুক্ত যে ব্রাহ্মণ, সেই 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি ব্রহ্ম শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম যেমন বৃহতের চেতনা বা শক্তি, তেমনি আবার ওই চেতনা বা শক্তিকে অনুভব করবে মন্ত্রও। মন্ত্র কী? "মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ"—অর্থাৎ যা হতে মন পরিত্রাণ পায় তা-ই মন্ত্র। ঋষি অনির্বাণের ভাষায় মন্ত্র হচ্ছে—"ঋষির হৃদয়ে স্ফুরিত দিব্য বাক্। বাক্ বা মন্ত্রের তাৎপর্য জ্ঞানেও হতে পারে আবার কর্মেও হতে পারে। ঋক সংহিতার 'হিরণ্যগর্ভ' সূক্তটি তার একটি সুন্দর উদাহরণ। সূক্তটির ধুরায় (ধুয়ায়) আছে 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—আহুতি দিয়ে কোন দেবতার প্রতি চলবে আমাদের অভিযান? প্রত্যেকটি মন্ত্রের প্রথম তিনটি চরণে আছে সেই উদ্দিষ্ট দেবতার পরিচিতি। এখানে আহুতিসহ অভিযান হল কর্ম, আর দেবতার পরিচয় লাভ হল জ্ঞান। কর্ম করা হচ্ছে জ্ঞানের জন্যই। যেমন এই কর্ম নিয়ে বিচারের প্রয়োজন আছে, তেমনি জ্ঞান নিয়েও। তাই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মোদ্য (ব্রাহ্মণ বলতে বোঝায় ব্রহ্মসম্পর্কিত বিচার। এই বিচারের প্রাচীন নাম 'ব্রহ্মোদ্য' বা 'ব্রহ্মবাদ'। যাঁরা এতে আত্মনিয়োগ করতেন তাঁরা ব্রহ্মবাদী অথবা ব্রহ্মবাদিনী) দু-ভাগে ভাগ

হয়ে পড়ল। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হল কর্মকাণ্ডের ধারক, উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ডের। আরণ্যক দুয়ের মাঝামাঝি।" (বেদ-মীমাংসা, প্রথম খণ্ড, অনির্বাণ)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক এবং উপনিষদ নিয়েই বেদ বা শ্রুতি। কিন্তু সমগ্র বৈদিক সাহিত্য শুধু শ্রুতি বা বেদ নিয়ে গড়ে ওঠেনি। ঋষি অনির্বাণের মতে "শ্রুতির বাইরেও একটা সাহিত্য অতি প্রাচীনকাল হতেই ছিল। পরে তার সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হল 'স্মৃতি'। শ্রুতি অপৌরুষেয়, স্মৃতি তা নয়। কিন্তু তা বলে তার মর্যাদা শ্রুতির চাইতে কিছু কম নয়। এই স্মৃতির মাঝে বেদপন্থীদের আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক সকল ভাবনাই স্থান পেয়েছে।"

বলা বাহুল্য, বেদের এই চারটি ভাগের মধ্যে অর্থাৎ সংহিতা, (মন্ত্রসকল সংগৃহীত বা সংকলিত যাতে, তার নামই সংহিতা), ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এদের মধ্যে একটা ক্রমবিন্যাস আছে। যেমন প্রথমে সংহিতা, তারপর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সর্বশেষে উপনিষদ। বেদের অন্তে বা শেষ ভাগে প্রকাশ হওয়ায় উপনিষদ 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। বেদান্তের আর এক নাম ব্রহ্মসূত্র। অপরদিকে ব্যাস-শিষ্য জৈমিনী যে বেদ বিষয়ক সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'ধর্মসূত্র'। ধর্মসূত্রের বারোটি অধ্যায়। ব্যাসদেবের 'ব্রহ্মসূত্র' চার অধ্যায় বিশিষ্ট। জৈমিনীর 'ধর্মসূত্র' বা ধর্ম মীমাংসার ভিত্তি হল ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্র। ব্রাহ্মণ কী তা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন ধর্মসূত্রের বা ধর্মমীমাংসার অন্যতম ভিত্তি কল্পসূত্র কী তা জানা দরকার। যার দ্বারা যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন বা সমর্থিত হয়—তা-ই 'কল্পসূত্র'। কল্প বা কল্পসূত্র তিন প্রকার—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে যে সকল যাগ-যজ্ঞের বিবরণ আছে তা নিয়ে আলোচনা যে গ্রন্থে দৃষ্ট হয় তার নাম 'শ্রৌতসূত্র'। গৃহীলোকের করণীয় যজ্ঞাদির বির্বরণ যে গ্রন্থে আছে তাকে বলে 'গৃহ্যসূত্র'। ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধাদি নিয়ে আলোচনার বিবরণ যে গ্রন্থে আছে তার নাম 'ধর্মসূত্র'। অপরদিকে ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের ভিত্তি হল উপনিষদ। ব্রহ্মপ্রাপক পরাবিদ্যাই এই গ্রন্থের মুখ্য বিবরণীয় বিষয়। মহর্ষি জৈমিনী ও ব্যাসদেবের 'ধর্মসূত্র' ও ব্রহ্মসূত্র দুটি মিলিয়ে এক অখণ্ড মীমাংসাশাস্ত্র।

মীমাংসা শাস্ত্রকেও অনেক বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈদিক যুগে যাঁরা অগ্নির উপাসক ছিলেন তাঁদের ছিল ঋক্‌মন্ত্র। যাঁরা বায়ুর উপাসনা করতেন তাঁদের ছিল যজুঃমন্ত্র এবং যাঁরা আদিত্যের সাধনা করতেন তাঁদের ছিল সামমন্ত্র। অগ্নি-বায়ু-আদিত্য এইসব রূপক বা প্রতীকী সাধনার অর্থ কী? তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। বেদ ও বেদের একটি মোটামুটি পরিচয় এই অধ্যায়ে বিবৃত করা হল। আমরা জানতে পারলাম বেদ যেমন চারভাগে বিভক্ত। তেমনি প্রত্যেক বেদও আবার কয়েকটি অংশে বা পর্বে বিভক্ত। বেদের আছে মোটামুটি দুটি প্রধান অংশ—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতা হল মন্ত্রসমষ্টি বা মূলবেদ। ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রসমষ্টি বা মূল বেদেরই ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণের আছে তিনটি ভাগ—আসল বা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সহজ কথায়, বৈদিক সাধনার সাধারণ অনুভূতি-উপলব্ধি, দেবতাদের পূজা-পদ্ধতি প্রকাশ করার জন্য যেসব মন্ত্র, তা নিয়েই সংহিতা। যে-সকল মন্ত্রের মধ্যে বৈদিক অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, যাগ-যজ্ঞাদির উল্লেখ ও বর্ণনা এবং বেদের অঙ্গ-পরিচয়। যথা—ঋষি, মন্ত্রসংখ্যা ইত্যাদির সম্বন্ধে বিবরণ বর্ণিত আছে তার নামই ব্রাহ্মণ। উপনিষদ ও আরণ্যকের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কখনও কখনও দেখা যায় আরণ্যক হচ্ছে ব্রাহ্মণেরই নামান্তর, যথা— ঐতরেয় আরণ্যক। আবার কখনও বা আরণ্যকের অর্থ উপনিষদ, যথা— বৃহদারণ্যক উপনিষদ। বেদ-বিশেষজ্ঞদের মতে বেদের এই বিভাগ নির্মিত হয়েছে আশ্রম বিভাগ অনুসারে। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে যখন স্বাধ্যায়ই ব্রহ্মচারী সাধকের জীবনের ব্রতরূপে পরিগণিত হতো, তখন মন্ত্রভাগের ওপর জোর দেওয়া হতো। গার্হস্থ্য আশ্রমে জোর দেওয়া হতো 'ব্রাহ্মণে'-এর উপর। বানপ্রস্থে আরণ্যক ও সন্ন্যাস আশ্রমে জোর দেওয়া হতো উপনিষদ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম বা তত্ত্বজ্ঞানের ওপর। সংহিতা অধ্যাত্মবিদ্যার রূপের দিকে জোর দিয়েছে। অপরদিকে উপনিষদ জোর দিয়েছে অধ্যাত্মবিদ্যার স্বরূপের দিকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে—বেদের দুটি প্রধান বিভাগ। একটি কর্মকাণ্ড অন্যটি জ্ঞানকাণ্ড। যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়াত্মক অনুষ্ঠানের বিবরণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই জন্য এটিকে বেদের কর্মকাণ্ড

বলা হয়। উপনিষদে আছে জ্ঞানের আলোচনা, সেজন্য এটিকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। কোনও কোনও বেদ-মনীষী আরণ্যককে বেদের উপাসনাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। উপাসনাকাণ্ডকে যদি কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাহলে বেদের তিনটি বিভাগকে স্বীকার করে নিতে হয়। যথা—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড।

এখন আমরা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের লক্ষণের সঙ্গে একটু বিশেষভাবে পরিচিত হব। প্রথমে 'মন্ত্র' শব্দটির লক্ষণ কী তা দেখা যাক। আচার্য যাস্ক তাঁর বৈদিক নিরুক্ত গ্রন্থে বলেছেন—"মন্ত্রা মননাৎ"। 'মন্ত্র' শব্দটি মন ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে।

'পঞ্চরাত্র সংহিতা' মতে—স্মরণ বা মনন করার ফলে যা ত্রাণ প্রদান করে তা-ই মন্ত্র। আচার্য লৌগাক্ষি ভাস্করের মতে—" প্রয়োগ সমবেতার্থ স্মারকামন্ত্রাঃ"—অর্থাৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দ্রব্য দেবতাদির জ্ঞান যা হতে উৎপন্ন হয় তা-ই মন্ত্র। যাজ্ঞিক দৃষ্টিতে মন্ত্র চারপ্রকার—(১) করণমন্ত্র, (২) ক্রিয়ামানানুবাদি মন্ত্র, (৩) অনুমন্ত্রণ মন্ত্র, (৪) জপমন্ত্র। (১) করণমন্ত্র—যে মন্ত্র উচ্চারণের পরই কর্ম সম্পন্ন করা হয় তা করণমন্ত্র। (২) ক্রিয়ামানানুবাদি মন্ত্র—কর্মানুষ্ঠানের সাথে সাথে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় বা উচ্চারিত হয়, তা ক্রিয়ামানানুবাদি মন্ত্র। (৩) অনুমন্ত্রণ মন্ত্র—কর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তা অনুমনন মন্ত্র। (৪) জপমন্ত্র—যজমান কর্তৃক মন্ত্রাদির যথাবিবিধ উচ্চারণই জপমন্ত্র।

মন্ত্রের সঠিক প্রয়োগ বা বিনিয়োগেই মন্ত্র ফলদানে সমর্থ হয় বা অভীষ্ট ফল প্রদানে ক্রিয়াশীল হয়। মন্ত্রের মন্ত্রত্ব বা গুরুত্ব যথাযথ বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল।

ব্রাহ্মণ— ব্রাহ্মণ শব্দের উৎপত্তি ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম শব্দ হতে। ঋষি অনির্বাণের মতে—"এই ব্রহ্মের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বৃহতের চেতনা বা শক্তি। তার প্রকাশ মন্ত্রে। মন্ত্র এবং মন্ত্রশক্তি দুই-ই ব্রহ্ম। বেদের সংহিতাভাগ ব্রহ্মের আধার। ব্রহ্মকে আশ্রয় করে প্রবর্তিত যে বিদ্যা ও প্রয়োগ বিজ্ঞান তা-ই ব্রাহ্মণ।.....যাস্ক 'ব্রহ্ম' বলতে কর্মও বুঝেছেন। আমরা আধুনিক ভাষায় তাকে বলব সাধনা। মন্ত্রচেতনা মন্ত্রশক্তি এবং মন্ত্রসাধনা এই তিনটি নিয়ে বেদ। চেতনা শক্তির পরিচয় আমরা পাই বেদের সংহিতা ভাগে, আর সাধনার বিবৃতি ব্রাহ্মণভাগে। এই সাধনার সাধারণ সংজ্ঞা 'যজ্ঞ'। তার উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্রহ্মকে বা বৃহৎকে লাভ করা।" ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে বেদ ও ব্রাহ্মণ অর্থও আছে। কোনও কোনও বেদ-মনীষী বলেন ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম অর্থ বেদ—এই বেদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলেই ব্রাহ্মণ নাম হয়েছে। আবার কেউ কেউ ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম শব্দে যজ্ঞের ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত বুঝেছেন। এঁদের মতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যজ্ঞ ও যজ্ঞের বিবিধ প্রণালীর বিবরণ যে গ্রন্থে উক্ত আছে তার নাম ব্রাহ্মণ। এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম শব্দের ব্রাহ্মণ অর্থ নিয়ে কোনও সংশয় নাই। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মণ বা ব্রহ্মই ব্রাহ্মণ। তাছাড়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে ব্রহ্মা ব্যতীত ঋক্ বেদের হোতা, সামবেদের উদ্‌গাতা, যজুর্বেদের অধ্বর্যু প্রভৃতি পুরোহিত বা ঋত্বিকগণের উক্তি ও কর্তব্যের বিবরণ আছে। অতএব ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম শব্দে এখানে সকল পুরোহিত রূপ অর্থই সমীচীন। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে—"চতুর্বেদ-বিদ্ মহর্ষি ব্রাহ্মণগণের বেদ-ব্যাখ্যানের নাম ব্রাহ্মণ।" ঋষি আপস্তম্বের মতে—"যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিবরণ যে গ্রন্থে বিবৃত আছে তা-ই ব্রাহ্মণ।" তাঁর মতে ছয়টি বিষয় ব্রাহ্মণের আলোচ্য। যথা—(১) বিধি (২) অর্থবাদ (৩) নিন্দা (৪) প্রশংসা (৫) পুরাকল্প (৬) পরকৃতি। এই ছয়টি বিষয়ের আলোচনা করলে, ব্রাহ্মণের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

(১) বিধি—বিশেষ বিশেষ কর্মানুষ্ঠানের জন্য যে নিয়ম বা নির্দেশ তা-ই বিধি।

(২) অর্থবাদ—ঋষি আপস্তম্ব বলেন, কর্মের অভিমুখে প্রেরিত করে যে সব বিধি তা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের অবশিষ্ট বা শেষভাগই অর্থবাদ। 'বেদের পরিচয়' গ্রন্থের প্রণেতা যোগীরাজ বসু বলেন—"ইহার মধ্যে দর্শনগত, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই সকল অর্থবাদ প্রবচনে পরবর্তী দর্শন, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের বীজ নিহিত আছে।"

(৩) নিন্দা—যা বেদানুগত বা বেদবিহিত নয় এরূপ বিরোধী মতের সমালোচনা খণ্ডন ও পরিহারকেই নিন্দা বলা হয়।

(৪) প্রশংসা—যা বেদানুগ বা বেদসম্মত ক্রিয়া—তারই স্তুতি করাকে প্রশংসা বলে। প্রশংসিত শ্রৌতক্রিয়াদি করা উচিত এবং নিন্দিত অবৈদিক কর্ম সমূহ বর্জন করা উচিত।

(৫) পুরাকল্প—অতি সুপ্রাচীনকালে যেসব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাদের পুরাকল্প বলে।

(৬) পরকৃতি—'পরের কৃতি বা কার্যকে' পরকৃতি বলে। যজ্ঞ পারদর্শী, অভিজ্ঞ খ্যাতনামা শ্রোত্রিয় বা পুরোহিতগণের কীর্তি এবং বিখ্যাত নৃপতিগণের যজ্ঞ-দান-দক্ষিণা ইত্যাদির কার্যাবলীর বর্ণনাকেও পরকৃতি বলে।

আরণ্যক—পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যা অরণ্যে উক্ত বা কথিত হয়েছে তা-ই আরণ্যক। আরণ্যকে দ্রব্যযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞের রূপগ্রহণ করেছে। আরণ্যককে অধ্যাত্ম জ্ঞানের অনুশীলন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্মবিদ ঋষিগণ লোকালয় থেকে দূর নির্জন অরণ্যে বাস করতেন এবং এই অরণ্যেই অন্তেবাসী ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্যা দান করতেন। সেইজন্য এই বিদ্যা যে গ্রন্থে বিবৃত আছে তাকেই আরণ্যক বলে। অরণ্য শব্দের এক অর্থ ব্রহ্ম, আবার অরণ্য অর্থাৎ নিবিড় ও গভীর। বেদের এই অংশ মানুষকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম পথের যাত্রী হতে প্রেরণা দেয়।

উপনিষদ—আরণ্যকে যে অধ্যাত্ম বা ব্রহ্মবিদ্যার সূচনা, উপনিষদে তা চরম উৎকর্ষের পর্যায়ে উন্নীত। উপনিষদ শব্দটির অর্থের মধ্যেই রয়েছে তার ইঙ্গিত। 'উপ' অর্থাৎ নিকটে বা সমীপে, 'নি' অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে বা নিঃশেষে, 'সদ' ধাতুর অর্থ জীর্ণ করা, বিনাশ করা ও গমন। যে বিদ্যার অনুশীলন মানুষের অজ্ঞান অথবা অবিদ্যাকে নিঃশেষে জীর্ণ বা বিনষ্ট করে, সেই বিদ্যার নাম উপনিষদ। জীবের অজ্ঞান-অবিদ্যাকে নাশ করে, জন্ম-মৃত্যুর কারণকে বিনষ্ট করে, যে বিদ্যা পরমজ্ঞান প্রদান করে, মুমুক্ষুকে পরমব্রহ্মের বা পরমাত্মার নিকট নিয়ে যায়, পরম ব্রহ্মপ্রাপ্তি সাধনরূপ সেই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাকে উপনিষদ বলে। বেদের চরম ও পরমজ্ঞান উপনিষদেই বিধৃত। উপনিষদের আর এক নাম রহস্য— বেদের চরম রহস্য এখানেই নিহিত, সে-জন্যই এই

নাম হয়েছে। বেদের ব্রহ্মবিদ্যা বলতে উপনিষদকেই বোঝায় এবং এটাই উপনিষদের মুখ্যার্থ। গৌণ অর্থে উপনিষদ হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যার আকরগ্রন্থ সমূহ। প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার-এর উপনিষদ প্রসঙ্গে বিখ্যাত উক্তিটি এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপনিষদ সম্পর্কে তাঁর অমর উক্তি—"Upanisad has been the solace of my life; it will be the solace of my death." অর্থাৎ উপনিষদ আমার জীবনে শান্তি প্রদান করেছে, মৃত্যুর পর এই উপনিষদই আমার মৃত্যুকে শান্তিময় করবে। উপনিষদ যে তাঁর প্রাণে গভীর প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, এই উক্তিই তার প্রমাণ। বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের সঙ্গে আমরা কিঞ্চিৎ পরিচিত হলাম। এখন চতুর্বেদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ আছে, সেগুলির নামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক :

ঋক্ বেদের ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ও কৌষীতকী বা শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ।

ঋক্ বেদের আরণ্যক—ঐতরেয় আরণ্যক ও কৌষীতকী বা শাংখ্যায়ন আরণ্যক।

ঋক্ বেদের উপনিষদ—ঐতরেয় ও কৌষীতকী বা শাংখ্যায়ন উপনিষদ।

সাম বেদের ব্রাহ্মণ—তাণ্ড্য ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ।

সাম বেদের আরণ্যক—ছান্দোগ্য আরণ্যক।

সাম বেদের উপনিষদ—ছান্দোগ্য ও কেন উপনিষদ।

যজুর্বেদের দুটি ভাগ—কৃষ্ণ-যজুর্বেদ ও শুক্ল-যজুর্বেদ।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের আরণ্যক—তৈত্তিরীয় আরণ্যক

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের উপনিষদ— কঠো শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয় ও মহানারায়ণ উপনিষদ।

শুক্ল-যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ—শতপথ ব্রাহ্মণ।

শুক্ল-যজুর্বেদের আরণ্যক—বৃহদারণ্যক।

শুক্ল-যজুর্বেদের উপনিষদ— বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদ।

অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ—গোপথ ব্রাহ্মণ। এই বেদের কোনও আরণ্যক নেই।

অথর্ব বেদের উপনিষদ—মুণ্ডক, মাণ্ডক্য ও প্রশ্নোপনিষদ।

উপরে উল্লিখিত উপনিষদগুলি ছাড়াও আরও বহু উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত মোট ১০৮ খানি উপনিষদের সন্ধান পাওয়া গেছে—সবগুলি শ্রৌত উপনিষদ নয়। পরবর্তীকালে বা বৈদিকোত্তর যুগে এগুলি রচিত হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে শ্রৌত ও অশ্রৌত উভয়বিধ উপনিষদ নিয়ে এক-একটি বেদের বহু সংখ্যক উপনিষদ দেখা যায়।

এখন বেদের শাখা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। পুরাণে বেদের বহু শাখার উল্লেখের বিবরণ পাওয়া যায়। বেদের শাখা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মন্তব্য—"শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন" অর্থাৎ গুরু-শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য বা প্রশিষ্য, আবার প্রশিষ্যের শিষ্য এই ভাবে ধারাবাহিক ক্রমে চলে আসার সময়ে চার বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়। বিষ্ণুপুরাণ এবং কূর্মপুরাণেও বেদের শাখার তালিকা পাওয়া যায়।

ঋক্ বেদের একুশ শাখা, যজুর্বেদের একশত শাখা, সাম বেদের সহস্র শাখা এবং অথর্ব বেদের নয়টি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। কূর্মপুরাণের চল্লিশ অধ্যায়ে বেদের শাখা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। "একবিংশতি ভেদেন ঋক্ বেদং কৃতবান্ পুরা। শাখানং তু শতেনাথ যজুর্বেদমথাকরোৎ।। সামবেদং সহস্রেন শাখানং চ বিভেদতঃ। অথর্বানমথ বেদং বিভেদ নবকেন তু।।" সুধী সমাজে বেদের শাখা সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা আছে। অনেক বিদ্বান ব্যক্তি মনে করেন এবং লেখেনও যে মূল সংহিতা গ্রন্থ শাখা ভেদে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইসব বিদ্বৎজনদের মতে মূল সংহিতা শাখা আকারে পৃথক পৃথক রূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাঁরা মনে করেন এক-একটি শাখা সেই মূলসংহিতার বা বেদের নবরূপ; একটি অন্যটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা বা স্বতন্ত্র। অর্থাৎ যত শাখা তত সংহিতা—এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল। কারণ শাখাভেদে সংহিতার বা বেদের ভেদ হয় না। একটি সংহিতা বা বেদের বহু শাখা থাকলেও মূল সংহিতা বা বেদের আক্ষরিক রূপ এক ও অবিকৃত থাকে। এই কারণেই এক বেদের যে কোনও একটি শাখা অধ্যয়ন করলেই সেই বেদের অধ্যয়ন হয়ে যায়।

বেদ-মনীষীদের মতে ঋক্ সংহিতার শাকল শাখা বা বাস্কল শাখা কিংবা আশ্বলায়ন শাখা, যে কোনও একটি শাখা অধ্যয়ন করলেই তা ঋক্ সংহিতার বা ঋক্ বেদের অধ্যয়ন বলে গণ্য হবে। বেদের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তি ও ভেদের কারণ কী? বেদজ্ঞ সন্ত আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমের মতে—"অধ্যয়নভেদ এব শাখাভেদ নিদানং নতু গ্রন্থ ভেদ ইতি।

ঐকেক বেদস্য অনেক শাখাত্বে অপি তাত্ত্বিক ভেদাভাবাৎ।।"

অর্থাৎ অধ্যয়ন ভেদই শাখার উৎপত্তি ও ভেদের কারণ। মূল গ্রন্থের ভেদ শাখা ভেদের নিমিত্ত নয়। এক-একটি বেদের অনেক শাখা থাকা সত্ত্বেও মূল সংহিতা বা বেদের ভেদ হয় না। যুগ যুগ ধরে গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদ শ্রুতির মাধ্যমে অধীত হয়ে আসার ফলে বেদের অধ্যয়নের, বেদমন্ত্র আবৃত্তির ও উচ্চারণের নানাপ্রকার ভেদই বেদের শাখা ভেদের কারণ। বলাবাহুল্য, সংহিতা ভেদ শাখা ভেদের কারণ নয়।

বেদের শাখা ভেদ ও উৎপত্তির কারণ অধ্যয়ন ভেদ। এই অধ্যয়ন ভেদ বলতে পারায়ণের অর্থাৎ নিয়মিত সময়ের মধ্যে গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ, উচ্চারণের, স্বরের, সুরের, জিহ্বা সঞ্চালন ও অঙ্গুলি সঞ্চালনের পৃথক পৃথক রীতি বুঝতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম 'শতপথ ব্রাহ্মণ'। তার দুটি শাখা কান্ব ও মাধ্যন্দিন। মাধ্যন্দিন শাখায় অন্তস্থ 'য' এর উচ্চারণ বর্গীয় 'জ' এর ন্যায়। মূর্ধণ্য 'ণ' এর উচ্চারণ 'খ' এর মতো এবং বিসর্গ (ঃ) উচ্চারণে অঙ্গুলি সঞ্চালন নিষিদ্ধ। মাধ্যন্দিন শাখায় মাত্র দুইটি স্বরের প্রয়োগ আছে—উদাত্ত এবং অনুদাত্ত। সাধারণত বেদ মন্ত্রের উচ্চারণে তিনটি স্বরের প্রয়োগ হয়। যথা—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। বৈদিক স্বর প্রসঙ্গে পরে তা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

উপরের আলোচনা হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে বেদ বলতে শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ বোঝায় না। মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-অরণ্যক-উপনিষদ-শাখা নিয়ে বেদ যেন এক বিশাল গ্রন্থালয়। এই জন্যই প্রখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ্ ভিন্টার নিৎস—(Winter nitz) তাঁর "History of India Literature" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন—

"It (The Veda) does not mean one single literary work, as for instance the word 'Koran', nor a complete collection of a certain number of books, compiled at some particular time as the

word 'Bibble' or as the word 'Tipitaka', the Bibble of the Buddhists,but a whole great literature which arose in the course of many centuries and through centuries has been handed down from generation to generation by verbal transmission"—অর্থাৎ ভিন্টার নিৎস বলছেন—"বেদ বলতে একটি মাত্র পুস্তক বোঝায় না—যেমন 'কোরাণ' বলতে বোঝায়, অথবা 'বাইবেল' বলতে বোঝায় বা বৌদ্ধদের 'ত্রিপিটক' বা 'তিপিটক' বলতে কোনও এক সময়ে কয়েকটি খণ্ড একত্রে সন্নিবেশপূর্বক একটি ধর্মগ্রন্থ রচনা বোঝায়; বেদ বলতে তেমন গ্রন্থ রচনা বোঝায় না। বেদ একটি বিশাল অখণ্ড সাহিত্য যা যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে এবং যুগ যুগ ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে চলে আসছে"।

বলাবাহুল্য, পরবর্তীকালে শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় চার বেদ বহুশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বেদের শাখা সম্পর্কে নানা মতভেদও দেখা যায়। সর্বসমেত চার বেদের মোট ১১৮০টি শাখা। বর্তমানে এই সকল শাখা-প্রশাখার অধিকাংশই বিলুপ্ত। প্রসঙ্গত সুধী পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই, শাখা বলতে যেমন বৃক্ষের অংশ বিশেষকে বোঝায় বেদের ক্ষেত্রে সেরূপ অংশ বিশেষকে বোঝায় না, বেদের এক-এক শাখা অর্থে এক-এক সংস্করণ বুঝতে হবে। যে কোনও বেদের প্রত্যেক শাখায় সেই বেদের পূর্ণাঙ্গ বিদ্যমান আছে। বেদের একটা পরিচয় আমরা পেলাম। এবার বেদাঙ্গের পরিচয় নেওয়া যাক, কারণ বেদার্থ বুঝতে হলে বেদাঙ্গের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেদাঙ্গ পরিচয়

সাধারণ অর্থে বেদাঙ্গ হচ্ছে বেদের বাস্তবিক অর্থের দিগ্‌দর্শনকারী। শাস্ত্রবিদ্‌রা বলেন —"অঙ্গয়ন্তে = ভগয়ন্তে অমীভিরিতি অঙ্গানি" অর্থাৎ যে উপকরণের দ্বারা কোনও তত্ত্বের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়, তাকেই অঙ্গ বলা হয়। সার কথাটা হচ্ছে বেদের অর্থ-জ্ঞান নিরূপণে ও তার কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদান করে যে শাস্ত্র, বেদবিদ্‌গণ তাকেই বেদাঙ্গ নামে অভিহিত করেন। বেদাঙ্গ ছয় প্রকার—

(১) শিক্ষা (২) কল্প (৩) ব্যাকরণ (৪) নিরুক্ত (৫) ছন্দ (৬) জ্যোতিষ।

বেদবিদ্‌গণের মতে শিক্ষা হচ্ছে বেদের নাসিকা, কল্প হচ্ছে বেদের হস্ত, ব্যাকরণ বেদের মুখ, নিরুক্ত বেদের কর্ণ, ছন্দ বেদের চরণ, জ্যোতিষ বেদের চক্ষু। অঙ্গ ব্যতীত যেমন অঙ্গধারীর পরিচয় পাওয়া যায় না, সেরূপ বেদাঙ্গ না জানলে বেদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। এবার আমরা বেদাঙ্গের সাথে পরিচিত হব।

শিক্ষা—ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষার স্থান প্রথমে। শিক্ষাকে বেদের নাসিকা বা ঘ্রাণ বলা হয়েছে—"শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য।" শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য বলেছেন—"স্বরবর্ণাদ্যুচ্চারণ প্রকারো যত্র শিক্ষ্যয়তে উপদিশ্যতে সা শিক্ষা" অর্থাৎ স্বর এবং বর্ণাদির উচ্চারণের প্রকরণ শিক্ষা এবং উপদেশ যেখানে দেওয়া হয়েছে, তাকেই শিক্ষা বলে। ইংরাজিতে শিক্ষাকে Phonetics বা ধ্বনি বিজ্ঞান বলে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষাশাস্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"অথশিক্ষাং ব্যাখ্যাসামঃ—বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বলম্, সাম, সন্তান ইত্যুক্ত শিক্ষাধ্যায়ঃ"—বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, সন্তান এই বিষয়গুলির বিবরণ শিক্ষাগ্রন্থেই আছে। প্রথমে বর্ণ নিয়ে আলোচনা অর্থাৎ 'অ'কারাদি স্বরবর্ণ অথবা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী। দ্বিতীয় স্বর

অর্থাৎ কণ্ঠের উচ্চারণ-বিধি, যেমন উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—মুখ্যত বেদের স্বর এই তিনরকমের। উঁচু স্বরে উচ্চারণের জন্য উদাত্ত, মন্দ স্বরে উচ্চারণের জন্য অনুদাত্ত এবং উভয় স্বরের মিশ্রণ বা সমাবেশে উচ্চারিত হওয়ার জন্য বেদের তৃতীয় স্বরকে স্বরিত বলা হয়।

এরপর 'মাত্রা'। মাত্রা তিন রকমের—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। তারপর 'বল'। 'বল' অর্থাৎ বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ-প্রযত্ন। এরপর 'সাম' ও 'সন্তান'। সাম অর্থাৎ উচ্চারণে সমতা, তাল লয় মেনে শব্দের বা পদের যথাযথ উচ্চারণই সাম নামে অভিহিত। 'সন্তান' অর্থাৎ পূর্ববর্ণ ও উত্তরবর্ণের মিলনে যে শব্দের বা পদের বিন্যাস ঘটে বা উদ্ভব হয় তাকে সন্তান বলে। এগুলি কেন শিক্ষণীয়? বেদ আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার। বিশুদ্ধ ব্যাকরণ ছাড়া বেদের মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হলে বেদের অন্তর্নিহিত অর্থ কখনও বোধগম্য হবে না। তাই বেদ পাঠের আগে উপনিষদের ঋষি বলছেন—এগুলি অবশ্যই শিক্ষণীয়। প্রত্যেক বেদের পৃথক পৃথক শিক্ষাগ্রন্থ ছিল। এখন তা দুষ্প্রাপ্য। সাম বেদে নারদ শিক্ষা, যজুর্বেদে যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা ও অথর্ব বেদে মাণ্ডুক্য শিক্ষা (উবট-ভাষ্যসহ) প্রকাশিত হয়েছে। ঋক্ বেদের কোনও শিক্ষাগ্রন্থ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এই জন্য পাণিনির শিক্ষাকেই ঋগ্বেদীয় শিক্ষা ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেদ-অধ্যয়নের প্রাচীন পদ্ধতি ছিল প্রথমে আচার্য স্বর-সহ কোনও বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, অতপর শিষ্য সাবধানতার সঙ্গে সেই মন্ত্র শুনে তাঁর উচ্চারণ (আচার্যের) অনুসরণ করত। এই জন্য বেদের আর এক নাম অনুশ্রব। অনুশ্রব অর্থাৎ পশ্চাৎ যা শোনা যায় বা শোনা হয়। এই জন্যেই বলা হয়—"গুরোর্মুখাদনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবো বেদঃ।"

কল্পসূত্র—বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির সমর্থনে যে-সকল গ্রন্থ রচিত হয় তা-ই কল্পশাস্ত্র। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ বহুধাবিস্তৃত এবং নানা আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। তার আখ্যায়িকা প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি প্রক্রিয়া নিয়ে সূত্রাকারে যে গ্রন্থ রচিত তাকেই কল্পসূত্র বা কল্প নামক বেদাঙ্গ বলা হয়। কল্পকে বেদের হস্ত বলা হয়। 'কল্প' এবং 'সূত্র' দুটি শব্দের সংযোগে 'কল্পসূত্র' শব্দটি রচিত, যার দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত বা সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলে এবং 'সূত্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপ। বৈদিকশাস্ত্রের

ইতিহাসে 'কল্পসূত্রের' আবির্ভাব এক নবযুগের সূচনা করে। প্রাচীন বৈদিক যুগে অনেকের পক্ষেই বেদের জ্ঞান আয়ত্ত করা ছিল একান্তই দুরূহ। রহস্যময় বেদের জ্ঞান অর্জনের পথে এই দুরূহতাকে দূর করার জন্য কল্পসূত্রের আবির্ভাব। কল্পসূত্রের প্রধানত তিনটি বিভাগ, যথা—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। কেউ কেউ বলেন শুল্বসূত্রও কল্পসূত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এতে জ্যামিতি আদির বিবরণ থাকায় অনেকে এটিকে একটি পৃথক সূত্র বলে মনে করেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত যাগ-যজ্ঞাদি নিয়ে আলোচনা যে গ্রন্থে আছে তাকে শ্রৌতসূত্র বলে। গৃহীলোকের করণীয় সংস্কার ও যাগ-যজ্ঞাদি যাতে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ আছে তাকে গৃহ্যসূত্র বলে।

ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধের উল্লেখ ও আলোচনা যে গ্রন্থে আছে তার নাম ধর্মসূত্র। চতুর্বর্ণ ও চার আশ্রম সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম ধর্মসূত্রকার রচনা করে গিয়েছেন। কল্পসূত্রের অন্তর্গত এই তিনপ্রকার সূত্রগ্রন্থ ছাড়াও 'শুল্বসূত্র' নামে আর এক প্রকার সূত্রগ্রন্থের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। 'শুল্ব' শব্দের অর্থ মাপের জন্য ব্যবহৃত রজ্জুখণ্ড। বেদ-বিহিত বিবিধ প্রকারের যজ্ঞবেদি ইত্যাদির নির্মাণকালে ভূমির পরিমাপ এবং বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণাকৃতি প্রভৃতি বিধি আকার নির্ধারণ করার জন্য যে-সকল প্রণালী অবলম্বন করা হতো তার বিবরণ 'শুল্বসূত্রে' পাওয়া যায়। সুতরাং কল্প নামক বেদাঙ্গ বলতে আমরা শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্রকেই বুঝব। সকল বেদের চারপ্রকার সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় না। কোনও কোনও বেদের পাওয়া যায়। উপরোক্ত চার প্রকারের কল্পসূত্র সাহিত্যে বৈদিক যুগের আর্যদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার বিধি-নিয়ম প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে সমগ্র কল্পসূত্র-সাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এক অমূল্য নিদর্শন।

ব্যাকরণ—বেদের ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ হচ্ছে তৃতীয় ও প্রধান অঙ্গ। পাণিনিয় শিক্ষায়—'মুখং ব্যাকরণম্ স্মৃতম্' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাকরণ হচ্ছে বেদের মুখ। ব্যাকরণকে বেদের মুখ বলায়—এই শাস্ত্রের মুখ্যত্ব বা প্রধানত্ব স্বয়ংসিদ্ধ হয়েছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। মুখ না দেখলে যেমন মানুষকে চেনা যায় না, তেমনি ব্যাকরণ ব্যতিরেকে বেদের ভাষাকে চেনা বা বোঝা যায় না। এই জন্যই বলা হয়—"ব্যাকরণং বৈ মুখং বেদানাম্" অর্থাৎ ব্যাকরণই

বেদের মুখ। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ ব্যাকৃত করা, উন্মুক্ত করা, বিভাজন বা বিভক্ত করা। যা অখণ্ড অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাকে অব্যাকৃত বলে এবং যাকে বিভাজন বা বিভক্ত করা হয়েছে, অখণ্ড রূপটি ভেঙ্গে খণ্ড করা হয়েছে, তাকে ব্যাকৃত বলে। সংস্কৃত শব্দগুলি অব্যাকৃত থাকে। ব্যাকরণ তাকে ব্যাকৃত করে। কোনও ভাষা আয়ত্ত করতে হলে প্রথমেই সেই ভাষার ব্যাকরণ-জ্ঞান অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদি ব্যাকরণজনিত জ্ঞান না থাকলে কখনওই কোনও ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। বেদাঙ্গরূপে বর্তমানে পাণিনি রচিত ব্যাকরণই পাওয়া যায়। পাণিনি ব্যতীত অন্যান্য ব্যাকরণ থাকলেও (যথা—মুগ্ধবোধ, কলাপ, সারস্বত ইত্যাদি)। একমাত্র পাণিনি ব্যাকরণেই বৈদিক ব্যাকরণের আলোচনা দেখা যায়।

ভর্তৃহরি তাঁর রচিত 'বাক্যপদীয়' নামক ব্যাকরণ দর্শনে, ব্যাকরণকে অপবর্গের দ্বার অর্থাৎ মোক্ষলাভের সাধন বলেছেন এবং বিদ্যাস্থানের মধ্যে অতি পবিত্র বাঙ্‌মলের বা শব্দদোষের চিকিৎসকরূপে বর্ণনা করেছেন, যথা—

"তদ্দ্বারম্ অপবর্গস্য বাঙ্‌মলানাং চিকিৎসিতম্।
সর্ববিদ্যাপবিত্রোহয়মধিবিদ্যাং প্রকাশতে।।

সুতরাং বেদ অধ্যয়ন করে বেদের বা অন্যান্য মোক্ষ বিষয়ক শাস্ত্রের জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই কারণেই ব্যাকরণকে ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে—'বেদানাং বেদম'। ভারতবর্ষে বেদাঙ্গ রূপেই ব্যাকরণের প্রথম আবির্ভাব। বেদের রক্ষা, যজ্ঞের প্রয়োজন অনুযায়ী মন্ত্রের কোনও শব্দের পরিবর্তন এবং অর্থ নিয়ে কোনও দ্বিধা বা সংশয় জাগলে তার নিরসনেও ব্যাকরণ বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই জন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন—"রক্ষার্থং বেদনামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্" অর্থাৎ বেদ বা বৈদিক সাহিত্যকে রক্ষা করতে হলে ব্যাকরণের প্রয়োজন।

ব্যাকরণের প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, লোপ-আগম, বর্ণের বিকার, অন্বিত-কৃৎ ইত্যাদি যে না জানে সে বেদ অধ্যয়ন করতে বা বুঝতে কখনই সমর্থ হবে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানে বেদাঙ্গ রূপে একমাত্র পাণিনি ব্যাকরণই স্বীকৃত। মহাবৈয়াকরণিক পাণিনি রচিত ব্যাকরণ শাস্ত্রটির নাম—'অষ্টাধ্যায়ী'। মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বলে গ্রন্থটিকে 'অষ্টাধ্যায়ী'

বলা হয়। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারটি করে খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলির নাম 'পদ'। আটটি অধ্যায়ের সূত্রসংখ্যা সর্বমোট ৩৯৮৩। আটটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সংক্ষেপিত নিম্নরূপ—

প্রথম অধ্যায়—সংজ্ঞা, পরিভাষা।
দ্বিতীয় অধ্যায়—সমাস, বিভক্তি।
তৃতীয় অধ্যায়—নামধাতু, কৃৎপ্রত্যয়, ধাতুরূপ
চতুর্থ অধ্যায়—স্ত্রীপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়।
পঞ্চম অধ্যায়—তদ্ধিত প্রত্যয়, সমাসান্ত প্রত্যয়।
ষষ্ঠ অধ্যায়—লিট্, সন্ধি, স্বর, অলুক্‌সমাস, দীর্ঘত্ব, বর্ণলোপ, আদেশ।
সপ্তম অধ্যায়—বর্ণাগম, নিপাতন, আদেশ।
অষ্টম অধ্যায়—শব্দদ্বিত্ব, নিপাতন, সাধারণ স্বর, প্লুতি, ষত্ব, ণত্ব।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্রাহ্মণই বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন, যে ব্রাহ্মণ বৈদিক বাক্যের পদ, অক্ষর, বর্ণ ও স্বর বিশ্লেষণ করতে অসমর্থ, তিনি শ্রৌতযজ্ঞের অনধিকারী বলে গণ্য হতেন। ব্যাকরণের জ্ঞান ব্যতিরেকে বৈদিক সাহিত্যের জ্ঞান আহরণ করা কোনওক্রমেই সম্ভব নয়।

নিরুক্ত—ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্তের স্থান চতুর্থ। 'নির' অর্থাৎ নিঃশেষরূপে বেদ মন্ত্রের পদ সমূহের ব্যাখ্যা যাতে উক্ত বা কথিত হয়েছে তাকেই নিরুক্ত বলা হয়। নিরুক্ত বেদাঙ্গের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এককথায় নিরুক্ত হল বেদের অভিধান। 'নিঘন্টু' নামে শব্দ কোষ অবলম্বনে 'নিরুক্ত' রচিত হয়। মহামুনি যাস্কাচার্য বা যাস্ক এই গ্রন্থের রচয়িতা। অনেকে মনে করেন যাস্কাচার্য 'নিরুক্ত' এবং 'নিঘন্টু', উভয় গ্রন্থেরই রচয়িতা। কিন্তু অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে যাস্ক্ নিরুক্তের রচয়িতা, নিঘন্টুর নন। মহাভারতের মোক্ষধর্ম পর্বে প্রজাপতি কশ্যপকে 'নিঘন্টু'র রচয়িতা বলা হয়েছে। আবার মহাভারতের শান্তিপর্বে নিরুক্তকার 'নিঘন্টু'র রচয়িতা বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে 'নিঘন্টু'র পর 'নিরুক্ত'র রূপে যাস্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে 'নিঘন্টু' নামক শব্দকোষ অবলম্বনে যাস্কমুনি 'নিরুক্ত' রচনা করেন—সেই 'নিঘন্টু'র তিনটি বিভাগ, যথা—নৈঘন্টুক কাণ্ড, নৈগমকাণ্ড

এবং দৈবতকাণ্ড। 'নিঘন্টুর' এই তিন বিভাগই নিরুক্তের তিন কাণ্ডরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

নৈঘন্টুক কাণ্ড—নৈঘন্টুক কাণ্ডের পাঁচ অধ্যায়। নৈগম কাণ্ডের ছয় অধ্যায় এবং দৈবত কাণ্ডের ছয় অধ্যায়। সর্বসমেত সতেরোটি অধ্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে আছে। নৈঘন্টুক কাণ্ডকে সংক্ষেপে নিঘন্টু বলা হয়। অনেকে এই কাণ্ডকে শব্দার্থ কাণ্ডও বলেন। সহজ কথায় সমানার্থকপর্যায় শব্দের উপদেশ যে গ্রন্থে বিবৃত আছে তার নামই নিঘন্টু। পৃথিবী বাচক একুশটি, রাত্রির তেইশটি, দিবসের বারোটি, এবং উষার ষোলটি পর্যায়শব্দ বা নাম-এর উল্লেখ এতে আছে।

নৈগম কাণ্ড—নিগম শব্দ হতে নৈগম শব্দের উৎপত্তি। নিগম শব্দের অর্থ বেদ। যাস্ক বেদ অর্থেই নিগম শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা—'ইত্যনি নিগমো ভবতি'—কথাটি একাধিকবার গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ ''বেদে এইরূপ আছে।'' এই জন্যই বেদে যে-সকল শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ আছে তার অধিকাংশই নৈগম নামক দ্বিতীয় কাণ্ডে নির্ণীত হয়েছে। এককথায় নৈগম কাণ্ডে অনেকার্থবাচক শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দৈবত কাণ্ড—দেবতানামের বিশ্লেষণ বা আলোচনা নিয়েই নিরুক্তের তৃতীয় কাণ্ড—দৈবত কাণ্ড। দৈবত কাণ্ডটির অধ্যয়নে বৈদিকযুগের ঋষির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও অদ্ভুত গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ভূলোক, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকভেদে দেবতাদের তিনটি শ্রেণী করে প্রতি দেবতার নিবাসস্থান, বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ, রূপের বর্ণনা, কোন দেবতার মন্ত্র কোন ছন্দে রচিত ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দেবতাদের মধ্যে অগ্নি পৃথিবীতে নিবাস করেন তাই তিনি আমাদের নিকটতম, সূর্য দ্যুলোকে বিরাজ করেন তাই তিনি দূরতম। এই অগ্নি ও সূর্যের মধ্যে সকল দেবতা বিদ্যমান। ভূলোকের প্রধান দেবতা অগ্নি, অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোক বা ব্যোমের প্রধান দেবতা সূর্য বা আদিত্য। এইসব দেবতাদের নাম ও নিবাসস্থান ভিন্ন ভিন্ন হলেও, তাঁরা একই পরমাত্মার অংশবিশেষ। মহামুনি যাস্কাচার্য বলেছেন—'দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে;

একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যাঙ্গনি ভবন্তি'—অর্থাৎ দেবতাদের এক আত্মা বহুরূপে বহুনামে কীর্তিত হয়। একই আত্মার প্রত্যঙ্গস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, দেবতাদের সাকার নিরাকার উভয়বিধ বর্ণনাই এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উল্লেখও নিরুক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা—অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ অগ্নি এবং পার্থিব অগ্নির মধ্যে পার্থক্য কী? যাস্ক বলেছেন অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ-অগ্নির জন্ম জল হতে এবং যখন সেই বিদ্যুৎ অগ্নি (বজ্ররূপে) পৃথিবীর কোনও স্থূলবস্তুর ওপর পতিত হয় তখন তা নির্বাপিত হয়। কিন্তু পার্থিব অগ্নি কাষ্ঠাদি বস্তু সমূহকে আশ্রয় করে প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু জল পড়লেই ওই অগ্নি নিভে যায়। এই গ্রন্থের একস্থানে সূর্য ও চন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে........আদিতোহস্য দীপ্তিভবতি'—অর্থাৎ সূর্যের তেজের একাংশ চন্দ্রকে আলোকিত করে। চন্দ্রের যে আলো বা দীপ্তি তা প্রকৃত পক্ষে সূর্যেরই। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ব্যাকরণ শব্দনিষ্ঠ অর্থাৎ ব্যাকরণের আলোচনা শব্দ নিয়ে, অপরদিকে নিরুক্ত অর্থনিষ্ঠ অর্থাৎ শব্দের অর্থকে নিয়ে নিরুক্তের আলোচনা বা বিশ্লেষণ।

ছন্দ—ছন্দ পঞ্চম বেদাঙ্গরূপে অভিহিত। মহামুনি যাস্ক-এর মতে ছন্দ শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে 'ছদ্' ধাতু হতে যার অর্থ আবরণ। এককথায় ছন্দ হচ্ছে বেদের আবরণ। পাণিনিয় শিক্ষায় বলা হয়েছে—''ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য''—অর্থাৎ ছন্দ হচ্ছে বেদের পদ বা পা। পদহীন মানুষকে যেমন খোঁড়া বা খঞ্জ বলা হয় তেমনই ছন্দহীন বেদ খঞ্জ বা খোঁড়া। বেদমন্ত্র জ্ঞানের বা উচ্চারণের জন্য ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য। প্রচলিত লৌকিক ধারণানুযায়ী পদ্যের সঙ্গে ছন্দের সম্বন্ধ গদ্যের সঙ্গে নয়। বৈদিক ছন্দ বিষয়ে এই ধারণা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন আর্য-পরম্পরা অনুসারে গদ্যকেও ছন্দযুক্ত মানা হয়। বেদ মনীষী দুর্গাচার্য নিরুক্তের ব্যাখ্যায় বলেছেন—'নাচ্ছন্দসি বাগুচ্চরতি'— অর্থাৎ ছন্দ বিনা বাণী বা বাক্য উচ্চারিত হতে পারে না। চার বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। বেদে সাতটি মুখ্য ছন্দ আছে। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জনাতী। বেদের ছন্দ অক্ষরভিত্তিক বলে একে অক্ষর-ছন্দও বলা হয়। অক্ষর গণনা করে বৈদিক ছন্দ নির্ণয় করতে হয়। সাতটি বৈদিক ছন্দের মোট অক্ষর সংখ্যা নিম্নে প্রকাশিত করা হল—

ছন্দ	অক্ষর
গায়ত্রী	২৪
উষ্ণিক	২৮
অনুষ্টুপ	৩২
বৃহতী	৩৬
পঙ্‌ক্তি	৪০
ত্রিষ্টুপ	৪৪
জগতী	৪৮

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গায়ত্রী ছন্দের নিয়মানুযায়ী গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্রের ২৪টি অক্ষর থাকা উচিত—কিন্তু একটি অক্ষর কম থাকায় ২৩টি অক্ষর আছে ওই মন্ত্রে। এই সংখ্যা (২৪) পূরণের জন্য পিঙ্গল ঋষি তাঁর ছন্দসূত্রে অক্ষর বিভাজনের যে বিধান দিয়েছেন তাতে গায়ত্রী মন্ত্রের 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' পদটিকে 'তৎসবিতর্বরেনিঅম্' (বা বরেনিয়ম্) পাঠ করতে হবে এবং এর ফলে এই মন্ত্রের সর্বসমেত ২৪ অক্ষর হবে। বলা বাহুল্য, ঋষি পিঙ্গলাচার্য কৃত 'ছন্দঃ সূত্রম্'-ই পঞ্চম বেদাঙ্গের আধার-গ্রন্থ।

জ্যোতিষ—বেদাঙ্গের ষষ্ঠ ও অন্তিম অঙ্গ জ্যোতিষ। ব্যাকরণ যেমন বেদের মুখ, তেমন জ্যোতিষকে বেদের নেত্র বলা হয়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের কাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষের জ্ঞান আবশ্যক। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এবং কোন রাশি বা কোন নক্ষত্রে সূর্য বা চন্দ্র অবস্থান করছে এসবের জ্ঞান না থাকলে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। বৈদিক কর্মকাণ্ডে তিথি-নক্ষত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং এই জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্র অন্যতম বেদাঙ্গ।

আবার কোনও কোনও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ঋতু বিশেষে অনুষ্ঠিত হতো। 'তৈত্তীরীয় ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণ অগ্নি আধান (স্থাপন) করবে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ক্ষত্রিয় এবং শরৎ ঋতুতে বৈশ্য অগ্নি আধান (স্থাপন) করবে। গার্হপত্য অগ্নিস্থাপনকে অগ্নির আধান বলা হয়েছে। আবার কোনও কোনও যজ্ঞের জন্য তিথি ও নক্ষত্রের জ্ঞান আবশ্যক। প্রাচীনকালে চার বেদেরই আলাদা আলাদা জ্যোতিষশাস্ত্র ছিল, এর মধ্যে সাম বেদের

জ্যোতিষশাস্ত্র এখন পাওয়া যায় না। অবশিষ্ট তিন বেদের জ্যোতিষগ্রন্থ পাওয়া যায়। তিন বেদের জ্যোতিষগ্রন্থের নাম—

১। ঋগ্বেদ জ্যোতিষ — আর্চ জ্যোতিষ।
২। যজুর্বেদ জ্যোতিষ — যাজুষ জ্যোতিষ।
৩। অথর্ব বেদ জ্যোতিষ — আথর্বণ জ্যোতিষ।

এরমধ্যে আথর্বণ জ্যোতিষকে অথর্ব জ্যোতিষ, এই নামেও অভিহিত করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বেদের স্বর-জ্ঞান

বেদ অধ্যয়ন করতে হলে বৈদিক স্বর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—অন্যথায় বেদ পাঠ বিফল হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণে যদি স্বরের বিপর্যয় ঘটে, তাহলে প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হয়ে অর্থেরও বিপর্যয় ঘটে। এই বিষয়ে বেদের 'ইন্দ্র শত্রু' শব্দটি নিয়ে একটি সুন্দর কাহিনী আছে, তাতে স্বরের ভুলে কিরূপ বিপর্যয় ঘটেছিল তা দেখান হয়েছে। ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করলে, ত্বষ্টা পুত্রেষ্টি যজ্ঞের মাধ্যমে আর একটি পুত্র কামনা করেন যে-পুত্র ইন্দ্রবধে সমর্থ হবে। এই উদ্দেশে তিনি প্রত্যহ যে যজ্ঞ করেন তার আহুতি মন্ত্র ছিল 'ইন্দ্রশত্রু বর্ধস্ব'। এখানে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের অর্থ দু-প্রকার হতে পারে। প্রথম অর্থ ইন্দ্রস্য শত্রু—'ইন্দ্রের শত্রু' ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। দ্বিতীয় অর্থ—ইন্দ্রঃ শত্রুঃ যস্যাঃ—অর্থাৎ ইন্দ্র যার শত্রু বহুব্রীহি সমাস। বহুব্রীহি সমাস করলে 'ইন্দ্র শত্রু' শব্দটির বিপরীত অর্থ হয়। সাধারণভাবে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটি উচ্চারণ করলে তা বহুব্রীহি সমাস না তৎপুরুষ সমাস তা বোঝা যায় না। কিন্তু বেদমন্ত্রে স্বরচিহ্ন থাকায় উচ্চারণমাত্র বোঝা যাবে এটা কোন সমাস হবে। যদি 'ইন্দ্রশত্রু' পদটির আদিতে উদাত্ত স্বর থাকে তাহলে বহুব্রীহি সমাস হবে এবং যদি ওই শব্দটির অন্তে উদাত্ত স্বর থাকে তাহলে তৎপুরুষ সমাস হবে। কিন্তু বিশ্বরূপ ও বৃত্রাসুরের পিতা ত্বষ্টা ভুল করে প্রত্যহ বৃত্রের বল বা শক্তি বৃদ্ধির জন্য আহুতি প্রদানের সময়ে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটির আদিতে উদাত্ত স্বর ব্যবহার করেছিলেন। বলাবাহুল্য এই ভুল ত্বষ্টার নয়—ত্বষ্টার ঋত্বিকের। যাই হোক 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটির আদিতে উদাত্ত স্বর প্রয়োগের ফলে তা বহুব্রীহি সমাস হয়ে যায় এবং অর্থ দাঁড়ায় ইন্দ্র যার শত্রু (ঘাতক)। ত্বষ্টা ও তার ঋত্বিকের ভুলের জন্য বৃত্রের বল বা শক্তি বৃদ্ধি না হয়ে ইন্দ্রেরই বলবৃদ্ধি হতে থাকে এবং

পরিণামে ইন্দ্রই বৃত্রাসুরকে বধ করেন। স্বরের ভুল প্রয়োগে বা উচ্চারণে কিরূপ ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে—এই কাহিনী তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বৈদিক নিরুক্ত গ্রন্থেও বলা হয়েছে—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্র শত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।" অর্থাৎ বেদমন্ত্র উচ্চারণে যদি স্বরের বা বর্ণের প্রমাদ বা ভ্রান্তি ঘটে, তাহলে মন্ত্র মনোবাঞ্ছিত অর্থ বা ফল প্রসব করে না। ভ্রান্তিযুক্ত মন্ত্রের উচ্চারণ বজ্র স্বরূপ হয়ে যজমানের ক্ষতিসাধন করে। যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটির স্বরের ভ্রান্ত প্রয়োগে ইন্দ্রহস্তে বৃত্রাসুর নিহত হয়েছিল এবং মন্ত্রের ফল বিপরীত হয়েছিল। সুতরাং এমন মারাত্মক অর্থ-বিপর্যয় যেখানে, সেখানে বেদমন্ত্র পাঠের একটা বিশেষ বিধি থাকা অবশ্যই দরকার। অন্যথায় স্বরের জ্ঞানাভাবে বেদমন্ত্রের যথার্থ অর্থও সম্যকরূপে বোধ হবে না। এই কারণেই বেদমন্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বোধগম্য হওয়ার জন্য বেদপাঠীর স্বর, বর্ণ, অক্ষর, মাত্রা-বিনিয়োগ এবং অর্থের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণের জন্য যে স্বর ব্যবহৃত হয় তা প্রধানত তিন প্রকার যথা—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। বেদ-মনীষীদের মতে, উদাত্ত স্বর শুক্লবর্ণ, সাত্ত্বিক গুণপ্রধান, ব্রাহ্মণ-জাতি, ভরদ্বাজ-গোত্র, দেবতা-অগ্নি, ছন্দ-গায়ত্রী। অনুদাত্ত স্বর রক্তবর্ণ রজঃ গুণপ্রধান, ক্ষাত্রভাবাপন্ন, গৌতম-গোত্র, দেবতা-চন্দ্র, ছন্দ-ত্রিষ্টুপ। স্বরিত স্বর কৃষ্ণবর্ণ, তমোবৃত্তিপ্রধান, বৈশ্য-ভাবাপন্ন, দেবতা-সূর্য, গোত্র-গার্গ এবং ছন্দ-জগতী। পাণিনি তিনটি স্বরের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন যথা—

উদাত্ত—"উচ্চৈরুদাত্ত"

অনুদাত্ত—"নীচৈরনুদাত্ত"

স্বরিত—"সমাহারঃ স্বরিতঃ"

কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের ঊর্ধ্বভাগ হতে উচ্চারিত হলে, তাকে উদাত্ত বলে। নিম্ন ভাগ হতে (কণ্ঠতালুর) উচ্চারিত হলে অনুদাত্ত হয়। উদাত্ত-অনুদাত্তের মিশ্রিত উচ্চারণই স্বরিত। সহজ কথায় উদাত্ত স্বরের উচ্চতা সর্বাপেক্ষা অধিক, স্বরিত মাঝামাঝি এবং অনুদাত্তের সর্বাপেক্ষা কম।

বেদমন্ত্র উচ্চারণে উচ্চতা, নীচতা নির্দেশের জন্য অক্ষরের নীচে ও উপরে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। সংহিতা বা মন্ত্রপাঠে উদাত্তের কোনও চিহ্ন থাকে না।

অনুদাত্ত চিহ্নিতকরণের জন্য অক্ষরের নীচে শয়ান দাঁড়ি (-) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। স্বরিত স্বর চিহ্নিত করার জন্যে অক্ষরের মাথায় খাড়া দাঁড়ি (।) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যথা—

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বি জং।"

এখানে প্রথম 'অ' বর্ণ অনুদাত্ত, দ্বিতীয় 'গ্নি' বর্ণ উদাত্ত, তৃতীয় 'মী' বর্ণ স্বরিত। অনুরূপভাবে 'পু' বর্ণ অনুদাত্ত, 'হি' বর্ণ স্বরিত, 'য' বর্ণ অনুদাত্ত, 'স্য' বর্ণ স্বরিত। 'দে' 'মৃ' বর্ণদ্বয় অনুদাত্ত। 'জ' বর্ণ স্বরিত। যে-সকল স্বরে কোনও চিহ্ন নেই তা উদাত্ত। পাণিনির শিক্ষাশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

"উদাত্তে নিষাদ গাং ধারাবনুদাত্ত ঋষভ ধৈবতৌ। স্বরিত প্রভবাহ্যেতে ষড়জ মধ্যম পঞ্চম।।" অর্থাৎ উদাত্ত স্বরে নিষাদ ও গান্ধার এই স্বরদ্বয় বিদ্যমান। অনুদাত্ত স্বরে ঋষভ ও ধৈবত স্বর বিদ্যমান। স্বরিত স্বরে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরত্রয় বিদ্যমান। বৈদিক ছন্দোবদ্ধ বা পদ্যময় মন্ত্রেই যে উক্ত তিন প্রকার স্বরের প্রয়োজন হতো এমন নয়। গদ্যে রচিত যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণে এবং গদ্যে রচিত তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও স্বরের প্রয়োগ দেখা যায়। বৈদিক মন্ত্রে প্লুতস্বরের প্রয়োগও দেখা যায়। পাণিনি সূত্রে বলা হয়েছে—দূর হতে কাউকে আহ্বান করার সময় প্লুতস্বরের প্রয়োগ করা হয়। পাণিনি শিক্ষাগ্রন্থে বলা হয়েছে—

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ
হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচি।।

অর্থাৎ প্রথমে স্বর বিভাগ যথা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, তারপর কাল বিভাগ। কাল বিভাগ অর্থে হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর ও প্লুতস্বর।

হ্রস্ব স্বরবর্ণ পাঁচটি —অ, ই, উ, ঋ, ৯।
দীর্ঘ স্বরবর্ণ আটটি — আ, ঈ, ঊ, এ ঐ, ও ঔ।

উচ্চারণে হ্রস্ব স্বরবর্ণ একমাত্রা বিশিষ্ট, দীর্ঘ স্বরবর্ণ দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট এবং প্লুতস্বর তিন মাত্রা বিশিষ্ট। কিন্তু প্লুতস্বর লেখবার জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর বা বর্ণ নেই।

দীর্ঘস্বর বোধক স্বরের উত্তর '৩' (তিন) লিখে সেই বর্ণের প্লুতত্ব বা ত্রিমাত্রা বোঝানো হয়। হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ হলে তা হয় দীর্ঘস্বর। দীর্ঘস্বর আরও দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হলে হয় প্লুতস্বর। ব্যঞ্জন বর্ণের অর্ধমাত্রা।

বৈদিক স্বরের আলোচনায় জ্ঞাত হলাম যে স্বর তিন প্রকার। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। উচ্চস্বর উদাত্ত, নীচুস্বর অনুদাত্ত এবং উভয়ের মিশ্রণে মধ্যমস্বর স্বরিত। বলাবাহুল্য, সংগীতের ক্ষেত্রে যে পৃথক সাতটি স্বর দৃষ্ট হয় যথা—নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম; বেদের তিন স্বরেই সামের বা সংগীতের ওই সপ্তস্বর অবস্থিত। এবিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষায় বলা হয়েছে—

"গান্ধর্ব বেদে যে প্রোক্তা সপ্তষড়জাদয়ঃ স্বরা।
ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয়ঃ উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ ।।"

গান্ধর্ব বেদে বা সাম বেদে যে ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি সঙ্গীতের সপ্তস্বর কথিত, ঋক্ ও যজুর্বেদে তা উচ্চ অর্থাৎ উদাত্তক্রমে তিনস্বরে জ্ঞাতব্য। বৈদিক শিক্ষাগ্রন্থে মন্ত্র বা সংহিতা পাঠের চতুর্দশ প্রকার দোষ ও ছয় প্রকার গুণের কথা বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিক্ষাগ্রন্থে এই দোষগুলির নাম উল্লেখ করেছেন, যথা—অক্ষর সম্বন্ধে শঙ্কা, ভীতি, উচ্চস্বর, স্পষ্ট কণ্ঠস্বর, অনুনাসিকস্বর, কর্কশ কণ্ঠ, মূর্ধ্নিস্বর (অত্যন্ত উচ্চস্বর)। উচ্চারণে স্থানচ্যুতি অর্থাৎ কণ্ঠস্বর জিহ্বা দ্বারা এবং তালব্যস্বর দন্তদ্বারা উচ্চারণ, কুস্বর, বিরস কণ্ঠ, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। অর্থাৎ এক অক্ষরে অনেক অক্ষরের উচ্চারণ বিষমরূপে অক্ষরকে আঘাত করে উচ্চারণ, চঞ্চল বা ব্যাকুল হয়ে পাঠ এবং তালহীন বা লয়হীনভাবে পাঠ করা।

পাণিনি শিক্ষাগ্রন্থে পাঠের ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে—

"মাধুর্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বর।
ধৈর্য্যং লয় সমর্থঞ্চ ষাড়েতে পাঠকা গুণাঃ।।

অর্থাৎ মধুর কণ্ঠে পাঠ, প্রতি অক্ষরের সুস্পষ্ট উচ্চারণ, পদচ্ছেদ করে পাঠ, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি স্বরক্রমে পাঠ, ধৈর্যের সঙ্গে পাঠ ও লয়যুক্ত পাঠ—এই ছয়টিকে পাঠের গুণ বলে অভিহিত করেছেন পাণিনি। বেদ পাঠের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যেই বৈদিক 'স্বর' জ্ঞান অপরিহার্য। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গ শিক্ষাগ্রন্থ অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন।

বেদ পাঠবিধি ও অধিকারী

অপৌরুষেয় এবং ঈশ্বরোক্ত বাণী বেদমন্ত্রগুলির মধ্যে যাতে ভবিষ্যতে কোনও কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ বা বিকার প্রবেশ করতে না পারে এবং মন্ত্রগুলি যাতে সর্বতোভাবে অপরিবর্তিতরূপে মানবসমাজের কল্যাণের জন্য অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত থাকে, তার জন্য ঋষিগণের যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তা ভাবলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়! সে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় আর্য ঋষিগণ হাজার হাজার মন্ত্র সম্বলিত বেদকে কণ্ঠস্থ করে সুদীর্ঘকাল যাবৎ সেগুলিকে সুরক্ষিত করে আসছেন, তাঁদের নিকট ভারতীয় হিন্দু সমাজ যে কতদূর ঋণী তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী অরুণানন্দ এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বেদসার' গ্রন্থে বলেছেন—"তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও প্রচেষ্টা, অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যাবসায়, প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস ও ধর্মনিষ্ঠার জন্যই আজ আমরা এই শ্রেষ্ঠ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছি। তাঁহাদের সেই অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলেই আজ আমরা আমাদের দুর্লভ পৈতৃক ধন লাভ করিতে পারিয়াছি।" আর্য ঋষিরা সমগ্র সংহিতার অক্ষরসংখ্যা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ঋষি শৌণিক তাঁর রচিত 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে সংহিতার সূক্তসংখ্যা, ঋক্‌সংখ্যা, ঋকের পদসংখ্যা ও সমগ্র সংহিতার অক্ষরসংখ্যা পর্যন্ত গণনা করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এমনকি বেদমন্ত্রের কোনও অক্ষরের স্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে ওই স্থানে যাতে অপর কোনও অক্ষরের অনুপ্রবেশ না ঘটে তার জন্য তাঁরা (ঋষিরা) বেদমন্ত্রের নানাবিধ পাঠের প্রচলন করেছিলেন। এক্ষেত্রে বেদের পবিত্রতা রক্ষা ও প্রক্ষেপ নিবারণই ছিল ঋষিদের একমাত্র লক্ষ্য।

বেদ পাঠ প্রধানত দু-প্রকারের—প্রকৃতি পাঠ ও বিকৃতি পাঠ। এর মধ্যে প্রকৃতি পাঠ তিন প্রকার ও বিকৃতি পাঠ আট প্রকারের, মোট একাদশ প্রকারের পাঠ পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃতি পাঠ—(১) সংহিতা পাঠ (২) পদ পাঠ (৩) ক্রম পাঠ। এই তিন প্রকারের পাঠকে প্রকৃতি পাঠ বলা হয়। **বিকৃতি পাঠ**—বিকৃতি পাঠ আট

প্রকারের, যথা— (১) জটা পাঠ (২) মালা পাঠ (৩) শিখা পাঠ (৪) লেখা পাঠ (৫) ধ্বজা পাঠ (৬) দণ্ড পাঠ (৭) রথ পাঠ (৮) ঘন পাঠ।

প্রকৃতি পাঠের অন্তর্গত সংহিতা পাঠকে যোগ্যা প্রকৃতি এবং অন্য দুটি পাঠকে (পদ পাঠ ও ক্রম পাঠ) রূঢ়া প্রকৃতি বলা হয়। আট প্রকার বিকৃতি পাঠের প্রত্যেকের নামের পূর্বে 'ক্রম' শব্দটি যুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ ক্রমজটা পাঠ, ক্রমমালা পাঠ, ক্রমশিখা পাঠ এরূপ বলতে হয়। এইরূপ বিবিধ পাঠ প্রণালীসহ পাঠ অনুশীলনের জন্যেই বেদের আর এক নাম 'আম্নায়'। বেদ পাঠের এইরূপ মহিমার জন্যই আজ প্রাপ্ত বেদের মূল শব্দরাশির একটিও বর্ণ অথবা মাত্রার বিপর্যয় ঘটেনি। সমগ্র বিশ্বে আর কোনও গ্রন্থ বা শাস্ত্রের এইরূপ অবিচ্ছিন্ন উচ্চারণ পরম্পরা আজ অবধি দৃষ্টিগোচর হয়নি—এটাই বৈদিক শব্দরাশির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বেদ-মনীষীদের মতে বেদ যেমন অপৌরুষেয়, সেইরূপ বেদ পাঠও অপৌরুষেয়, কারণ সব পাঠই ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট। বেদের প্রত্যেক প্রকার পাঠের লক্ষণ দৃষ্টান্তসহ নিচে দেওয়া হল। এর জন্য আমরা ঋক্ বেদের প্রথম ঋক্ বা মন্ত্রটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করব; কারণ এই ঋক্‌টি অনেকেরই জানা, যথা—

'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।। (ঋগ্বেদ, ১।১।১)।

একাদশ প্রকার পাঠ ভেদে এই ঋক্ বা মন্ত্রটির ভিন্ন ভিন্ন পাঠরূপ প্রদর্শিত হচ্ছে—

১। **সংহিতা পাঠ**—বেদের সংহিতা ভাগে মন্ত্রটি যেরূপ আছে অর্থাৎ ওপরে উল্লিখিত ঋক্‌টি যেরূপ উদ্ধৃত হয়েছে সংহিতা পাঠে অবিকল এইরূপই পাঠ করতে হবে।

পদ পাঠ—একটি ঋকের প্রত্যেকটি পদ বা শব্দ স্বতন্ত্ররূপে সন্ধিবিচ্ছেদ করে ও সমাসবদ্ধ পদকে ব্যস্ত বা বিভক্ত করে দেখানো হচ্ছে। এর ফলে উল্লিখিত ঋক্‌মন্ত্রটির পদ পাঠ হবে এইরূপ,—

'অগ্নিম্। ঈড়ে পুরঃ S হিতম্।
যজ্ঞস্য। দেবম্। ঋত্বিজম্।
হোতারম্। রত্ন S ধাতমম্।।'

এই পদ পাঠে 'পুরোহিতম্' ও 'রত্নধাতমম্' সমাস দুটিকে ব্যস্ত বা বিভক্ত রূপে দেখানো হয়েছে। যথা 'পুরঃ S হিতম্' এবং 'রত্নধাতমম্'-এর মধ্যে ব্যাসসূচক বা বিভাগ-সূচক চিহ্নটিকে 'S' অবগ্রহ বলে (সমস্ত পদের ঘটক বা যোজক শব্দকে পৃথক-পৃথক করাকে অবগ্রহ বলে)। শাকল ঋষি বেদের পদ পাঠ রচনা করেছেন, এইজন্য একে 'শাকল্য সংহিতা'ও বলা হয়। তিনি ঋক্ সংহিতার ছয়টি মন্ত্রবাদে সকল মন্ত্রের পদপাঠ রচনা করেছেন। তিনি যে ছয়টি ঋকের পদ পাঠ রচনা করেননি, সেই ছয়টি ঋক্ হল—ঋক্ বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৫৯ সংখ্যক সূক্তের ১২ সংখ্যক মন্ত্র, দশম মণ্ডলের ২০ সংখ্যক সূক্তের ১ সংখ্যক মন্ত্র, দশম মণ্ডলের ১২১ সংখ্যক সূক্তের ১০ সংখ্যক মন্ত্র, দশম মণ্ডলের ১৯০ সংখ্যক সূক্তের ১ সংখ্যক মন্ত্র, দশম মণ্ডলের ১৯০ সংখ্যক সূক্তের ২ ও ৩ সংখ্যক মন্ত্র। ঋষি শাকল এই ছয়টি মন্ত্রের পদ পাঠ কেন রচনা করেননি তা জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, এই ছয়টি ঋক্ মূল সংহিতার অন্তর্গত কিনা, তিনি এ-বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।

ক্রম পাঠ—ক্রম পাঠে একটি ঋকের দুইটি করে পদ এক-একবারে গৃহীত হয় এবং প্রথম পদ ও অন্তিম পদ ব্যতীত মধ্যবর্তী সকল পদই দু-বার করে পঠিত হয়। যথা—

'অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম।
পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য দেবম্।
দেবম্ ঋত্বিজম্। ঋত্বিজং হোতারম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।"—এই ক্রম পাঠে প্রথম পদ 'অগ্নিম্' এবং অন্তিম পদ 'রত্নধাতমম্' ব্যতিত সকল পদই দুইবার করে পঠিত হয়েছে। আক্ষরিক প্রতীকের মাধ্যমে ক্রম পাঠকে এইভাবে বোঝানো হয়। যথা—এক দুই, দুই তিন, তিন চার, চার পাঁচ, পাঁচ ছয়, ছয় সাত, সাত আট ইত্যাদি। ক্রম পাঠ প্রক্ষিপ্ত (অন্তর্নিবেশিত বা নিক্ষিপ্ত) নিবারণের একটি উপায়। কিন্তু প্রথম ও অন্তিম পদ দুটির দ্বিত্ব বা দুইবার পঠিত না হওয়ায়, এই দুটি পদের প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেল। এই সম্ভাবনা পরবর্তী জটা নামক পাঠের বিধি বা রীতিতে নিবারিত হয়েছে। ক্রম পাঠকে ইংরাজিতে 'step text' বলা হয়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে এক-একটি পদ দু-বার করে গৃহীত বা পঠিত হয়েছে।

জটা পাঠ—এই পাঠবিধিতে প্রথম ও অন্তিম পদ দুটি তিনবার করে এবং মধ্যবর্তী পদগুলি প্রতিটি ছয়বার করে পঠিত হয়, যথা—

'অগ্নিম্ ঈড়ে, ঈড়ে অগ্নিম্ অগ্নিম্ ঈড়ে
ঈড়ে পুরেহিতং, পুরোহিতং ঈড়ে, ঈড়ে পুরোহিতম্
পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য
যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য দেবং—এইভাবে উচ্চারিত বা পঠিত হবে। আক্ষরিক প্রতীকে জটা পাঠ হবে এইরূপ—
এক দুই, দুই এক, এক দুই, দুই তিন, তিন দুই, দুই তিন,
তিন চার, চার তিন, তিন চার, চার পাঁচ,
পাঁচ চার, চার পাঁচ, পাঁচ ছয়, ছয় পাঁচ, পাঁচ ছয় ইত্যাদি।

মালা পাঠ—এই পাঠবিধি বা রীতি বেশ কঠিন। মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পদ পাঠ করেই তারপর ষষ্ঠপদ ও পঞ্চমপদ পাঠ করতে হয়। অতঃপর পুনরায় দ্বিতীয়পদ ও তৃতীয়পদ—এরপর পুনরায় পঞ্চমপদ ও চতুর্থপদ। পুনঃপুন অভ্যাস ব্যতীত এই দুরূহ পাঠবিধি আয়ত্ত করা কঠিন। উল্লিখিত ঋক্‌টির মালা পাঠ হবে নিম্নরূপ—

'অগ্নিম্ ঈড়ে, ঋত্বিকং দেবম্। ঈড়ে পুরোহিতং, দেবং যজ্ঞস্য
পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতম্। যজ্ঞস্য দেবং
পুরোহিতং ঈড়ে। দেবম ঋত্বিজম্, ঈড়ে অগ্নিম্।'—এই পাঠবিধির আক্ষরিক রূপায়ণ হবে এইরূপ—এক দুই ছয় পাঁচ।। দুই তিন পাঁচ চার।। তিন চার চার তিন।। চার পাঁচ তিন দুই।। পাঁচ ছয় দুই এক ইত্যাদি। পাঁচ রকমের ফুলের মালা গাঁথতে হলে যেমন কয়েক রকম ফুলকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাঁথতে হয়। এই পাঠবিধিও অনেকটা সেইরূপ। পাঁচ ছয়টি পদের পুনঃপুন যথাক্রমে এবং বিপরীতক্রমে পাঠ করতে হয় বলেই একে মালা পাঠ বলা হয়।

শিখা পাঠ—জটা পাঠের অনুরূপ, পার্থক্য কেবল এই যে জটা পাঠে দুটি করে পদ এক-একবারে উচ্চারিত হয়। শিখা পাঠে মধ্যে মধ্যে অথবা তৃতীয় চরণে, ষষ্ঠ চরণে, নবম চরণে তিনটি করে পদ থাকে। যথা—অগ্নিম, ঈড়ে।। ঈড়ে অগ্নিম্।। অগ্নিম ঈড়ে পুরোহিতম্।। ঈড়ে পুরোহিতম্।। পুরোহিতম ঈড়ে।। ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য পুরোহিতং যজ্ঞস্য।। যজ্ঞস্য পুরোহিতম্।। পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্।।

'যজ্ঞস্য দেবম্।। দেবং যজ্ঞস্য।। যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।।' এইরূপে পঠিত বা উচ্চারিত হবে। এই পাঠের আক্ষরিক রূপায়ণ হবে এইরূপ—

এক দুই।। দুই এক।। এক দুই তিন।।
দুই তিন।। তিন দুই।। দুই তিন চার।।
তিন চার।। চার তিন।। তিন চার পাঁচ।।
চার পাঁচ।। পাঁচ চার।। চার পাঁচ ছয়।।

লেখা পাঠ—ক্রম পাঠের বৈপরীত্য বা ব্যতিক্রম এই পাঠবিধিতে দৃষ্ট হয়। লেখা পাঠে যথাক্রম (ক্রমানুযায়ী) ও বিপরীতক্রমে কখনও দুটি পদ, কখনও তিনটি পদ একত্রে পাঠ করা হয়। উল্লিখিত ঋক্‌টির লেখা পাঠ হবে এইরূপ—

'অগ্নিম্ ঈড়ে, ঈড়ে অগ্নিম্, অগ্নিম ঈড়ে,
ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ ঈড়ে,
ঈড়ে পুরোহিতম্, পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য'—এইরূপে পঠিত হয়। লেখা পাঠকে রেখা পাঠও বলা হয়। আক্ষরিক প্রতীকে লেখা পাঠের পদবিন্যাস হবে—

এক দুই, দুই এক, এক দুই।।
দুই তিন চার, চার পাঁচ দুই;
দুই তিন, তিন চার, ইত্যাদি।

ধ্বজ পাঠ—এই পাঠে প্রথমে অবিকল ক্রম পাঠের মতো ছয়টি করে উচ্চারণ করে বা পাঠ করে, তারপর সেই ছয়টি পদের বিপরীতক্রমে পাঠ করতে হয়। উল্লিখিত ঋক্ বেদের ঋক্ বা মন্ত্রটির ধ্বজ পাঠ হবে এইরূপ—

'অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য।
পুরোহিতং যজ্ঞস্য। ঈড়ে পুরোহিতম্। অগ্নিম ঈড়ে।।
যজ্ঞস্য দেবম্। দেবম্ ঋত্বিজম্। ঋত্বিজং হোতারম্।
ঋত্বিজং হোতারম। দেবম্ ঋত্বিজম্। যজ্ঞস্যদেবম্।

এখানে ক্রম পাঠের প্রথম চরণ অনুযায়ী। দ্বিতীয় চরণ তার বিপরীত। আবার তৃতীয় চরণ ক্রম পাঠ অনুযায়ী। চতুর্থ চরণ তার বিপরীত। এইরূপে ধ্বজ পাঠের উচ্চারণ বা পাঠক্রম চলতে থাকে। এই পাঠের আক্ষরিক রূপায়ণ হবে—

এক দুই, দুই তিন, তিন চার, দুই তিন, এক দুই।
চার পাঁচ, পাঁচ ছয়, ছয় সাত। পাঁচ ছয়, চার পাঁচ ইত্যাদি।

দণ্ড পাঠ—এই পাঠবিধিতে ক্রম পাঠের দুটি দুটি পদে যথাক্রমে তিন-তিনবার উচ্চারিত হয়। কেবল দ্বিতীয়বার বিপরীতক্রমে পাঠ করতে হয়। যথা—

'অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম ঈড়ে।
ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্ ঈড়ে অগ্নিম্।
এইভাবে পাঠ চলতে থাকবে। এর আক্ষরিক রূপায়ণ হবে এইরূপ—
এক দুই।। দুই এক।। এক দুই
দুই তিন।। তিন দুই এক।। ইত্যাদি।

রথ পাঠ—ক্রম পাঠের ধারা এবং তার বিপরীতক্রমের ধারা, এই দুই ধারার মিশ্রণে রথ পাঠের সৃষ্টি হয়েছে। রথ পাঠ দুই প্রকারে সম্পন্ন হতে পারে। একটি চরণের একপাদ বা এক অংশ ধরে, অথবা সমগ্র চরণ (অর্থাৎ শ্লোক বা মন্ত্রটির চতুর্থাংশ বা চারটি অংশ) ধরে। প্রথম প্রকারের রথ পাঠ হবে এইরূপ—এক দুই, দুই এক। তিন চার, চার তিন, এক দুই।।

'অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্।
পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য পুরোহিতম্।
অগ্নিম ঈড়ে।' ইত্যাদি। —প্রথম প্রকার রথ পাঠটি সংখ্যার প্রতীকে হবে এইরূপ—এক দুই, দুই এক। তিন চার, চার তিন, এক দুই। দ্বিতীয় প্রকারের রথ পাঠটি যেভাবে পঠিত হয় তা এইরূপ—

'অগ্নিম্ ঈড়ে যজ্ঞস্য দেবম্।। ঈড়ে অগ্নিম্ দেবং যজ্ঞস্য।।
অগ্নিম্ ঈড়ে ঈড়ে পুরোহিতম্।।
যজ্ঞস্য দেবং দেবম্ ঋত্বিজম্।।' —এই পাঠটির আক্ষরিক রূপ হবে—
এক দুই চার পাঁচ।। দুই এক পাঁচ চার।। এক দুই দুই তিন।।
চার পাঁচ পাঁচ চার।।

ঘন পাঠ—এই পাঠে জটা পাঠের ন্যায় প্রথম চারটি পদ দুটি দুটি করে পাঠ করতে হয়। তারপর তিনটি করে পদ যথাক্রমে, বিপরীত ক্রমে ও বিপর্যস্ত ভাবে (ব্যতিক্রম, পরিবর্তিত) উচ্চারণ করতে হয়। যথা—

'অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্।
পুরোহিতম্ ঈড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্।
ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্ ঈড়ে। পুরোহিতং যজ্ঞস্য।

যজ্ঞস্য পুরোহিতং ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য।' ইত্যাদি ঘন পাঠের আক্ষরিক রূপ নিম্ন প্রকার—

এক দুই। দুই এক। এক দুই তিন।
তিন দুই এক। এক দুই তিন। দুই তিন। তিন দুই। দুই তিন চার।
চার তিন দুই। দুই তিন চার। তিন চার। চার তিন।
তিন চার পাঁচ। পাঁচ চার তিন। তিন চার পাঁচ।—ইত্যাদি ক্রমে এই পাঠ পঠিত হয়।

উপরে উল্লিখিত একাদশ প্রকার পাঠকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে— 'নির্ভুজ' এবং 'প্রতৃণ' নির্ভুজ পাঠ বলতে মূল সংহিতায় যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ বা শ্রুতিধৃত আছে অবিকল সেইরূপ পাঠ করাকে 'নির্ভুজ' পাঠ বলে। অন্যান্য পাঠগুলি সংহিতায় লিপিবদ্ধ পাঠগুলির অবিকলরূপ নয় বলে সেগুলিকে 'প্রতৃণ' পাঠ বলা হয়। অতএব কেবলমাত্র সংহিতা পাঠই নির্ভুজের অন্তর্ভুক্ত, বাকি দশ প্রকারের পাঠই 'প্রতৃণ' পাঠের অন্তর্ভুক্ত। মূলের অবিকল পাঠ একমাত্র সংহিতা পাঠেই রয়েছে, এইজন্য এই পাঠকে একমাত্র 'নির্ভুজ' পাঠ বলা হয়।

বলা বাহুল্য বেদের আট প্রকার বিকৃতি পাঠ অত্যন্ত জটিল। সাধারণ পাঠকের পক্ষে গ্রন্থের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বেদপাঠী অভিজ্ঞ আচার্যের কাছেই বেদ পাঠের অনুশীলন করা উচিত। গ্রন্থ পড়ে বেদ পাঠের অনুশীলন না করাই শ্রেয়। যাদের পক্ষে বেদপাঠী অভিজ্ঞ আচার্যের সঙ্গ পাওয়া সম্ভব নয়—তারা সংহিতা পাঠেই বেদ পাঠের ফল লাভ করবেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বেদের সংহিতা ভাগে মন্ত্রটি যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, অবিকল সেইভাবে পাঠ করাই সংহিতা পাঠ। 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' গ্রন্থে বেদ পাঠের বিধি ও বিবিধ প্রকার পাঠের ফলশ্রুতি ও প্রশংসা পরিলক্ষিত হয়। সংহিতা, পদ ও ক্রমসহ বেদ পাঠ করলে দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার হাওয়া যায়। প্রত্যেক সংহিতা সরহস্য তিনবার অধ্যয়নে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত হয়। মানুষ যাতে সৎকর্ম অভিমুখী হয় সেইজন্য এইরূপ আশাব্যঞ্জক প্রেরণাদায়ক কথা বেদাঙ্গে ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখা যায়। বস্তুত গুণকীর্তনের ছলে বেদাধ্যায়ীকে বেদ-এর প্রতি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য।

এই প্রকারের গুণকীর্তন ও প্রশংসাকে অর্থবাদ বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষানুযায়ী, বেদ পাঠক সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করবেন। শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্নান করবেন। স্নানের পর শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে পূর্বদিকে অথবা উত্তরদিকে মুখ করে আসন স্থাপন করে উপবেশন করবেন। অতপর প্রসন্ন চিত্তে বিনীতভাবে নিজ গুরুকে স্মরণ করে মনে মনে গুরুর অনুমতি চেয়ে—প্লুতস্বরে প্রথমে 'হরি ওঁ' উচ্চারণ করবেন। 'হরি ওঁ' উচ্চারণ করে মন্ত্রপাঠ করাই বৈদিক শাস্ত্রের বিধি। 'হরি ওঁ' মন্ত্র উচ্চারণের পর গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করে বেদের পাঠ আরম্ভ হয়। গায়ত্রী পাঠের পর—

"শ্রীগণেশায় নমঃ।। শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ।।
শ্রীবেদপুরুষায় নমঃ।। শ্রীগুরু চরণকমলেভ্যো নমঃ।।
গণনাথ সরস্বতী রবি শুক্র বৃহস্পতিন্।।
পঞ্চৈতান সংস্মরন্নিত্যং বেদবাণীং প্রবর্তয়েৎ।"

এই মন্ত্রসকল উচ্চারণের পর বেদ পাঠ আরম্ভ হয়। বেদের প্রতিটি মন্ত্রের আদিতে 'ওঁ' সংযুক্ত করে বেদ পাঠ করতে হয়। যথাযথ বেদ পাঠের জন্য জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত প্রভৃতি বিকলতারহিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি বেদ পাঠে অনধিকারী। 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

'ন করালো ন লম্বোষ্ঠো নাবাক্তো নানুনাসিকঃ।
গদ্‌গদো বদ্ধ জিহ্বশ্চ ন বর্ণানবক্তুমর্হতি।'

অর্থাৎ যার করালবদন, ওষ্ঠ লম্বা, জিহ্বা জড় (তোত্‌লা), যার স্বর অনুনাসিক, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ অর্থাৎ অস্পষ্ট, তার বর্ণোচ্চারণ কখনও শুদ্ধ হতে পারে না বলে, তিনি বেদ পাঠে অনধিকারী। 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' গ্রন্থে বেদ পাঠের অধিকারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"যার প্রকৃতি শান্ত, দন্ত ওষ্ঠ সুশোভিত, যিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেন এবং সম্মুখে বিনীত থাকেন তিনিই বেদবর্ণ উচ্চারণের বা বেদ পাঠের অধিকারী।"

ঋষি, দেবতা, ছন্দ, বিনিয়োগ

বেদ অধ্যয়ন প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ঋষি-দেবতা-ছন্দ এবং বিনিয়োগ-এর জ্ঞানসহ বেদ অধ্যয়ন করা উচিত। যে ঋষ্যাদি (ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগ)

জ্ঞান বিনা বেদ অধ্যয়ন করে—তার বেদ অধ্যয়নের শ্রম ব্যর্থ হয়। বেদমন্ত্রের অর্থ তার কখনও হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং বেদমন্ত্রের জ্ঞানলাভের জন্য ঋষ্যাদির জ্ঞান অপরিহার্য।

মহর্ষি শৌনক তাঁর বেদ-বিষয়ক 'অনুক্রমণী' গ্রন্থে বলেছেন—"যে মনুষ্য ঋষি ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগের জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, জপ, হবন, যজন (পূজা), যাজন (যজ্ঞ) ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে তার বেদাধ্যয়নসহ ওই সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যর্থ এবং দোষযুক্ত হয় এবং ওই মনুষ্য অশ্বগর্ত নামক নরকে পতিত হয় কিংবা মৃত্যুর পর স্থাবর যোনিত্ব প্রাপ্ত হয়।" ঋষি শৌনকের মতে, যে মনুষ্য ঋষ্যাদি জ্ঞানসহ বেদাধ্যয়ন করে—তার বেদ পাঠ ফলপ্রদ হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসদেবও আপন আপন স্মৃতিগ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

চতুর্বেদের প্রতি সূক্তের, স্থলবিশেষে প্রতি মন্ত্রের পৃথক পৃথক ঋষি, ছন্দ, দেবতা এবং বিনিয়োগ আছে। অতএব বেদমন্ত্রের সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য শুধুমাত্র মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ জানলেই হবে না—প্রতি মন্ত্রের ঋষি কে? ছন্দ কী? দেবতা কে এবং যজ্ঞে তার বিনিয়োগ কিরূপ তাও সঠিকভাবে জানতে হবে। এসব না জেনে যে বেদমন্ত্র অধ্যয়ন বা স্বাধ্যায় করে তাকে ধর্মশাস্ত্রে 'মন্ত্রকণ্টক' বলা হয়। সুতরাং বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যয়নজনিত জ্ঞানলাভের জন্য— ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগের পৃথক পৃথক লক্ষণের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

ঋষি ঃ 'ঋষি' শব্দের অর্থ নিয়ে নানা জনের নানা মত। পাণিনিয় ব্যাকরণ অনুসারে গত্যর্থক ঋষ্ ধাতুতে ইন্ প্রত্যয় যোগে 'ঋষি' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। 'সর্বানুক্রম সূত্রে' ঋষি ক্যাতায়ন বলেছেন—"দ্রষ্টারঃ ঋষয়ঃ স্মর্তারঃ" অর্থাৎ মন্ত্রের দ্রষ্টা ও স্মর্তাকে (স্মরণকারী) ঋষি বলা হয়। যাস্কের মতে—'ঋষির্দর্শনাত্'; অর্থাৎ যিনি দর্শন করেছেন তিনিই ঋষি। আবার যাস্ক তাঁর 'নিরুক্ত' গ্রন্থে ঋষির লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন—"সাক্ষাৎকৃত ধর্মানঃ ঋষয়ো বভূবুঃ" অর্থাৎ যাঁরা ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন তাঁরাই ঋষি। বেদ অখিল ধর্মের মূল সেইজন্য এখানে ধর্ম শব্দে বেদ বা বেদের মন্ত্রদর্শন বুঝতে হবে। এখন মন্ত্রদর্শন অর্থে আমরা কী বুঝব? ঋষিদের 'মন্ত্রদ্রষ্টা' বলা হয়—মন্ত্ররচয়িতা

নয়। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় অর্থাৎ যা কোনও পুরুষ বা ব্যক্তির দ্বারা কৃত বা রচিত নয়। মহাভারতের একটি শ্লোকে ঋষিগণের তপস্যা দ্বারা যুগান্তে বা প্রতি কল্পের প্রারম্ভে এই বেদ বা বেদমন্ত্র প্রাপ্তির বার্তা পাওয়া যায়। যথা—

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান, মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা।।

তিরোহিত বেদমন্ত্রকে যাঁরা তপস্যার দ্বারা আবির্ভূত করিয়েছিলেন তাঁরাই ঋষি।

উপরের মহাভারতের শ্লোকটির সমর্থনে বেদ-মনীষীরা বলেন—

"ঋষন্তি প্রাপ্নুবন্তি তপসা বেদমন্ত্রাণ্ ইতি ঋষয়ঃ।"

ঋতম্ভরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ঋষিদের কঠোর তপস্যায় বেদমন্ত্র স্বতঃই আবির্ভূত হয়েছিল তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বরের কৃপায়। এক-একজন ঋষির নিকটে বেদের এক-একটি সূক্ত, কখনও বা এক-একটি অনু্াক প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁর নিকট যে যে মন্ত্র প্রকাশিত হয়েছিল তিনি সেই সেই মন্ত্রের ঋষি বা দ্রষ্টা। যে-সকল ঋষি অধিক তপস্যা করেছিলেন, তাঁদের নিকট অধিক মন্ত্র ও সূক্ত প্রকাশিত হয়েছিল। যে-সকল ঋষিদের তপস্যা ছিল কম—তাঁরা অল্প মন্ত্র ও সূক্ত লাভ করেছিলেন। বেদ-মনীষীগণ ঋষিদেরকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—একাকী ও পারিবারিক।

একাকী (শ্রেণীবর্গের ঋষি)—বেদমন্ত্র প্রকাশের জন্য যে-সকল ঋষি একা একা কঠোর প্রয়াস বা তপস্যা করেছিলেন, পরিবারের কোনও সদস্যের সহায়তা গ্রহণ করেননি, সেই সকল ঋষিদের 'একাকী' শ্রেণীবর্গের মধ্যে রাখা হয়।

পারিবারিক (পারিবারিক শ্রেণীবর্গের ঋষি)—যে-সকল ঋষি বেদমন্ত্র প্রকাশের জন্য স্বীয় প্রচেষ্টা ও তপস্যার সাথে সাথে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যের সহায়তা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের পারিবারিক শ্রেণীবর্গের মধ্যে গণনা করা হয়।

দেবতা ঃ বেদের প্রতিমন্ত্রের একজন অধিষ্ঠাতা দেবতা ও একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। যে মন্ত্রের যিনি অধিষ্ঠাতা বা অধিষ্ঠাত্রী সেই মন্ত্রের দ্বারা সেই দেবতা বা দেবীর আহ্বান ও প্রশংসা করা হয়। দিব্ ধাতু থেকে দেবতা, দেব,

দেবী প্রভৃতি শব্দসকল নিষ্পন্ন হয়েছে। দিব্ ধাতুর অনেকার্থের মধ্যে একটি অর্থ হচ্ছে প্রকাশ পাওয়া। 'নিরুক্তে' যাস্ক 'দেব' শব্দের নিরুক্তি (নিশ্চিত অর্থ) দিয়েছেন—

'দেবো দানাৎ বা দীপনাৎ বা দ্যোতনাদ্ বা ভবতি'—অর্থাৎ যিনি দান করেন তিনি দেবতা অথবা যিনি নিজে প্রকাশ স্বরূপ হয়ে অন্যকেও প্রকাশিত করেন তিনি দেবতা। দেবতার উদ্দেশে স্তুতি-বন্দনা, মন্ত্রপাঠ অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানে মানুষের মনোকামনা পূরণ হয়—তাই তিনি দানী অথবা দাতা। তিনি (দেবতা বা দেবী) স্বয়ং দীপ্তস্বরূপ হয়ে অপরকেও দীপ্ত বা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রের চৈতন্যশক্তি বা অধিষ্ঠাতা অধিষ্ঠাত্রী হলেন দেব বা দেবী স্বয়ং। যাঁরা ত্রিলোকে ভ্রমণ করেন, প্রকাশিত হন এবং বৃষ্ট্যাদি দ্বারা ভক্ষ্য বা ভোজ্যাদি মনুষ্যকে প্রদান করেন তাঁরাই দেবতা। বস্তুত বিভিন্ন নামে ও বিভিন্নরূপে প্রকাশিত দেব-দেবীগণ সেই এক অখণ্ড সুন্দররূপ পরমব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। ঋক্ বেদের একটি মন্ত্রে এই তত্ত্বটি সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে—

"একং সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)। সেই এক অখণ্ড অব্যয় সৎব্রহ্মকে বিপ্রগণ বহু নামে অভিহিত করেন। যথা—অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বায়ুর এক নাম) ইত্যাদি। 'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি' (ঋগ্বেদ, ১০।১১৪।৫), অর্থাৎ সেই এক সৎ-কে ঋষিগণ বহুরূপে ভাবনা করেন। ঋক্ বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্নতম সূক্তের প্রতি ঋকের অন্তিমচরণে বা পাদে—'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্' বাক্যটি দৃষ্ট হয়। এর অর্থ 'তুমিই সকল দেবতার প্রাণদাতা মহান সত্তা।' মূলত দেবগণ পরমাত্মা স্বরূপ। বেদে দেবতার নাম দৃষ্ট হয়। নিরুক্তকার যাস্কের মতে মূল দেবতা তিনটি। তিনি তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন—"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ অগ্নিঃ পৃথিবী-স্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বাহহন্তরিক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ"—অর্থাৎ পৃথিবীর স্থানীয় দেবতা অগ্নি, অন্তরিক্ষ স্থানের দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোক স্থানের দেবতা সূর্য। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ মন্ত্রদ্বারা যে দেবী বা দেবতার স্তুতি করেন, সেই দেবী বা দেবতা সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী বা অধিষ্ঠাতা।

ছন্দ ঃ মহর্ষি ক্যাত্যায়নের 'অনুক্রমণিকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"যোঽ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবত ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেন যাজয়তি বাধ্যাপয়তি স্থানুং বর্চ্ছতি বা পাত্যতে প্রমীয়তে বা পাপীয়ান ভবতি।" অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ঋষি-ছন্দ-জ্ঞান বিনা কেবলমাত্র মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ করান, অথবা অধ্যাপনা করেন, তাঁর কৃত যজ্ঞ-বেদ পাঠ স্থানুত্ব প্রাপ্ত হয় কিংবা গর্তে পতিত হয়, অথবা পাপপূর্ণ হয়। সুতরাং বেদার্থ জানার জন্য ছন্দজ্ঞান আবশ্যিক। ছন্দের জ্ঞান ছন্দগ্রন্থ ব্যতিত কোনও প্রকারেই পাওয়া সম্ভব নয়। মহর্ষি পিঙ্গলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ছন্দঃসূত্রে' বিবিধ প্রকার ছন্দের বিবরণ দৃষ্ট হয়। এছাড়া নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও ছন্দ শব্দের একাধিক অর্থ পাওয়া যায়।

যাস্ক-এর মতে—'ছন্দাংসি ছাদনাত্।' 'ছদ্ সংবরণে'—অর্থাৎ ছন্দ হচ্ছে বেদের আবরণ বা আচ্ছাদন। বেদ-বিদগ্ধ যুধিষ্ঠির মীমাংসক তাঁর 'বৈদিক ছন্দ মীমাংসা' গ্রন্থে ছন্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন—'চদি আহ্লাদনে' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে আহ্লাদনের অর্থ মনোরঞ্জন। অর্থাৎ ছন্দ যেমন বেদের আচ্ছাদন, তেমনি মনেরও আহ্লাদ বা আনন্দের সাধন। কাব্যের কোনও বিশেষ ভাব ছন্দের সাহায্যেই ব্যক্ত করা সহজ হয়। বীররসের ছন্দ হতে কখনই করুণরসের ভাব জাগ্রত হয় না। বৈদিক মন্ত্রের ভাবকে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে ছন্দ কখনও কখনও শব্দের চেয়ে অধিক প্রভাবসিদ্ধ হয়। অতএব বৈদিক মন্ত্রের ভাবের গভীরে পৌঁছানোর জন্যে ছন্দের সাহায্যের প্রয়োজন। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতে, যা পাপ হতে যজমান ও পুরোহিতদের আচ্ছাদন করে, রক্ষা করে তা-ই ছন্দ। পূর্বেই 'বেদাঙ্গ পরিচয়' অধ্যায়ে উক্ত হয়েছে যে বেদের সাতটি প্রধান ছন্দ আছে। যথা—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। সাতটি বৈদিক ছন্দের মোট অক্ষর সংখ্যা পূর্বেই 'বেদাঙ্গ পরিচয়' অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

বিনিয়োগ ঃ বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মন্ত্রের প্রয়োগকে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগ অর্থাৎ বিশেষরূপে প্রয়োগ। এই ব্যাপারে যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত হল—'অনেনেদং তু কর্তব্যং বিনিয়োগ স উচ্যতে'—অর্থাৎ এই মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের এই কর্ম করতে হবে। এইভাবে মন্ত্রের যে প্রয়োগ তাকেই বিনিয়োগ বলা হয়। বিনিয়োগ দু-প্রকারের— সামান্য ও বিশেষ। সমগ্র সংহিতার ব্রহ্মযজ্ঞে

(অর্থাৎ, নিয়মিত সময়ের মধ্যে সমগ্র সংহিতার সম্পূর্ণ পাঠ) বিনিয়োগকে সামান্য বিনিয়োগ বলে। অশ্বলায়নের মতে প্রতি সূক্তের ও সূক্তগত মন্ত্রের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ হল বিশেষ বিনিয়োগ। বিশেষ বিনিয়োগের কয়েকটি প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা, সমগ্র সূক্তের বিনিয়োগ, সূক্তের অন্তর্গত তিনটি অথবা চারটি ঋকের সামূহিক কিংবা এক-একটি ঋকের পৃথক বিনিয়োগ। প্রতিটি মন্ত্রের বিনিয়োগ তথা ঋষি-ছন্দ-দেবতাদির জ্ঞান সেই সেই বেদের (অর্থাৎ, যে যে বেদের মন্ত্র বিনিয়োগ বা প্রয়োগ হচ্ছে) ব্রাহ্মণ তথা কল্পসূত্র হতে জানা প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

বেদের যজ্ঞ

ভারতীয় সনাতনধর্ম-সংস্কৃতিতে বৈদিক যজ্ঞের অপরিসীম মহিমার কথা বলা হয়েছে। যজ্ঞই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। যজ্ঞের মাধ্যমে সাধক বিশ্বেশ্বর বিশ্বাত্মার বা পরমাত্মার সাথে একাত্মতা অনুভব করে। বেদ মতে সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মকে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত করার একমাত্র বিধি বা উপায় হচ্ছে যজ্ঞ। যজ্ঞের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই চলে আসছে। তত্বত সমগ্র মানব-জাতির জীবনের প্রারম্ভিক যাত্রা যজ্ঞ থেকেই শুরু হয়। পুরুষ ও নারী পরস্পর পরস্পরের নিকট সম্যক আহুতিদানের (যজ্ঞ) ফলেই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হয়। সৃষ্টির প্রাক্‌লগ্ন পরমপুরুষ ও পরম প্রকৃতি উভয়ে উভয়ের নিকট আহুতি (যজ্ঞ) দানের ফলেই সৃষ্টির উদ্ভব বা বিকাশ ঘটে।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যজ্ঞকর্ম সম্পাদনের জন্যেই মানবের আবির্ভাব বা উৎপত্তি। যথা—

> "যজ্ঞ নিষ্পত্তয়ে সর্বম্ এতদ ব্রহ্মা চকার হ।
> চাতুর্বর্ণ্যং মহভাগ যজ্ঞসাধনম্ উত্তমম্।।
> (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—৩।১২৩)।

অর্থাৎ, হে মহাভাগ! যজ্ঞকর্মের জন্য ব্রহ্মা যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সাধন চাতুর্বর্ণের রূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যজ্ঞ সম্বন্ধে বলা হয় যে, যজ্ঞই সমস্ত ভুবনের কেন্দ্র বা নাভি। এই বিষয়ে শুক্ল যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদের বক্তব্য একই যথা—

(ক) "অয়ং ভুবনস্যনাভিঃ" (শুক্ল-যজুর্বেদ, (৩১।১৬)।

(খ) "যজ্ঞো বিশ্বস্য ভুবনস্য নাভিঃ" (অথর্ব বেদ, ৯।১০।১৪)।

অথর্ব বেদে আরও বলা হয়েছে যে—"যজ্ঞাঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি"—অর্থাৎ, "যজ্ঞই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে।" শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"যজ্ঞো

বৈ বিষ্ণুঃ"—অর্থাৎ, "যজ্ঞই বিষ্ণু"। একথা সর্বজনবিদিত যে বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি কমল বিকশিত হয়। ওই কমলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রকট হন—এরপর সৃষ্টিক্রম চলতে থাকে। বেদ বা পুরাণের এটা হচ্ছে একটা আলংকারিক বর্ণন। এই আলংকারিক বর্ণনার অন্তরালে প্রথম যজ্ঞীয় পুরুষার্থের আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞকে 'ভুবনস্যনাভি' বলায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, যে বিষ্ণুর নাভি থেকে কমলের এবং ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ওই দিব্যনাভি যজ্ঞেরই নামান্তর। যজ্ঞীয় পুরুষার্থের কর্মবল্লরী আগে বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলস্বরূপ তার অঙ্গ-উপাঙ্গ কমলের পাপড়িরূপে বিকাশ পেতে থাকে। ওই বিকাশ প্রক্রিয়া থেকে যে কল্যাণকারী যজ্ঞীয় সৃজনশক্তির বিকাশ হয় তাঁকেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বলা হয়। বৈদিকশাস্ত্র মতে যজ্ঞ সাক্ষাৎ ভগবান স্বরূপ। এই ভগবান স্বরূপকেই বিভিন্ন বিদ্বৎজন ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন। যথা—বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, যজ্ঞপুরুষ, প্রজাপতি, সবিতা, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। ঋগ্বেদের ভাষায়—"একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২২)।

বৈদিক কর্মকাণ্ড মতে মানব মাত্রেই দেহধারণ করার ফলে তিন প্রকার ঋণে ঋণী হয়। যথা—(১) ঋষিঋণ, (২) দেবঋণ, (৩) পিতৃঋণ। এই তিন প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়, ব্রহ্মচর্য ও স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতৃঋণ থেকে মানব মুক্ত হয়।

উপরে কথিত বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে—বৈদিক যজ্ঞ একটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র অনুষ্ঠান, যা কোনওক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। এইজন্যই হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের সমস্ত অনুষ্ঠানেই যজ্ঞের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন—

"যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।"

অর্থাৎ, যজ্ঞ-দান তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই সকল কর্ম করাই বিধেয়। কারণ এই সমস্ত কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী মনীষীগণের চিত্তশুদ্ধিকারক। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি আরও বলেছেন—"যজ্ঞার্থাৎ কর্মনো অন্যত্র লোকোয়ং কর্মবন্ধনঃ" অর্থাৎ যজ্ঞীয় কর্মের অতিরিক্ত সমস্ত

কর্ম লোকবন্ধনের কারণ। জীবনে যজ্ঞের মহত্ব কতখানি তা নিশ্চিত করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩১ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুনকে বলছেন—

"নায়ং লোকোঅস্ত্য যজ্ঞস্য কুতো অন্যঃ কুরুসত্তম।"

অর্থাৎ হে অর্জুন, যজ্ঞহীন ব্যক্তির ইহলোকই নাই, সর্বলোকাতীত আত্মজ্ঞান লাভ তো দূরের কথা। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে—'অযজ্ঞিয়ো হতবর্চা ভবতি।'—অর্থাৎ যজ্ঞহীন ব্যক্তির তেজ নষ্ট হয়ে যায়। কালিকাপুরাণ মতে—'সর্বং যজ্ঞময়ং জগত্'—অর্থাৎ সম্পূর্ণ জগৎ যজ্ঞময়। যা সদা-সর্বদা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যথা—সন্ধ্যা, তর্পণ, বলিবৈশ্বদেব, দেবপূজন, অতিথি সৎকার, ব্রত, জপ, তপ, ভগবৎকথা শ্রবণ, তীর্থযাত্রা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ভোজন-পান, শয়ন-জাগরণ, উপনয়ন-বিবাহাদি সংস্কার। নৈমিত্তিক এবং পুত্রেষ্টি, রাজ্য প্রাপ্তি আদি কাম্য কর্ম—এসবই তত্ত্বত এবং তথ্যত যজ্ঞস্বরূপই। শুধু এইখানে শেষ নয়, জীবন-মরণকেও ভারতীয় ঋষি-মুনিরা যজ্ঞের স্বরূপ প্রদান করেছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্থ অধ্যায়ের ২৮ সংখ্যক শ্লোকে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় তথা জ্ঞানযজ্ঞ আদির উল্লেখ করে সবগুলিকেই যজ্ঞের রূপ প্রদান করেছেন।

মুণ্ডক উপনিষদেও যজ্ঞের মহিমা ঘোষিত হয়েছে—

'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ' (মুণ্ডক উপনিষদ, ১।২।৭)।

অর্থাৎ যজ্ঞ হচ্ছে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার নৌকা বিশেষ। বেদে যখন যজ্ঞের এত মাহাত্ম্য, তখন দেখা যাক—যজ্ঞ কী! যজ্ঞ কথাটি যজ্ ধাতু থেকে পাণিনিয় সূত্র দ্বারা নঙ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে—যার অর্থ দেবপূজা, সংগতিকরণ ও দান।

দেবপূজা—"যজনং দেবানাং পূজনং সৎকার ভাবনং যজ্ঞঃ—দেবতার পূজা, সেবা-সৎকার ভাবনাই যজ্ঞ। যে ব্যক্তি সমাজ-সংসার বা বিশ্বকে কিছু দেয়—যথা, সুখসমৃদ্ধি প্রদান, জ্ঞান বিতরণ, জীবনের সঠিক পথ নির্দেশকরণ ইত্যাদি। এইরূপ ব্যক্তিরাই দেব বা দেবতুল্য। এইরূপ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোই দেবপূজা। সহজ কথায় দেবপ্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা, আরাধনা ও শ্রদ্ধাসহকারে সম্মান জানানোই দেবপূজা।

সংগতিকরণ— যজ্ঞের জন্য শুধু যজ্ঞের দ্রব্যসমূহ যথা—সমিধ, যজ্ঞপাত্র, যজ্ঞকুণ্ড, ঘৃত, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করলেই যজ্ঞ হবে না, যদি না ওইসব দ্রব্যসমূহের মধ্যে সংগতিকরণ করা না হয়। যজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য সংগতিকরণ অর্থাৎ সংগঠন বা একীকরণ করে নেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সংগতিকরণের পূর্বে যজ্ঞকর্তাকে ওইসব দ্রব্যসমূহের দোষগুণ বিশ্লেষণ বা বিচার করে যে বস্তু বা দ্রব্য যোগ্য তা গ্রহণ যা অযোগ্য তা বর্জন করতে হবে। বৈদিক যজ্ঞে দ্রব্যসমূহের মধ্যে সংগতিকরণের যে ভাবনা তা বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও এর অন্তরালে এক দিব্য ভাবনারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা হল ব্যক্তি (যজ্ঞকর্তা) বা প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন বা একাত্ব অনুভব করা।

ঈশ্বরের প্রতীকস্বরূপ বিশ্বের সাথে তাদাত্ম্য স্থাপন করে, সবকিছুর মধ্যে তাঁর (ঈশ্বরের) দর্শন ও দর্শনান্তে একরূপ একাত্ম হয়ে যাওয়া। নিজ চেতনাকে বিশ্বচেতনার সাথে বিলীন করে দেওয়াই যজ্ঞের সংগতিকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। সামান্য নদী-নালার জল গঙ্গায় পতিত হলে তা যেরূপ গঙ্গায় পরিণত হয় তদ্রূপ ব্যক্তিচেতনা ঈশ্বরচেতনায় মিলিত হলে ঈশ্বর স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সংগতিকরণের ফলশ্রুতি হচ্ছে মানব মাত্রেই আপনার সত্তাকে অনুভব করা। এই দৈবী ভাবপ্রেরণা দ্বারা মানুষ উদাত্ত ও মহৎ হয়। সমষ্টির উন্নতিকেই সে তখন নিজের উন্নতি মনে করে। সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। সংগতিকরণে ব্যক্তিচেতনায় "আত্মবৎ সর্বভূতেষু", "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাবনার প্রকাশ হয়। যজ্ঞের এই মহান দিক লক্ষ করেই ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—"ইজ্যন্তে স্বকীয় বন্ধুবান্ধবাদয়ঃ প্রেম সম্মান ভাজঃ সংগতিকরণায় আহূয়ন্তে প্রার্থ্যন্তে চ যেন কর্মনেতি যজ্ঞঃ"—অর্থাৎ "যেখানে বন্ধু- বান্ধব স্নেহভাজন প্রিয়জনদের পারস্পরিক সংগঠনের জন্য প্রেম এবং সম্মানের সাথে একত্রিত করা হয় তা-ই যজ্ঞ।"

দান—দেশ-কাল-পাত্র বিচারপূর্বক সদুদ্দেশ্যের নিমিত্ত যে ধন দান করা হয় তাকেও যজ্ঞ বলা হয়। ভগবানে আত্মসমর্পণের বা আত্মদানের ক্রিয়াও যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। পরমাত্মা বা ভগবান আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা শুধু নিজেদের ভোগ বা সঞ্চয়ের জন্য নয়। কূপ, নদী, বৃক্ষ, পুষ্প, গাভী, ঘোড়া ইত্যাদি সব আপনার সম্পত্তি অপরের সেবার জন্য প্রদান করে—সেখানে

মানুষ হয়ে আমরা যদি তাদের থেকে পিছিয়ে থাকি তবে তা হবে বৈদিক যজ্ঞভাবনার বিপরীত। আমাদের যা কিছু বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ইত্যাদি আছে তা অপরের সেবার নিমিত্ত একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। কথায় বলে দু-হাতে উপার্জন করো, সহস্র হাতে দান করো। দানের উদ্দেশ্য নিজ ক্ষমতা, প্রতিভা, সম্পন্নতা লোক-কল্যাণের নিমিত্ত সমর্পণ করার জন্য নিজের মনকে তৈরি করা। যজ্ঞের এই মহিমা লক্ষ করেই যজুর্বেদের ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

"অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্।
অমীমদন্ত পিতরো যথা ভাগমাবৃষাষিয়ত্।।"

অর্থ—"হে যজ্ঞ দ্বারা আহুত দেবগণ ও পিতৃগণ—আপনারা এই যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়ে আনন্দ ও পুষ্টি প্রাপ্ত করুন এবং আমাদেরকেও আনন্দ ও পুষ্টি প্রদান করুন।" সবিতা বা সূর্য যেমন নিষ্কামভাবে বিশ্বের সেবা করে সুখ প্রদান করে ওইরূপ আমরা সবাই যেন বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত থাকি। উপরোক্ত যজ্ঞের তিন অর্থ বা যজ্ঞীয় দর্শন মানুষকে উদার ও মহৎ হতে প্রেরণা প্রদান করে—এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক বৈদিক যজ্ঞের বৈজ্ঞানিক আধার কী?

বিশ্বের প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনশীল। বস্তু সতত একরূপ বা এক রসে থাকে না। প্রকৃতির সব পদার্থ পরস্পরের সংযোগে নির্মিত হয় এবং বিয়োগে বিচ্ছিন্ন হয়।

মৃৎ-পরমাণু, জল ও অগ্নির সংযোগে ঘটরূপে প্রকাশ পায়, অন্যদিকে ওই মৃৎ-পরমাণু অন্য কোনও কারণে বিয়োগ দশা প্রাপ্ত হয়ে ঘটাদির নাশের কারণ হয়। এইজন্য সংযোগ অর্থাৎ পদার্থের পরস্পর সংগতিকরণই জগৎ সংসারের স্থিতির কারণ এবং বিয়োগ বা বিচ্ছিন্নতা বিনাশের হেতু। বীজ এবং মাটির সংযোগ না হলে অঙ্কুরোদ্গম্ হয় না। রজ এবং বীর্যের সংযোগ না হলে সন্তানের জন্ম হয় না।

অতএব মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জগৎ-সংসারের স্থিতি বজায় রাখার জন্য পদার্থের সংগতিকরণরূপী উদ্যোগে সতত প্রযত্নশীল থাকা— এই

সংগতিকরণের নামই যজ্ঞ। যজ্ঞই বিশ্বস্থিতির প্রধান কারণ। যজ্ঞ বিনা সমষ্টি-জগৎ এবং ব্যষ্টিজগৎ (ব্রহ্মাণ্ড এবং শরীররূপী জগতে অস্থিরতা প্রকাশ পাবে) অস্থিরতার কবলে পতিত হবে। যেমন মানুষ যদি উত্তম অন্ন, দুগ্ধ, ফল, ঘৃত, শাক-সবজি আদির মিশ্রণ বা একীকরণ অর্থাৎ সংগতিকরণ করে যদি উদররূপী হবনকুণ্ডে বৈশ্বানররূপী যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান না করে—তাহলে ওই উদররূপী হবনকুণ্ড থেকে রস-রক্ত-অস্থি-মজ্জাদি কখনও উৎপত্তি হবে না। ফলত রসাদি ধাতুর অভাবে মানুষ রোগগ্রস্ত হবে এবং দুর্বল হয়ে পড়বে, কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, যেখানে সে নিজের শরীরকে সুস্থ বা ঠিক রাখার জন্য অন্ন, দুধ, ঘৃত, শাক-সবজির আহুতি প্রতিদিন জঠরাগ্নিরূপী যজ্ঞাগ্নিতে করে সেরূপ সমষ্টি স্থিতিকে সুচারুরূপে বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন ঘৃত-দুগ্ধ ওষধি তথা অন্নাদির আহুতি যজ্ঞাগ্নিতে প্রদান করে। কারণ যজ্ঞই বিশ্বের আধার। সমষ্টি জগতের স্থিতিকে সুচারুরূপে বজায় রাখার জন্য যজ্ঞের প্রয়োজন অপরিহার্য।

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সমাজ এক যজ্ঞ। পরিবার এক যজ্ঞ। যে স্থানে বা যে সংস্থায় আমি কাজ করি সেই কাজ জ্ঞানের সাথে করাও এক যজ্ঞ। আমরা ওই যজ্ঞে অর্পিত হওয়ার হব্য-দ্রব্য বা সমিধবিশেষ। যজ্ঞে যজমান অগ্নি প্রজ্বলিত করেন—এই যজ্ঞাগ্নি সংকল্পের প্রতীক। অগ্নি যতক্ষণ প্রজ্বলিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির সংকল্পিত কার্য বাস্তবায়িত হয় না। কোনও কাজ সম্পন্ন করার আগে ব্যক্তি যদি ভাবে কাজটা করব কি করব না—তাহলে বুঝতে হবে ব্যক্তির জীবনযজ্ঞের সংকল্পের অগ্নি ঝিমিয়ে গেছে—এরূপ ব্যক্তির সংকল্পিত কর্মের পরিণতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বৈদিক যজ্ঞের মুখ্য পুরোহিত চারজনের মধ্যে সর্বপ্রধান হলেন ব্রহ্মা। সমগ্র যজ্ঞকর্মটি তিনি পরিচালনা করেন। যজ্ঞকর্মে যদি কোনওরূপ ত্রুটি ঘটে তবে তার জন্য তিনিই দায়ী থাকেন। তিনি লক্ষ রাখেন মন্ত্রপাঠ ও আনুষঙ্গিক কর্ম ঠিকমত হচ্ছে কি না। ঠিক সময়ে আহুতি দেওয়া হচ্ছে কি না। যজ্ঞের কোনও নিয়মকে যাতে অবহেলা না করা হয় তিনি সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখেন। কোনও যজ্ঞে যদি ব্রহ্মা না থাকেন তবে সেই যজ্ঞকে অপূর্ণ মনে করা হয়।

আমাদের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল পদের প্রবর্তন করা হয়েছে কেন? বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা বৈদিক যজ্ঞেরই একরূপ। ভারতীয় ঋষিভাবনায় রাষ্ট্রের কর্মও এক যজ্ঞ। বৈদিকব্রাহ্মণ গ্রন্থে (যথা—'শতপথ ব্রাহ্মণ') রাষ্ট্র এবং অশ্বমেধ যজ্ঞকে এক ও অভিন্ন ভাবা হয়েছে। যথা—''শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রং। রাষ্ট্রং বৈ অশ্বমেধঃ। তস্মাৎ রাষ্ট্রী অশ্বমেধেন যজেত্''—অর্থাৎ সমৃদ্ধিই হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই অশ্বমেধ। অশ্বমেধের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যজন অর্থাৎ সংগতিকরণ বা সংগঠন হোক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভারতীয় ঋষির ভাবনায় রাষ্ট্রেরও যজ্ঞকর্ম আছে। জনগণ বা নাগরিক এই যজ্ঞের যজমান। প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীগণ এই যজ্ঞের অন্যান্য পুরোহিতবর্গ। রাষ্ট্র বা রাজ্য নির্মাণের তথা সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য তাঁরা সংকল্প গ্রহণ করে আপন আপন কাজে নিযুক্ত থাকেন। রাষ্ট্র বা রাজ্যরূপ যজ্ঞকর্মের যিনি ব্রহ্মা তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল। বলা বাহুল্য বর্তমান শাসনব্যবস্থা বৈদিক যজ্ঞ কর্মের রূপান্তর মাত্র। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রকল্যাণ কর্মরূপ যজ্ঞের ঋত্বিক বা পুরোহিত। জনতারূপ যজমানের সাবধানতার সঙ্গে এদের নির্বাচন করা উচিত। অন্যথায় রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যা আজ প্রতিমুহূর্তেই হচ্ছে। বৈদিক যজ্ঞের সাথে গীতোক্ত বা 'গীতায়' কথিত যজ্ঞ বা যোগের সংগতিকরণ কী? তার বৈজ্ঞানিক আধার কী? এই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন—যজ্ঞে যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয় তার বিশেষত্ব কী?

প্রথমত—যজ্ঞের অগ্নিশিখা সদাই ঊর্ধ্বমুখী, সে যেন নত হতে জানে না। তাকে নত করার চেষ্টা করলেও সে নত হতে চায় না।

দ্বিতীয়ত—অগ্নিতে যা আহুতি দেওয়া হয় তা অগ্নিরূপ প্রাপ্ত হয়। যে বস্তুই আহুতি দেওয়া হোক, অগ্নি তা নিজের সমতুল্য বা নিজ সদৃশ করে নেয়।

তৃতীয়—অগ্নিতে যা আহুতি দেওয়া হয়, অগ্নি তা সঞ্চয় না করে বিশ্বকে বিলিয়ে দেয়।

চতুর্থত—অগ্নি নিজের অস্তিত্বের উষ্ণতা ও আলোকে সর্বদাই প্রকাশ করে।

পঞ্চমত—অগ্নি ঋক্ বেদ মতে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরোহিত। পূর্বকথিত বৈদিক যজ্ঞাগ্নির পাঁচ বিশেষত্বকে যদি ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারে বা আচারে-আচরণে আনা যায় তাহলে মানুষের মধ্যে হবে দেবত্বের উদয় এবং ধরিত্রীর বুকে হবে স্বর্গের আবির্ভাব। যজ্ঞের প্রতিটি আহুতির সাথে উচ্চারিত হয় 'ইদং ন মম'—অর্থাৎ এসব আমার নয়। যজ্ঞের সবকিছুই রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য। যজ্ঞ যজ্ঞকর্তার বা যজমানের একার কল্যাণের জন্য নয়। যজ্ঞ শেষে যে যজ্ঞাবশেষ (নিবেদিত অন্ন বা প্রসাদ) থাকে তা সকলকে বিতরণ করার জন্য—যজমানের একার ভোগের জন্য নয়।

বেদ মতে যজ্ঞের তিনক্ষেত্র— (১) ব্রহ্মাণ্ড, (২) দেহ, (৩) সংসার।

১। ব্রহ্মাণ্ড—নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ক্রিয়া প্রতি মুহূর্তেই সংঘটিত হচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে অনেক অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া। যেমন গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব, ঋতুর পরিবর্তন, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, মরুত প্রভৃতি দেবশক্তির গতিবিধি, মানবজাতির ভাব এবং কর্মের প্রতিক্রিয়াদি কারণে অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যে চঞ্চলতা বা অস্থিরতার সৃষ্টি হয় তাকে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্রে আকাশী যজ্ঞ মানা হয়।

২। দেহ—পঞ্চতত্ত্বে নির্মিত দেহের সঞ্চালন, প্রাণ, অপানাদি বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ (শ্বাস-প্রশ্বাস), বাত-পিত্ত-কফ, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার এবং পঞ্চকোষের (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়) গতিবিধিকে দেহগত যজ্ঞ বলা হয়। এই যজ্ঞ দেহক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই প্রকার যজ্ঞ সুসঞ্চালিত হলে সংসারে সুখ-শান্তি স্থির হয়। দুই যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে না—তা থেকে অনেক বিপদ-আপদ-এর আবির্ভাব সুনিশ্চিত।

ব্রহ্মাণ্ডক্ষেত্রে আকাশী যজ্ঞে যদি কিছু গোলমাল ঘটে তবে ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, ঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ, মহামারী, সামুহিক বিদ্বেষ, বিক্ষোভ, যুদ্ধ, ভয়, শোক ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে।

দেহক্ষেত্রে দেহগত যজ্ঞে যদি বিশৃঙ্খলা বা অনিয়ম ঘটে তাহলে স্বাস্থ্যহীনতা, দুর্বলতা, রোগ-ব্যাধি, নিরাশা, বুদ্ধিভ্রম ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

৩। সংসার—এই তৃতীয় যজ্ঞটি হবনক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ হোমের মাধ্যমে সংসারক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা উপরোক্ত দুই যজ্ঞের বিকৃতি এবং

ক্ষতির পূর্তিকরণ সম্পন্ন করা হয়। ঋতুর আবর্তনে যখন শীতের আধিক্য ঘটে তখন অগ্নি প্রজ্বলন বা গরম পোশাকের সহায়তায় শীতকে নিবারিত করা হয়। শরীরে কোনও ভিটামিনের অভাব হলে ঔষধ বা ইঞ্জেকশন দ্বারা তা পূরণ করা হয়। তদ্রূপ হবন দ্বারা বা হোমের দ্বারা হব্য পদার্থ (হোমের দ্রব্য) এবং শক্তিশালী বেদমন্ত্র দ্বারা দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ড বা পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে যজ্ঞকর্ম সব সময় চলছে তার ভারসাম্য ঠিক করে সংসারে সুখশান্তি স্থাপন করা হয়। যে দেবশক্তি আকাশের মধ্যে থেকে সৃষ্টিকে সঞ্চালন করে সেই দেবশক্তিই মানবের দেহে প্রবিষ্ট হয়ে দেহযন্ত্রকে সঞ্চালন করে। শীত-গ্রীষ্ম, প্রকাশ, বায়ু, অন্ন, জল ইত্যাদি সব ব্রহ্মাণ্ড থেকে দেহরূপ পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত হয়। মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়সকল ওই দেবশক্তির অধীন। সূর্য বা প্রকাশ যদি না থাকে, তবে চক্ষু-ইন্দ্রিয় কিভাবে দেখবে! বায়ুদেব না থাকলে নাসিকা বেকার, জীব মৃত্যুমুখে পতিত হবে। ব্যোমদেব (আকাশ) যদি না থাকে তবে কর্ণ-ইন্দ্রিয় নিরর্থক হয়ে পড়বে। এইভাবে দেহপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়েরই কার্যকলাপ উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একের যজ্ঞক্রিয়ায় অপরের যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এইজন্যই 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ বলা হয়েছে—

"যজ্ঞাৎ যজ্ঞং নির্মিতা ইতি"—অর্থাৎ যজ্ঞ থেকেই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। বেদেও বলা হয়েছে—

"যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম।

যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ।।"—অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। দেবতা যজ্ঞ দ্বারাই যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এইরূপে দেহের মধ্যে যে দেবশক্তি ক্রিয়াশীল থেকে দেহযজ্ঞ সম্পন্ন করেন বা করছেন সেই দেবশক্তির পারমার্থিক যজ্ঞের কারণেই আমরা জীবনধারণ করতে সমর্থ হই।

যথা বায়ুদেব দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস, অগ্নিদেব দ্বারা পাচনক্রিয়া, বরুণদেব দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে রস-রক্তের প্রবাহ, পৃথিবী দ্বারা অস্থি, সূর্যদেব দ্বারা নেত্রাদির সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দেবশক্তি অধিষ্ঠিত হয়ে আপন আপন কার্য সম্পন্ন করে থাকেন। যজ্ঞে দেবতারা বর্ষণ করেন নীচের দিকে, মানবলোক বর্ষণ করে উর্ধ্বদিকে। ভূমিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নিতে অর্পিত দ্রব্যসমূহ সুগন্ধিযুক্ত ধূমাকারে উর্ধ্বদিকে প্রবাহিত হয়—এটাই

মানব-অর্পিত বা মানবলোককৃত উর্ধ্বদিকের বর্ষণপ্রবাহ। বৃষ্টি-বিদ্যুৎপাত দেবলোকেরকৃত নিম্নপ্রবাহ। 'বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে' এই কথাই উক্ত হয়েছে, যথা—

"অধপ্রবর্ষিনো দেবা সৌমাস্তূর্দ্ধ প্রবর্ষিণঃ
উর্দ্ধং প্রবর্ষিণং মুখ্য ভৌমদত্ত হুতাশনে।। (বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ, অধ্যায় ২৮৭, শ্লোক ৫)। আমরা বেদ এবং গীতায় দেখতে পাই, যজ্ঞের সঙ্গে বর্ষার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যজ্ঞের দ্বারা বৃষ্টিপাতের কথা বেদ, গীতা মনুস্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে আমাদের পুণ্যভূমি ভারতে প্রায় প্রত্যহই নানাবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো—ফলে বর্ষাও খুব হতো। দেশও ছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, অন্ন-দুধে পরিপূর্ণ। কৃষিকার্যে বর্ষা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ কাল—কারণ বর্ষার জলে আকাশস্থ অনেক খাদ্য সম্মিশ্রিত থাকত, যার ফলে অন্ন বনস্পতির বৃদ্ধি হতো প্রচুর মাত্রায় এবং পৌষ্টিক উপাদানও থাকত প্রচুর। নদী-নালার জল সিঞ্চন করেও ওই পৌষ্টিক বর্ধন হতো না, যা হতো বর্ষার জলে। কিন্তু বর্ষা, প্রকৃতি বা দৈবাধীন। চাহিদানুযায়ী মানুষ তো আর খেয়ালখুশি মতো বৃষ্টিপাত করাতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের অন্ন বৃষ্টির উপরেই নির্ভরশীল। বেদের ঋষি বৃষ্টির অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বর্ষা বা বৃষ্টিপাতের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য প্রযত্নশীল হন। দীর্ঘ প্রযত্নের পর ঋষিরা যজ্ঞ দ্বারা বৃষ্টিপাত ঘটানো এবং বন্ধ করা— উভয়ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করেন। ঋষিদের এই সফলতা ও যজ্ঞের মহত্ব ঘোষিত হল 'পদ্মপুরাণের' সৃষ্টি খণ্ডে—

যজ্ঞেনা আপ্যাগিতা দেবা বৃষ্টযুৎ সর্গেন মানবাঃ।
আপ্যায়নং বৈ কুর্বন্তি যজ্ঞাঃ কল্যাণ হেতবঃ।।

অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতারা পরিতুষ্ট হন। যজ্ঞ হতে বর্ষা হয় এবং মনুষ্য ও উদ্ভিদাদির পালন হয়। যজ্ঞই কল্যাণের হেতু। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখেও ধ্বনিত হল যজ্ঞের মহিমা—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভুতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।"

অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অন্নের উৎপত্তি বর্ষা থেকে হয়। বর্ষা যজ্ঞ থেকে হয়। যজ্ঞ কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়। অথর্ব বেদের 'কৃষিসূক্তে'ও বৃষ্টির জন্য ঋষির প্রার্থনা—

শুনাসীরেহ স্ম মে জুষেষাম্।
যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়স্তেনেমামুপ সিঞ্চতম্।।

অর্থাৎ হে পবন এবং সূর্যদেব আমার হবন স্বীকার বা গ্রহণ করুন। যে জল আকাশ মণ্ডলে রয়েছে তা বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীকে সিঞ্চন করুন। যজুর্বেদেও উক্ত হয়েছে—

"নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু,
ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগাক্ষেমো নঃ কল্পতাম্।"

অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় মেঘ বর্ষণ করুক। আমাদের জন্য ফলশালী ওষধি পরিপক্ক হোক এবং প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তির সহায়তা হোক। যজুর্বেদে আরও বলা হয়েছে—

'বিষ্টম্ভেন বৃষ্টয়া বৃষ্টিং জিন্ব।"

অর্থাৎ অনাবৃষ্টির উপর বিজয় প্রাপ্ত হও। যজ্ঞের দ্বারা সুবৃষ্টিকে পৃথিবীতে নামাও। উপরোক্ত মন্ত্রসমূহে যজ্ঞ দ্বারা বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন যজ্ঞের দ্বারা কি বৃষ্টিপাত সম্ভব? বিজ্ঞান বলে আগুন জ্বালালে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ওই গ্যাস পৃথিবীর উপর একটা স্তর রচনা করে এবং এই স্তরের কাজ হল সূর্যকিরণের তাপকে ধরে রাখা। ওই গ্যাসীয় স্তর পাতলা হলে সূর্য কিরণের তাপকে ধরে রাখতে সমর্থ হয় না, ফলে ভূমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যদি কার্বন ডাই-অক্সাইডের গ্যাসীয় স্তর পৃথিবীর উপরিস্তরে ঘন ও মজবুত হয়ে অবস্থান করে তাহলে সূর্যকিরণ দ্বারা পৃথিবীতে আগত উর্বরাশক্তি ও তাপশক্তি সুরক্ষিত এবং সংগৃহীত থাকে। মেঘ ফাঁপা বা মেঘের ভেতর শূন্যতার সৃষ্টি হলে হাওয়া বা বাতাস তার মধ্যে প্রবেশ করে মেঘকে এদিক সেদিক উড়িয়ে বা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যদি ওই মেঘ ঘন হয় তাহলে বাতাস তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে ওই মেঘ তখন ভারী হয় এবং বর্ষণ করতে শুরু করে। যজ্ঞীয় হোমের দ্বারা ওই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। যজ্ঞে অর্পিত ঘৃত সূক্ষ্ম হয়ে বাতাসের সাহায্যে

মেঘ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং মেঘের উপরে একটা উজ্জ্বল মসৃণ আবরণ বা স্তর রচনা করে যার ফলে বাতাস মেঘের ভেতরে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়। ফলত মেঘ ভারী হয়ে বৃষ্টিপাত বা বর্ষণ শুরু করে। শীতকালে ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শে যাতে হাত-পায়ের বা গায়ের চামড়া না ফাটে তারজন্য অনেকে যেমন ওই প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভ্যাস্‌লিন, দুধের সর, গ্লিসারিন বা নানা ভেষজ ক্রিম প্রলেপ দেয়, যার ফলে ঠান্ডা বাতাস ত্বক বা গাত্রচর্মের আবরণ ভেদ করতে পারে না। ঠিক সেইরূপ মেঘের উপর যজ্ঞীয় হোমের আবরণস্তর বাতাসকে মেঘের ভেতর প্রবেশ করতে না দিয়ে মেঘকে ভাসিয়ে বা উড়িয়ে নিয়ে যেতে বাধা দেয়—এই বাধাদানই বর্ষার কারণ।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আজ প্রমাণিত বায়ু শোধন করার এক বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যজ্ঞের মধ্যে নিহিত। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু বিভিন্ন রোগ-কীটাণুর আধার। এর নিবারণের জন্য যজ্ঞীয় অগ্নিজাত উর্জা মহৌষধ স্বরূপ। বৈদিক বিবিধ যজ্ঞের যে বিবিধ কল্যাণকারী দিক আছে তা নিয়ে আলোচনা করতে বা সুগন্ধি বায়ুতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে, প্রকৃতি ও পরিবেশকে নির্মল ও দূষণ মুক্ত করতে বৈদিক যজ্ঞের ভূমিকা অপরিসীম।

যজ্ঞ বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে অন্তরিক্ষের উর্বরতা বাড়ানোর এক সাধনপ্রক্রিয়া বিশেষ। জমিতে সার দিলে যেমন জমির ফসল বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ যজ্ঞের বা যজ্ঞীয় অগ্নিজাত উর্জার এক বিশেষত্ব হচ্ছে, ওই উর্জা অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হয়ে এক বিশেষ জীবনীশক্তিবর্ধক তত্ত্ব দিয়ে অন্তরিক্ষকে ভরে দেয়—যা মানুষ, প্রাণী, বনস্পতি সবারই পোষক। এই পোষক তত্ত্বই গীতার ভাষায় পর্জন্য। পর্জন্য শব্দের অর্থ শুধু মেঘ নয়। পর্জন্য শব্দের আর এক অর্থ প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি যা বর্ষার সাথে বর্ষিত হয়ে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে।

বেদে অসংখ্য যজ্ঞের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে মুখ্য বা প্রধান পাঁচটি—(১) দর্শপূর্ণমাস বা ইষ্টিযাগ, (২) অগ্নিহোত্র, (৩) চাতুর্মাস, (৪) পশু, (৫) সোম। এছাড়াও পৌরাণিক, তান্ত্রিক এবং শাস্ত্রকথিত বহুবিধ যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়। যথা—বিষ্ণুযাগ, রুদ্রযাগ, মহারুদ্রযাগ, গণেশযাগ, চণ্ডীযাগ, গায়ত্রীযাগ, সূর্যযাগ, গ্রহশান্তি, লক্ষহোম, নারায়ণ, পবিত্রেষ্টি ইত্যাদি।

আবার যাজ্ঞিক দৃষ্টিতে যজ্ঞকে, শ্রৌতযজ্ঞ বা শ্রৌতকর্ম (বৈদিক), স্মার্তযজ্ঞ বা স্মার্তকর্ম (তান্ত্রিক), পৌরাণিক (মিশ্র), এই বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। নিচে সংক্ষেপে তিন শ্রেণীতে যজ্ঞের কথা বিবৃত করা হল—

শ্রৌতযজ্ঞ—বেদের ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র নামে দুই অংশ আছে। এই দুই অংশের অথবা কোনও এক অংশের সাঙ্গ-উপাঙ্গ রীতিসহ বর্ণিত যজ্ঞকেই শ্রৌতযজ্ঞ বলা হয়।

আবার প্রত্যেকটি বৈদিক যাগ প্রকৃতি ও বিকৃতি পর্যায়ে দ্বিবিধ। প্রকৃতি যাগকে প্রধান যাগ বলা হয়। এক-একটি প্রকৃতি যাগে বহু বিকৃতি বা রূপান্তর দৃষ্ট হয়। এক জাতীয় যাগের মূল রূপটিকে প্রকৃতি বা প্রধান যাগ বলে। প্রকৃতি যাগকে আদর্শ রেখে বিকৃতি যাগগুলি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতি যাগ অঙ্গী বা মূল। বিকৃতি যাগ তার অঙ্গ।

অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞই শ্রৌতযজ্ঞ নামে অভিহিত। এই সকল যজ্ঞের বিবরণ যে-সকল বৈদিক গ্রন্থ বা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেইগুলিকে বলা হয় শ্রৌতসূত্র।

শ্রৌতযজ্ঞে তিন অগ্নির কথা বলা হয়েছে—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। এই তিন অগ্নিতে শ্রৌতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই তিন অগ্নিকে শ্রৌত অগ্নিও বলা হয়। বৈদিক যজ্ঞশালায় চতুষ্কোণ বেদী নির্মাণ করে তার তিনদিকে তিন অগ্নিকে স্থাপন করা হতো। বেদীর পশ্চিমদিকে থাকত গার্হপত্য অগ্নির স্থান। বেদীর পূর্বদিকে আহবনীয় অগ্নি স্থাপন করা হতো এবং বেদীর দক্ষিণদিকে স্থাপন করা হতো দক্ষিণাগ্নিকে। মাটির বেড়া দিয়ে অগ্নির স্থান নির্মিত হতো। গার্হপত্যের স্থান চতুর্ভুজ আকার, আহবনীয়র স্থান বৃত্তাকার এবং দক্ষিণাগ্নির স্থান ছিল অর্ধ বৃত্তাকার। তিনেরই ক্ষেত্রফল (Area) হতো সমান। একহাত দীর্ঘ, একহাত চওড়া ক্ষেত্রের সমান।

গার্হপত্য অগ্নি ছিল গৃহপতির প্রতিনিধিস্বরূপ। এই অগ্নিকে গৃহের কর্তাও বলা যায়। আহবনীয় অগ্নি, দেবতাদের উদ্দেশে ব্যবহৃত অগ্নির নাম। এই অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশে যাবতীয় দ্রব্যের আহুতি প্রদান করা হয়। আহুতি হয় বলেই এর নাম আহবনীয়। যে অগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দিষ্ট (অভিপ্রেত)

দ্রব্য দেওয়া হয়—তা দক্ষিণাগ্নি। এই তিন অগ্নি দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নামই শ্রৌতকর্ম বা শ্রৌতযজ্ঞ। গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নির বিধিপূর্বক স্থাপনকে শ্রৌতাধান বলে। গার্হপত্যে হবি আদির (ঘৃত ও হোমের দ্রব্য), সংস্কার, আহবনীয়তে হবন (হোম) এবং দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃসম্বন্ধী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হতো।

বৈদিক যজ্ঞের কোনওটিতে ক্রিয়াদির প্রাধান্য আবার কোনওটিতে ভাবনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যেসব যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধানের দিকে লক্ষ রেখে অনুষ্ঠিত হতো সেগুলিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য এবং যে-সকল যজ্ঞে ভাব বা ভাবনার প্রাধান্য সেগুলিতে পবিত্রতা, সততা, সাত্ত্বিকতা ও সৎ উদ্দেশ্যকে মহত্ব দেওয়া হতো।

সকল শ্রৌতযজ্ঞে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে ঋক্, সাম, যজু এই তিন বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হতো। এই দৃষ্টিতে শ্রৌতযজ্ঞ ত্রয়ীসাধ্য। শ্রৌতযজ্ঞের অন্তর্গত ইষ্টিযাগ চারজন বৈদিক বিধি-বিধান বিশেষজ্ঞ বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হতো। পশুযাগে ছয়জন ঋত্বিক বা পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। সোমযাগে ষোলজন ঋত্বিক থাকেন। ইষ্টিযাগে দেবতার উদ্দেশে প্রধান হবি অন্ন। এইসব শ্রৌতযজ্ঞের অনুষ্ঠান আজকাল হয় না বললেই চলে।

স্মার্তযজ্ঞ—উপনয়ন, বিবাহ, বৃষোৎসর্গ, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য যে যজ্ঞীয় কর্মের অনুষ্ঠান হতো তা-ই স্মার্তযজ্ঞ। এই যজ্ঞের মুখ্যত চারভেদ যথা—হুত, অহুত, প্রহুত এবং প্রাশিত। যে যজ্ঞকর্মে অগ্নিতে কোনও বিহিত (শাস্ত্র নির্ধারিত) দ্রব্যের হবন হতো তা হুতযজ্ঞ। অহুত শব্দের অর্থই হচ্ছে যেখানে দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে কোনও কিছু প্রক্ষিপ্ত করা হয় না। যে যজ্ঞে হবন ও দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যসমূহের 'বলি' সংজ্ঞা দ্বারা ত্যাগ করা হতো তা প্রহুত যজ্ঞ। যে যজ্ঞে শুধুমাত্র ভোজনেরই প্রাধান্য তা প্রাশিত যজ্ঞ। স্মার্তযজ্ঞ শাস্ত্রীয় অগ্নি ও লৌকিক অগ্নি দ্বারা সম্পন্ন হতো। শাস্ত্রীয় অগ্নি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় অগ্নিস্থাপন বিধি দ্বারা স্বীকৃত অগ্নি। সাধারণ অগ্নিই লৌকিক অগ্নি। এই অগ্নিকে সংস্কার দ্বারা পরিশোধি ভূমিতে স্থাপন করে স্মার্তযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই যজ্ঞের বিধি যে-সকল গ্রন্থে বলা হয়েছে তাদের 'গৃহ্যসূত্র'

বা 'স্মার্তসূত্র' বলা হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ, ষোড়শ সংস্কার, পারলৌকিক আদি ক্রিয়া স্মার্তযজ্ঞের অধীন। স্মার্তযজ্ঞ সাধারণত এক ব্যক্তি বা এক ঋত্বিক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। হবনমূলক ক্রিয়ায় এক ব্রহ্মার (ঋত্বিক), তথা ভোজন আদিতে অনেক ব্যক্তি বা ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। গৃহ্যসূত্রকার স্মার্তযজ্ঞের জন্য যজমান, ব্রহ্মা (যজ্ঞের এক ঋত্বিক) এবং আচার্য এই তিনজনের আবশ্যকতার কথা বলেছেন।

পৌরাণিক যজ্ঞ—আজকাল এই যজ্ঞেরই প্রচার-প্রসার দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক যজ্ঞকে হবন, দান, পুরশ্চরণ, শান্তিকর্ম, পৌষ্টিক (পোষক, কল্যাণকারী, বলবর্ধক), ইষ্ট, পূর্তব্রত (সাধারণের কল্যাণের জন্য জলাশয়াদি খনন), সেবা আদিরূপে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। বেদ এবং তন্ত্রের সংমিশ্রণে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম পৌরাণিক যজ্ঞ। এই যজ্ঞে লৌকিক অগ্নিই প্রধান। এই যজ্ঞে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত ঋত্বিক নিয়োগ করা যেতে পারে। পৌরাণিক যজ্ঞে সকল বর্ণেরই মানুষের অধিকার ঘোষিত হয়েছে।

এবার আমরা শ্রুতি বা বেদ প্রতিপাদিত যজ্ঞের সাথে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত হব। পূর্বেই বলা হয়েছে, বেদকথিত অনেক যজ্ঞের মধ্যে মুখ্য যজ্ঞ পাঁচটি। যথা—

১। ইষ্টিযাগ— একশ্রেণীর শ্রৌতযজ্ঞের নাম ইষ্টিযাগ। আহিতাগ্নি অর্থাৎ যার গার্হপত্য অগ্নি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় এবং প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটি ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করতে হয়। অমাবস্যায় ইষ্টিযাগের নাম দর্শযাগ এবং পূর্ণিমায় ইষ্টিযাগের নাম পূর্ণমাসযাগ। উভয় যজ্ঞের বিধি-বিধান প্রায় একই। যাজ্ঞিকের ভাষায় পূর্ণমাসযাগ যাবতীয় ইষ্টিযাগের প্রকৃতি, বাকি সব ইষ্টিযাগ তার বিকৃতি। অমাবস্যায় দু-দিন ও পূর্ণিমায় দু-দিন এই ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করতে হয়। এই যাগের জন্য চারজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। এই যাগে পুরোহিত বা ঋত্বিকদের মধ্যে ইতর বিশেষ ভেদ নেই। সোমযাগে যেরূপ ব্রহ্মা অন্যান্য পুরোহিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী, ইষ্টিযাগে তেমন ভেদ নেই। এখানে চারজন পুরোহিতেরই

সমমর্যাদা। এই যজ্ঞে তিনটি আহুতিই মুখ্য। প্রথম আহুতিতে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ (যব অথবা চালের তৈরি রুটি) অর্পিত হয়। যব অথবা চাল বেটে আগুনে সেঁকে এই রুটি প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় আহুতিকে উপাংশুযাজ বলা হয়। যা বিষ্ণু, প্রজাপতি, অগ্নি ও সোম এই চারজন দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হয়। তৃতীয় আহুতি অগ্নি ও সোম এই যুগ্ম দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। এই যজ্ঞে যে চারজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় তাদের যথাক্রমে—হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীধ্র (ব্রহ্মার সহকারী) এবং ব্রহ্মা নামে অভিহিত করা হয়। বহু প্রকারের ইষ্টিযাগ আছে যথা পুত্রলাভের জন্য 'পুত্রেষ্টি', অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি আনার জন্য 'কারিরী ইষ্টি'। জমির প্রথম শস্য বা গাছের প্রথম ফল দেবতাকে অর্পণ করার জন্য 'আগ্রায়ণ ইষ্টি' ইত্যাদি।

২। **অগ্নিহোত্র বা হোমযজ্ঞ**—বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলি ছিল নিত্য অনুষ্ঠেয়, কতকগুলি ছিল কাম্য। কাম্যকর্ম স্বেচ্ছাধীন। যিনি বিশেষ কোনও ফল কামনা করেন, তিনি তদনুযায়ী কাম্যকর্ম বা যজ্ঞ করবেন, না করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু নিত্যকর্ম বা নিত্যযজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য। যা অবশ্য কর্তব্য তা না করলে প্রত্যবায় বা পাপ হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ নিত্যকর্ম। এই যাগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় গৃহস্থের অগ্নিকুণ্ডে দুধ-দই-পুরোডাশ প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হয়। সূর্য ও অগ্নি এই যাগের দেবতা। প্রাতে সূর্যকে উদ্দেশ করে এবং সন্ধ্যায় অগ্নিকে উদ্দেশ করে মন্ত্রপাঠ ও আহুতি দিতে হয়। এই যাগকে দর্বীযাগ ও দর্বীহোমও বলা হয়। কারণ দর্বী বা হাতার সাহায্যে হোমকুণ্ডে আহুতি অর্পণ করা হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ প্রত্যহ অগ্নিহোত্র যাগ অনুষ্ঠান করতেন। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে এই যজ্ঞ ছিল বাধ্যতামূলক। 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে অগ্নিহোত্রকে 'জরামর্য সত্র' বলা হয়েছে, যথা—"এতদ্ বৈ জরামর্যং সত্রং..." কারণ জরা বা মৃত্যু ব্যতীত এই যাগের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান হতে ব্রাহ্মণের অব্যাহতি নেই। এই যাগে প্রাতে সূর্যের উদ্দেশে এবং সন্ধ্যায় অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। একই মন্ত্র দু-বেলা উচ্চারণ করা হয়। কেবল প্রাতে 'সূর্যঃ জ্যোতিঃ জ্যোতিসূর্যঃ' স্থলে সন্ধ্যায় সূর্যের পরিবর্তে অগ্নিশব্দ যুক্ত করে 'অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ' উচ্চারণ করতে হয়। প্রাতঃকালের

অনুষ্ঠান কারও মতে সূর্যোদয়ের পূর্বে, কারও মতে সূর্যোদয়ের পরে করা কর্তব্য। যাঁরা সূর্যোদয়ের পূর্বে হোমাহুতি করেন তাঁদের 'অনুদিতহোমী' এবং যাঁরা সূর্যোদয়ের পর হোমাহুতি প্রদান করেন তাঁদের 'উদিতহোমী' বলা হয়। প্রাতে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র যাগের দুটি প্রধান আহুতির মধ্যে প্রথমটি সূর্যের, দ্বিতীয়টি প্রজাপতির উদ্দেশে এবং সন্ধ্যায় দুটি প্রধান আহুতির মধ্যে একটি অগ্নি অপরটি প্রজাপতির উদ্দেশে নিবেদিত হয়। অগ্নিহোত্র যাগ প্রথম যেদিন আরম্ভ হয়, সেদিন প্রথম যাগটি সন্ধ্যায় সম্পন্ন করতে হয়। সন্ধ্যায় অগ্নিদেবের প্রাধান্য— এইজন্যই যাগটির 'সূর্যহোত্র' নাম না হয়ে 'অগ্নিহোত্র' নাম হয়েছে।

৩। **চাতুর্মাস**—চারমাস অন্তর অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম চাতুর্মাস যজ্ঞ। এই যজ্ঞের চারটি পর্ব। প্রথম ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (১) বৈশ্বদেব পর্ব। দ্বিতীয় আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে (২) বরুণ প্রধাস পর্ব। তৃতীয় কার্তিকী পূর্ণিমাতে (৩) সাকমেধ পর্ব এবং চতুর্থ ফাল্গুন শুক্ল প্রতিপদে (৪) শুনাসীরীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

১। যে পর্ব বৈশ্বদেবের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় তাকে 'বৈশ্বদেব পর্ব' বলে।

২। যে পর্বে বরুণ দেবতার উদ্দেশে প্রধাস অর্থাৎ হবি দেওয়া হয় তাকে 'বরুণ প্রধাস পর্ব' বলে।

৩। যে পর্বে যজ্ঞীয় হবি প্রাপ্ত হয়ে দেবগণ সমানভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন তাকে 'সাকমেধ পর্ব' বলে।

৪। যে পর্বের দেবতা আদিত্য ও বায়ু হন এবং এই দুই দেবতার উদ্দেশে হবি প্রদানই 'শুনাসীরীয় পর্ব' নামে অভিহিত।

৪। **পশুযাগ**—এই যাগের আর এক নাম নিরূঢ় পশুবন্ধযাগ। আহিতাগ্নি তিন বর্ণের পুরুষই (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) পশুযাগের অধিকারী। প্রতি বৎসর এই যাগ একবার করে করতে হয়। প্রয়োজনে বৎসরে দুইবার বা ছয়বারও করা যায়। যদি একবার করা হয় তাহলে প্রতি বৎসর বর্ষায় অনুষ্ঠেয়। বৎসরে দুইবার করলে একটি সূর্যের উত্তরায়নকালে অপরটি দক্ষিণায়ণকালে করতে হবে। ছয়বার করলে ছয় ঋতুর প্রতি ঋতুতে এক-একটি যাগের বিধান। এই যাগের আহুতি দ্রব্য পশু সেইজন্য একে পশুযাগ বলা হয়। পশুযাগের দেবতা প্রজাপতি, সূর্য বা ইন্দ্র বা অগ্নি। যাগটি সম্পন্ন করার জন্য

ছয়জন পুরোহিতের প্রয়োজন। যথা অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, হোতা, মৈত্রবরুণ, অগ্নিধ্র ও ব্রহ্মা। পশুযাগের বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও ধর্মস্থানে পাওয়া যায়।

৫। সোমযাগ—বৈদিক আর্যদের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যাগ। এই যাগে অগ্নিতে সোমলতার রস আহুতি দেওয়া হয়। এইজন্য এর নাম সোমযাগ। সকল সোমযাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম (যজ্ঞবিশেষ)। সেজন্যই এই যাগকে জ্যোতিষ্টোমও বলা হয়। সোমযাগে যে বারোটি স্তোত্রগীত হয় তার শেষ স্তোত্রটির নাম অগ্নিষ্টোম। অগ্নিষ্টোম সামগানের মাধ্যমে যাগ সমাপ্ত হয়, সেইজন্য এই যাগ বা যজ্ঞটিকে অগ্নিষ্টোম আখ্যাও দেওয়া হয়। একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমযাগের বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই যাগে ষোলজন অর্থাৎ সকল বৈদিক পুরোহিতদের প্রয়োজন হয়। যজমানকে নিয়ে পুরোহিতের সংখ্যা হয় সপ্তদশ। মতান্তরে 'সদস্য' নামক পুরোহিত সপ্তদশ সংখ্যায় পূরণ করে। সোমযাগে সোমলতা ছেঁচে তার রস জলে মিশিয়ে আহুতি দিতে হয়। সোমলতা ছেঁচে রস বার করার নাম অভিষব। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিনবার সোমের অভিষব ও আহুতি দিতে হয়। সোমযাগে অনুষ্ঠেয় আনুষঙ্গিক যাবতীয় কর্মের নাম এককথায় সবন—প্রাতে বা পূর্বাহ্নে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন, অপরাহ্নে তৃতীয় সবন।

বেদে বহুবিধ যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। সমস্ত রকম যজ্ঞের বিধিবিধান বেদ, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি কল্পসূত্রে এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। উপরোক্ত মুখ্য পাঁচ যজ্ঞ ছাড়াও যেসব যজ্ঞের বিবরণ বৈদিক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ যজ্ঞের বিবরণ নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

সত্রযজ্ঞ—'গবাময়ন' নামক যজ্ঞই হল সত্রযজ্ঞের প্রকৃতি। সোমযাগের অন্তর্ভুক্ত বলে 'গবাময়নের' প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম। তাহলে সত্রের বা 'গবাময়নের' পৃথকীকরণ ও আলোচনা কেন করা হয়? কারণ যজ্ঞের জাতি হিসাবে 'গবাময়ন' সোমযাগের অন্তর্গত, কিন্তু যজ্ঞের কালের দিক দিয়ে বিচার করলে 'গবাময়ন' ও তদীয় বিকৃতি সকল সত্রের একটি নিজস্ব বিশিষ্টরূপ আছে, সেইজন্যই ঋষিরা পৃথক শ্রেণীবিন্যাস করে গিয়েছেন।

যে যজ্ঞ একদিনেই সম্পন্ন হয় তাকে 'একাহ যাগ' বলে। যেসব যজ্ঞ সম্পন্ন করতে একদিনের বেশি সময় অথচ দ্বাদশ দিনের কম সময় লাগে সেই সব যজ্ঞকে 'অহীন যজ্ঞ' বলে। আবার যেসব যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে দ্বাদশ দিনের বেশি সময় লাগে সেগুলিকে 'সত্রযাগ' নামে অভিহিত করা হয়। যজ্ঞের স্বরূপ অনুযায়ী কোনও 'সত্রের' অনুষ্ঠানকাল এক বৎসরব্যাপী, কোনওটি অনুষ্ঠানকাল দশবর্ষব্যাপী, কোনওটির অনুষ্ঠানকাল একশত বৎসর, কোনওটির আবার সহস্র বৎসর। 'গবাময়ন' যাগ সম্পন্ন করতে তিনশো একষট্টি দিন লাগে—অর্থাৎ একটি সংবৎসর। এইজন্য 'গবাময়ন' সত্রযাগের অন্তর্ভুক্ত। 'সত্রটির' অনুষ্ঠানকালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমার্ধে একশো আশি দিন, দ্বিতীয়ার্ধে একশো আশি দিন, উভয়ের মধ্যে বিষুব নামে একটি দিন—এইভাবে সর্বসমেত মোট তিনশো একষট্টি দিন। সোমযাগের সমসংখ্যক পুরোহিতের প্রয়োজন এই যাগেও হয়।

তিনশো ষাট দিনের অধিক দিনে অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠেয় সকল 'সত্রযাগের' প্রকৃতি বা স্বরূপ 'গবাময়ন' এবং তিনশো ষাট দিনের কমসংখ্যক কিন্তু একাদশ দিনের অধিক সংখ্যক দিন সম্পন্ন সত্রযাগের প্রকৃতি বা স্বরূপ 'দ্বাদশাহ' যাগ নামে অভিহিত।

দ্বাদশাহ যাগ—সত্র ও অহীন ভেদে দু-প্রকার দ্বাদশাহ যাগ অনুষ্ঠানের জন্য ছত্রিশ দিনের প্রয়োজন হয়। প্রথম দ্বাদশ দিনে দীক্ষা ও পরবর্তী দ্বাদশ দিনে উপসদ্—উপসদ্ ইষ্টিযাগের অন্তর্গত। দেবতা—অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণু। আহুতি আজ্য—তরল বা গলিত ঘৃতকে আজ্য বলা হয়। বেদ মতে আতিথ্যেষ্টির পর প্রবর্গ্য ইষ্টি—প্রবর্গের পর উপসদ্ ইষ্টিযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপসদ—উপ অর্থ আসন্ন বা অবস্থিত হওয়া। দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা অসুরদিগের প্রতি যে বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, তা-ই উপসদ্। এই বাণে অগ্নি-সোম-বিষ্ণু তিন দেবতাই অবস্থিত ছিলেন ফলে অসুরদের পরাজয় হয়। দ্বাদশাহে প্রথম দ্বাদশ দিন দীক্ষা এবং পরবর্তী দ্বাদশ দিনে উপসদ্ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শেষ দ্বাদশ দিনে দ্বাদশটি 'সুত্যা' বিহিত। 'সুত্যা' অর্থাৎ সোমলতার রস যথাবিধি নিষ্কাশন করে বা ছেঁচে বার করে প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকাল এই তিনকালে

হবন করাকে 'সুত্যা' বলে। আবার 'সুত্যা' বলতে যজ্ঞস্নান ও সোমরস পানও বোঝায়।

দ্বাদশ যাগের প্রথম দিনকে প্রায়নীয় এবং শেষ দিনকে উদয়নীয় বলা হয়। এই যাগে দুটি প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়, যথা—ভরতদ্বাদশাহ ও বৃ্যঢ়দ্বাদশাহ। দুটি প্রকারভেদের ফলে এই যাগে বিহিতসংস্থারও প্রকারভেদ ঘটে। 'সংস্থা' শব্দটি অনুষ্ঠান সমাপ্তিকে বোঝায়। যেমন অগ্নিষ্টোম সামদ্বারা যে যজ্ঞের সমাপ্তি হয় সেই যজ্ঞই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ। অনুরূপভাবে উকথ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্যামঃ প্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠান করণীয়। বলা বাহুল্য এগুলি সবই সোমযাগ বা জ্যোতিষ্টোম যাগের অন্তর্ভুক্ত।

রাজসূয় যজ্ঞ—যে যজ্ঞে রাজা বা নৃপতি নির্বাচিত এবং অভিষিক্ত হতেন তাকেই রাজসূয় যজ্ঞ বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—

"যজ্ঞঃ এবং সূয়ং কর্মঃ। রাজা বৈ রাজসূয়েন দৃষ্ট্বা ভবতি"—অর্থাৎ শাসনব্যবস্থাকে রাজসূয় বলা হয়। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান অন্তে রাজা দেশের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করতেন। বর্তমান যুগে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন দ্বারা শাসক নির্বাচনকেই রাজসূয় যজ্ঞ বলা হয়। তেত্রিশ মাসে এই বৈদিক যজ্ঞটি সম্পূর্ণ হয়।

বাজপেয় যজ্ঞ—দেশের সার্বিকক্ষেত্রে (রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক) ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য লোকসেবী-বিদ্বান-পরিব্রাজক, সাধু-সন্ত একত্রে কোনও বিশেষ স্থানে মিলিত হয়ে সাময়িক পরিস্থিতির উপর বিচার-বিবেচনা করে, আপন আপন মত প্রকাশ করে কতকগুলি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। পরে ওই সিদ্ধান্তগুলি যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য সচেষ্ট হতেন। রাজা বা শাসককুলও এই সম্মেলনে যোগ দিতেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে— "বাজপেয়েন সম্রাড় ভবতি"। অর্থাৎ বাজপেয় যাগের অনুষ্ঠানে সম্রাট হওয়া যায়। চল্লিশ দিনে যজ্ঞটি সম্পন্ন হয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞ—এই যজ্ঞটি অনুষ্ঠান করার অধিকারী সার্বভৌম চক্রবর্তী রাজা বা নৃপতি। এই যজ্ঞে দিগ্বিজয়ের জন্য অশ্ব বা ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়। দুই বৎসরের অধিক সময়ে যজ্ঞটির অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতো। শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

(ক) "রাষ্ট্রং বৈ অশ্বমেধঃ"—"রাষ্ট্রই অশ্বমেধ।"

(খ) "তস্মাদ্ রাষ্ট্রী অশ্বমেধেনযজেত্"—"রাষ্ট্রবাদীর অশ্বমেধ যজ্ঞ করা উচিত।"

(গ) "অশ্বমেধ যাজী সর্বদিশো অভিজয়ন্তি"—"অশ্বমেধকারী সকল দিক জয় করেন।"

যে কোনও চক্রবর্তী রাজা বা সম্রাট যিনি রাষ্ট্রের সংগঠন করেছেন, সার্বিক উন্নতি বা বিকাশ সাধন করেছেন, তিনিই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন বা অনুষ্ঠান করতেন। রাজার ঐশ্বর্য এবং প্রতাপের প্রতীক অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সকল দিক পরিক্রমা করে ফিরে আসত। বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞাতজন এবং তথাকথিত বিদ্বৎজনদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, অশ্বমেধের ঘোড়া ফিরে আসার পর ওই অশ্বকে হত্যা করে বা টুকরো টুকরো করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হতো। ঋষিযুগের কয়েক হাজার বৎসর পরে বিদেশী সংস্কৃতি ভাবধারার আগমন ঘটে ভারতের বুকে, ফলে বেদের প্রকৃত অর্থকেও বিকৃত করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পশুহিংসা বিদেশী সংস্কৃতি মিশ্রণের ফল। বেদমাতা যজ্ঞকে 'অধ্বর' শব্দের বলে অভিহিত করেছেন। বৈদিক নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক 'অধ্বর' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

"ধ্বরতীতি হিংসা কর্মা, তৎ প্রতিষেধ অধ্বরঃ"—অর্থাৎ হিংসার ত্যাগ হল 'অধ্বর'। বেদের অনেক স্থানে যজ্ঞের জন্য 'অধ্বর' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং বেদে ঘোড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদি কোনও পশু-হিংসার আদেশ বা বিধান নেই। প্রখ্যাত বেদ-মনীষী পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর তাঁর বেদ-বিষয়ক গ্রন্থে বলেছেন—"মনুষ্য শরীরের মধ্যে দেব ও পশুভাব উভয়ই বিদ্যমান। মনুষ্য শরীরের মধ্যে এই দুই ভাব নিরাকারে বিরাজ করে। পশুভাব যখন প্রবল হয় তখন তা সাকার হয়ে মনুষ্য শরীরকে অবলম্বন করে বাইরে বেরিয়ে আসে—অর্থাৎ মনুষ্য পশুত্বপ্রাপ্ত হয়।" মানুষের ভেতরের এই পশুভাব যখন ঘোড়া বা অশ্বের মতো শক্তিশালী হয়ে সর্বত্র দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে তখনই অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন হয়। মানব শরীরে স্থিত এই পশুপ্রবৃত্তির বলিদানই অশ্বমেধ যজ্ঞ। অশ্ব শব্দের প্রচলিত অর্থ ঘোড়া। কিন্তু যজ্ঞ প্রসঙ্গে

অশ্ব শব্দের অর্থ বেদ-মনীষীদের মতে—যা তীব্র গতিসম্পন্ন তাই অশ্ব। বৈদিক ঋষিরা অশ্বকে জাতিবাচক সংজ্ঞায় সীমিত না রেখে গুণবাচক সংজ্ঞাই গ্রহণ করেছেন। নিচের কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থোক্ত দৃষ্টান্তে তা সহজেই বোঝা যায়। যথা গোপথ ব্রাহ্মণের উক্তি—'সৌর্যো বা অশ্ব'—অর্থাৎ সূর্যের সূর্যত্ব বা তেজই অশ্ব। বেদের অনেক স্থানে যজ্ঞাগ্নিকেও অশ্ব বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের, ১।১৬৩।২ মন্ত্রে বলা হয়েছে—"গন্ধর্বো অস্য রশনামগৃভ্নাৎ সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট।।" অর্থাৎ গন্ধর্ব বল্‌গা ধারণ করলেন, ইন্দ্র তাতে আরোহণ করলেন। বসুগণ যজ্ঞীয় অশ্বকে অগ্নি বা সূর্য হতে নির্মাণ করলেন। অর্থাৎ অশ্ব সূর্যের প্রতীক।

বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে—"বীর্য বৈ অশ্বঃ"—"শৌর্য-বীর্যই হচ্ছে অশ্ব।"

"শ্রী বৈ অশ্বঃ"—"সম্পদই অশ্ব।" "অগ্নির্বা অশ্বঃ আজ্যং মেধঃ"—অর্থাৎ অগ্নিই অশ্ব এবং ঘৃতই মেধ। সংক্ষেপে রাজনৈতিক অনুশাসনের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ, সমাজে সৎপ্রবৃত্তির সংবর্ধনের জন্য বাজপেয় যজ্ঞ এবং রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও বিকাশের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অনেকে মনে করেন প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে অশ্বমেধ, নরমেধ, গো-মেধ ইত্যাদি যজ্ঞে পশু বা নরবলি দেওয়া হতো। বৈদিক মন্ত্র ও শব্দের অর্থ এবং রহস্য বোঝা অত সহজ নয়। এরজন্য তপস্যা, ত্যাগ, সাধনা ও সংযমের প্রয়োজন—যা বৈদিক ঋষিদের ছিল। সাধারণত লোকে 'বলি' শব্দে বধ বা হত্যা বোঝে। 'বল্ + ইন্' সূত্র থেকে 'বলি' শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ আহুতি। ভেট বা উপহার দেবতার নিকট অর্পণ করা বা অর্পিত হওয়া। ভোজ্য পদার্থ অর্পণ করা। প্রাচীন বৈদিক যুগে গৃহস্থের নিত্যকর্ম ছিল 'বলিবৈশ্ব দেবযজ্ঞের' অনুষ্ঠান করা। এই যজ্ঞে ভোজনের এক অংশ পৃথক করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হতো। কিছু অংশ পশুপাখি আদির উদ্দেশে অর্পণ করা হতো। 'বলি' শব্দে ও ক্রিয়ায় কোনও জীব হত্যার বিধানের প্রশ্নই ওঠে না। দুর্বল জীবকে পালন করাই শাস্ত্রীয় বিধান। উদাহরণ—মহাকবি শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকে আর্য চারুদত্ত নামে একটি চরিত্র নিজ মিত্রকে বলেছেন—

"যাসাং বলি সপদি মদ্গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ, সারসগণৈশ্চ বিলুপ্ত পূর্বঃ।"

অর্থাৎ, আমার ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর সমর্পিত 'বলি' (আহার) হংস এবং সারসাদি পক্ষীগণ খেয়ে যায়। এখানে স্পষ্টত 'বলি' বলিবৈশ্ব-যজ্ঞরূপে অর্পিত অন্নকেই বোঝাচ্ছে। আবার 'বলি' শব্দে কর (Tax) বা রাজকরও বোঝায়। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে মহাকবি কালিদাস রাজা দিলীপের শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন—

"প্রজানামেব ভূত্যর্থ স তাভ্যো বলিমগ্রহীত।
সহস্রগুণং উৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ।।

অর্থাৎ, তিনি (রাজা) প্রজার কল্যাণের জন্য 'বলি' (রাজ কর) গ্রহণ করতেন। যেরূপ সূর্য পৃথিবীর জলশোষণরূপ 'কর' গ্রহণ করে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা চতুর্গুণ ফিরিয়ে দেয়। এখন এখানে যদি 'বলি' শব্দের প্রচলি অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ বা রহস্য সুস্পষ্ট হয় না। বামন শিবরাম আপ্তে প্রণীত 'সংস্কৃত-হিন্দি কোষে' 'বলি' শব্দের অর্থ উক্ত হয়েছে এইরূপ—(১) আহুতি, ভেট, (২) দৈনিক আহার প্রদান করা, (৩) পূজা আরাধনা, (৪) উচ্ছিষ্ট, (৫) দেবতার উদ্দেশে অর্পিত নৈবেদ্য, (৬) শুল্ক বা কর, (৭) রাজা বলি ইত্যাদি।

হিন্দুর শ্রাদ্ধকর্মে গো বলি, কুমকুম বলি, কাক বলি, পিপীলিকাদির বলির বিধান আছে। কিন্তু এর অর্থ কোনও গাভী, কুকুর, কাক বা পিপীলিকা বধ বা হত্যা নয়। বরং এদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভোজ্য পদার্থ অর্পণ করা হতো।

বেদভাষ্যকার আচার্য মহীধর যজুর্বেদ ভাষ্যে বলেছেন—"তেম্বারণ্যাঃ সর্বে উৎস্রষ্টব্যা নতু হিংসয়া"—অর্থাৎ যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদনান্তে পশুদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হতো। তাদের বধ বা হিংসা করা হতো না। বেদে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে—

"পশুনাং পাহি গাং মা হিংসী. অজা মা হিংসী।
অপি মা হিংসী, ইমং মা হিংসী দ্বিপাদ পশুং।।
মা হিংসী রেকশংক পশুং মাং হিংস্যাত সর্বভূতানি।।

অর্থাৎ—পশুদের রক্ষা কোর। গাভীদের বধ কোর না। ছাগ বধ কোর না, মেষ বা ভেড়াদের হত্যা কোর না, দুই পা-বিশিষ্ট (মানুষ-পাখি) প্রাণীদের নিধন কোর না। এক খুরওয়ালা পশুদের (ঘোড়া-গাধা) হনন কোর না। কোনও প্রাণীকে হিংসা বা হত্যা কোর না। বেদের এই মহান বাণীকে স্বীকার করে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন—

"এতে অপি যাজ্ঞিকা যজ্ঞকর্মনি পশুন ব্যাপাদয়ন্তি তে মূর্খাঃ পরমার্থং শ্রুতের্ন জানন্তি। তত্র কিলৈতযুক্তম্ অজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি অজাস্তাবদ্ ব্রীহয়ঃ সাপ্তবার্ষিকাঃ কথ্যন্তে ন পুনঃ পশুবিশেষাঃ।" অর্থাৎ যে বা যিনি যজ্ঞে পশুদের হত্যা করেন, তিনি মূর্খ। তিনি বস্তুত শ্রুতি বা বেদের তাৎপর্য জানেন না। বৈদিক যজ্ঞে 'অজ' বলির তাৎপর্য ব্রীহি (যব বা ধান্য) অথবা পুরনো ফসল। সাধারণ ভাষায় আনাজপাতি অর্পণ বা উৎসর্গ করা— ছাগ-মেষাদি হত্যা করা নয়। একটি আপ্তবাক্যেও (ঋষিবাক্য, অভ্রান্ত)—"বৃক্ষাণ্ ক্ষিত্বা পশুন্ হত্যা কৃত্বারুধির কদর্মম্ যদেব্যং গম্যতে স্বর্গং, নরকং কেন গম্যতে।।" অর্থাৎ বৃক্ষ ধ্বংস করে, পশুদের হত্যা করে রক্তের ধারা বইয়ে দিয়ে যদি স্বর্গে যাওয়া যায় তবে নরকে যাবে কে? অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে স্তুতির বা স্তবের যোগ্য বলা হয়েছে। যজুর্বেদ ভাষ্যে আচার্য মহীধর বলেছেন—"হে অশ্ব যস্তবমভিধা অসি। অভিধীয়তে স্তূয়ত্ ইত্যমভিধাঃ।" অর্থাৎ হে অশ্বমেধের অশ্ব আপনি স্তুত্য অর্থাৎ স্তব বা স্তুতির যোগ্য। বেদে ব্যবহৃত 'বলি' শব্দের ন্যায় 'মেধ' শব্দেরও ভুল বা বিকৃত অর্থ করা হয়। বেদে 'মেধ' শব্দ যজ্ঞ শব্দের পর্যায়বাচী। শব্দটির এক অর্থ বধও হয়—কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে ওই অর্থের (বধ) প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যুৎপত্তি (শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ) অনুসারে মিথ্, মিদ্, মেথ্, মেদ্ আদি ধাতুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত 'মেধ' শব্দটির অর্থ—মিলিত হওয়া, যুক্ত হওয়া বা করা, জানা, প্রেমবর্ধন করা, বুদ্ধি, শক্তি বা বল ও যজ্ঞ। শব্দটি অর্পণ, রস, সার, পূজ্য এবং পবিত্রাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 'বাজসনেয়ী সংহিতার' বত্রিশ অধ্যায়ে সর্বমেধ প্রকরণে (গ্রন্থাদির অধ্যায় বা অংশ) বেদ ভাষ্যকারগণ উপরোক্ত অর্থেই প্রয়োগ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত বেদ-মর্মজ্ঞ পণ্ডিত

দামোদর সাতবলেকর 'মেধ' শব্দটি বুদ্ধি বা জ্ঞান, একতা এবং প্রেমবৃদ্ধিকরণ অর্থে প্রয়োগ করেছেন আপন বেদভাষ্যে।

'বলি' ও 'মেধ' শব্দ দুটির বৈদিক অর্থ কী তা আমরা জানলাম। অনন্তর গো-মেধাদি কয়েকটি যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

গো-মেধ যজ্ঞ—বেদের কর্মকাণ্ডের যজ্ঞবিধানসমূহের মধ্যে গো-মেধ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়। গো-মেধ-অশ্বমেধ এই দুটি যজ্ঞের সঙ্গে পশুহত্যার বিষয়কে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে কোনও রাজা অথবা ঋষি গো-মেধ যজ্ঞ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রাচীনকালে অনেক প্রসিদ্ধ রাজা-মহারাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। এর বিবরণ রামায়ণ-মহাভারতে পাওয়া যায়। রামায়ণে শ্রীরামের এবং মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ওইসব গ্রন্থে আরও অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বেদজ্ঞানে অজ্ঞ কর্মকাণ্ডী সাম্প্রদায়িকগণ অশ্বমেধের সঙ্গে পশুবধ যুক্ত করেছেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁরা বামমার্গী বা বামাচারী বহু তান্ত্রিক আচার্যের সহায়তা পেয়েছিলেন। যাই হোক, এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গো-মেধ যজ্ঞ। গো-মেধ যজ্ঞ কথাটি তিনটি শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। (১) গো, (২) মেধ, (৩) যজ্ঞ। 'গো'-দুগ্ধ প্রদানকারী চতুষ্পদ প্রাণী বা পশু। কিন্তু সংস্কৃত বা বৈদিক সাহিত্যে 'গো'-এর অনেক অর্থ হয়। সকল রকম সাহিত্যে এর (অনেক অর্থের) প্রয়োগও পাওয়া যায়। হলায়ুধ কৃত 'সংস্কৃত-কোষে' 'গো' শব্দের দশ প্রকার অর্থ করা হয়েছে—(১) দিশা, (২) দৃষ্টি, (৩) দীধিতি (কিরণ), (৪) স্বর্গ, (৫) বজ্র, (৬) বাক্ (বাণী), (৭) বাণ (তির), (৮) বারি (জল), (৯) ভূমি বা পৃথিবী, (১০) পশু (গো বা গাভী নামক পশু)। গো-মেধ যজ্ঞে বাক্ এবং ভূমি বা পৃথিবীর পরম্পরা অনুযায়ী প্রয়োগ পাওয়া যায়। অন্য প্রয়োগও হয়। যথা গো শব্দের আর এক অর্থ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সমূহ। গো বা গৌ-এর এই প্রকার অর্থ যাস্কাচার্য প্রণীত বৈদিক কোষ 'নিঘণ্টু' দ্বারা সমর্থিত। উপরোক্ত গো বা গৌ-শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে দুটি অর্থ এখানে গ্রহণ করা হচ্ছে—(১) গো—পৃথিবী বা ভূমি। (২) বাক্ বা বাণী। 'মেধ' শব্দের অর্থ পূর্বেই করা হয়েছে। তথাপি পাঠকদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—(১) 'মেধ' অর্থ বুদ্ধি বা জ্ঞান। (২)

'মেধ'-এর সংগমন, সমন্বয়, সংগতিকরণ অর্থও হয়। 'যজ্ঞ' শব্দের তিনটি অর্থ পূর্বেই বলা হয়েছে, যথা—(১) পূজা, (২) সংগতিকরণ, (৩) দান করা। এখন গো-মেধ-যজ্ঞ— এই তিনশব্দ একত্রিত করলে বিষয়টা সহজেই বোধগম্য হয় যে, পৃথিবী বা ভূমিকে উর্বর উপযোগী করে অন্ন উৎপাদন করাই গো-মেধ-যজ্ঞ। ভারতীয় পরম্পরায় গোদান এবং গোচারণ ভূমির দান বহুবার একই সঙ্গে সম্পাদিত হতো। বেদে গাভীকে শ্রদ্ধাসহকারে পালন ও সংরক্ষণ করার বিধান আছে। বেদে মাংসভক্ষণ ও মদ্যপানেরও উল্লেখ নেই। মহর্ষি ব্যাস মহাভারতের শান্তিপর্বে বলেছেন—

"সুরা মৎস্যাঃ মধু মাংসমাসবং কৃশরৌদনম্।
ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং হোতদ্ নৈতদ্, বৈদেষু বিদ্যতে।।
(শান্তিপর্ব, ২৬৫/৯)।

অর্থাৎ মদ, মাংস, মৎস্য ইত্যাদি যজ্ঞে প্রচলন করার বিধি ধূর্তগণের প্রচার। এই প্রকার বিধি-বিধান বেদের কোথাও পাওয়া যায় না। পূর্বেই বলা হয়েছে 'গো' শব্দের অন্য এক অর্থ বাক্ বা বাণী।

মহর্ষি গার্গ্যায়ন কৃত 'প্রণববাদে' গো-মেধ যজ্ঞের ব্যাখ্যা নিম্নরূপে পাওয়া যায়—

"গো মেধস্তাবচ্ছব্দমেধ (শব্দ + মেধ) ইত্যবগম্যতে, গাং বাণীং মেধয়া সংয়োজনমিতি তদর্থাৎ। শব্দশাস্ত্র জ্ঞানমাত্রস্য সর্বেভ্যঃ প্রদানমেব গোমেধো যজ্ঞঃ" (প্রণববাদ—প্রকরণ ৩, তরঙ্গ ৬)

অর্থাৎ বাণীকে মেধার সঙ্গে সংযুক্ত করা, অন্য সকল ব্যক্তিকে শব্দশাস্ত্রের (ব্যাকরণের) শিক্ষা দেওয়াই গো-মেধ যজ্ঞ। এছাড়াও বেদে বিবিধ মেধ যজ্ঞ পরিলক্ষিত হয়, যথা—সর্বমেধ, পুরুষমেধ, নরমেধ—এইসব শব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির আপন স্বার্থত্যাগ করে রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সর্বস্ব অর্পণ করে দেওয়াই পুরুষমেধ যজ্ঞ। নরমেধ যজ্ঞের উদ্দেশ্য বা অর্থ, মনুষ্য দ্বারা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মত্যাগ করা। সর্বমেধ যজ্ঞ—সর্বমেধের তাৎপর্য, নিজের সম্পদ, প্রতিভা, জীবন, সমষ্টির কল্যাণের জন্য সমর্পিত করা।

পিতৃমেধ যজ্ঞ—এই যজ্ঞে মৃত পিত্রাদিগণের অস্থিদাহ করা হতো। যজ্ঞই বিশ্ব সৃষ্টির উৎস। বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্লগ্নে যিনি প্রথম যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন,

তিনি পরমপুরুষ। বিশ্বনির্মাণ যজ্ঞে পরমপুরুষ নিজেকে আহুতি দিলেন। যজ্ঞের উপকরণ তিনি, যজ্ঞও তিনি। এইভাবে সেই পরমপুরুষ নিজেই নিজেকে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে সৃষ্টি করলেন এই বিশ্বসংসার। দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিটি বস্তুই তাঁর প্রকাশ। বেদে এই যজ্ঞকেই বলা হয় **পুরুষ যজ্ঞ**।

এতদ্ব্যতীত বেদে প্রত্যেক মানুষের কল্যাণের জন্য এক প্রকার বিশেষ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। যার নাম—**বলিবৈশ্য যজ্ঞ**। একে মহাযজ্ঞও বলা হয়ে থাকে। তথ্যগত দিক দিয়ে নয়, তত্ত্বগত দিক দিয়ে এই যজ্ঞটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ঋষিরা এই যজ্ঞটিকে স্বতন্ত্রভাবে রেখে এর নামকরণ করেছেন বলিবৈশ্য মহাযজ্ঞ। বলিবৈশ্য সংক্ষিপ্ত নাম, এর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে **বলিবৈশ্যদেব**। যজ্ঞনামবাচক শব্দটির মধ্যে তিনটি শব্দের সমাবেশ—**বলি—বৈশ্য—দেব**।

'বলি'—অর্থাৎ উপহার, অর্পণ, অনুদান। 'বৈশ্য'—অর্থাৎ সবার জন্য। 'দেব'—দিব্য প্রয়োজনের নিমিত্ত। তিনে মিলে হয় বলিবৈশ্যদেব। উচ্চ উদ্দেশ্যের জন্য, সার্বজনিক কল্যাণের জন্য অনুদান, অর্পণ বা উৎসর্গীকরণ। বলিবৈশ্যযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ গৃহ্যসূত্রাদির মধ্যে পাওয়া যায়। শাংখ্যায়ন, আশ্বলায়ন, পরাশর, গোভিল, শতপথ গৃহ্যসূত্র ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির মধ্যে এই যজ্ঞের বিবিধ বিধানের নির্দেশ পাওয়া যায়। এই যজ্ঞের প্রধান পাঁচটি বিভাগ—

১। ব্রহ্ম যজ্ঞ—ব্রহ্ম যজ্ঞের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানলাভের প্রেরণার জন্য সচেষ্ট হওয়া। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানই এই যজ্ঞের মুখ্যভাব বা উদ্দেশ্য।

২। দেব যজ্ঞ—দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি প্রদানই দেব যজ্ঞ। মানবত্ব থেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়াই এই যজ্ঞের লক্ষ্য। নিজের মধ্যে দিব্য গুণ-কর্ম-স্বভাব-এর বিকাশই দেব যজ্ঞ।

৩। ঋষি যজ্ঞ—ঋষি প্রণীত শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ঋষি যজ্ঞ। সার্বিক কল্যাণের জন্য সদ্গ্রন্থাদির প্রচার। সমাজের সর্বস্তরে সৎপ্রবৃত্তির বিকাশ ও কল্যাণই এই যজ্ঞের উদ্দেশ। ব্রহ্মচর্য-বেদ অধ্যয়ন এই যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত।

৪। নর যজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ—অতিথি আপ্যায়ন ও সৎকারই বা অতিথি সেবাই নর যজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ। এই যজ্ঞে যজ্ঞীয় প্রেরণা হচ্ছে মনুষ্যত্বের গরিমার বিকাশের জন্য অনুরূপ পরিবেশ এবং সমাজ ব্যবস্থার নির্মাণ। কোনও কোনও ঋষি নর যজ্ঞের পরিবর্তে পিতৃ যজ্ঞকেই বলিবৈশ্যদেব যজ্ঞের পাঁচ অঙ্গের এক প্রধান অঙ্গ বলেছেন। **পিতৃ যজ্ঞ**—পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং সন্তানাদির উৎপাদন ও পালনই পিতৃ যজ্ঞ।

৫। ভূত যজ্ঞ—সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার, বৃক্ষ-বনস্পতির সৃজন-বিস্তার ও সংরক্ষণই ভূত যজ্ঞ। প্রতিদিনের অন্ন থেকে একটা অংশ তুলে রেখে তা কুকুর, পতিত, পাপ-রোগী, কাক, কৃমি-কীটাদির উদ্দেশে দান বা বিতরণ করাই ভূতযজ্ঞ।

মীমাংসকগণ (মীমাংসা শাস্ত্রজ্ঞগণ—জৈমিনীকৃত দর্শনশাস্ত্র) বলেন, দেবতার উদ্দেশে যে দ্রব্যত্যাগ—তা-ই যজ্ঞ। ত্যাগকর্মের নাম আহুতি, এবং যে দ্রব্য ত্যাগ করা হতো তার নাম হব্য—যথা আজ্য (যজ্ঞের নিমিত্ত সংস্কৃত তরল ঘৃত), চরু বা পায়সান্ন, দুধ, দই, পুরোডাশ বা রুটি, সোমলতার রস ইত্যাদি। এই দ্রব্যত্যাগ কর্মের নামই যাগ বা যজ্ঞ। যজ্ঞে যজমান আহুতি ত্যাগের মন্ত্রে বলেন—"ইদম্ অগ্নয়ে—ন মম।" অর্থাৎ এই দ্রব্য অগ্নিকে দেওয়া হল, আমার কোনও অধিকার থাকল না—এটাই ত্যাগমন্ত্র। এইভাবেই—"ইদং সোমায়-ন মম"। "ইদং ইন্দ্রয়ে-ন মম।" তাৎপর্য—যা কিছু প্রিয় সব দেবতার উদ্দেশে সমর্পণ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যাগের সঙ্গে হোমের পার্থক্য আছে। যাগকালে আহুতি দেন অধ্বর্যু, কিন্তু মন্ত্রপাঠ করেন আর একজন ঋত্বিক তাঁর নাম হোতা, হোতা দেবতাকে আহ্বান করে মন্ত্রপাঠ করেন, মন্ত্রের পর 'বৌষট' শব্দ উচ্চারণ করেন। এঁর নাম বষট্কার। এই বষট্কারের সঙ্গে অধ্বর্যু আহুতির দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করেন। তাঁকে কোনও মন্ত্র পড়তে হয় না—এরই নাম যাগ। অন্যদিকে হোম অনেকটা সংক্ষিপ্ত ব্যাপার—এতে হোতার দরকার হয় না। অধ্বর্যু অগ্নির পাশে বসে নিজেই যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রপাঠের পর 'স্বাহা' উচ্চারণ করেন এঁর নাম স্বাহাকার, স্বাহাকারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিতে আহুতি দেন—এটাই হল হোম যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ বস্তুত আত্মত্যাগ। বেদঋষি মহামনীষী অনির্বাণের ভাষায়—"জীবনের

যজ্ঞবেদীতে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে দেবতার উদ্দেশে নিজেকে আহুতি দিই, তাই সত্যকার যজ্ঞ। ...সমস্ত জীবনই একটা সাধনা। কিসের সাধনা? না আত্মহুতির। আত্মহুতিরই নাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ভোক্তা সেই যজ্ঞেশ্বর, ...কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ—সবারই মূলে রয়েছে যজ্ঞ ভাবনা। যজ্ঞ ভাবনা হল অন্তর্যাগ, যার অনুষ্ঠানে এক মুহূর্ত ফাঁক থাকে না। বহির্যাগ ছিল তারই প্রতিরূপ। বহির্যাগে যজ্ঞবেদীতে আগুন জ্বালানো হতো। সেই আগুনে দেবতার উদ্দেশে হোম দ্রব্য আহুতি দেওয়া হতো। হোমদ্রব্যগুলিকে মনে করা হতো যজমানের প্রতিনিধি। সুতরাং হবির আহুতি ছিল বস্তুত যজমানেরই আত্মাহুতি। আগুনের ছোঁয়ায় হোমদ্রব্য আগুন হয়ে উঠত। তার শিখা দ্যুলোকের দিকে উদ্যত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেত। মনে করা হতো, মর্ত্য যজমান এমনি করে দ্যুলোকের দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে অমৃত হয়ে গেল।" (যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ, ঋষি অনির্বাণ)

বৈদিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ষোলজন পুরোহিতের প্রয়োজন হতো। এঁদের মধ্যে প্রধান পুরোহিত চারজন। ঋক্ বেদের যিনি পুরোহিত তাঁর নাম হোতা। সাম বেদের পুরোহিতের নাম উদ্গাতা। যজুর্বেদের পুরোহিতকে বলা হতো অধ্বর্যু। ঋক্-সাম-যজুঃ এই তিন বেদ বিশেষজ্ঞ পুরোহিতের নাম ব্রহ্মা। ইনিই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান পুরোহিত। সমগ্র যজ্ঞকর্মটি এঁরই পরিচালনায় সম্পন্ন হতো। প্রত্যেক পুরোহিতের সঙ্গে তিনজন করে সহকারী পুরোহিত থাকতেন। মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্ ও গ্রাবস্তুৎ নামে তিনজন পুরোহিত হোতার সহকারী। প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্য এই তিনজন অধ্বর্যুর সহকারী। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নিধ্র ও পোতা এই তিনজন ব্রহ্মার সহকারী। কৌষীতকী ব্রাহ্মণের মতে এই ষোলজন পুরোহিত ছাড়াও 'সদস্য' নামে অপর একজন পুরোহিত থাকতেন। তাঁকে নিয়ে পুরোহিত সংখ্যা সর্বসমেত সতেরোজন। অন্য মতে যজ্ঞে যেহেতু যজমানকে বহু মন্ত্র পাঠ করতে হয় এবং বহু প্রকারের অনুষ্ঠান করতে হয়, অতএব তিনিও একজন পুরোহিত পদবাচ্য। তাঁকে নিয়েও পুরোহিতের সংখ্যা হয় সতেরোজন। অবশ্য সব যজ্ঞেই ষোল বা সতেরোজন পুরোহিত বা ঋত্বিকের প্রয়োজন হয় না। যজ্ঞের প্রকৃতি অনুযায়ী পুরোহিত সংখ্যাও কমবেশি হয়ে থাকে।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলেছেন। জগত-সংসারে বাহ্যত দ্রব্যযজ্ঞই অধিক প্রচলিত—যাতে ধর্মশালা, কূপখনন, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, জলাশয় নির্মাণ, বিদ্যালয় নির্মাণ এবং নানাবিধ মানবসেবামূলক কর্মে বা কর্মযজ্ঞে দ্রব্যের ব্যবহার হয়—গীতাকারের মতে এই সব অল্পজ্ঞ দ্বারা কৃত যজ্ঞ। যোগেশ্বর তথা যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে জীবনের প্রতিটি স্তরে মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত সমস্ত ক্রিয়াই যখন পরমাত্মার উদ্দেশে এবং পরমাত্মার সকল সন্তানের কল্যাণের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়—তখনই আত্মত্যাগ দ্বারা জ্ঞানযজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এইরূপে বা এইরূপ যজ্ঞে পয়সা ব্যয় করতে হয় না। এইরূপ মানসিক যজ্ঞের কথা বেদের 'পুরুষসূক্তে'ও পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে বসন্ত ঋতু আজ্য (শুদ্ধ তরলঘৃত), গ্রীষ্ম ইন্ধন (যজ্ঞের কাঠ), শরৎ হবি (যজ্ঞ বা হোমের দ্রব্য), এক কথায় সর্বকালের যজ্ঞ করার বিধান ওই সূক্তে বলা হয়েছে। যজ্ঞরূপ কর্মের মূল উদ্দেশ্যটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন। যথা—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম-নোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।"

অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি (অর্জুন) ভগবানের উদ্দেশে অনাসক্ত হয়ে সর্বকর্ম (শাস্ত্রোক্ত) সম্পন্ন করো। কারণ কর্মই যজ্ঞ—যজ্ঞই বিষ্ণু বা ঈশ্বর। শ্রুতির বচন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু"। বিষ্ণুই যজ্ঞাধিপতি।

পঞ্চম অধ্যায়

বেদ অপৌরুষেয়

ভারতীয় সনাতন ধর্মের মূলস্তম্ভ বেদ। ভারত বলতে আমরা সাধারণত বুঝি বেদের দেশ, ঋষি-মুনিদের দেশ। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-কলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, এক কথায় সবকিছুর মূল উৎস বেদ। প্রাচীন ভারতীয় আর্য পরম্পরার বিশ্বাস—বেদ কোনও মনুষ্যকৃত রচনা নয়। যা মনুষ্য বা কোনও পুরুষ দ্বারা রচিত তা পৌরুষেয়। বেদ কোনও মনুষ্য দ্বারা রচিত নয় বলেই বেদকে অপৌরুষেয় এবং নিত্য বলা হয়। বেদ পৌরুষেয় না অপৌরুষেয় এনিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক বা মতান্তর দেখা যায়। আমরা সে-সকল তর্ক-বিতর্ক, মত-মতান্তরের মধ্যে প্রবেশ না করে, শুধু নির্যাসটুকু এই অধ্যায়ে পরিবেশন করব।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রবক্তাগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু অপৌরুষেয়ত্ব এবং নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। ন্যায়শাস্ত্রবিদ প্রবক্তাদের মতে বেদ পরমপুরুষের রচিত, পরমপুরুষও একজন পুরুষ। অতএব বেদ পৌরুষেয় এবং অন্যান্য মনুষ্যাদি রচিত গ্রন্থের ন্যায় অনিত্য।

অন্যদিকে মীমাংসা দর্শন ও বেদান্ত দর্শন বেদকে অপৌরুষেয় বলে স্বীকার করেছেন। এই দুই দর্শনের মতে মানুষ অপূর্ণ এবং তার জ্ঞানও সীমিত। সেইজন্য তার রচনায় বা বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ (অসাবধানতা বা অমনোযোগ), বিপ্রলিপ্সা (বিরুদ্ধ উক্তি বা অর্থ), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা), এই চারটি দোষ দেখা যায়। বেদমন্ত্রে বা বেদবাক্যে এই চারটি দোষ দৃষ্ট হয় না। এইজন্যই বেদ মনুষ্যদ্বারা রচিত নয় বলেই মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন মনে করেন।

ঋক্ বেদের 'পুরুষসূক্তে'ও বলা হয়েছে—পরমেশ্বরও বেদের রচয়িতা নন। সূর্য হতে সূর্যের আলোর মতো বেদ পরমেশ্বর হতে স্বয়ং প্রকাশিত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হয়েছে— "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতং যদেতৎ ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ।" অর্থাৎ প্রাণীদের ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস যেমন স্বাভাবিক কর্ম, এর জন্য যেমন কোনও চেষ্টা করতে হয় না, সেইরূপ বেদও পরমেশ্বরের চেষ্টাকৃত বা বুদ্ধিকল্পিত নয়। পরমেশ্বরের পরমজ্ঞানই বেদ। প্রতি কল্পে পরমেশ্বর বেদ স্মরণ করেন। বলাবাহুল্য, ব্রহ্মাও বেদের কর্তা নন, স্মরণ কর্তা মাত্র। পরাশর সংহিতায় বলা হয়েছে, "ন কশ্চিৎ বেদকর্তাস্তি বেদস্মর্তা চতুর্মুখঃ"— অর্থাৎ বেদের কর্তা কেউ নয়, চতুর্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্তা মাত্র। পরমেশ্বরকেও বেদের আধার বলা হয়, কিন্তু রচয়িতা নয়। বেদ যেহেতু অপৌরুষেয় সেই হেতুই তাকে নিত্য বলা হয়। এরূপ নিত্যসিদ্ধ যে বেদ, সেই বেদ পরমেশ্বর প্রতিটি কল্পে স্মরণ করেন (চারশত বত্রিশ কোটি দেব-বর্ষে এক কল্প হয়—এক কল্প ব্রহ্মার এক অহোরাত্র)।

পরমেশ্বরকে বেদের রচনাকর্তা বললে দুটি দোষ দেখা দেয়। প্রথমত, বেদ অনিত্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞত্বের হানি ঘটে।

আমরা যখন কোনও কাব্য বা কবিতা, শ্লোক রচনা করি, তখন সেই রচনা প্রথমে মনে সৃষ্টি হয়, সেই সময়ের পূর্বে সেই কাব্য-কবিতা বা শ্লোক আমাদের অজানা ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ এবং ত্রিকালদর্শী। তাঁর নিকট কোনও বিষয় অজ্ঞাত থাকতে পারে না। তিনি কোনও এক বিশেষ সময়ে বেদ রচনা করেছিলেন বললে সেই বিশেষ সময়ের পূর্বে বেদ তাঁর অজ্ঞাত ছিল এই আপত্তি এসে পড়ে। তিনি সর্বজ্ঞ—তাই বেদ কোনও সময়ে তাঁর অজ্ঞাত থাকতে পারে না। অতএব বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। বেদ নিত্য একরূপ, কল্পভেদে তাঁর রূপভেদ বা পরিবর্তন হয় না। প্রতি কল্পে পূর্ব পূর্ব কল্পের ঠিক অনুরূপ বেদ পরমেশ্বর স্মরণ করেন। প্রতি কল্পে বেদের স্মরণ বলা হয়েছে, প্রথম উচ্চারণ বলা হয়নি—কারণ তা পূর্বকল্পের বেদের স্বজাতীয় উচ্চারণ—এইরূপে বেদের অনাদি অনন্ত প্রবাহ চলতে থাকে, এইজন্যই বেদ পৌরুষেয় না হয়ে অপৌরুষেয়।

বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্যও তাঁর বেদভাষ্যে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেছেন। যথা—

"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরম্।"

অর্থাৎ যে চার বেদ হতে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে, সেই চার বেদ তাঁর নিঃশ্বাস স্বরূপ এবং যিনি সর্ববিদ্যার আধার সেই মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করি। বেদকে মহেশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপে বর্ণনা করে সায়নাচার্য বেদের অপৌরুষেয়ত্বকে সমর্থন করেছেন। বেদান্ত ও পূর্ব মীমাংসা উভয় দর্শনেই মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। ন্যায়দর্শনে শব্দকে অনিত্য বলা হয়েছে। মীমাংসাকার জৈমিনী ন্যায়দর্শনের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে শব্দের নিত্যতা প্রমাণ করেছেন। শব্দের নিত্যতা স্থাপিত হলে বেদের নিত্যতাও সিদ্ধ হয়। বেদান্ত দর্শনের মতে নিত্যতা দু-প্রকারের। একটি কূটস্থ নিত্যতা, অপরটি প্রবাহ নিত্যতা। কূটস্থ অর্থাৎ সর্বদা একরূপ নির্বিকার। কূটস্থ নিত্যত্ব একমাত্র পরব্রহ্মেরই আছে। এর কোনও পরিবর্তন হয় না। যার আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে, প্রতি কল্পে যা আবির্ভূত বা অভিব্যক্ত হয় এবং প্রতি প্রলয়কালে যার সাময়িক তিরোভাব ঘটে তাকে প্রবাহ-নিত্য বলা হয়। গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতু সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু এদের প্রবাহরূপে নিত্যতা আছে। সৃষ্টি ও প্রলয়াদিরও প্রবাহরূপে নিত্যতা আছে। বেদের কূটস্থ নিত্যতা বেদান্ত স্বীকার করে না, কিন্তু প্রবাহরূপে বেদের নিত্যতা বেদান্ত স্বীকার করে। কারণ বেদ প্রলয়কালে পরমেশ্বরে লীন বা তিরোহিত হয়ে থাকে এবং প্রতিকল্পে তিনি বেদ স্মরণ করেন বা অভিব্যক্ত করেন। এই কারণেই বেদের কূটস্থ নিত্যতা বেদান্ত স্বীকার করে না। পূর্বমীমাংসা দর্শন বেদের নিত্যতা স্বীকার না করলেও বেদ যে অপৌরুষেয় তা স্বীকার করেছেন। বেদকে যে শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থে স্থান বিশেষে নিত্য বলা হয়েছে সাংখ্যদর্শন মতে তার অর্থ হল গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বেদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। পাতঞ্জল দর্শন মতে বেদের অর্থ নিত্য কিন্তু শব্দরাশি অনিত্য। এই দর্শনের মতে মহাপ্রলয়ে বেদের শব্দরাশি বা অক্ষর পরম্পরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আবার নূতন কল্পে ঋষিরা স্মরণ করেন। কিন্তু বেদের অর্থের কখনও বিনাশ হয় না। সুতরাং পাতঞ্জল দর্শনের মতে বেদ নিত্য ও অনিত্য—অর্থের দিক দিয়ে নিত্য, শব্দ বা অক্ষরের দিক দিয়ে অনিত্য। উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল

পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত ও সাংখ্য এই তিন দর্শনের মতে বেদ অপৌরুষেয়। ন্যায়দর্শনের মতে বেদ পৌরুষেয়। নৈয়ায়িক বা ন্যায়শাস্ত্রীগণ নিত্য সর্বজ্ঞ, পুরুষ-পরমেশ্বর দ্বারা প্রণীত হওয়ার কারণেই বেদকে পৌরুষেয় বলেছেন। নৈয়ায়িক মতে এই পুরুষ কোনও সাধারণ মানুষ নন, তিনি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর। তথ্যত এটাই প্রমাণিত হয়, বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য। আজকের ভৌতিক বিজ্ঞানও বলে উচ্চারিত হওয়ার পর কোনও শব্দ নষ্ট হয় না। এই উচ্চারিত শব্দ বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে থাকে। বেতার, দূরদর্শন এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। জলাশয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করলে যেমন তরঙ্গ-পরিধির সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ বায়ুমণ্ডলেও উচ্চারিত শব্দের তরঙ্গ-পরিধির সৃষ্টি হয়। এইরূপ বলার উদ্দেশ্য আজকের বিজ্ঞান মতে শব্দও নিত্য। সুতরাং মীমাংসা দর্শনের অভিমত শব্দ নিত্য এবং শব্দের নিত্যতার কারণেই বেদও নিত্য। বিজ্ঞানসঙ্গত কারণেই এই তথ্য প্রমাণসঙ্গত।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যতা প্রসঙ্গে আর একটি সংশয়াত্মক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, বেদ যদি অনাদি হয় তবে তার মধ্যে মিথিলা নরেশ জনক, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি ব্যক্তির নাম কেন এইভাবে পাওয়া যায়, যেভাবে প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসাদিতে বর্ণিত আছে? এর উত্তরে বেদ-মনীষীগণ বলেন, বেদে ওইসব নাম পদবাচক। শাস্ত্রমতে প্রায় ত্রিশ কোটি বৎসরে এক মন্বন্তর হয় এবং প্রলয়কালের পরিমাণও ত্রিশ কোটি বৎসর। এরপরে নূতন মন্বন্তর আরম্ভ হয়। বিগত মন্বন্তরের নাম ছিল চাক্ষুষ মন্বন্তর, বর্তমান মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত। ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের নাম সাবর্ণী। প্রত্যেক মন্বন্তরের প্রারম্ভে এক নূতন দেবগোষ্ঠী সৃষ্টির কার্যভার চালানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। মন্বন্তর সমাপ্তির সাথে সাথে দেবগোষ্ঠীর কার্যভারও সমাপ্ত হয়। বেদে ইন্দ্র, যম, বরুণ ইত্যাদি দেবের উল্লেখ আছে। বস্তুত এগুলি দেবতাদের উপাধি বা পদের নাম, যেমন বর্তমান যুগের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি। প্রত্যেক মন্বন্তরের দেবতা পৃথক পৃথক হন। সকল দেবতাই উপাধি বা পদের নাম দ্বারা পরিচিত হন। বেদে এই সকল উপাধি বা পদবাচক নাম আপত্তিজনক নয়। কারণ পদ শাশ্বত। শাস্ত্র অনুসারে এই সব মনীষীরা (জনক, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য) হচ্ছেন সেইসব আধিকারিক তপস্বী পুরুষ যাঁদের ঈশ্বর বেদের গূঢ় রহস্য স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে

বা এইরূপ দৈবীকার্যের জন্য নিযুক্ত করেছেন। দেবতাদের ন্যায় এই সকল নাম পদবোধক বা পদবাচক। বেদে এইসব নামের উল্লেখের ফলে বেদের অনাদিত্ব হওয়ার কোনও হানি হয় না। আমাদের অবশ্যই ধ্যান রাখা উচিত, বেদে প্রযুক্ত নামসমূহকে কখনও যেন ইতিহাসপুরুষের সাথে যুক্ত করা না হয়। আমাদের মনে রাখা দরকার বেদজ্ঞান বেদজ্ঞ আচার্য পরম্পরায় লভ্য। আচার্য ব্যতিরেকে বেদ অধ্যয়ন করতে গেলে, বেদে নানা অসংগতি দেখা যায়। এইজন্য ভারতের মহান ঋষিগণ বেদ অধ্যয়নের এক বিধি নির্দেশ করেছেন। ব্যাস-শিষ্য জৈমিনীকৃত কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণকে মীমাংসাশাস্ত্র বলা হয় এবং মহর্ষি ব্যাসদেবকৃত জ্ঞানকাণ্ডের বিশ্লেষণকে বলা হয় বেদান্তশাস্ত্র। বেদে যে কোনও অসংগতি নেই তা দেখানোই এই দুই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই দুই আচার্যের বৌদ্ধিক গম্ভীরতা এবং হৃদয়ের উদারতা অতুলনীয়। বেদের অধ্যয়ন, অধ্যয়ন-অন্তে বেদরহস্য উন্মোচনে এই দুই গ্রন্থের আচার্য বা বেদজ্ঞ-পুরুষের সমীপে অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হলে বা বিজ্ঞানের কোনও রহস্যভেদ করতে হলে যেমন মহান বৈজ্ঞানিক নিউটন ও আইনস্টাইনকে স্বীকার করতে হয়, ঠিক সেইরূপ বেদজ্ঞান অর্জনের জন্য মহান বুদ্ধিমান দার্শনিক জৈমিনী ও ব্যাসদেবকে স্বীকার করতে হয়।

পরিশেষে বলি বেদ বা বেদমন্ত্র কেন অপৌরুষেয় তা আমরা জ্ঞাত হলাম। বেদকৃপা বা বেদজ্ঞান লাভ করতে হলে, বেদের মন্ত্র যাঁর কাছে প্রকটিত হবে তাঁরও অপৌরুষেয় হওয়া চাই। অপৌরুষেয় হওয়ার অর্থ হল কর্তৃত্বশূন্য হওয়া। আমি কর্তা এই অভিমান বা অহংকার সর্বতোভাবে দূর হয়েছে যাঁর, তিনিই বেদের অপৌরুষেয় বাণী ও জ্ঞান গ্রহণের যোগ্য। বেদার্থ তাঁরই বোধগম্য হয়।

অপৌরুষেয় অর্থাৎ কর্তৃত্বশূন্যতা বা আমিত্বহীন হওয়া—এককথায় ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন অতিক্রম করে বৃহৎ বা সত্যিকার আমিত্বের উপলব্ধি—এটা যার হয় বা হয়ে থাকে, ঋষির কথা, বেদের কথা তিনিই বোঝেন। যাঁর এরূপ ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন ঘোচেনি তিনি বুদ্ধির সুতোয় জাল তৈরি করে সেই জালে নিজেই নিজেকে আবদ্ধ করে মূর্খের ন্যায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন মাত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেদের বর্ণনশৈলী

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বেদের স্থান নির্মল গগনস্থিত উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায়। সূর্য যেমন আলো দেয়, বেদরূপী সূর্যও তদ্রূপ জ্ঞানের দ্যুতি ছড়ায়। অর্থের গভীরতা, দেবতার মাধ্যমে নানা বিষয় প্রতিপাদন করার কলা, ব্রহ্মবিদ্যা তথা সৃষ্টিবিদ্যার, ইহলোক তথা পরলোকের সমুচিত সমন্বয়, স্থুল প্রতীক দ্বারা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রহস্যের বর্ণনা, কখনও গম্ভীর, কখনও আখ্যান সংবাদ আদির রুচিকর শৈলী দ্বারা বিষয়ের নিরূপণ। অনুপম কাব্যিক সৌন্দর্যের কারণে বেদ বিশেষ আদর ও গৌরবের অধিকারী।

কোনও শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্বে আমাদের সেই শাস্ত্রের ভাষাগত তথা অর্থগত শৈলীর সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। অন্যথায় ওই শাস্ত্রের বর্ণিত জ্ঞান বুঝতে বা উপলব্ধি করতে আমরা সমর্থ হব না। এমনকি শাস্ত্রের যথাযথ মূল্যায়ন করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। কালিদাস, ভাস, মাঘ প্রভৃতি কবিদের বিশিষ্ট রচনাশৈলীর সাথে পরিচিতি না হয়ে আমরা ওইসব মহৎ কবিদের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারি না এবং বুঝতেও অসমর্থ হই। বেদের রচনাশৈলী অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা পৃথক বৈচিত্র্যের দাবী রাখে। বেদের ন্যায় স্মৃতিও ধর্মশাস্ত্র। কিন্তু বেদ তথা স্মৃতিশাস্ত্রের বর্ণনাশৈলীর মধ্যে মহান অন্তর বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণ, আশ্রম, রাজনীতি আদি প্রত্যেক বিষয়ের পৃথক পৃথক প্রকরণের উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে বেদে এইরূপ কোনও স্পষ্টক্রমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বেদ অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্যাদি দেবতার স্তুতি প্রসঙ্গ করতে করতে কখনও বিষয়ান্তরে গমন করে অন্য বিষয়ের কথা বলেছে। বেদের মর্মার্থ প্রায়শই দ্ব্যর্থকতার আবরণের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেছে, যা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষা সর্বদাই এক নিশ্চিত অর্থ প্রদান করে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই অর্থ গ্রহণ করেন বা বোঝেন। অন্যদিকে বেদের ভাষা বড়ই রহস্যময়। বিভিন্ন ব্যক্তি তা থেকে আপন আপন বোধের স্তর অনুযায়ী অর্থ বা অভিপ্রায় গ্রহণ করে থাকেন। বেদের অনেক স্থলে প্রহেলিকা (হেঁয়ালি, কূটপ্রশ্ন) শৈলীর বিবরণ পাওয়া যায়। এই শৈলীর সাথে পরিচিত না হলে, ওই শৈলী দ্বারা বর্ণিত বাক্যের অর্থ বোধগম্য হওয়া তো দূরের কথা, বরং মনে হবে এই অসংবদ্ধ বাক্য যেন উন্মত্তের প্রলাপ। এই শৈলীর রহস্য না বোঝার কারণেই অনেকেই এমনকি অনেক বিদ্বান ভাষ্যকারও বেদের অভিপ্রায় বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন। অতএব বেদের বর্ণনাশৈলীর সাথে যথাযথ পরিচিত হতে পারলে বেদের স্বরূপ, রহস্য, এবং বেদের যে অংশকে আমরা শুধুমাত্র ইতিহাস বা কাল্পনিক আখ্যান ভেবে থাকি, তার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়কে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হব। যদিও বেদ সরাসরি বা স্পষ্টত তার বর্ণনাশৈলীর নির্দেশ করেনি, তথাপি প্রসঙ্গবশত কতিপয় শৈলীর বিবরণ বেদে পাওয়া যায়। বেদকে প্রথমে ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিনভাগে ভাগ করার একটি ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয় যে, বর্ণনাত্মক মন্ত্র ঋক্, বিধিপরায়ণ বা যজ্ঞের সাথে সম্পর্ক যুক্ত মন্ত্র যজুঃ এবং স্তুতিগান পরায়ণ মন্ত্র সাম—এইভাবে বেদ-এর তিনশৈলী—ঋক্, সাম ও যজুঃকে মানা হয়। যদিও এই শৈলীভেদ স্পষ্ট নয় এবং এ-সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণও পাওয়া যায় না। প্রাচীন বেদ-মনীষীগণের মতে কোনও একটি বিষয়ের জ্ঞান তিনটি ভূমি থেকে আসে বা আসতে পারে। বেদের মরমী ব্যাখ্যাকার ঋষি অনির্বাণ এই তিনটি ভূমি সম্পর্কে বলেছেন—"প্রথম ভূমি হল অধিভূত (phenomenal বা material)। যেমন চোখ মেললেই আলো দেখছি। আলো এখানে ভূতগুণ। কিন্তু আলোতে আমার চিত্তে যে স্বচ্ছতা এবং প্রসন্নতার আবির্ভাব হল, তা-ও জ্ঞানের আর একটা দিক। বলতে পারি, যেন বাইরের আলো আমার ভিতরে ফুটল। এই যে ভিতরের আলোর জ্ঞান, এটা হল অধ্যাত্ম (Psychical)। অধিভূত এবং অধ্যাত্মজ্ঞানে একটা সাযুজ্য আছে। বাইরে-ভিতরে তত্ত্বের একতা না হলে জ্ঞানই সম্ভব হয় না। তাই বেদান্তী বলেন, বিষয়ী চৈতন্য আর বিষয় চৈতন্যের একাত্মতাই জ্ঞান। সাংখ্যাবিদও এই ধরনের কথাই বলেন। যদি অধ্যাত্মজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয় অর্থাৎ বিষয়ের সংযোগে চেতনার যে উন্মেষ, চিত্তকে অন্তর্মুখ

করে তারই অনুধাবন করা হয়, তাহলে চেতনার উত্তেজনা ও বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণ বিষয়ী এবং বিষয় উভয়কে কুক্ষিগত করে তৃতীয় একটা ব্যাপ্তিচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। এই ব্যাপ্তিচৈতন্যই দেবতা এবং তাঁর জ্ঞান অধিদৈবতা (spiritual)। বাইরের অধিভূত আলো দেখে অন্তরে যে অধ্যাত্ম আলো ফুটল, যদি চিত্তকে তাতে নিবিষ্ট করি, তাহলে এবং অধিদৈবত আলোর মাঝে দুয়ের সমাহার ঘটাতে পারি। ...বৈদিক ঋষিরা নিজেদের বলতেন কবি, দেবতাকেও বলতেন কবি। এই কবি সংজ্ঞাতে বেদমন্ত্রের গূঢ় রহস্য যতখানি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এমন বুঝি আর কিছুতে নয়।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্য এই কবি চেতনার বাঙ্ময় বিগ্রহ। অধ্যাত্ম চেতনা সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছে। অধিদৈবত চেতনায় এবং তাকে রূপ দেওয়া হয়েছে অধিভূতের ভাষায়। উপনিষদে যে অনুভব বিশ্লেষণ-মুখে প্রকাশ পেয়েছে, বেদমন্ত্রে তারই প্রকাশ দেখি সংশ্লেষণ-মুখে। উপনিষদের তত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য, আর সংহিতার তত্ত্ব বোধিলব্ধ। বুদ্ধি দিয়ে বোধির অনুভবকে বিবৃত করলেই প্রকৃত মনের পক্ষে তা ধরা সহজ হয়। উপনিষদে অধ্যাত্ম-অনুভবের তিনটি ভূমির কথা আছে—জ্ঞান, বাল্য এবং মৌন। বুদ্ধির ব্যাপার দিয়ে তত্ত্বকে প্রথম আমরা 'জানি', আমরা তখন প্রাজ্ঞ। তারপর সেই জানা যখন সহজবোধে পরিণত হয়, চেতনা তখন হয়ে যায় ছেলেমানুষের মতো, আমাদের মাঝে ফোটে 'বাল্য'। আরও গভীরে গেলে সব চুপ হয়ে যায়, তখন 'মৌন'। বেদমন্ত্রে এই 'বাল্যে'র প্রকাশ। অনুভবের আদিম সারল্য সেখানে প্রজ্ঞার বীজ-ভাবের সূচক। তারই বিস্তার উপনিষদে।" (বেদ-মীমাংসা, প্রথম খণ্ড, অনির্বাণ)

বেদের বর্ণনশৈলীর বিচার এক বিস্তৃত বিষয়। বেদে বর্ণনশৈলীর অনুসন্ধান দুই দৃষ্টিতে করা হয়ে থাকে। এক ভাষার দৃষ্টিতে, দ্বিতীয় প্রতিপাদনের (বুঝিয়ে দেওয়া, বোধন) দৃষ্টিতে। ভাষার দৃষ্টিতে বর্ণনাশৈলীর বিচার নিম্নরূপ—

বাক্য রচনা কেমন হয়েছে? বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়াদির স্থান কোথায় রয়েছে? উপসর্গের (ধাতুর পূর্ববর্তী প্র-পরা প্রভৃতি) প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম কী আছে? বর্ণবিষয় (বর্ণনীয়), বক্তা, বোদ্ধব্য, রসাদির অনুসারে ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে কি হচ্ছে না? ভাষাকে অলংকরণ করার প্রয়াস কতটা সীমা অবধি পাওয়া যাচ্ছে? কোন কোন শব্দালংকারের প্রয়োগ হয়েছে?

কোন কোন ছন্দ বা কী ধরনের ছন্দের ব্যবহার হয়েছে? বিরাম-চিহ্ন প্রয়োগের নিয়ম কী? শব্দযৌগিক (প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থানুসারী অর্থবোধক শব্দ), যোগরূঢ় (যে সকল শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থানুসারী হয়ে কোনও একটি নির্দিষ্ট পদার্থের বোধক হয়। যথা—পঙ্কজ), অথবা রূঢ় (প্রকৃতি প্রত্যয়ের অপেক্ষা না করে অন্যার্থবোধক শব্দ), কোন প্রকারের? লক্ষণা (শব্দের শক্তি বিশেষ), ব্যঞ্জনাদির (শব্দের যে শক্তিদ্বারা তাৎপর্যার্থের বোধ হয়) প্রয়োগ কি পাওয়া যায় অথবা পাওয়া যায় না ইত্যাদি বিষয়ের তুলনামূলক অধ্যয়নই ভাষাগত শৈলীর অনুসন্ধান। ভাবাগত শৈলীর অধ্যয়ন বা অনুসন্ধান এক স্বতন্ত্র বিষয়।

বিষয়-প্রতিপাদন শৈলীর তাৎপর্য, বেদ কোনও কথা বলার জন্য যে শৈলীর প্রয়োগ করে। বেদের এইরূপ বলার অভীষ্ট কী? এর উত্তর যে শৈলীতে পাওয়া যায় তা-ই বিষয়-প্রতিপাদন শৈলী। 'শতপথ ব্রাহ্মণ', যাস্কের 'নিরুক্তি' এবং শৌনকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বৃহদ-দেবতা'য় উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে বিবিধ শৈলীর বিবরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে কতকগুলি মুখ্য শৈলীর নাম হল—প্রহেলিকাত্মক শৈলী, আত্মকথানক শৈলী, সংবাদাত্মক শৈলী, অর্থবাদাত্মক শৈলী, অভিশাপাত্মক শৈলী, ভর্ৎসনাত্মক শৈলী, স্তুত্যাত্মক শৈলী, প্রার্থনাত্মক শৈলী, আশংসাত্মক শৈলী ইত্যাদি। বেদের প্রাচীন ও বর্তমান ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকারের মতে বর্ণনশৈলী মুখ্যত তিনপ্রকার—অধিভূত, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত—সহজ কথায় আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক। এই তিন প্রকার বর্ণনাশৈলী অবলম্বনে বেদ বা বেদমন্ত্রের তিন প্রকার অর্থ আছে বা হয়। প্রাচীন বেদ-মনীষীরা এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। **আধিভৌতিক অর্থ**—পঞ্চভূতাত্মক জীব ও প্রাকৃত জগৎকে অবলম্বন করে বেদ বা বেদমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা বা অর্থ হয়, তা-ই আধিভৌতিক অর্থ। **আধ্যাত্মিক অর্থ**—আমাদের সকলের মধ্যে যে অজর-অব্যয়-অবিনাশী আত্মা এবং সকল আত্মার কেন্দ্রে যে এক পরমাত্মা আছেন, তাঁকে অবলম্বন করে যে ব্যাখ্যা। **আধিদৈবিক অর্থ**—বৈদিক দেবগণ, দেহ-মন-প্রাণ ও ভৌতিক জগতের বস্তুসমূহকে অবলম্বন করে যে ব্যাখ্যা বা অর্থ করা হয়, তা আধিদৈবিক অর্থ বা ব্যাখ্যা। **উদাহরণ**—যেমন অগ্নি, অগ্নি অর্থে সাধারণত ভৌতিক অগ্নি অর্থাৎ যে অগ্নি আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। এই অগ্নি পঞ্চভূতের একটি ভূত। আধ্যাত্মিক

অর্থে অগ্নি পরমাত্মার জ্যোতি বা ব্রহ্মজ্যোতি। এই জ্যোতি অবলম্বনে আমাদের বদ্ধ বা ক্ষুদ্র আত্মা বন্ধন মুক্ত হয় এবং শেষে ব্রহ্মময় হয়ে যায়। ব্রহ্মের সাথে মিশে ব্রহ্মময় হয়ে যাওয়াই সাধকের সাধনার লক্ষ্য। আত্মার ব্যাপ্তি বা বিশালতা প্রাপ্তিই আধ্যাত্মিক সাধনার মূলকথা। আধিদৈবিক অর্থে অগ্নি হচ্ছে দিব্যশক্তি যা আমাদের সকলের মধ্যে তপঃশক্তিরূপে ও আমাদের ঊর্ধ্ব দিকে নিয়ে যায়। ঊর্ধ্ব দিকের অর্থ উঁচু দিকে নয়—ঊর্ধ্ব চেতনার দিকে, ব্যাপকতার দিকে। আত্মাকে ঊর্ধ্ব চেতনার দিকে, ব্যাপকতার দিকে নিয়ে যায় যে অগ্নি তাই আধিদৈবিক অগ্নি। বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে হলে বেদে ব্যবহৃত শব্দগুলি যথা—ক্রতু, শ্রবস্, অশ্ব, গো, ঘৃত, ধী প্রভৃতি শব্দগুলির গভীরতম অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

প্রথমেই ধরা যাক, 'ক্রতু' শব্দ,—যার অর্থ সূর্যরশ্মি, আধ্যাত্মিক অর্থ—অন্তর্হৃদয়ের জ্ঞানরাশি। 'ক্রতু' শব্দের আর এক অর্থ কর্ম বা যজ্ঞ। এর আধ্যাত্মিক অর্থ—হৃদয়ের সংকল্প শক্তি। বেদে বহু প্রযুক্ত 'শ্রবস্' শব্দের অর্থ করা হয় কীর্তি। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ শ্রুত বিষয়জাত জ্ঞান বা শ্রুতজ্ঞান। এই দৃষ্টিতে 'শ্রবস্' শব্দের অর্থ হচ্ছে—অন্তর্প্রেরণা বা অন্তর্প্রেরিত জ্ঞান। বেদে 'গো' শব্দের সাধারণ অর্থ দেওয়া হয়েছে, যথা—পৃথিবী, বাক্ এবং রশ্মি। 'গো' শব্দে জ্যোতি অর্থের ব্যবহার বেদে পরিলক্ষিত হয়। যেমন—ঊষার 'গো', সূর্যের 'গো' ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে 'আলো' বা জ্যোতি ছাড়া অন্য অর্থ করা যায় না। বেদে-ঊষাকে গোমতী ও অশ্বাবতী বলা হয়েছে। এর ফলে বাহ্য বা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঊষার সঙ্গে অনেক গরু ও ঘোড়া থাকে। এইরূপ ভাবনার কোনও অর্থ হয় না। এর প্রকৃত অর্থ ঊষা সমস্ত জগতের জন্য আলো বা জ্যোতি সৃষ্টি করে। যে আলো বা জ্যোতি ঊষা সৃষ্টি করে, সেটি খুবই শক্তিশালী, গভীর অন্ধকারকে নাশ করে। এখানে 'গো' অর্থে জ্যোতি বা আলো এবং শক্তিশালী অর্থে অশ্ব বা ঘোড়া শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। বেদে ব্যবহৃত শব্দ সম্বন্ধে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন—"The Vedic 'horse' is a symbol of power spiritual strength, force of Tapasya." (Hymns to the Mystic Fire)। "অর্থাৎ অশ্ব শক্তির প্রতীক। আধ্যাত্মিক শক্তি, প্রাণশক্তি, তপঃশক্তি, তেজ-বীর্য, গতি ও বেগের বাহন। পূর্ণ সত্যের

দিকে যাহার গতি, বিশুদ্ধ প্রাণের যে ঊর্ধ্বায়ন, দিব্য আনন্দভোগের যে যোগশক্তি, তাহাই হইল অশ্ব।"

এরপর 'ঘৃত' শব্দ। 'ঘৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন ঘৃত। 'ঘৃ' অর্থ দীপ্ত হওয়া বা প্রকাশ হওয়া। তাই 'ঘৃত' অর্থ আলোক। বেদে ইন্দ্রের অশ্বকে 'ঘৃতস্নু' অর্থাৎ আলোকস্নাত বলা হয়েছে। যাস্ক তাঁর নিরুক্তিতে ঘৃতের অর্থ করেছেন—ক্ষরণ, দীপন ও সেচন। বেদ-ঋষি অনির্বাণ 'ঘৃত' শব্দের অর্থ করেছেন "জ্যোতির ধারা"। বেদে 'ঘৃত' শব্দের আর এক অর্থ জ্যোতি বা দিব্যজ্যোতি। ঋগ্বেদে ভরদ্বাজ ঋষি বলেছেন—"ঘৃতেন দ্যাবা-পৃথিবী অভীবৃতে ঘৃতশ্রিয়া ঘৃতপৃচা ঘৃতাবৃধা"—অর্থাৎ এই দ্যুলোক-পৃথ্বীলোক দিব্যজ্যোতির ধারায় বর্ধিত হয়ে নিষ্ণাত (প্রকাশিত) হয়ে জ্যোতির্ময় রূপে ঝলমল করছে।

বেদে প্রযুক্ত 'ধী' শব্দ বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার বিচারশক্তির বোধ অর্থেও 'ধী' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় বা প্রয়োগ হয়। বহুবচনে 'ধী' শব্দটির রূপ হয় 'ধিয়ঃ'—অর্থাৎ চিন্তারাশি বা চিন্তাসমূহ। গায়ত্রীতে 'ধিয়ঃ' শব্দের অর্থ গভীরতর। বেদ, বেদমন্ত্রকে বুঝতে হলে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। অন্যথায় বেদ-রহস্য অধরা রয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঋষি অরবিন্দ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিকেই জোর দিয়েছেন। বিজ্ঞানবিদ্ বেদ-মনীষী শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁর 'বেদ ও বিজ্ঞান'গ্রন্থে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ব্যাখ্যার উপর যে আলোকপাত করেছেন তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও রহস্য মণ্ডিত। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য আধিযাজ্ঞিক বা আধিভৌতিক ভাব অবলম্বন করে বেদ ব্যাখ্যা করেছেন। সকল ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকারই যজ্ঞকে আশ্রয় বা অবলম্বন করেছেন। যজ্ঞের তিন প্রকার অর্থ—পার্থিব যজ্ঞ, অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাদি সমর্পণ। দ্বিতীয় অর্থ—জৈমিনী মুনি দেবগণের সকল কর্মবিধির দিকে দৃষ্টি রেখে যজ্ঞের যে তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন, তাকে আধিদৈবিক দেবগণের যজ্ঞ বলা যায়। যজ্ঞের তৃতীয় ব্যাখ্যা—এই বিশ্বে একটি যজ্ঞ চলছে। পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বিশ্বযজ্ঞে নিরন্তর নিজেকে আহুতি দিচ্ছেন বা দিয়ে চলেছেন—এটাই যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যাস্ক এই অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

অপৌরুষেয় বেদ-জ্ঞানের বিশেষত্ব ও বেদ

বেদ অনন্ত জ্ঞানের আকর বা খনি। 'নেতি', 'নেতি', (এখানেই শেষ নয়)—এইরূপ বিশ্লেষণের পথে অবস্তু নেতি করে বস্তু মেলে, এইজন্য অবস্তু কী তার চর্চাও বেদ করেছে। এইজন্য বেদ বিজ্ঞান ও জ্ঞানপূর্ণ। কোনও কোনও সন্তের মতে, বিংশ শতাব্দীর বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতবাদের কিয়দংশ বেদে পরিদৃষ্ট হয়। যা ব্রহ্মবস্তুতে বিচরণ করে তা-ই বেদ। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা অপৌরুষেয় বেদের বিশেষত্ব কী এবং তৎসহ চার বেদের সংহিতা অংশের সাথে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত হব। প্রথমে অপৌরুষেয় বেদজ্ঞানের বিশেষত্ব কী তার সাথে পরিচয় পর্বটা সেরে নেওয়া যাক। এই পরিচয় পর্বের আগে বেদের প্রাচীনতা নিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

বেদ প্রথমে অখণ্ড ছিল। পরবর্তীকালে মহর্ষি বেদব্যাস বেদকে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারভাগে ভাগ করেন। ভারতীয় ধর্ম পরম্পরা ঋক্ বেদকে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে মনে করেন। পাশ্চাত্য মনীষী ম্যাকডোনেল তাঁর 'A Vidic Reader for students' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ঋক্ বেদের কাল-বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন—"The Rigveda is undoubtedly the oldest literary monument of the Indo-European languages." অর্থাৎ "ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের মধ্যে সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বা গৌরবস্তম্ভ হচ্ছে ঋগ্বেদ।" পাশ্চাত্যের অপর এক মনীষী ম্যাক্সমুলারও তাঁর বেদ-বিষয়ক গ্রন্থে লিখেছেন—"The Rigveda is oldest book in library of world." "জগতের গ্রন্থালয়গুলির মধ্যে ঋক্ বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন-গ্রন্থ।"

পাশ্চাত্যের ওল্ডেনবর্গ, ব্লুমফিল্ড প্রভৃতি মনীষীরাও ঋক্ বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেছেন। প্রাচ্য বেদ-মনীষী ডাঃ মঙ্গলদেব শাস্ত্রী বলেছেন—"বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম গ্রন্থ।" পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেছেন—"এই সংসারে সবচেয়ে পুরানো গ্রন্থ বেদ।" পরমাত্মা পরমেশ্বরই জগৎ-সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ। মহর্ষি ব্যাসদেব 'বেদান্ত দর্শনের' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে এইরূপই উল্লেখ করেছেন, যথা—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।।" অর্থাৎ যা হতে দৃশ্যমান জগতের জন্ম-স্থিতি-লয় হয়—তিনিই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। জগৎ-সংসার সৃষ্টির পর সংসারে মানুষের কিভাবে থাকা উচিত, ভৌতিক পদার্থের কীরূপ ব্যবহারে সকলের প্রয়োজন বা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে 'বেদরূপে' জগৎকে দিলেন। যেমন আজকের যুগে টি.ভি., কম্‌পিউটর, ফ্রিজ ইত্যাদি নির্মাণকারী সংস্থাগুলি এইসব বস্তু বা দ্রব্য নির্মাণের সাথে সাথে, এগুলির ব্যবহার ও সুরক্ষা কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ক একটি ছোট্ট পুস্তিকা বা Booklet প্রকাশ করে তা ক্রেতাদের ওইসব দ্রব্যগুলি ক্রয়ের সময়ে দেন। তদ্রূপ জগৎ-সংসার নির্মাণকারী পরমেশ্বর। সংসারে মানুষ কিভাবে থাকবে, অন্যের সাথে তার আচরণ কেমন হবে, কেমন করে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করে পরমকল্যাণের পথে অগ্রসর হবে, সংসারের ভোগ্য দ্রবসমূহ কিভাবে ভোগ করবে, ইত্যাদি বিষয়ক যে জ্ঞান সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রদান করেছেন—জগৎ সংসারে তা-ই বেদ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বেই বলা হয়েছে বেদ কোনও পুরুষ বা ব্যক্তির লিখিত জ্ঞান বা গ্রন্থ নয়। বেদ সর্বদাই অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় বেদ, বেদের জ্ঞান কত প্রাচীন এ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ম্যাক্সমুলার বলেছেন—"খ্রীষ্টপূর্ব বারোশত অব্দে বেদের জন্ম।" বেদজ্ঞ পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক সিদ্ধান্ত করেছেন, "খ্রীষ্টপূর্ব ছয় হাজার।" বেদ কত প্রাচীন? বেদের বয়স কত? পরম বৈষ্ণব ও বেদজ্ঞ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এই বিষয়ে সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন তাঁর রচিত 'বেদ-বেদান্ত পূর্বখণ্ড ব্রহ্মসূত্রে'র 'আভাস' নিবন্ধে, গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন—"অতি প্রাচীন বেদজ্ঞ ঋষির কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই প্রশ্নকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন 'বেদের আবার বয়স কী'? অপৌরুষেয় গ্রন্থের বয়সের প্রশ্ন তোলা বালকোচিত। একখানি গ্রন্থের বয়স জিজ্ঞাসা করা বালকোচিত কেন? ঋষি

বলিবেন, বেদ একখানি গ্রন্থমাত্র নহে, বেদ জ্ঞানভাণ্ডার। জ্ঞানের আবার বয়স কী? দুই-এ দুই-এ চার হয়—ইহা গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান। ইহার বয়স কত কেহ কি জিজ্ঞাসা করে? জ্ঞান অর্থ সত্যজ্ঞান। সত্যজ্ঞান মাত্রই অপৌরুষেয়।"

মানুষ গুরু বা শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞানী বা বিদ্বান হয়। ভৌতিক জগতে অধ্যয়ন-শিক্ষক ব্যতীত কেউ কখনও জ্ঞানী বা বিদ্বান হয় না। মানুষ গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। গুরুও তাঁর গুরুর কাছ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। এইভাবে পিছনের বা অতীতের দিকে চলতে চলতে অবশেষে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সৃষ্টিতে যখন প্রথম মানুষ উৎপন্ন হল, তখন তাকে জ্ঞান কে দিয়েছিল? তার জ্ঞানদাতা গুরু বা শিক্ষক কে ছিল? মহর্ষি পতঞ্জলি এর উত্তরে তাঁর যোগদর্শনে বলেছেন—"স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদত।" অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরই আদি গুরু, তিনিই সকল গুরুরও গুরু।

পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা এই চার ঋষির মাধ্যমে চার বেদের জ্ঞান প্রদান করেন। বেদান্ত দর্শনেও বলা হয়েছে—"প্রজাপতির্বার্ক ইমানেবেদাসৃজত।" অর্থাৎ পরমাত্মা বেদকে উৎপন্ন করলেন। পরমাত্মা বা ঈশ্বরীয় জ্ঞান হওয়ার কারণেই বেদ-জ্ঞানের না আছে শুরু, না আছে অন্ত। অর্থাৎ বেদ নিত্য এবং অনাদি। পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম যেমন নিত্য এবং অনাদি, তদ্রূপ বেদ এবং বেদের জ্ঞানও নিত্য, অনাদি।

মানুষ যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বায়ুকে শরীরের ভেতরে গ্রহণ করে এবং গ্রহণান্তে বাইরে বের করে দেয়। তদ্রূপ পরমেশ্বরও সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বীয় বেদজ্ঞান ঋষিদের মাধ্যমে প্রদান করেন এবং প্রলয় অবস্থায় ওই জ্ঞান স্বীয় অন্দরে গুটিয়ে নেন—অর্থাৎ শ্বাস নেওয়ার মতো নিজের ভেতরে গ্রহণ করেন। বৈদিক 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে এইরূপই বলা হয়েছে।

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বেদ অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরীয় জ্ঞান। এখন প্রশ্ন—ঈশ্বরীয় বা অপৌরুষেয় জ্ঞানের বিশেষত্ব কী? কিভাবে আমরা বুঝব যে বেদের জ্ঞান ঈশ্বরীয় বা অপৌরুষেয়। ঈশ্বরীয় জ্ঞানের এমন কিছু বিশেষত্ব হওয়া উচিত—যা অধ্যয়ন-মনন করলে স্পষ্টতই বোধগম্য হবে যে এই জ্ঞান ঈশ্বরীয় জ্ঞান।

প্রথমত, এর উত্তরে বেদ-মনীষীরা যা বলেন তা হল—ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উপদেশ সৃষ্টির প্রারম্ভে হওয়া উচিত। যদি জগৎ-সংসার সৃষ্টির বেশ কয়েক পুরুষ বা বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরমাত্মা ওই জ্ঞান প্রদান করেন, তাহলে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর পক্ষপাতদোষে দোষী হবেন। যেহেতু সৃষ্টির পর বেশ কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত, সেইহেতু পূর্ববর্তী মনুষ্যগণ, যাঁরা বেশ কয়েক পুরুষ আগে জগতের বুকে এসেছিলেন, তাঁদের স্বীয় জ্ঞান থেকে তিনি বঞ্চিত রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে উৎপন্ন মানুষদের তিনি স্বীয় জ্ঞান প্রদান করে লাভান্বিত করেছেন—অর্থাৎ তিনি পক্ষপাতী বলে বিবেচিত হবেন। কিন্তু পরমাত্মা পক্ষপাত রহিত। অতএব এই জ্ঞান তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে মানুষ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাদের দিয়েছিলেন। ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে বেদ ততটাই পুরানো, যতটা পুরানো এই জগৎ-সংসার।

দ্বিতীয়ত, পরমাত্মা অপরিবর্তনশীল। তাঁর সৃষ্ট নিয়মও অপরিবর্তনশীল। যেমন হাজার বৎসর আগে অগ্নিতে হাত রাখলে হাত পুড়ে যেত—এখনও যায়। এইরূপে ঈশ্বরীয় জ্ঞানও অপরিবর্তনশীল। মানুষ অল্পজ্ঞ, সেইজন্য তার জ্ঞান, তার রচিত গ্রন্থের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়। কিন্তু বেদের আজ পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কেবলমাত্র বেদ-অধ্যয়নের রীতি রচনা বা প্রবর্তন করা হয়েছিল বা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, এর মধ্যে কোনও ব্যক্তি, স্থান, দেশ-বিশেষ, রাজা-মহারাজার বর্ণন করা হয় না। রাজা হওয়ার পর তার ইতিহাস লেখা হয়। ঈশ্বরীয়জ্ঞান সৃষ্টির প্রথমেই দেওয়া হয়। যে সকল ধর্মগ্রন্থে, রাজা-মহারাজার বা দেশ-স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়, তা ঈশ্বরীয় জ্ঞানগ্রন্থ নয়। অন্যদিকে যে ধর্মগ্রন্থে কোনও স্থান বা রাজার বর্ণনা পাওয়া যায় না, তা ঈশ্বরীয় জ্ঞান। এখানেও বেদ ঈশ্বরীয়জ্ঞানের আধার প্রমাণিত।

চতুর্থত, ঈশ্বরীয় জ্ঞানে সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধে কোনও বর্ণনা অনুচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কিছু কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি বেদের মধ্যে ব্যক্তিবাচক ইতিহাসের বর্ণনা দেখেন বা ইতিহাস খুঁজে পান। শিবশংকর শর্মা প্রণীত—'বৈদিক ইতিহাসার্থ নির্ণয়' এবং ডাঃ রঘুবীর বেদালংকার প্রণীত 'বৈদিক ইতিহাস বিমর্শ' ইত্যাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে বেদে ব্যক্তির নামবাচক শব্দগুলি পদবাচক

অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বেদের সব পদই যৌগিক (প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থানুসারে অর্থবোধক শব্দ)। এখানে যেটুকু বলা প্রয়োজন তা হচ্ছে—বেদে অঙ্গিরস, ইন্দ্র, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি পদবাচক বা পদবোধক শব্দগুলির যৌগিক অর্থ না বোঝাই এর কারণ। ওই সকল শব্দগুলির রূঢ়ি বা প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করার ফলেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী শব্দগুলির যৌগিক ব্যাখ্যা (প্রকৃতি-প্রত্যয়াত্মক) করে বেদে ইতিহাসের বর্ণনা আছে এইরূপ ভ্রান্তির নিরসন করেন। বেদে ব্যবহৃত 'অত্রি' শব্দ কোনও ঋষি বা ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধ-লোভ এই তিন দোষ থেকে মুক্ত অথবা যিনি সত্ত্ব-রজঃ-তম এই তিনগুণ থেকে মুক্ত—এরূপ ব্যক্তিকেই 'অত্রি' বলা হয়। এইরূপ বিশ্বামিত্র কোনও ঋষি বিশেষের নাম নয়—সমস্ত জগৎ-সংসার যার মিত্র তিনিই বিশ্বামিত্র। আবার সূর্যকেও বেদে বিশ্বামিত্র বলা হয়েছে—কেন না সূর্য সবার মিত্র।

ঋষির নাম 'অঙ্গিরা' বা 'অঙ্গিরস'। যাস্ক বলেন, "অঙ্গারেষু অঙ্গিরা" (নিরুক্ত, ৩)। আগুনে পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছেন, আগুন অর্থাৎ তপস্যার আগুন, যাঁর আর নিজের বলতে কিছুই নেই তিনিই অঙ্গিরা বা অঙ্গিরস বা আঙ্গিরস। দেহ বলতে আমরা শরীর বুঝি, দেহী বলতে বুঝি আত্মা বা পরমাত্মা। সেইরূপ অঙ্গ অর্থাৎ শরীর, 'অঙ্গি' অর্থাৎ আত্মা বা পরমাত্মা। এই পরমাত্মার রসে যিনি বিভোর তিনিই অঙ্গিরস। ঋষির নাম 'ভৃগু'—অর্থাৎ দুঃখে তাপে তপস্যায় ভাজা ভাজা হয়েও যিনি দগ্ধ হন নাই তিনিই ভৃগু। ভৃগু অর্থ জ্ঞানসিদ্ধ, সিদ্ধজ্ঞানী। এইরূপে যে পদ ব্যক্তিবাচক বা ব্যক্তিবোধক তা মূলত যৌগিক শব্দ। বেদে জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ আদির নাম ইন্দ্রিয়সমূহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বেদের নদী, পর্বতের নামও যৌগিক। অনুসন্ধানী পাঠক এ বিষয়ে বিশদ জানার জন্য, শিবশংকর শর্মা প্রণীত 'বৈদিক ইতিহাসার্থ নির্ণয়' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন। (আর্য সাহিত্য মণ্ডল, আজমেঢ় হতে প্রকাশিত)।

বেদের মধ্যে যে ইতিহাস নেই এই তথ্য প্রমাণের জন্য ঋষি দয়ানন্দ আরও একটি জোরালো প্রমাণের উত্থাপন করেছেন এবং এ বিষয়ে বেদ অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর বেদাদি গ্রন্থের ভাষ্যে বলেছেন ব্যক্তিবাচক শব্দের সাথে তরপ্, তমপ্ প্রত্যয়ের অর্থাৎ Comparative তথা

Superlative degree-র প্রয়োগ হয় না। যেমন রাম শ্যামের চেয়ে মোটা—অর্থাৎ স্থূলতর বা স্থূলতম। অনুরূপভাবে দক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতর বা দক্ষতম ব্যবহৃত হয়। বেদে অঙ্গিরা বা অঙ্গিরস, ইন্দ্র ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে তরপ্-তমপ্ প্রত্যয় যুক্ত হলে হয় অঙ্গিরসতম, ইন্দ্রতম, অর্থ হবে অত্যন্ত অঙ্গিরস, অত্যন্ত ইন্দ্রতম—এগুলিকে বিশেষণও বলা হয়। ঋগ্বেদে ১০।১১৫।৪ মন্ত্রে, 'কণ্ব' শব্দের সাথে তমপ্ (তমঃ) প্রত্যয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে—এতে স্পষ্ট হয় যে 'কণ্ব' শব্দ ব্যক্তিবাচক নয়। কারণ 'তমপ্' প্রত্যয় যোগে 'কণ্ব' শব্দ 'কণ্বতম' হয়েছে। যা কোনওরূপেই ব্যক্তিবাচক নয়।

ইতিহাস অতীতকালের ক্রিয়াদির বিষয়। বেদমন্ত্রে যদি কোনও ক্রিয়া অতীতকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে সেই ক্রিয়া ইতিহাসের বর্ণনা এরূপ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র। প্রখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন, বেদে অতীত কালের প্রয়োগ বর্তমান কাল অর্থে হয়। এইসব প্রমাণ থেকে বেদ-বিদ্‌রা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বেদে কোনও ইতিহাসের বর্ণনা নেই। পঞ্চমত, ঈশ্বরীয় বা অপৌরুষেয় জ্ঞানে মানুষের কল্যাণের জন্য বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উল্লেখ হওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধি, তর্ক বিরুদ্ধ অথবা অন্ধবিশ্বাসযুক্ত কোনও কথা ওই জ্ঞানে না থাকাই বিধেয়। সবকিছুর প্রকাশের মূলে যেমন সূর্য। সেরূপ সর্ববিদ্যার মূল বেদ। এইজন্য বেদের মধ্যে শরীরবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ঔষধি বা রসায়নবিজ্ঞান, তারবিজ্ঞান (বেতার-টেলিফোন), প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। এরূপ বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান তথাকথিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। অন্ধ বিশ্বাসগ্রস্ত হয়ে ধর্মান্ধরা গ্যালিলিও, ব্রুনো আদি বৈজ্ঞানিকদের নির্মমভাবে কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছেন। ঈশ্বরীয় বা অপৌরুষেয় জ্ঞান তাকেই বলা হয়, যে জ্ঞান মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ-হিংসা ছড়ায় না। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে লড়াই ঝগড়ার প্রেরণা বা উৎসাহ দেয় না। বরং সকলকে একসাথে মিলেমিশে থাকার উপদেশ দেয়। যেমন বেদ দিয়েছে। যথা—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথাপূর্বে সঞ্জনানা উপাসতে।।" (ঋগ্বেদ, ১০।১৯২।২)।

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ, তোমরা সকলে একসঙ্গে চলো, একসঙ্গে মিলেমিশে আলোচনা করো, তোমাদের মন উত্তম সংস্কার যুক্ত হোক, পূর্বকালীন পুরুষেরা সেরূপ সম্মিলিত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেছেন তোমরাও সেরূপ করো।

অথর্ব বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"সহৃদয়ং সাং মনস্যম বিদ্বেষং কৃনোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্ষ্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা।" (অথর্ব বেদ, ৩।৩০।১)।

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য সহৃদয়তা, উত্তম মন, নির্বৈরতা প্রদান করেছি। তোমরা একে অন্যের প্রতি, গাভী যেমন নবজাত বাছুরটির মলিন শরীরকে স্বীয় জিহ্বা দ্বারা পরিষ্কার করে, তোমরাও সেরূপ প্রেম করো।

বেদ এইভাবে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রেরণা দেয়, বলে "বসুধৈব কুটুম্বকম্"— বিশ্বের সবাই তোমার আত্মীয় বা আপনজন। এইরূপে ঈশ্বরীয় বা অপৌরুষেয় জ্ঞানের অনেক বিশেষত্ব বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বেদের অনেক ভাষ্যকার বা পণ্ডিতরা মনে করতেন যে বেদমন্ত্রের সাথে 'বিনিয়োগ'-এর অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। যজ্ঞকর্মে মন্ত্রের প্রয়োগকে 'বিনিয়োগ' বলা হয়। কিন্তু বেদে যজ্ঞোদ্দিষ্ট মন্ত্র ছাড়াও অনেক মন্ত্র আছে, যেগুলি যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত হয় না। সায়ন, মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা এই সত্যটি ভুলে, বেদমন্ত্র মাত্রই 'বিনিয়োগের' সাথে অভিন্ন সম্বন্ধযুক্ত এটি মনে করে বহুক্ষেত্রে বেদের বিকৃত এমনকি অশ্লীল অর্থও করেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশত ছাব্বিশ সংখ্যক সূক্তটির অন্তর্গত সাত সংখ্যক ঋক্ বা মন্ত্রটির বিশেষ করে সায়নাচার্য এমন বিকৃত অর্থ করেছেন, যাতে সকল বেদানুরাগীদের মনে হবে, এটা তার পক্ষে বেদকে কলঙ্কিত করার এক নিন্দনীয় প্রয়াস। সূক্ত অন্তর্গত মন্ত্রটি হচ্ছে—

"উপোপ মে পরামৃশ মা মে দভ্রানি মন্যথাঃ।
সর্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারিনামিবাবিকা।।" (ঋগ্বেদ, ১।১২৬।৭)।

সায়নাচার্য মন্ত্রটির অর্থ করেছেন—রোমশা নামে এক স্ত্রী তার স্বামী ভাবয়ব্য-এর নিকট সহবাসের প্রার্থনা করছে এবং প্রার্থনারত অবস্থায় সে তার গোপনাঙ্গের বর্ণনা কুৎসিত ভাষায় ব্যক্ত করছে। এরূপ ঘৃণিত

এবং সদা ত্যাজ্য ঘটনার বিবরণ কখনও ঈশ্বরীয় বা অপৌরুষেয় জ্ঞানগ্রন্থে থাকে না।

এযুগে বেদের অন্যতম মহান ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী মন্ত্রটির অর্থ করেছেন—

"এক রানী রাজাকে বলছেন আমি আপনার চেয়ে কোনও ব্যাপারে ছোট বা ন্যূন নই, আপনি যেমন সকল প্রজা বা পুরুষদের ন্যায়-বিচারক ওইরূপ আমিও সকল স্ত্রীদের সাথে ন্যায় করে থাকি। প্রাচীন রাজা মহারাজাদের রাণীরা যেমন প্রজাদের স্ত্রীদের সাথে ন্যায় করতেন আমিও সেইরকমই করে থাকি।

এযুগের আরও একজন তপোনিষ্ঠ বেদমূর্তি পণ্ডিত শ্রীরামশর্মা আচার্য তাঁর ঋগ্বেদ সংহিতা ভাষ্যের প্রথম খণ্ডে মন্ত্রটির ভাষ্যবিবৃতি দিয়েছেন এইরূপ—মন্ত্রটিতে সহধর্মিণী বলছেন, হে পতিদেব আপনি আমার নিকটে এসে আমায় বারবার বাক্ বা বাণী দ্বারা স্পর্শ করুন। এবং প্রেরিত ও উৎসাহিত হোন, পরীক্ষা করে দেখুন আপনি আমায় বাণীদ্বারা স্পর্শ করে প্রেরণা পেয়েছেন কি না। আপনাকে প্রেরণা বা উৎসাহ প্রদান করার জন্য আমার এই কার্যকে আপনি অন্যভাবে গ্রহণ করবেন না। আমার প্রার্থনা, মেষের শরীর যেমন রোমরাজি দ্বারা পূর্ণ, আমিও সেইরূপ অসংখ্য গুণরাজি দ্বারা পূর্ণ প্রৌঢ়া স্ত্রী। ভাবার্থ আপনি আমার গুণদ্বারা প্রেরণা লাভ করে পূর্বের ন্যায় স্বীয়কর্মে ব্রতী হন।

আমাদের মনে রাখা দরকার বেদ তপোসিদ্ধ ঋষি-হৃদয়ের অনুভবলব্ধ বাণী। কঠোর তপস্যায় ঋষিরা এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। পরমেশ্বরের কৃপায় এই জ্ঞান তাঁদের হৃদয়ে অবতরিত বা আবির্ভূত হয়েছিল। অনেক মন্ত্রেই দেখা যায় যে ঋষিগণ দেবগণের নিকট প্রার্থনা করছেন—ঋষিদের এই প্রার্থনা দেখে তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। মনে হয় তাঁরা সিদ্ধপুরুষ—নিবৃত্তি পরায়ণ, মহৎ ও ত্যাগী; তাঁদের এরূপ প্রার্থনা করা কেন? আমাদের মনে এরূপ ভাবনার উদয় হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে বেদ ও বেদের বাণী বড়ই রহস্যময়। মহাভারতে যেমন ব্যাসকূট বা ব্যাসদেবের প্রহেলিকাত্মক কথা আছে, অনুরূপভাবে অনেক রহস্যময় মন্ত্রবাণী পরিদৃষ্ট হয়। বেদ স্বয়ং তার নামকরণ করেছেন—"নিন্যা বচাংসি"। 'নিন্য' শব্দের

বৈদিক অর্থ নির্ণয় করা—অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রবাণীর অর্থ সাধন করে নির্ণয় বা স্থির করতে হবে। উপর থেকে ভাসা ভাসা দেখে যে অর্থ মনে হয় তা আবরণ মাত্র—নিগূঢ় বা গভীর অর্থ আবরণের অভ্যন্তরে। "বেদ নিজেই বলিয়াছেন সতী নারী সর্বদা বস্ত্রাদ্বারা আবৃত অবস্থায় চলেন, তাঁহার শ্রবণপ্রিয় বল্লভের নিকটমাত্র উন্মুক্ত হইয়া থাকেন। সেইরূপ বেদার্থ আবৃতই থাকেন। ঋষিতুল্য ব্যক্তির কাছে আপনাকে ব্যক্ত করেন। ঋষি কে তাহা বুঝাও কঠিন।" (বেদ-বিজ্ঞান, উত্তরখণ্ড, মহানন্দব্রত ব্রহ্মচারী)। বেদমন্ত্র-রহস্য ভেদ করার চাবিকাঠিটি একদিন ভারতবাসীর হাতে ছিল। নানা কারণে সে চাবিকাঠিটি ঋষিরা হয়তো আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাননি, কিংবা হয়তো অন্য কোনও কারণে চাবিকাঠিটি হারিয়ে গেছে অথবা বিদেশী বিধর্মীদের অত্যাচারে তা নষ্ট হয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বেদ ভাষ্যকার সায়নাচার্য থেকে আরম্ভ করে খ্রিঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর যাস্কাচার্য পাননি। তিনি তাঁর (যাস্কাচার্য) বৈদিক অভিধান ও 'নিরুক্ত' গ্রন্থে এক-একটি শব্দের অনেক অর্থ করেছেন—কিন্তু কোন ক্ষেত্রে কোনটি যে প্রযোজ্য তা বুঝে উঠতে পারেননি। আবার অন্যদিকে বেদরহস্যের চাবি না পেয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্রের যে অর্থ করেছেন তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাস্যকর। বেদে আছে 'উষার গো-রাজি' বা 'গোযূথ'—পাশ্চাত্য বা বিদেশী পণ্ডিতেরা তার অর্থ করেছেন—'উষার গরুর দল।' বেদে 'গো' অর্থে যে জ্যোতি তা বুঝতে না পেরে বলেছেন, ভারতের "বেদ হচ্ছে অসভ্য চাষার গান।" বেদের কোনও মন্ত্রে ঋত্বিক প্রার্থনা করছেন—"আমাকে শত অশ্ব দাও"—তা পাঠ করে ওইসব বিদেশী পণ্ডিতরা অর্থ করছেন—বৈদিক যুগের লোকেরা ঘোড়ায় চাপতে খুব ভালোবাসত, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত, আনন্দে কখনও বা বেড়াত। বৈদিক অর্থে 'অশ্ব' যে প্রাণশক্তি বা শক্তির প্রতীক, তা তাদের মাথায় প্রবেশ করত না।

বৈদিক সংহিতামন্ত্রে ঋষিদের ধন-রত্নের জন্য যে প্রার্থনা, তা আপাতদৃষ্টিতে কেবলমাত্র শব্দার্থজ্ঞানে বোধগম্য হওয়ার নয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ঋষি শুধু মন্ত্রেরই দ্রষ্টা নন, তিনি তত্ত্বেরও দ্রষ্টা। মন্ত্রদ্রষ্টা, তত্ত্ব বা সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মনে কখনও ধন বা অর্থ-লালসা থাকতে পারে না। মনে বা হৃদয়ে অর্থ বা ধনের লালসা থাকলে, অন্তরে সত্যের জ্যোতি উদ্ভাসিত হবে কেমন করে?

আমরা যারা সংসারী মানুষ, প্রবৃত্তির পথে চলি, আমাদের অর্থের প্রয়োজন ও লালসা থাকতেই পারে। কিন্তু ঋষিরা অর্থলোভী হবেন কেন? তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র ত্যাগ— তাঁদের লক্ষ্য নিবৃত্তির পথে পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিসার ও মিলন। এই মিলনানন্দ রসই তাঁদের প্রার্থনার ধন। বৈদিক সকল পূজা-অর্চনাতেই ঋত্বিক বা পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। ঋত্বিক বা পুরোহিতেরা যা কিছু কামনা করেন, তা সবটাই যজমানের জন্য, সমাজ-সংসারের জন্য, সকল নরনারীর জন্য, নিজের ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়াবোধক তিন ধরনের ধাতু ব্যবহার হয়—আত্মনেপদী, পরস্মৈপদী ও উভয়পদী। যেখানে সংকল্প বা ভাবনা অপরের জন্য সেখানে পরস্মৈপদীর ক্রিয়া ধাতুর ব্যবহার—এটাই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম বা বিধান। ঋষিদের প্রার্থনায়, অধিকাংশ স্থলেই পরস্মৈপদী ক্রিয়া ধাতুর ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ঋষিদের প্রার্থনায় এবং গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে 'নঃ' শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যার অর্থ আমাদের বা সকলের। সকলের সত্য লাভ হোক, সকলেই পরম ধনরত্নের অধিকারী হোক—এই ছিল ঋষিদের হার্দিক প্রার্থনা। বৈদিক নিরুক্তকার যাস্ক ধন শব্দের অর্থ করেছেন—"ধিনোতীতি ধনম্"। অর্থাৎ, যা আনন্দদায়ক তাই ধন। বেদে ধন বা রত্ন বলতে এই আনন্দ সম্পদকেই বোঝায়। আমাদের সকলের মধ্যে চেতনারূপ যে মহামূল্যবান রত্ন ক্ষুদ্র অহং-এর গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে আছে, সেই চেতনাকে সর্বব্যাপীর পরমাত্মার অনন্ত চেতনার সাথে, তপস্যা বা সাধনার পথে অভিসার করিয়ে মিলন ঘটাতে হবে। এই মহামিলনে যে মহানন্দ-রূপ রত্ন-ধন প্রাপ্তি হবে—সেই ধনই বেদের ঋষিদের অন্তরের কাম্য। ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে, বৃহতের সাথে, অনন্তের সাথে মিলন রচনা করতে হবে। এই মিলনই, মহামুক্তি-মহানির্বাণ। এইরূপ মহামুক্তি ও মহানির্বাণই বেদের ধনরত্ন। বেদের মন্ত্রগুলির দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে দেখা যায় ঋষিরা নিজেদের জন্য কোনও ধনরত্ন প্রার্থনা করেননি। তাঁদের চাওয়া যজমানের বা সকলের জন্য। বেদে ব্যবহৃত 'রয়ি', 'রাধ', 'রায়' প্রভৃতি শব্দগুলি ধনবাচক। এর দ্বারা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ঋষি যেখানে বা যে মন্ত্রে পার্থিব ধন কামনা করেন, বুঝতে হবে তা বিশ্ববাসী সকলের জন্য। বেদের স্থূল অভিপ্রায় যজ্ঞকেন্দ্রিক বা কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিকতা, সূক্ষ্ম অভিপ্রায় দেবতা কেন্দ্রিকতা বা

পরমাত্মাভিমুখীনতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিপ্রায় আত্ম-অভিমুখীনতা। স্বয়ং বেদও এই তথ্যের স্পষ্টতা বিবৃত করেছেন। যথা—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্য ঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।"
(ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)

অর্থাৎ, এই আদিত্যকে মেধাবী বা জ্ঞানীগণ—ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষ বিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও জ্ঞানীগণ এঁকে বহু নামে অভিহিত করেন—যথা, অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা।

শুক্ল-যজুর্বেদ অন্তর্গত ঈশোপনিষদের ১৫ সংখ্যক মন্ত্রটিতে হিরণ্ময় পাত্রের কথা বলা হয়েছে, যথা—"হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।" অর্থাৎ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা বা জ্যোতির আবরণে সত্যের অর্থাৎ সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের মুখ ঢাকা। হে জগৎপালক বা পোষক পূষণ আদিত্য! তোমার আবরণ উন্মোচন করো। সত্যধর্মকে আমাদের দর্শন করাও। উপরোক্ত বা পূর্বকথিত ঋক্‌মন্ত্রে (১।১৬৪১।৪৬), অগ্নি দেবতাই ওই হিরণ্ময় পাত্র। অগ্নি প্রতীকে আত্মতত্ত্বের দর্শনই ঋষির অভিপ্রেত। এই আত্মতত্ত্বই ঋষির প্রার্থনার ধন। অগ্নির প্রতীকে ঋষি 'আত্মাগ্নি' প্রজ্জ্বলনের বা আত্মজ্ঞানরূপ ধনের কথাই বলেছেন প্রার্থনার মন্ত্রে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'বেদরহস্যে' বলেছেন—"অগ্নিদেবতা হইতেছেন পরমব্রহ্মের তপঃশক্তি। অতি কঠোরভাবে পরমনিষ্ঠার সহিত তপস্যায় নিমগ্ন হইলে অগ্নির নিকট হইতে সেই পরম রত্নধন লাভ করা যায়।" ঋষি অনির্বাণ তাঁর 'বেদমীমাংসা' গ্রন্থে বলেছেন—"রত্ন অমৃত চেতনার দীপ্তি, উপনিষদের প্রজ্ঞানঘনতা।"

ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের, প্রথম সূক্তের, তৃতীয় মন্ত্রে ঋষির প্রার্থনা—

"অগ্নিনা রয়িম্ অশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমম্।"

এই মন্ত্রে ঋষির প্রার্থনা—হে অগ্নিদেব মনুষ্য বা যজমানদের প্রতিদিন বিবর্ধমান ধন যশ এবং পুত্র পৌত্রাদি বীরপুরুষ প্রদান করো, এবং এই সকল ধন যেন কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হয়। সুতরাং ঋষির প্রার্থনা—

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।" অর্থাৎ "বিশ্বের সবসুখী হোক, হোক নিরাময়।"

বৈদিক ঈশ্বরীয় বা অপৌরুষেয় জ্ঞানের বিশেষত্ব কী এবং ঋষির প্রার্থনার অন্তর্নিহিত অর্থ কী তা আমরা সংক্ষেপে জানলাম। এবার আমরা বেদের সংহিতা অংশের সাথে পরিচিত হব। প্রথমে ঋক্ সংহিতার পরিচয় নেওয়া যাক।

ঋক্ সংহিতা—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চার সংহিতার মধ্যে ঋক্ সংহিতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। ঋক্ সংহিতার প্রাচীনত্বের আরও একটি নিদর্শন হল—ঋক্ সংহিতার অনেক মন্ত্র অন্যান্য সংহিতাগুলিতে দৃষ্ট হয়। ঋক্ সংহিতার সকল মন্ত্রই সামবেদ-সংহিতায় পাওয়া যায়। কেবল ৭৫টি মন্ত্র অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়। যজুর্বেদের কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় বিভাগেই ঋক্ সংহিতার বহু মন্ত্র পাওয়া যায়। অথর্ব বেদের 'শৌনক সংহিতায়' ঋক্ সংহিতার ১২০০ মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ঋষি শৌনকের 'চরণব্যূহ' গ্রন্থ মতে ঋক্ সংহিতার ১৯০০ মন্ত্রের উল্লেখ যজুর্বেদে পাওয়া যায়।

ঋক্ বেদ ঋচা অর্থাৎ স্তুতি-মন্ত্রের বেদ। ঋক্ শব্দের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য বৈদিক গ্রন্থ 'জৈমিনী ন্যায়ভাষ্যে' বলা হয়েছে—"ঋচ্যন্তে স্তুয়ন্তে দেবা অনয়া ইতি ঋক্।" অর্থাৎ যে মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার গুণগান এবং দেবতাদের গুণ বর্ণনা করা হয় তাকেই ঋক্ বা ঋচা বলা হয়। আবার ঋক্ শব্দের অর্থ বিষয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে, যে মন্ত্র বা বাক্যে অর্থানুসারে পাদ-ব্যবস্থা বিদ্যমান অর্থাৎ যে মন্ত্র পদ্যরূপে ছন্দোবদ্ধ, তাকে ঋক্ বা ঋচা বলা হয়। ঋক্ শব্দের অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ। ঋক্ বেদ সকল জ্ঞানের আধার, তাই এটিকে জ্ঞান বেদ বা প্রকাশ বেদও বলা হয়। কোনও কোনও গ্রন্থে ঋক্ বেদ সংহিতা নামেও অভিহিত করা হয়। মন্ত্রের অপর নাম সংহিতা সেইজন্য বেদের মন্ত্রাংশকে সংহিতাও বলা হয়। 'সংহিতা' শব্দের অর্থ ঋচা বা মন্ত্রের সংগ্রহ বা সংকলন। এইরূপে প্রতিটি বেদের ঋচা বা মন্ত্রের সংগৃহীত স্বরূপকেই তৎ-তৎ অর্থাৎ সেই-সেই বেদসংহিতা নামে অভিহিত করা হয়। যথা—সাম বেদের মন্ত্রাংশকে সাম সংহিতা বা সাম বেদ সংহিতা, যজুঃ ও অথর্ব বেদের মন্ত্রাংশকে যথাক্রমে যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদ সংহিতা বলা হয়। চার বেদের মধ্যে ঋক্ বেদই সর্বপ্রথম

এবং প্রাচীন গ্রন্থ। ঋক্ বেদ মণ্ডল ও অষ্টক এই দুই বিভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগ—মণ্ডল-অনুবাদ সূক্ত এবং ঋক্ বা মন্ত্ররূপে বিভক্ত। দ্বিতীয় বিভাগ—ঋক্ বেদের মন্ত্রের স্তবককে ঋক্ বা ঋচা (verse) বলা হয়। কয়েকটি ঋক্ নিয়ে একটি সূক্ত (Hymn) গঠিত হয়। সূক্ত অর্থাৎ সুন্দররূপে যা উক্ত বা কথিত। সূক্ত অর্থাৎ স্তুতি বা প্রশংসা। সাধারণত এক-এক দেবতার উদ্দেশে এক-একটি স্তুতি, কখনও কখনও একই সূক্তে কয়েকজন দেবতার স্তুতিও দেখা যায়। কয়েকটি সূক্ত নিয়ে একটি অনুবাক (অধ্যায়) গঠিত, কয়েকটি অনুবাক নিয়ে এক-একটি মণ্ডল, বা এক-একটি মণ্ডল হল কয়েকটি অনুবাকের সমষ্টি। ঋক্ বেদের প্রথমভাগ অনুসারে, সমগ্র ঋক্ সংহিতায় ১০টি মণ্ডল, ৮৫টি অনুবাক, ১০১৭টি সূক্ত, ১০,৬০০ ঋক্ বা মন্ত্র আছে। ঋক্ বেদের মন্ত্রসংখ্যা নিয়ে বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

ঋষি কাত্যায়ন প্রণীত 'ঋক্‌সর্বানুক্রমণী' অনুসারে ঋক্ বেদের মন্ত্রসংখ্যা ১০,৫৫২। 'চরণব্যূহ' গ্রন্থের টীকাকার মহীদাস-এর মতেও ঋক্ বেদের মন্ত্রসংখ্যা ১০,৫৫২। ঋষি শৌনক তাঁর 'অনুবাকানুক্রমণী'তে ঋক্ বেদের মন্ত্রসংখ্যা ১০,৫৮০১/২ উল্লেখ করেছেন। ঋষি দয়ানন্দ তাঁর ঋক্ বেদ ভাষ্যে ঋক্ বেদের মন্ত্রসংখ্যা ১০,৫২০ লিখেছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক ঋক্ বেদের মন্ত্রসংখ্যার বিস্তৃত বিবরণ তাঁর "ঋগ্বেদ কি ঋক্‌সংখ্যা" নামক গ্রন্থে ঋক্ বেদের মন্ত্র গণনার সাথে, ওই বেদের শব্দ ও অক্ষর সংখ্যার গণনা করেছেন। ওই গ্রন্থে শব্দ গণনায় লেখক বলেছেন যে, ঋক্ বেদে একলাখ তিপান্ন হাজার আটশত ছাব্বিশটি পদ বা শব্দ আছে এবং অক্ষরের সংখ্যা উল্লেখ করে বলেছেন, ঋক্ বেদে চার লাখ বত্রিশ হাজার অক্ষর আছে।

ঋক্ বেদের দ্বিতীয় প্রকারের বিভাগ অনুসারে ঋক্ বেদের আটটি অষ্টক আছে। অষ্টক শব্দের তাৎপর্য আটটি অধ্যায়। আটটি অধ্যায় নিয়ে এক-একটি অষ্টক। এইজন্যই অষ্টক নামকরণ হয়েছে। এই হিসাবে ঋক্ সংহিতায় চৌষট্টিটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলিকে বর্গ হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। এক-এক বর্গের কমপক্ষে একটি এবং খুব বেশি হলে নয়টি মন্ত্র আছে। এইরূপে ঋক্ বেদে দু হাজার ছয়টি বর্গ আছে। সহজ কথায় বর্গগুলিকে মন্ত্রে বিভাগ করা হয়েছে এবং এই হিসাবে বর্গসংখ্যা ২০০৬টি। মন্ত্রসংখ্যা ঋষি

কাত্যায়ন প্রণীত 'ঋক্ সর্বানুক্রমণী' অনুসারে ১০,৫৫২। ঋক্ বেদের এই বিভাগের বিশেষ প্রচলন নেই। মণ্ডল-অনুবাক-সূক্ত ও ঋক্—এই ক্রম অনুযায়ী ঋক্ বেদের বিভাগই বেশি প্রচলিত। দশ মণ্ডল হওয়ার কারণে ঋক্ বেদকে 'দাশতয়ী'ও বলা হয়।

ঋক্ বেদের সূক্ত সংখ্যা নিয়েও মতপার্থক্য দেখা যায়। ঋক্ বেদের শাকল ও বাস্কল দুটি শাখাভেদে এই মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। শাকল শাখামতে ১,০১৭টি সূক্ত এবং বাস্কল শাখামতে ১,০২৮টি সূক্ত ঋক্ বেদ সংহিতায় আছে, অর্থাৎ ঋক্ বেদের শাকল শাখা থেকে বাস্কল শাখায় এগারোটি সূক্ত অধিক আছে। এর কারণ ঋক্ বেদের অষ্টম মণ্ডলে ৪৯তম সূক্ত হতে ৫৯তম এই এগারোটি সূক্ত বালখিল্য সূক্ত নামে পরিচিত। বালখিল্য নামক ঋষিগণ এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন। এই একাদশটি সূক্ত বাদ দিয়ে সূক্ত সংখ্যা নির্ধারণ করেছে শাকলশাখা, কিন্তু বাস্কলশাখা এই একাদশটি সূক্তও গণনার মধ্যে রেখেছে। বালখিল্য সূক্তগুলি সংহিতার অন্তর্গত, বৈদিক ঋষিগণ এই সূক্তগুলি আবৃত্তিও করতেন, কিন্তু যেহেতু এই সূক্তগুলির পদ পাঠ দৃষ্ট হয় না এবং সংহিতার অক্ষর গণনায় গৃহীত হয়নি, সেইজন্য কেউ কেউ সূক্তগুলিকে সূক্তসংখ্যার মধ্যে গণনা করেন না। ঋক্ বেদ গদ্যরূপে ছন্দোবদ্ধ রচনা সংকলন। ঋক্ বেদে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, উষ্ণিক, বৃহতী, জগতী, পংক্তি ইত্যাদি ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গায়ত্রীছন্দে ২৪, উষ্ণিকে ২৮, অনুষ্টুপে ৩২, বৃহতীতে ৩৬, পংক্তিতে ৪০, ত্রিষ্টুপে ৪৪, এবং জগতী ছন্দে ৪৮ অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

এই সকল ছন্দ ছাড়াও অতিজগতী ৫২ অক্ষর, শক্করী ৫৬ অক্ষর, অতি শক্করী ৬০ অক্ষর, অষ্টি ৬৪ অক্ষর, অত্যষ্টি ৬৮ অক্ষর, ধৃতি ৭২ অক্ষর, অতিধৃতি ৭৬ অক্ষর ইত্যাদি অন্য ছন্দের ব্যবহারও ঋক্ বেদে পাওয়া যায়।

শাখা—বেদের শাখা কী? এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি ও পণ্ডিতরাও নানা ভ্রান্ত মত পোষণ করেন। অনেকে ভাবেন যে বৃক্ষের যেরূপ শাখা-প্রশাখা বা ডালপালা আছে, সেরূপ বেদেরও ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে এবং ওই সকল শাখা-প্রশাখার সমষ্টিগত নাম বেদ। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখাসমূহ মিলে পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট বেদবৃক্ষের সৃজন।

লোকসমাজে শাখা শব্দের পর্যায়বাচী শব্দ হচ্ছে—'কাণ্ড', 'সর্গ', 'স্কন্ধ' ইত্যাদি। যেমন সপ্তকাণ্ড বিশিষ্ট রামায়ণ, উনিশসর্গ বিশিষ্ট মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ', দ্বাদশস্কন্ধ বিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ—বেদের শাখা-প্রশাখাদি এইরূপই যার সমষ্টিগত নাম বা রূপ হচ্ছে বেদ। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। রামায়ণের কাণ্ডের ন্যায় বেদের শাখা-প্রশাখা, কোনও বেদ বিশেষের অবয়ব নয়, বরং ওই সকল শাখা-প্রশাখা স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ বেদরূপে পরিগণিত। রামায়ণের কাণ্ড, কথা দ্বারা পরস্পর অনুবদ্ধ (যথাক্রমানুসার), কিন্তু বেদে এইরূপ কথা-কাহিনীর অনুবদ্ধতা না থাকায় প্রত্যেক শাখা স্বয়ং পূর্ণ বেদরূপে বিবেচিত হয়। এর অধ্যয়নে অধ্যয়নকর্তা সম্পূর্ণ বেদ পাঠের ফল লাভ করেন। যদি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার ন্যায়, সম্পূর্ণ শাখার যোগে এক বেদের পূর্ণতা মানা হয়—তাহলে শত বৎসরের জীবনে বা আয়ুতে সহস্র শাখাযুক্ত সাম বেদের পাঠ কে সমাপন করবে? সুপ্রাচীনকাল হতে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে বেদবিদ্যা প্রবাহ-আকারে চলে আসছে, এর ফলে দেশ-কাল-ভেদে বেদমন্ত্রের আবৃত্তিতে, পাঠশৈলীতে, উচ্চারণ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য ও স্বতন্ত্রতা দেখা দেয়। এই স্বাতন্ত্রের ফলেই ভিন্ন-ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে বলা হয়েছে—

"শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন।"

(শ্রীমদ্ভাগবত—১-৪-২৩)।

অর্থাৎ গুরুশিষ্য, শিষের শিষ্য বা প্রশিষ্য, আবার প্রশিষ্যের শিষ্য, এইভাবে ধারাবাহিক ক্রমে চলে আসার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন যে মূল সংহিতা গ্রন্থ শাখাভেদে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি বেদের যতগুলি শাখা, মূলসংহিতা ততগুলি পৃথক পৃথকরূপে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন অনেক বিদ্বান ব্যক্তি মনে করেন যে, ঋক্ বেদের যে একুশটি শাখা ছিল এবং বর্তমানে যে পাঁচটি শাখা পাওয়া যায় তার অর্থ মূল সংহিতা একুশটি বা পাঁচটি সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন রূপে পরিণত হয়। তাঁরা মনে করেন এক-একটি শাখা সেই সেই বেদের (যথা—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব) সম্পূর্ণ নবরূপায়ণ। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুত শাখাভেদে সংহিতার ভেদ হয় না। একটি সংহিতার বহু শাখা থাকলেও মূল সংহিতাটির আক্ষরিক

রূপ একই ও অবিকৃত থাকে। এইজন্যই এক বেদের যে কোনও একটি শাখা অধ্যয়ন করলেই সেই বেদের অধ্যয়ন হয়। যেমন ঋক্ সংহিতার শাকল শাখা বা বাস্কল শাখা অথবা আশ্বলায়ন শাখা— যে কোনও একটি শাখার অধ্যয়ন করলেই তা ঋক্ সংহিতার অধ্যয়ন বলে গণ্য হবে। এই নিয়ম সকল বেদ-সংহিতাগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বেদজ্ঞ আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁর প্রণীত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' 'ঐতরেয়ালোচন' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় শাখা সম্বন্ধে বলেছেন—

"অধ্যয়নভেদ এব শাখাভেদনিদানং নতু গ্রন্থভেদ ইতি।
একৈকবেদস্য অনেকশাখাত্বেঽপি তাত্ত্বিক ভেদভাবাৎ।"

অর্থাৎ, অধ্যয়নভেদই শাখাভেদের কারণ, মূলগ্রন্থভেদ শাখাভেদের কারণ নয়। এক-একটি বেদের অনেক শাখা থাকা সত্ত্বেও মূলগ্রন্থের ভেদ হয় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য, ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি বেদের প্রত্যেক শাখার পৃথক পৃথক ভাষ্য রচনা করেননি। মাত্র এক-একটি শাখাধৃত গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন অথচ তিনি সেই বেদের ভাষ্যকার বলে পরিচিত। শাখাভেদে গ্রন্থভেদ হয় না বলেই মাত্র একটি শাখাধৃত গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করলেই সেই বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করা হল। এইরূপে সাম বেদের অনেক শাখার মধ্যে মাত্র 'কৌথুম' শাখার ভাষ্য রচনা করেছেন সায়নাচার্য এবং এর ফলে তাঁর সাম বেদের ভাষ্যরচনা করা হল।

ঋক্ বেদের শাখা—ঋক্ বেদের শাখার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। ভর্তৃহরি তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে ঋক্ বেদের পনেরোটি শাখার উল্লেখ করেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' অনুসারে ঋক্ বেদের একুশটি শাখা, যজুর্বেদের একশত শাখা এবং সাম বেদের সহস্র শাখা আছে। ভাগবতাদি পুরাণেও বেদে বহু শাখার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কূর্মপুরাণেও বেদের শাখার সংখ্যা নিয়ে আলোচনা বা বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

"একবিংশতি ভেদেন ঋক্ বেদং কৃতবান পুরা।
শাখানাং তু শাতনাথ যজুর্বেদমথাকরোৎ।।
সামবেদং সহস্রেণ শাখানাং চ বিভেদতঃ।
অথর্বাণমথ বেদং বিভেদ নবকেন তু।।"

অর্থাৎ ঋক্ বেদের একুশ শাখা, যজুর্বেদের একশত শাখা, সাম বেদের এক সহস্র শাখা এবং অথর্ব বেদের নয়টি শাখা। পাণিনির সূত্র অবলম্বনে রচিত 'কাশিকাবৃত্তি' গ্রন্থে এবং কল্পসূত্রে (বেদাঙ্গ) তিরিশের বেশি ঋক শাখার নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে ঋক্ বেদের এই সকল শাখার অধিকাংশই পৃথিবী হতে লুপ্ত হয়ে গেছে। বেদ-বিশেষজ্ঞদের অনুমান এইসব শাখার অধিকাংশই মোঘল শাসনকালে ভস্মীভূত করা হয় অথবা বেদের প্রতি ঋষির সন্তান ভারতীয়দের অনাদর দেখে এইসব মূল্যবান শাখাগ্রন্থসমূহ অশ্রুজলে আপন আপন বক্ষোদেশ সিক্ত করে কোথাও বা অজ্ঞাতবাস করছে। বর্তমানে ঋক্ বেদের মাত্র কয়েকটি শাখা পাওয়া যায়। শৌণক ঋষির 'চরণব্যূহ' গ্রন্থের মতানুসারে, বর্তমানে ঋক্ বেদের পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়। যথা—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন ও মণ্ডুক। শাখার সৃষ্টিকর্তা ঋষির নাম অনুসারেই শাখার নামকরণ হয়েছে। শাকল নামক ঋষিই প্রথম ঋক্ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। পরে শাংখ্যায়ন আশ্বলয়ন, মণ্ডুক ও বাস্কল নামে অপর চারজন ঋষি ওই সংহিতা অধ্যয়ন করেন। শৌণককৃত 'ঋক্-প্রতিশাখ্য'গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

ঋক্ বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ—ঋক্ বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ দুটি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—চারবেদের সমস্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ঐতরের ব্রাহ্মণের দ্রষ্ঠা ঋষি মহিদাস। তিনি যেহেতু ইতরার পুত্র তাই তাঁর নাম ঐতরেয়। গ্রন্থটি ঋক্ বেদের শাকল সংহিতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এতে চল্লিশটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থটি আট পঞ্জিকায় বা খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি পঞ্জিকায় বা খণ্ডে পাঁচটি করে অধ্যায় আছে—একে পঞ্চিকা বা বর্গও বলা হয়। প্রত্যেক অধ্যায় আবার কতিপয় কণ্ডিকা বা অনুচ্ছেদে বিভক্ত। এইরূপে গ্রন্থটিতে মোট ২৮৫টি কণ্ডিকা বা অনুচ্ছেদ আছে। এতে সোমযাগ, রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থের তেত্রিশ অধ্যায়ে হরিশচন্দ্র ও শুনঃশেপের আখ্যানের বর্ণনা আছে। এই আখ্যানের মাধ্যমে সাধককে 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'; অর্থাৎ এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, এইরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সায়নাচার্য এই গ্রন্থটির সংস্কৃত ভাষ্য রচনা

করেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কীথ গ্রন্থটির ইংরাজি অনুবাদ এবং ভারতের বেদ-মনীষী পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় গ্রন্থটির হিন্দি অনুবাদ করেছেন।

বৈদিক যুগে ভারতে কিভাবে নৃপতিগণের রাজ্যাভিষেক হতো, তার একটি সুন্দর চিত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থ তুলে ধরেছে। গ্রন্থটিতে ঋক্‌বেদীয় 'হোতা' নামক পুরোহিতের কর্তব্যের বিবরণও পাওয়া যায়।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ—গ্রন্থটি ঋক্ বেদের বাস্কল শাখার সঙ্গে সম্বন্ধিত। একে শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণও বলা হয়। গ্রন্থটিতে ত্রিশটি অধ্যায় আছে। ঋষি কৌষীতকী এই ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা—তাই গ্রন্থটির নাম কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। গ্রন্থটির ত্রিশ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে অন্নযাগ ও দর্শ পূর্ণমাস-ইষ্টিযাগের বর্ণনা এবং পরের চব্বিশ অধ্যায়ে সোমযাগের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত যজ্ঞের কথা এবং বেদবিদ্যার পরাকাষ্ঠার তথা ঋক্, যজুঃ, সাম তিন বেদের পুনঃপুন উল্লেখের কথা এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়।

ঋক্‌বেদের আরণ্যক গ্রন্থ—ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ন্যায় ঋক্ বেদের আরণ্যক গ্রন্থও দুটি— ঐতরেয় আরণ্যক ও কৌষীতকী আরণ্যক।

ঐতরেয় আরণ্যক—গ্রন্থটি ঋক্ বেদের শাকল শাখা বা শাকল সংহিতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। একে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশিষ্টও বলা হয়। গ্রন্থটি পাঁচভাগে বা পাঁচটি আরণ্যকে বিভক্ত। প্রথম আরণ্যকে উকথ্, প্রাণবিদ্যাদির বিশেষ আলোচনার বিবরণ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ অধ্যায় ঐতরেয় উপনিষদ নামে পরিচিত। তৃতীয় আরণ্যককে সংহিতোপনিষদ বলা হয়। এতে বেদের সংহিতাপাঠ, ক্রমপাঠ এবং পাদপাঠ তথা স্বর-ব্যঞ্জনাদির বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ আরণ্যকে মহাব্রত পালনের কথা আছে। বারো বা তার বেশিদিন ধরে যে সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয় তার নাম সত্রযাগ। সত্রযাগের শেষ দিনের আগের দিন যে সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয় তার নাম মহাব্রত। এই ব্রতপালনের পঞ্চমদিনে পঠনীয় 'মহানান্নী' ঋচা বা মন্ত্রের উল্লেখ আছে। পঞ্চম আরণ্যকে নিষ্কেবল্যের (এক যজ্ঞ, মোক্ষ উপদেশ) বর্ণনার বিবরণ দেখা যায়।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আরণ্যকের দ্রষ্টা ঋষি ঐতরেয় বা মহিদাস। চতুর্থ আরণ্যকের দ্রষ্টা ঋষি আশ্বলায়ন এবং পঞ্চম আরণ্যকের দ্রষ্টা কৌষীতকী ঋষি। এই জন্য একে (পঞ্চম আরণ্যককে) **কৌষীতকী আরণ্যক**ও বলা হয়। পঞ্চম আরণ্যকের পনেরটি অধ্যায় আছে এবং এটি বাস্কল শাখার সঙ্গে সম্বন্ধিত। এর তিন থেকে ছয় অধ্যায় পর্যন্ত অংশটি কৌষীতকী উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ।

ঋক্ বেদের উপনিষদ—ঋক্ বেদের উপনিষদও দুটি—ঐতরেয়োপনিষদ এবং কৌষীতকী উপনিষদ।

ঐতরেয় উপনিষদ—মহিদাস বা ঐতরেয় এই উপনিষদের দ্রষ্টা ও রচয়িতা। পূর্বকথিত ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থের তৃতীয় আরণ্যকের চতুর্থ হতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম বহ্বৃচ ব্রাহ্মণোপনিষদ অথবা ঐতরেয়োপনিষদ। উপনিষদটি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় দু-খণ্ডে বিভক্ত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় এক খণ্ডে একত্রিত। এই গ্রন্থে সৃষ্টির উৎপত্তি, মানুষের জন্ম-জীবন-মৃত্যুর বিশেষ আলোচনা, আত্মার স্বরূপ, জীবাত্মার জাগৃতি-স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং প্রজ্ঞান ব্রহ্ম আদির বিশেষ বিবরণ বা আলোচনা দৃষ্ট হয়।

কৌষীতকী উপনিষদ—কৌষীতকী আরণ্যকের অন্তর্গত এই উপনিষদ—সেই জন্য এর নামে কৌষীতকী উপনিষদ। চার অধ্যায়-বিশিষ্ট উপনিষদটির প্রথম অধ্যায় সাত খণ্ডে, দ্বিতীয় অধ্যায় পনের খণ্ডে, তৃতীয় অধ্যায় নয় বা নবম খণ্ডে এবং চতুর্থ অধ্যায় ২০ খণ্ডে বিভক্ত। উপনিষদ্‌টি গদ্যাকারে লিখিত। প্রথম অধ্যায়ে দেবযান, পিতৃযান, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাণ, তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতর্দনের ইন্দ্রের সমীপে উপনীত হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে অজাতশত্রু ও বালাকির আখ্যানের মাধ্যমে পরব্রহ্ম সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে শৌনক ঋষির 'চরণব্যূহ' গ্রন্থানুসারে বর্তমানে ঋক্ বেদের পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়। যথা—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন ও মণ্ডুক। উপরোক্ত পাঁচটি শাখার মধ্যে বর্তমানে ঋক্ সংহিতার শাকল, শাংখ্যায়ন ও বাস্কল (বাষ্কল-ও হয়) এই তিনটি শাখা পাওয়া যায়। শাকল সংহিতার মন্ত্রগুলিকে মণ্ডল এবং সূক্তে ভাগ করা হয়েছে। অপর দিকে বাস্কল সংহিতায় মন্ত্রগুলিকে ভাগ করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায় এবং বর্গে।

ঋক্ বেদের শাকল সংহিতাই বর্তমানে প্রচলিত। এবার ঋক্ বেদের মণ্ডলগুলির সাথে পরিচিত হওয়া যাক। ঋক্ বেদের মণ্ডলগুলির সাথে পরিচিত হলে, অন্য তিন বেদের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও আমরা একটা সম্যক্ ধারণা লাভ করতে পারব। কতিপয় মন্ত্র ব্যতিরেকে বাকি তিন বেদ ঋক্ বেদেরই প্রতিধ্বনি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রথম মণ্ডল—ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত এবং ২০০৬টি মন্ত্র আছে। এই মণ্ডলের ঋষিরা হচ্ছেন—দীর্ঘতমা, অগস্ত্য, মৈত্রাবরুনি, কুৎস, অংগিরস, বিশ্বামিত্র, মধুছন্দা, মেধাতিথি, কান্ব প্রভৃতি। এই মণ্ডলের ৫৬ সংখ্যক সূক্তে অগ্নি, ৬৩ সংখ্যক সূক্তে ইন্দ্র, ১৯সংখ্যক সূক্তে অশ্বিনৌ, ১৩ সংখ্যক সূক্তে মরুত এবং ৬নং সূক্তে বায়ুদেবতার বর্ণনা বা স্তুতি করা হয়েছে। এছাড়াও—ঊষা, রুদ্র, বিষ্ণু, সূর্য, মিত্রাবরুণৌ. অগ্নায়ী, দ্যবা পৃথিবী, ইন্দ্রাণী, বৃহস্পতি, বিশ্বদেবা, সোম, অগ্নিষোমৌ আদি দেব-দেবীরও স্তুতি করা হয়েছে। ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলে ঈশ্বরীয় উপাসনা, পুরুষার্থ বিদ্যা ব্রহ্মচর্য, বিদ্বৎজনের শ্রেষ্ঠতা, রাজা এবং প্রজাদের কর্তব্য, ঈশ্বর এবং সূর্যের গুণ, বায়ু এবং বরুণ দেবতার গুণ, প্রকৃতির বিবিধ রূপ গুণ, স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম, সোমলতার মহত্ব তথা গুণ, মিশ্র এবং অমিত্রের গুণ তথা অন্ন আদির গুণের সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে অগ্নি ও ইন্দ্রকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—দুই দেবতার একই পরমাত্মার রূপ মানা হয়েছে। ঋক্ বেদে ঈশ্বরকে অসংখ্যা নামে আহ্বান করা হয়েছে, বস্তুত এই অসংখ্যা নাম একই পরমাত্মা বা ঈশ্বরের নাম। এ-প্রসঙ্গে ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সংখ্যক সূক্তের ৪৬ সংখ্যক ঋক্‌টি উল্লেখযোগ্য। যথা—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমহুরথো দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ।।

অর্থাৎ, এই আদিত্যকে মেধাবীগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ও অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও একে বহু বলে বর্ণনা করা হয়। একে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) বলে। "ঋষি বা সাধক কিন্তু নিজে তপস্যা করেন না। সাধন করেন তাঁর অন্তরস্থ ভগবান, তাঁর অন্তরাত্মা, আত্মাই সাধক, আত্মাই সাধনা। উদ্বোধিত আত্মার মধ্যে বিভিন্ন সব চিৎশক্তি

জেগে উঠেন। তাঁরাই দেবতা। ঋষির তপস্যা তাই দেবতার তপস্যা। দেবতারা সব দ্রুত অন্তরে সমবেত হন—তাঁরা হলেন "আশুহেমা" (অর্থাৎ দ্রুত গতিশীল)। আত্মার মধ্যেই দেবতারা বিরাজ করেন। আত্মশক্তিই তাঁদের গতি, রথ ও অশ্ব। তাঁদের আয়ুধ ও অস্ত্র। আত্মাই সকল দেবতা। ঋষি যাস্ক তাই বলেন—

"আত্ম জন্মানঃ আত্মৈবৈষাম রথোভবতি।

আত্মাশ্বঃ। আত্মায়ুধম্। আত্মাসর্বে দেবস্য।" (নিরুক্ত, ৭/৪)।

ঋষির অন্তরে বসে দেবতারা যে সাধনা করেন বা করছেন তাঁরা আত্মারই নানারূপ নানা অঙ্গ বিভিন্ন ক্রিয়ানুসারে—'একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।' (নিরুক্ত, ৭/৪)।" (মর্ত্যেষু অমৃত—অমলেশ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-৪৫)।

দ্বিতীয় মণ্ডল—ঋক্ বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩টি সূক্ত এবং ৪২৯টি মন্ত্র আছে। এর মধ্যে ১২ সংখ্যক সূক্তটির দেবতা অগ্নি এবং এই সূক্তে ৭৮টি ঋক্ বা মন্ত্র আছে। এই মণ্ডলের ১৬ সংখ্যক সূক্তে ১৩৪ মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতার স্তুতি বা বর্ণনা।

এছাড়াও বরুণ-মরুৎ-বৃহস্পতি-রুদ্র-বায়ু-অশ্বিনৌ আদি দেবতার স্তুতি বা বর্ণনা আছে। এই মণ্ডলের ঋষি গৃৎসমদ, ভারবি বা সোমাহুতি।

তৃতীয় মণ্ডল—এই মণ্ডলে ৬২টি সূক্ত এবং ৬১৭টি মন্ত্র আছে। এর ২৯ সংখ্যক সূক্তের দেবতা অগ্নি এবং ২৬ সংখ্যক সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। এতদ্ব্যতীত, মিত্র, উষা, পূষা, সবিতা, সোম, আত্মা, বাক, মিত্রাবরুনৌ, মরুতঃ, বৃহস্পতিঃ, ইন্দ্রবরুনৌ আদি দেব-দেবীর স্তুতি বা বর্ণন আছে। ২২৯-মন্ত্রে ইন্দ্র এবং ১৮৬ মন্ত্রে অগ্নি দেবতার স্তুতি আছে। অবশিষ্ট সংখ্যক মন্ত্রগুলিতে অন্য দেব-দেবীর স্তুতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সূক্তের বা মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র, কৌশিক প্রভৃতি। কেবল ২৬ সংখ্যক সূক্তের সপ্তম ঋকের ঋষি অগ্নি বা ব্রহ্ম।

চতুর্থ মণ্ডল—চতুর্থ মণ্ডলে ৫৮টি সূক্ত এবং ৫৮৯টি মন্ত্র আছে। এই সূক্তের ঋষি বামদেব, পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ। এই মণ্ডলের সূক্তগুলিতে ইন্দ্র অগ্নি, ঋভবঃ, অশ্বিনৌ, ইন্দ্রাবরুণৌ, উষা, সবিতা, দ্যাবা পৃথিবী, ইন্দ্র, বায়ু আদি দেবতার স্তুতি আছে।

পঞ্চম মণ্ডল—এই মণ্ডলের ৮৭টি সূক্ত এবং ৭২৭টি মন্ত্র আছে। পঞ্চম মণ্ডলে ১৮৪টি মন্ত্রে অগ্নি, ১২০টি মন্ত্রে বিশ্বেদেবাঃ ১১৮টি মন্ত্রে মরুতঃ এবং ১১২টি মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতার স্তুতি-বর্ণনা আছে। বাকি মন্ত্রগুলিতে, মিত্রাবরুনৌ, অশ্বিনৌ, উষা, সবিতা, রুদ্র, বায়ু আদি দেবতার স্তুতি-বন্দনা। এই মণ্ডলের এবং সূক্তের ঋষি অত্রিবংশীয় বুধ, গবিষ্ঠির ও অন্যান্য আত্রেয়গণ (অত্রির বংশধরগণ)।

ষষ্ঠ মণ্ডল—এই মণ্ডলটিতে ৭৫টি সূক্ত এবং ৭৬৫টি মন্ত্র আছে। সকল সূক্ত সহ এই মণ্ডলের ঋষি ভরদ্বাজ। এতে অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বেদেবা, পূষা, ইন্দ্রাণী, অশ্বিনৌ, মিত্রাবরুণৌ, উষা, সরস্বতী, মরুতঃ, সবিতা, সোম আদি দেব-দেবীর স্তুতির বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত মণ্ডলটিতে পরমাত্মার সৃষ্টি জগৎ-সংসার-এ আনন্দ, প্রভু বা ঈশ্বরের মহিমা, পরমাত্মার উপাসনা, উপাসনার ফল, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির প্রশংসা, জ্ঞান-বিজ্ঞান হতে সুখ বৈভবাদি প্রাপ্তি, উপদেশকের গুণ, যজ্ঞের মহত্ব, নেতার গুণ, বাণীর সদ্ব্যবহার, পাপ থেকে বাঁচার উপায়, শুভ বা মাঙ্গলিক কর্ম, পুরুষার্থর বিশেষতা, গৃহের সুখ, উত্তম সন্তানের লক্ষণ, দানের প্রশংসা, গাভীর মহিমা, শরীর স্বাস্থ্যের রক্ষাকরণ, জল-চিকিৎসা ইত্যাদি বহু বিষয়ের বর্ণনা আছে।

সপ্তম মণ্ডল—সপ্তম মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা ১০৪, মন্ত্র সংখ্যা ৮৪১। মণ্ডলের ঋষি বশিষ্ঠ, দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনৌ, বিশ্বেদেবাঃ, মরুতঃ, উষসঃ, পর্জন্য, সূর্য, বিষ্ণু, রুদ্র, আপঃ ও ভগ। এই মণ্ডলে পবিত্রতা ও সততার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাম-ক্রোধাদি আন্তরিক শত্রুদের নিন্দা এবং কামভোগী ব্যক্তির যজ্ঞে উপস্থিত না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এছাড়া সুশিক্ষা, সুমতি, সৎপথে চলা, দেবত্ব প্রাপ্তি, পূর্ণ আয়ু ভোগ, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি, বৃষ্টি-বিজ্ঞানাদি বিষয়ের বর্ণনা আছে।

অষ্টম মণ্ডল—সূক্ত সংখ্যা ১০৩, মন্ত্র সংখ্যা ১৭১৬। এই মণ্ডলেই পরমাত্মার বিবিধ বা অসংখ্য নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—অগ্নি, বরুণ, আদিত্য, বায়ু ইত্যাদি সবই এক পরমাত্মা বা ঈশ্বরের নাম। মণ্ডলের ঋষি—কান্ব, আঙ্গিরস, ভার্গব প্রভৃতি। এই মণ্ডলের ৪৯-৫৯, এই এগারোটি সূক্ত বালখিল্য সূক্ত নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এবং তাঁদের অনুসরণকারী ভারতীয়

পণ্ডিতবর্গ এই সূক্তগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। কিন্তু ভারতীয় বৈদিক মান্যতা এরূপ নয়। ভারতের বেদ-বিদ্‌রা এই মন্ত্রগুলিকেও বেদের অন্য মন্ত্রের সমান প্রাচীন এবং ঈশ্বর দ্বারা উপদিষ্ট মনে করেন।

নবম মণ্ডল—সূক্ত সংখ্যা ১১৪ এবং মন্ত্রসংখ্যা ১০৯৭। এই মণ্ডল পবমান (পবিত্রকারী) সোমদেবতার বন্দনায় মুখর। সোমশব্দ পরমাত্মা, বিদ্বান, সৌম্য-গুণসম্পন্ন, রাজা, চন্দ্র, ওষধি ইত্যাদি বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়। পরমাত্মা—পবিত্রতা, শান্তি, আনন্দ অমৃতরস প্রদান করেন, এই জন্য তাঁর স্তুতি বা বন্দনা পবমান সোমরূপে করা হয়। বিদ্বান সাধুসন্তের সৎসঙ্গ বা সান্নিধ্য এবং তাঁদের উপদেশ ও প্রবচন মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ বা পবিত্র করে। মানুষকে যথার্থ সুখ, শান্তি ও আনন্দ-অমৃতরস আস্বাদনে উৎসাহিত করে। এইজন্য বিদ্বান সাধুসন্তদের এবং তাঁদের উৎসাহব্যঞ্জক বা প্রেরণাদায়ী বাণীকে সোম নামে অভিহিত করা হয়। আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাথে, অথবা ভক্ত যখন ভগবানের সাথে মিলিত হন, তখন সেই মিলনজাত আনন্দরসানুভূতি সোম নামে অভিহিত হয়।

দশম মণ্ডল—সূক্ত সংখ্যা ১৯১, মন্ত্রসংখ্যা ১৭৫৪। এই মণ্ডলে 'যমসূক্ত' (১৪), 'পিতৃসূক্ত (১৮), 'অক্ষসূক্ত'(৩৪), 'মন-আবর্তনসূক্ত' (৫৮), 'সূর্যসূক্ত' (৮৫), 'পুরুষসূক্ত' (৯০), 'চিকিৎসাসূক্ত' (৯৭), 'দানসূক্ত' (১১৭), 'হিরণ্যগর্ভসূক্ত' (১২১), 'বাক্ সূক্ত' (১২৫), 'নাসদীয়সূক্ত' (১২৯), 'শ্রদ্ধাসূক্ত' (১৫১), 'রাজধর্মসূক্ত' (১৭৩-১৭৪) এবং 'সংগঠনসূক্ত' (১৯১) অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই মণ্ডলে 'মৃত্যুসূক্তটি'ও উল্লেখযোগ্য।

'যমসূক্তে' পরমাত্মাকে 'যমরূপে' বর্ণনা ও স্তুতি করা হয়েছে। সূক্তটিতে বলা হয়েছে পরমাত্মা সমগ্র সৃষ্টিকে আপনার সুব্যবস্থা বা নিয়ম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। রাজা যিনি রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ম-বিধি-দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং পুরুষ বা গৃহকর্তা, যিনি গৃহের ব্যবস্থা নিয়ম-বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ঘরের বা গৃহের সকল সদস্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন—এই জন্য রাজা-গৃহকর্তা বা পুরুষদেরও 'যম' বলা হয়।

পরমাত্মা বা ঈশ্বর সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়মে রেখে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করেন। এইজন্যে পরমাত্মাকেও 'যম' বলা হয়। 'যম' শব্দের অর্থ যিনি নিয়মের

দ্বারা সবকিছুকে নিজ নিয়ন্ত্রণে বা বশে রাখেন। 'পিতৃসূক্তে' মাতা-পিতার উপকারের বর্ণনা করা হয়েছে। 'মৃত্যুসূক্তে' আত্মার নিত্যতা এবং শরীরের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 'অক্ষসূক্তে' অক্ষ বা দ্যুতক্রীড়ার ফলে মানুষের যে ভয়ানক ক্ষতি বা হানি হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। 'মন-আবর্তন সূক্ত' মনের মহত্ব এবং কার্যের বিবরণ তথা বিচার বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়।

'সূর্যসূক্তে' বিবাহ উপদেশ, গৃহস্থধর্ম, পতি-পত্নীর কর্তব্যাদির বর্ণনা আছে। 'পুরুষসূক্তে' পরমাত্মা এবং জীবাত্মার পুরুষরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। 'চিকিৎসাসূক্তে' কোন কোন রোগে কোন কোন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত এ-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। 'দানসূক্তে' দানের মহিমা ও প্রয়োজনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 'হিরণ্যগর্ভসূক্তে' পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা আছে। 'বাকসূক্তে' বাণীর মহিমা ঘোষিত এবং 'নাসদীয়সূক্তে' সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি সৎ না অসৎ ছিল এ-বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'শ্রদ্ধাসূক্তে' শ্রদ্ধার গুরুত্ব বা মহিমার কথা বলা হয়েছে। 'রাজধর্মসূক্তে' রাজা এবং রাজকর্মচারীদের প্রজাগণের সাথে কী করণীয় বা প্রজাদের প্রতি কী কর্তব্য—এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সামাজিক সংগঠনের স্বরূপ মহত্ব এবং উপযোগিতা কী ইত্যাদি বিষয়ের উপদেশ ঋক্ বেদের অন্তিমসূক্ত 'সংগঠনসূক্তে' দেওয়া হয়েছে। ঋষি অনির্বাণের ভাষায়—"মোটের উপর দশম মণ্ডলে আমরা পাচ্ছি.... দেবতাদের উদ্দেশে রচিত 'সূক্ত' ছাড়াও দার্শনিক এবং লৌকিক ভাবনা অবলম্বনে রচিত অনেকগুলি সূক্ত যার মধ্যে আর্যচিত্তের বিচিত্র সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।" (বেদ-মীমাংসা, প্রথমখণ্ড, অনির্বাণ)।

সাম বেদ পরিচয়—গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।" গীতার দশম অধ্যায়ের নাম 'বিভূতিযোগ'। বিভূতি অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য বা শক্তি। গীতায় সাম বেদকে নিজের ঐশ্বর্য বা শক্তিরূপে স্বীকার করার ফলে, সাম বেদের গুরুত্ব বা মহত্ব যে কতখানি তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে মহর্ষি শৌনক বলেছেন—"সামানি যো বেত্তি স বেদ তত্ত্বম্"—অর্থাৎ যিনি সাম বেদকে জানেন, তিনিই বেদের তত্ত্ব সম্যকরূপে জ্ঞাত হন। সাম শব্দের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বৃহদারণ্যকের (উপনিষদ) ঋষি বলেছেন—"সা চ অমশ্চেতি তত সাম্নঃ

সামত্বম্।" (১।৩।২২)। অর্থাৎ 'সা' শব্দের অর্থ ঋচা বা মন্ত্র এবং 'অম্' শব্দের অর্থ গান্ধার আদি স্বর। এইহেতু ঋচা এবং গানের স্বর এই দুইয়ের মিলনকেই "সাম" বলা হয়।

'গীতিষু সামাখ্যা'—এই জৈমিনীসূত্র অনুসারে গীতি বা গানের অপর পর্যায় সাম। কোনও কোনও বেদবিদ্ সাম শব্দের অর্থ করেন প্রিয় বা প্রীতিকর বচন বা মধুর বাণী। যেহেতু সামগান সবার প্রিয় এবং মধুর লাগে, সেই জন্য এই অর্থও সুসংগত। সাম বেদ উদ্‌গাতার বেদ। উদ্‌গাতার কার্য, যজ্ঞে দেবতাদের প্রসন্ন করার জন্য ঋচা বা মন্ত্রগুলি গান করা। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে 'না সাম যজ্ঞো ভবতি'—অর্থাৎ সাম গান রহিত যজ্ঞ, যজ্ঞই নয়। এই জন্যই ভারতে প্রত্যেক যজ্ঞের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বা সম্পূর্ণতার জন্য প্রারম্ভিক কাল থেকেই সাম গান করার প্রথা ছিল। চতুর্বেদের বিভাগের মধ্যে সাম বেদের স্থান তৃতীয়। কিন্তু নৈকট্যের দিক থেকে সাম সংহিতার স্থান ঋক্ সংহিতার পরেই—কারণ ঋক সংহিতার সঙ্গে তার যোগ সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সাম বেদের ৭৫টি মন্ত্র বাদ দিলে বাকি সব মন্ত্র ঋক্ বেদ থেকে নেওয়া। সাম বেদ সঙ্গীত বেদ বা সঙ্গীত গ্রন্থ—কেননা গানই হচ্ছে এই বেদের প্রাণ। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে এই গান গাওয়া হতো। সাম বেদ সংহিতায় সর্বমোট ১৮১০টি মন্ত্র আছে। ৭৫টি মন্ত্র ব্যতীত বাকী সব মন্ত্রই ঋক্ বেদের মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কোনও কোনও মতে সাম বেদের পূর্ণমন্ত্র ১৮৭৫। সাম বেদে ঋক্ বেদের প্রায় সকল মন্ত্রই পুনরুক্ত, তথাপি উভয়ের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে—ঋক্ বেদে মন্ত্রগুলি গানরহিত এবং সাম বেদের ওই পুনরুক্ত মন্ত্রগুলি (ঋক্ বেদের) গানযুক্ত বা গানসহিত। মন্ত্রগুলির ব্যবহার উভয় সংহিতায় একরূপ হলেও ঋক্ বেদে গানের রাহিত্য এবং সাম বেদে গানের সহিত বা সাহিত্য (সহিত বা সঙ্গ) উভয় বেদকে পৃথক করেছে। গান বা সংগীতই সামবেদীয় সূক্তগুলির প্রাণ। ঋক্ বেদে দেবতাদের মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করা হয়, সাম বেদে মন্ত্রগুলিকে গানের সুরে গেয়ে দেবতাদের স্তুতি বন্দনা করা হয়। গীত বা গানের সঙ্গে স্তুতি উচ্চারণ করলে তবেই তাকে স্তোত্র বলা হয়।

সাম বেদের শাখা—সাম বেদের সহস্র শাখা ছিল একথা বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্র-পুরাণাদি, দ্বারা সমর্থিত। আজকাল সাম সংহিতার মাত্র তিনটি শাখা

পাওয়া যায়। যথা—রানায়নীয়, কৌথুমী ও জৈমিনীয় বা তলবকার। এর মধ্যে রানায়নীয় এবং কৌথুম শাখার মধ্যে মন্ত্রভেদ নেই। কেবলমাত্র মন্ত্র গণনার পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখা যায়। রানায়নীয়গণ মন্ত্র গণনা করেছেন প্রপাঠক (অধ্যায়), অর্ধপ্রপাঠক এবং দশতি অনুসারে। দশমন্ত্রের সমষ্টিকে দশতি বলা হয়। অপরদিকে কৌথুমীরা মন্ত্র গণনা করেছেন অধ্যায় এবং খণ্ড অনুসারে। দুটি শাখায় কিছু স্বরভেদ এবং পাঠভেদও দৃষ্ট হয়। জৈমিনীয় বা তলবকার সংহিতায় মন্ত্রের সংখ্যা কিছু কম। কিন্তু গানের সংখ্যা বেশি—এই সংহিতার মন্ত্রবিন্যাসের পদ্ধতিও আলাদা। কৌথুম বা কৌথুমী সংহিতা মতে, সাম বেদ সংহিতা দুটি খণ্ডে বা দু-ভাবে বিভক্ত—'আর্চিক' এবং 'গান'। ঋক্ মন্ত্রে সুর বসিয়ে গান করা হতো এই সুরকে বলা হতো সাম। এইজন্য ঋক্‌কে সামের যোনি (উৎপত্তি বা উদ্ভব স্থান) বলা হয়। সাম বেদ সংহিতার 'আর্চিক' ভাগটি হল ঋক্‌মন্ত্রের সংগ্রহ বা সংগীতের সংকলন, অপরভাগ 'গান' হল তার স্বরলিপি। পূর্বকথিত সাম বেদের তিন শাখার বর্ণনা পাঠকদের বোঝার সুবিধার জন্য নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

কৌথুম সংহিতা বা শাখা—শ্রীমদ্ভাগবত তথা বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থানুসারে মহর্ষি বেদব্যাস নিজ শিষ্য জৈমিনীকে সাম বেদ অধ্যয়ন করান বা শিক্ষা দেন। পরবর্তী সময়ে জৈমিনীকে সাম বেদের আদি আচার্য নামে অভিহিত করা হয়। জৈমিনীর বংশ পরম্পরায় এই বেদ তাঁর পৌত্র সুকর্মার মাধ্যমে, তাঁর (সুকর্মার) দুই প্রধানশিষ্য—হিরণ্যনাভ কৌশল্য এবং পৌষ্যঞ্জি প্রাপ্ত হন। হিরণ্যনাভ দ্বারা প্রবর্তিত তথা রক্ষিত ভাগকে 'উদীচ্য সাম' এবং পৌষ্যঞ্জি দ্বারা প্রবর্তিত রক্ষিত ভাগকে 'প্রাচ্য সাম' নামে অভিহিত করা হয়।

সাম বেদের কৌথুম বা কৌথুমী, রানায়নীয় এবং জৈমিনীয় এই তিন শাখা বা সংহিতা বর্তমানে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে মন্ত্রের সংখ্যার তারতম্য থাকলেও মন্ত্রগত বিষয় একই। কৌথুম সংহিতার মুখ্য দুই ভাগ—পূর্বার্চিক এবং উত্তরার্চিক। পূর্বার্চিকে ছয় অধ্যায় বা ছয়টি প্রপাঠক এবং মন্ত্র সংখ্যা ৬৪০। এর প্রথম প্রপাঠককে আগ্নেয়কাণ্ড বলা হয়, এতে অগ্নি সম্বন্ধীয় মন্ত্রের সংগ্রহ আছে। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ প্রপাঠক পর্যন্ত ভাগকে ঐন্দ্র পর্ব বলা হয়। পঞ্চম প্রপাঠক পবমান পর্ব, এটি সোম সম্বন্ধীয় মন্ত্রের সংকলন—যা ঋক্

বেদের পবমান মণ্ডল (নবম মণ্ডল) থেকে অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে। ষষ্ঠ প্রপাঠক আরণ্যক পর্ব নামে অভিহিত, এই পর্বের সাম বা গানগুলি অরণ্যে গাওয়া হতো।

উত্তরার্চিকে অনুরূপ নয়টি প্রপাঠক বা অধ্যায়, ১২২৫টি মন্ত্র আছে। দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষুদ্র (বৈদিক সূক্ত বিশেষ, যেখানে সূক্ষ্ম ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে), এই সাত বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করা হয়েছে। এর ফলে মন্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২২৫ এর জায়গায় ১৮৮৫ হয়েছে। এর মধ্যে ৯১টি মন্ত্র বাকি তিন বেদে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাকি মন্ত্রগুলি সবই ঋক্ বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। গুজরাটের শ্রীমালী এবং নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই সংহিতা বা শাখার পর্যাপ্ত প্রচার পরিলক্ষিত হয়। বেদ ভাষ্যকার সায়নাচার্য এই সংহিতার উপর ভাষ্য রচনা করেছেন।

রানায়নীয় সংহিতা বা শাখা—কৌথুমী শাখার থেকে কলেবরে কিঞ্চিৎ ছোট। এর মন্ত্রসংখ্যা ১৫৪৯। উচ্চারণের দৃষ্টিতে উভয় শাখার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কৌথুমী শাখার অনুগামীরা মন্ত্রগান করার সময় স্বর-সাধনার জন্য যেখানে 'হাও' 'রাই'-এর আলাপ করেন, সেখানে রানায়নীরা বা রানায়নীয় শাখা অধ্যায়ীরা 'হাওউ' বা 'হাবু' এবং 'রায়ি' উচ্চারণ করেন। এই শাখার প্রচার ও প্রসার মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড় দেশেই (দক্ষিণ দেশে) পরিলক্ষিত হয়।

জৈমিনীয় সংহিতা (তলবকার সংহিতা) বা শাখা—সমগ্ররূপে এই সংহিতাটি (অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, শ্রৌত তথা গৃহ্যসূত্রসহ) বর্তমানে পাওয়া যায়। বেদানুরাগীদের কাছে এটা একটা আনন্দের বিষয়। এর মন্ত্র সংখ্যা ১১৮৭। বিষয়ের দৃষ্টিতে এই শাখা কৌথুমী শাখার সমান। যদিও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাঠভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই সংহিতায় উল্লেখিত সামগান চার প্রকারের। যথা—গ্রামগেয়, আরণ্যকগেয় বা অরণ্যগেয়, উহ এবং উহ্য। কৌথুমী সংহিতা বা শাখার ন্যায় এই সংহিতাও দুই মুখ্য ভাগে বিভক্ত। পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। পূর্বার্চিকে গ্রামগেয় ও আরণ্যক সামগানের উল্লেখ আছে এবং উত্তরার্চিকে আছে উহ এবং উহ্য সামগানের বিবরণ। আর্চিক শব্দের অর্থ সমূহ বা সংকলন। বৈদিক পরিভাষায় একে যোনি গ্রন্থও বলা হয়। সাম বেদের সামগান বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য, সামবিধান

ব্রাহ্মণ, সামতন্ত্র, পুষ্পসূত্র, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, নারদশিক্ষা এইসব প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে সাম বেদ সংহিতার আর্চিক ভাগটি হল ঋক্ মন্ত্রের সংগ্রহ বা সংগীতের সংকলন এবং এই সংহিতার অপর ভাগ 'গান' হল তার স্বরলিপি। ঋক্ সংহিতার দশটি মণ্ডল হতেই সাম সংহিতার মন্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ঋক্ বেদের দশ মণ্ডলের মধ্যে অষ্টম এবং নবম মণ্ডলের মন্ত্রই অধিক সংখ্যায় সাম বেদে গৃহীত হয়েছে। সাম সংহিতার আর্চিক অর্থাৎ যে ভাগে সঙ্গীতের সংকলন বা সংগ্রহ আছে দুটি ভাগ—পূর্বার্চিক এবং উত্তরার্চিক। "পূর্বার্চিকে স্বতন্ত্রভাবে এক-একটি করে মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। তার এক-একটি মন্ত্রে এক-একটি সাম উৎপন্ন হয়। এই মন্ত্রগুলিই সামের যোনি। বিশেষ করে যোনিমন্ত্রের সংগ্রহ বলে 'আর্চিকের' আর এক নাম 'যোনি গ্রন্থ' বা 'ছন্দো গ্রন্থ', কিন্তু যজ্ঞে সাধারণত তিনটি ঋকে বা একটি তৃচে (তিনটি ঋকের একটি গুচ্ছকে বলে 'তৃচ') একটি সাম গাওয়া হয়। পূর্বার্চিকে মন্ত্রগুলি দেবতা ও ছন্দ অনুসারে সাজানো। আর্চিকটি চারটি কাণ্ডে বিভক্ত—আগ্নেয়, ঐন্দ্রেয়, পাবমান এবং অরণ্য। প্রথম তিনটিতে ঋক্ বেদের প্রধান তিন দেবতা, অগ্নি, ইন্দ্র, এবং পবমান সোমের মন্ত্র সংগ্রহ, আর অরণ্যকাণ্ডে নানা দেবতার মন্ত্র। এই কাণ্ডটি আবার 'অর্ক-দ্বন্দ্ব-ব্রত' এই তিনটি পর্বে বিভক্ত। সবশেষে মহানাম্নী আর্চিক নামে ছোট একটি পরিশিষ্ট আছে।"

(বেদ-মীমাংসা, প্রথম খণ্ড, অনির্বাণ)।

অরণ্য বা আরণ্যক কাণ্ডের পর আছে ইন্দ্রের স্তুতি—এই স্তুতি মহানাম্নী আর্চিক নামে অভিহিত। সাম সংহিতার অপর খণ্ডে অর্থাৎ উত্তরার্চিক নামক খণ্ডে ১২২৫টি মন্ত্র এবং ৪০০টি সূক্ত আছে। উত্তরার্চিকের সামমন্ত্রগুলি প্রধান প্রধান যজ্ঞে গান করা বা গানের সুরে গাওয়া হয়। পূর্বার্চিকের মন্ত্রগুলি অংশত ছন্দানুযায়ী এবং অংশত অগ্নি-ইন্দ্র-সোম দেবতানুযায়ী সাজানো। কিন্তু উত্তরার্চিকে যাগ বা যজ্ঞের পারম্পর্য অনুযায়ী মন্ত্রগুলিকে সাতটি পর্বে সাজানো হয়েছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, ঋকের মতো সাম বা সুরও ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঋক্ বা মন্ত্রটির দ্রষ্টা যদি একজন ঋষি হন, তবে তাতে সাম বা সুর বসিয়েছেন অন্য আরেকজন ঋষি। এক-একটি ঋকে একাধিক সুর দেওয়া হয়েছে—এমন অনেক মন্ত্রও দৃষ্ট হয়। একটি ঋকে ২৫টি

কিংবা তারও বেশি সুর বসানো হয়েছে—এমন ঋকের সংখ্যা ১৭টি। যথা—"পুনানঃ সোমধারয়াপো বসানো অর্ষসি"

(সামবেদ সংহিতা, উত্তরার্চিক, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড সূক্ত ৯)।

অর্থাৎ হে সোম, তুমি পবিত্র; তুমি জলের বসন পরিধান করে ধারারূপে বর্ষিত হও। এই ঋক্ বা মন্ত্রটিতে সুর বসানো হয়েছে ৬১টি। এমনি করে 'গান' গ্রন্থে সর্বমোট ২৬৩৭টি সুরের স্বরলিপি পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে সাম বা সুরগুলির স্বরলিপি সাম বেদ সংহিতার যে অংশে সংকলিত হয়েছে, তাকে বলে 'গান'। আর্চিকের সহকারী সাম বেদ সংহিতার অপর বিভাগ 'গানের' চারটি সংহিতা বা গ্রন্থ আছে। এগুলি হল গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, উহ এবং উহ্যগান। এই 'গান' গ্রন্থটির আর এক নাম রহস্যগান। পূর্বার্চিকের প্রথম তিনটি কাণ্ডের (অর্থাৎ-আগ্নেয়, ঐন্দ্রেয় ও পবমান কাণ্ড) স্বরলিপি আছে গ্রামগেয় গানে। গ্রামগেয় গানকে প্রকৃতি গান, যোনি গান এবং বেদ-সামও বলা হয়। পূর্বার্চিকের অবশিষ্ট বা চতুর্থকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড ও পরিশিষ্টের স্বরলিপি আছে অরণ্যগেয় গানে। এটিও প্রকৃতি গানেরই অন্তর্গত। এতে অর্ক, দ্বন্দ্ব, ব্রত, শুক্রিয় ও মহানাম্নী এই পাঁচটি পর্ব আছে।

যে গান সর্বসমক্ষে গাওয়া যায় বা গাওয়া হতো তার নাম গ্রামগেয় গান এবং যে সকল গান গ্রামে বা সর্বসমক্ষে গাওয়া নিষিদ্ধ, শুধুমাত্র নির্জনে বা অরণ্যে গুরুর সমীপে থেকে শিক্ষা করে গাওয়া হতো, তার নাম অরণ্যগেয় গান। অরণ্যে বা নির্জনে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষালাভ করে এই গানটি গাইতে হতো—এই জন্য এই অরণ্যগেয় গানটির একটি বিশেষ গুরুত্ব বা মহত্ত্ব আছে। বৈদিক উপনিষদ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যাঁরা গ্রামবাসী, তাঁরা ইষ্টাপূর্ত (অগ্নি হোত্রাদি শ্রৌতযজ্ঞ, সত্যকথন প্রভৃতি এবং জলাশয় খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, দেবালয় নির্মাণাদি সৎকার্য) এবং দানব্রতের অনুশীলন করে পিতৃযান পথে গিয়ে আবার সংসারে ফিরে আসেন। যাঁরা অরণ্যবাসী, তাঁরা তপস্যার দ্বারা সত্যের উপাসনা করে সত্যকে জ্ঞাত হয়ে দেবযান পথে যান, আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না। এ থেকেই গ্রাম আর অরণ্যের তফাৎ এবং মহিমা বোঝা যায়। গ্রাম্যজীবন প্রাকৃত। অরণ্যজীবন অপ্রাকৃত। যজ্ঞে সামগানের যে ক্রম অনুসরণ করতে হয় সেই ক্রমের নির্দেশ পরবর্তী দুইটিতে অর্থাৎ উহ এবং উহ্য নামক গান গ্রন্থ

দুটিতে আছে। 'উহে' গ্রামগেয় গানের ক্রম এবং 'উহ্যে' অরণ্যেগেয় গানের ক্রম বা নির্দেশ আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে উত্তরার্চিকের মন্ত্রগুলি যজ্ঞবিধি অনুসারে সাতটি পর্বে সাজানো হয়েছে। যথা—দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষুদ্র। উত্তরার্চিকের স্বরলিপি আছে। উহ্যগানের আরেক নাম রহস্যগান। রহস্য বোঝায় আরণ্যককে। উহ্যগানেরও স্বরলিপি বিন্যাস করা হয়েছে যজ্ঞবিধি অনুসারে। কিন্তু তার ভিত্তি হল আরণ্যক সংহিতা এবং অরণ্যগেয় গান, যজ্ঞে যেসব গান গাইতে হয় বা হবে এটা তারই স্বরলিপি। সাম বেদই ভারতীয় সংগীত বা আর্য সংগীতের উৎস। 'সাম' শব্দে সংগীত বা গানই বোঝায়। ঋক্‌মন্ত্রে সাতটি স্বর সংযোজন করে সামগান করা হতো। সাম বেদের যুগে এই সপ্ত স্বরের নাম ছিল—ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য। বেদ ভাষ্যকার সায়নাচার্য সাম বেদের সপ্তস্বরকে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম নামে অভিহিত করেছেন। এই সপ্তস্বরকে বর্তমানে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ বা সংক্ষেপে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি বলা হয়। 'সঙ্গীত সুধাকর' রচয়িতা ঋষি শার্ঙ্গরব এবং ওই গ্রন্থের টীকাকার মল্লিনাথ এই মত সমর্থন করেন। বর্তমান যুগের অনেক সঙ্গীতবিশারদও সামগানকে মার্গসঙ্গীতের উৎস বলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। সামের পাঁচটি ভাগ আছে—এদের বলে 'ভক্তি'। ঋষি অনির্বাণের ভাষায়—"প্রথম ভাগের 'প্রস্তাব' সেটির গান প্রস্তোতা; দ্বিতীয় ভাগ 'উদ্গীথ', গান উদ্গাতা; তৃতীয় ভাগ 'প্রতিহার' গান প্রতিহর্তা; চতুর্থভাগ 'উপদ্রব' গান আবার উদ্গাতা। তারপর সবাই মিলে গান শেষভাগ 'নিধন'। গানের আরম্ভে সব ঋত্বিকরা মিলে ওঙ্কার উচ্চারণ করেন এবং হুঙ্কার ধ্বনি করেন—যাকে বলে 'হিঙ্কার', ওঙ্কার আর হিঙ্কার নিয়ে সাম সপ্তভক্তি।" (বেদ-মীমাংসা, প্রথম খণ্ড, ঋষি অনির্বান)।

সাম বেদের ব্রাহ্মণ—পূর্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য কুমারিল ভট্ট তাঁর 'তন্ত্রবার্তিক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সাম বেদের আটটি ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করেছেন। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্যও 'সামবিধান ব্রাহ্মণের' ভাষ্য-ভূমিকায় ওই আটটি ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করেছেন—(১) তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ অথবা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, (২) ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, (৩) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, (৪) জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ অথবা তলবকার ব্রাহ্মণ, (৫) সামবিধান ব্রাহ্মণ, (৬) দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ

(৭) আর্ষের ব্রাহ্মণ, (৮) বংশ ব্রাহ্মণ। এগুলির মধ্যে শেষ চারটি ব্রাহ্মণ সাম বেদের বিষয়সূচী মাত্র। অতএব সাম বেদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ সংখ্যা চারটি। যথা—তান্ড্য মহাব্রাহ্মণ, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ—চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে পঁচিশটি অধ্যায়ের নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ এবং তার পরের পাঁচটি অধ্যায়ের নাম অর্থাৎ ছাব্বিশ অধ্যায় হতে তিরিশ অধ্যায় পর্যন্ত ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ এবং শেষ দশটি অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। একে প্রৌঢ় বা মহাব্রাহ্মণও বলা হয়। এতে সোমযাগের বর্ণনা আছে এবং এই ব্রাহ্মণে অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা এবং যজ্ঞক্রিয়া দ্রষ্টা ঋষির নামও দেখা যায়। গ্রন্থটিতে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে কিভাবে ব্রাত্যদের পুনরায় আর্যত্ব প্রদান করা হতো সে-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ করত না তাদের 'ব্রাত্য' বলা হতো। 'সামবিধান ব্রাহ্মণের' মতানুসারে তাণ্ডি নামে এক আচার্য এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থটির উপর প্রবচন করতেন, সেই কারণে তাঁর নাম অনুসারে এই ব্রাহ্মণের নাম হয় তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ বা তান্ড্য মহাব্রাহ্মণ। সাম বেদের অন্য ব্রাহ্মণগুলির তুলনায় এই ব্রাহ্মণের গুরুত্বের আধিক্য থাকায় একে মহাব্রাহ্মণও বলা হয়।

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ—পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায় বা তৃতীয় প্রপাঠককে দু-ভাগে ভাগ করেছেন, ফলে তাঁর মতানুযায়ী এই ব্রাহ্মণের ছয়টি অধ্যায়। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ। কোনও কোনও বিদ্বানের মতে এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। দুঃখ, রোগ, অশুভ ইত্যাদির শান্তির উপায় এই অদ্ভুত ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞের সময়ে ঋত্বিকের বেশ বা পরিধেয় বসন কেমন হবে সে-সম্পর্কে নির্দেশও এই গ্রন্থটিতে দৃষ্ট হয়। প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় ঈশ্বর-উপাসনার কথা এই গ্রন্থটিতে প্রথমবার পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ—দুইটি প্রপাঠকে বিভক্ত এই গ্রন্থটি। প্রত্যেক প্রপাঠক আবার আট-আট খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটি ভিন্ন ভিন্ন বেদমন্ত্রের সংগ্রহ মাত্র। আবার কিছু কিছু মন্ত্র অন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকেও নেওয়া হয়েছে।

জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণটির সংকলক মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনী এবং জৈমিনীর শিষ্য তলবকার। গ্রন্থটি মুখ্যত তিনভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ভাগ আবার কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এতে সর্বমোট ১১৮২টি খণ্ড আছে। গ্রন্থটিতে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণে এমন উক্তিও পাওয়া যায়, যা জগৎ-সংসারে কোনও না কোনও ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যথা—

"মোচ্চরিতি হোবাচ কর্ণিনী বৈ ভূমিরিতি।" (জৈমিনী ব্রাহ্মণ, ১/১২৬)। অর্থাৎ ঋষি নিজ পত্নীকে বলছেন-"জোরে বা উঁচু স্বরে কথা বোল না, মাটি বা ভূমিরও কান আছে।" বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের কথা গ্রন্থটিতে দৃষ্ট হয়। সাম বেদের অন্য চার ব্রাহ্মণেরও বিবরণ সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল।

সামবিধান ব্রাহ্মণ—এই ব্রাহ্মণের তিনটি প্রপাঠক। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রপাঠকে আট-আট খণ্ড এবং তৃতীয় প্রপাঠকে নয়টি খণ্ড আছে। সর্বমোট পঁচিশটি খণ্ড এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে। গ্রন্থটিতে অভিচার-আদি কর্মের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়। বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা শত্রুবধার্থ হিংসাত্মক কার্যকে অভিচার কর্ম বলা হয়—এই কার্য ছয় প্রকার। যথা—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি। যদিও গ্রন্থটি প্রাচীন, তবু এতে প্রক্ষিপ্তের বাহুল্য আছে এরূপ বেদ-বিদ্‌গণ মনে করেন।

দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ—দৈবত ব্রাহ্মণের অপর নাম দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ। খুব ছোট গ্রন্থ। এর মধ্যে তিনটি খণ্ড আছে। প্রতিটি খণ্ড কয়েকটি কণ্ডিকায় বিভক্ত। এতে সর্বমোট ৬২টি কণ্ডিকা (অনুচ্ছেদ বা পর্ব) আছে। গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে ছন্দের বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্ষেয় ব্রাহ্মণ—সাম বেদের কৌথুম শাখাকে মান্য করে যে গ্রন্থ তার নামই আর্ষেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। এতে মুখ্যত সামগানের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণটি তিনটি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রপাঠকগুলি আবার কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এতে সর্বমোট ৮২টি খণ্ড আছে। সাম বেদের পূর্বার্চিক সম্বন্ধীয় গ্রামগেয় এবং অরণ্যগেয় গানের বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বংশ ব্রাহ্মণ—ছোট্ট গ্রন্থ। তিন খণ্ডে বিভক্ত। সামবেদীয় আচার্যগণের বংশ পরম্পরার বিবরণ এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

সাম বেদের আরণ্যক—সাম বেদের আরণ্যকের নাম তলবকার আরণ্যক। এর আর এক নাম জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ। এতে আছে চারটি অধ্যায়। প্রত্যেকটি অধ্যায়কে আবার কয়েকটি অনুবাকে ভাগ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের দশম অনুবাক থেকে সুপ্রসিদ্ধ 'কেনোপনিষদের' আরম্ভ। এই আরণ্যকে অনেক মন্ত্রের সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অনেক আচার্যের নামও গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। ব্যাস-শিষ্য জৈমিনী এবং জৈমিনীর শিষ্য তলবকার এই আরণ্যক ভাগ সংকলন করেন। অনেকের মতে সাম বেদের তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের একটি খণ্ড আরণ্যক নামে অভিহিত।

সাম বেদের উপনিষদ—সাম বেদের উপনিষদ দুটি। ছান্দোগ্য এবং কেনোপনিষদ।

ছান্দোগ্য উপনিষদ— ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদ। যাঁরা বেদ গানে পারদর্শী তাঁদের বলা হয় 'ছন্দোগ' এই ছন্দোগদের শাস্ত্রকে বলে 'ছান্দোগ্য'। উপনিষদটির শুরু ব্রহ্মবাচক 'ওঁ' দিয়ে (ওম ইত্যেদক্ষরম.....)। প্রাচীনতম এই উপনিষদটির আকার যেমন বৃহৎ তেমনি এর চিন্তা-ভাবনাও খুব উঁচু স্তরের। শুধু ব্রহ্মতত্ত্ব বা ওঁকার-রূপী অক্ষর পুরুষের কথা বলেই উপনিষদটি থেমে যায়নি, মানুষের দ্বন্দ্বময় জীবনকে কিভাবে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়, কিভাবে মানুষ তার মহান লক্ষ্যে উপনীত হবে, সে-সম্পর্কে সুন্দর পথনির্দেশও করেছে। বিবিধ কাহিনী, আখ্যান ও কথোপকথনের আঙ্গিকে এই উপনিষদটি সুসমৃদ্ধ। বেদের 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য ছান্দোগ্য উপনিষদেই প্রথম ধ্বনিত ও শ্রুত হয়। মধুবিদ্যা, সম্বর্গবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, বৈশ্বানর বিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যার সঙ্গে—ওইসকল বিদ্যার উপাসনা প্রণালীও সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে এই উপনিষদে। বিবিধ কাহিনী ও আখ্যানের মাধ্যমে গভীর তত্ত্বকে সাধারণে বোধগম্য করানোর যে অনুপম প্রয়াস এই উপনিষদের ঋষি করেছেন, তা এক কথায় অসাধারণ। পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ এই উপনিষদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন—"এই উপনিষদের ভাষা সরল, ভাব গম্ভীর, যেমন আখ্যায়িকাগুলি উত্তমরূপে সাজানো, আবার উপদেশগুলিও মধুর। সাধারণ লোকের করণীয় কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানীদের উপযোগী ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যন্ত এখানে অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।" ঋষি অরবিন্দ মন্তব্য করেছেন—"ছান্দোগ্য

হল মানব-চিন্তার একটি পরম গৌরবময় ও কৌতূহলোদ্দীপক যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।"

কেনোপনিষদ—'কেন' শব্দ দিয়ে উপনিষদটি শুরু হয়েছে। তাই এর নাম কেনোপনিষদ। 'কেন' অর্থাৎ কার দ্বারা সংকল্পান্তরে গমন করে। কার ইচ্ছায় এই গমন বা যাতায়াত? কার দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? কার নির্দেশে চন্দ্রসূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরিচালিত হচ্ছে? ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি এই উপনিষদে তারই অনুসন্ধান করেছেন। জিজ্ঞাসুর উত্তরে জানিয়েছেন, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা ও উৎস হলেন অনন্ত শক্তিমান পরমব্রহ্ম। কেন উপনিষদ সামবেদীয় জৈমিনিয়োপনিষদ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। এই উপনিষদটির আর এক নাম তলবকারোপনিষদ। তলবকার একজন সম্প্রদায় প্রবর্তক বিখ্যাত ঋষি। সম্ভবত এই উপনিষদটির তিনিই মন্ত্র দ্রষ্টা, এইজন্যেই এই উপনিষদের আর এক নাম তলবকারোপনিষদ। উপনিষদটি গুরু ও শিষ্যের সংলাপ অবলম্বনে রচিত। এর চারটি খণ্ড। ৩৫টি মন্ত্র। ১৪টি মন্ত্র নিয়ে প্রথম দুটি খণ্ড ছন্দোবদ্ধ। শেষ দুটি খণ্ড গদ্যে আখ্যায়িকা বা কাহিনীর আকারে। আমার আচার্যদেব শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের ভাষায়—"এই ইন্দ্রিয় জগৎ, এই দৃশ্য জগৎ আমাদের কাছে অতি সত্য বস্তু। দেহ-প্রাণ-মন প্রভৃতি লইয়াই আমাদের বাস্তব সত্তা। এই প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্তার সহিত অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম সত্তার সম্পর্ক কী ইহার আলোচনাও এই উপনিষদখানির আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"

(উপনিষদ রহস্য, কেনোপনিষদ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

যজুর্বেদ—সাম বেদ সংহিতার সাথে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হল। এবার যজুর্বেদ সংহিতার সাথে পরিচিত হওয়া যাক। মহর্ষি জৈমিনী তাঁর 'পূর্ব মীমাংসা' গ্রন্থে বেদের লক্ষণ বর্ণনায় বলেছেন—'শেষে যজুঃ শব্দ'—অর্থাৎ ঋক ও সাম ভিন্ন অবশিষ্ট বেদমন্ত্র যজুঃ নামে অভিহিত। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে উক্ত হয়েছে যজুঃ যজ্‌ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ দেবপূজা, সংগতিকরণ, ও দান। আবার—'যজুর্যজনাত্‌' অর্থাৎ যজ্‌ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন যজুঃ শব্দের আর এক অর্থ সংমিশ্রণ। যজুঃ দুই তত্ত্বের সংমিশ্রণ। অগ্নিতত্ত্ব এবং সামতত্ত্বের পরস্পর অনুস্যূত অবস্থাই যজুঃ। এই জন্য শুক্ল এবং কৃষ্ণভেদে এই সংহিতা দু-ভাগে বিভক্ত। যজুর্বেদের আগ্নেয় ভাগ কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সংহিতা নামে পরিচিত এবং সাম বা সৌম্য ভাগ শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা নামে পরিচিত।

'শতপথ ব্রাহ্মণে' ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—"যত চ জূশ্চে যজুঃ। যজুর্বেদের যজুঃ"—'যত্' এর অর্থ গতিশীল বায়ু এবং 'জু' এর অর্থ স্থিতিশীল আকাশ, এবং এই দুইয়ের সংমিশ্রণই যজুঃ। বায়ু এবং আকাশতত্ত্বকে প্রাণ এবং বাক্‌ও বলা হয়। বায়ুপুরাণ মতে যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় যজুঃ সংহিতার নাম হয়েছে, যথা—

"যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে, তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।
যাজনোদ্ধি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।।"

অর্থাৎ ঋক্ ও সাম ব্যতিরেকে যা যজুর্বেদে অবশিষ্ট রইলো, তার দ্বারা যজ্ঞের যোজনা হল। যাজন শব্দ অর্থাৎ যজ্ঞের যজ্ ধাতু, যা থেকে যজুঃ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এটাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ঋক্ বেদ সংহিতা এবং সাম বেদ সংহিতার মন্ত্রসকল ছন্দোবদ্ধ এবং গীতিময়। ঋক্ বেদের মন্ত্রসকল ছন্দোবদ্ধ এবং পদ্যময়, অপরদিকে সাম বেদের মন্ত্রসকল ছন্দোবদ্ধ পদ্যময় তথা গীতিময়। কিন্তু যজুর্বেদ সংহিতায় পদ্যময় এবং গদ্যময় উভয় প্রকারের মন্ত্রই দৃষ্ট হয়। বেদ-মনীষীদের মতে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব যজুর্বেদে। সাম বেদ সংহিতার ৭৫টি মন্ত্র ব্যতীত বাকী সকল মন্ত্রই ঋক্ বেদ সংহিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। কিন্তু যজুর্বেদ সংহিতায় কিছু ঋক্ সংহিতার মন্ত্র দৃষ্ট হলেও বাকী সকল মন্ত্রই যজুর্বেদের নিজস্ব। যজ্ঞে ঋক্ বেদের মন্ত্রে হয় দেবতার আহ্বান। সাম বেদের মন্ত্রে হয় দেবতার স্তুতিগান, যজুর্বেদের মন্ত্রে যজ্ঞের সকল কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ঋষি অনির্বাণের ভাষায় "যজুর্বেদকে কখনও কখনও বলা হয় কর্মবেদ বা অধ্বর্যু বেদ। যজ্ঞই কর্ম। দেবতার উদ্দেশে যে দ্রব্যত্যাগ তা-ই যজ্ঞ। যিনি ত্যাগ করেন তিনি যজমান। ত্যাগের অনুষ্ঠানটি জটিল। যাঁরা যজমানের হয়ে এই জটিল অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন, তাঁরা 'ঋত্বিক'। দেবতার আবাহন ও প্রশস্তি পাঠ, তাঁর স্তুতিগান এবং তাঁর উদ্দেশে হোমদ্রব্য আহুতিদান—এই তিনটি হল যজ্ঞের মুখ্য সাধন। ঋত্বিকদের মধ্যে যিনি প্রশস্তি পাঠ করেন তিনি 'হোতা'; তাঁর পাঠ্য মন্ত্রের সংকলন হল ঋক্ সংহিতা। যিনি স্তুতিগান করেন তিনি 'উদ্গাতা'; তাঁর গেয় মন্ত্রের সংকলন হল সাম সংহিতা। যিনি আহুতি দেন, তিনি 'অধ্বর্যু'। প্রত্যেকটি কাজ মন্ত্র স্মরণ করে করতে হয়। এই মন্ত্রের সংকলন হল যজুঃ সংহিতা। ঋক্ সংহিতার

ভাষায়, অধ্বর্যু যজ্ঞের শরীর নির্মাণ করেন। যে মন্ত্রের সহায়ে তিনি এই কাজটি করেন তাই হল যজুঃ।" (বেদ-মীমাংসা, প্রথম খণ্ড, অনির্বাণ)।

যজুর্বেদ সংহিতার দুটি ধারা বা বিভাগ—কৃষ্ণ এবং শুক্ল, অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা বা তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসেনেয় সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদ শুক্ল যজুর্বেদের পূর্ববর্তী। যজুর্বেদের কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুই বিভাগ নিয়ে বিষ্ণুপুরাণ এবং বায়ুপুরাণে একটি কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। কাহিনীটি এইরূপ—একদা যাজ্ঞবল্ক্য বিদগ্ধ শাকল্যের কাছে ঋক্ বেদ পড়তে যান এবং পড়তে গিয়ে তাঁর সঙ্গে (শাকল্যের) কোনও বিষয় নিয়ে মতান্তর হলে তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) তাঁকে (শাকল্যকে) ছেড়ে চলে আসেন। অতঃপর তিনি ব্যাসদেবের শিষ্য জৈমিনীর কাছে যান যজুর্বেদ অধ্যয়নের জন্য। বেদ-বিভাগ কর্তা মহর্ষি বেদব্যাস বা ব্যাসদেব সমগ্র বেদবিদ্যার বহুল প্রচার এবং বেদরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম তাঁর প্রধান চার শিষ্যকে, যথা—পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনী এবং সুমন্তকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ শিক্ষা দেন। এই সকল শিষ্যদের মধ্যে বৈশম্পায়ন যজুর্বেদ আয়ত্ত করেন এবং পরবর্তী সময়ে এই বেদের শিক্ষাদানে ব্রতী হন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি শাকল্যের কাছ হতে বিদায় নিয়ে বৈশম্পায়নের কাছে আসেন যজুর্বেদ শিক্ষার জন্য। বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণকে যজুর্বেদাদি শিক্ষাপ্রদান করেন। এই সময় বৈশম্পায়নের একটি ঋষি সম্মেলনে যোগদান করার কথা ছিল। কিন্তু কোনও বিশেষ কারণবশত তিনি এই সম্মেলনে যোগদান করতে অসমর্থ হন। মেরু পর্বতের শিখরে প্রাচীনকালে ঋষিদের এই সম্মেলন সম্বন্ধে নিয়ম ছিল, যদি কোনও ঋষি এই সম্মেলনে যোগ দিতে না পারেন, তাহলে সপ্তাহকাল মধ্যে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হবেন। ঋষি বৈশম্পায়ন সম্মেলনে যোগ দিতে না পারার জন্য নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন। অতএব তাঁকে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে। তাই তিনি ব্রহ্মহত্যা-পাপ প্রতিরোধ করার জন্য, শিষ্যদের মধ্যে কেউ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে সমর্থ কিনা—এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন। শিষ্যদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর প্রতিনিধিরূপে তপস্যা করে তাহলে ব্রহ্মহত্যা পাপ নিবারিত হবে। শিষ্যগণ গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে তপস্যায় মগ্ন হন। শিষ্যদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বৈশম্পায়নকে বললেন—"ভগবান! আপনার

আমি ব্যতীত বাকী সকল শিষ্যদের এরূপ বিদ্যাবত্তা বা তপঃপ্রভাব নাই, যে তার দ্বারা আপনার ব্রহ্মহত্যার পাপ নিবারণ হবে। অতএব আপনি আমাকে আদেশ করুন। আমি একাই কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনাকে আসন্ন ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে পরিত্রাণ করি। যাজ্ঞবল্ক্যের এরূপ গর্বিত তথা উদ্ধত বাক্য শ্রবণে, বৈশম্পায়ন ক্ষুব্ধ হলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ যাজ্ঞবল্ক্যকে ভর্ৎসনা করে বললেন—"তোমার মতো গর্বিত এবং সতীর্থদের অবমাননাকারী শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার আশ্রম থেকে অন্যত্র প্রস্থান করো। প্রস্থানের পূর্বে আমা প্রদত্ত সমস্ত বিদ্যা প্রত্যর্পণ করো।" গুরু-অনুগত যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আদেশে তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত সমস্ত বেদ-বিদ্যা উদ্‌গিরণ বা বমন করে নির্গত করে দিলেন। বৈশম্পায়ন অন্যান্য শিষ্যদের ওই উদ্‌গীর্ণ বা বমনকৃত বিদ্যা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। মনুষ্য শরীরে উদ্‌গীর্ণ বা বমনকৃতবস্তু গ্রহণ করা অবিধেয় ও অসম্ভব। তাই, শিষ্যগণ তিতির পাখির রূপধারণ করে যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্‌গীর্ণ বেদ-বিদ্যা গ্রহণ করলেন। অতঃপর ওইসব শিষ্যগণ কালান্তরে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ওইরূপে প্রাপ্ত বা গৃহীত বেদ-বিদ্যার প্রচার করতে লাগলেন। উদ্‌গীর্ণ বা বমন করা বস্তু অপবিত্র বা দূষিত এই জন্য যজুর্বেদের এই অংশকে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সংহিতা বলা হয় এবং তিতির পাখির রূপ ধরে ঋষির শিষ্যরা ওই বিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন বলে একে তৈত্তিরীয় শাখা বা তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলা হয়।

অন্যদিকে যাজ্ঞবল্ক্যও গুরু কর্তৃক বিতাড়িত ও বেদ-বিদ্যাহীন হয়ে মনোকষ্টে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। দিবারাত্রি তিনি ভাবতে থাকেন কী করে আমি ব্রহ্মজ্ঞানের আকর বেদ-বিদ্যা লাভ করব। বেদ-বিদ্যা ব্যতীত মানবজন্ম বৃথা, নিষ্ফল তথা পশুসদৃশ। একদিন এইরূপ বিষন্ন চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় তাঁর দৃষ্টি পড়ে গগনমণ্ডলস্থিত জ্যোতির্ময় সূর্যনারায়ণের প্রতি, এই সময় সহসা তাঁর মনোমধ্যে অনুরণিত হল—

"ঋগ্‌ভিঃ পূর্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ।
সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি দেবঃ।।"

"অর্থাৎ জ্যোতিস্বরূপ স্বত প্রকাশমান জগৎপ্রসবকারী সূর্যদেব পূর্বাহ্নে ঋক্ বেদের মন্ত্রসমূহ দ্বারা বিভূষিত হয়ে নভোমণ্ডলে উদিত হয়ে থাকেন,

মধ্যাহ্নে যজুর্বেদে অধিষ্ঠান করেন এবং সন্ধ্যাকালে সাম বেদ দ্বারা পূজিত হন। এই সবিতাদেব কখনও বেদশূন্য অবস্থায় থাকেন না, এক-এক সন্ধ্যায় (ত্রিসন্ধ্যা) এক-এক বেদযুক্ত হয়ে প্রকাশ পান।"

যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে প্রসন্ন হলেন এবং মনোস্থির করলেন, 'আমি এই সূর্যদেবের নিকটেই বেদ শিক্ষা করব।' এইরূপ সংকল্প করে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। সূর্যদেবও তাঁর আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে বাজীরূপ (সূর্যরশ্মি, অন্ন) ধারণ করে যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদ-বিদ্যায় পারদর্শী করে তুললেন। সূর্যের নিকট হতে প্রকাশিত বা প্রাপ্ত এই বেদ-বিদ্যাই শুক্ল-যজুর্বেদ বা বাজসনেয়-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হল। 'বাজ' অর্থে সূর্যরশ্মি অথবা অন্ন, 'সনি' অর্থ ধনসম্পদ। সূর্যের শুভ্র কিরণ হতে শ্রেষ্ঠ ধনসম্পদ রূপে যে বেদ প্রকাশ পেয়েছিল সেই বেদের নাম বাজসনেয়ি সংহিতা বা শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা। আবার অন্নধন যাঁর আছে তাকে বলা হয় 'বাজসনি'। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচুর অন্ন-ধন থাকায় তাঁর আর এক নাম 'বাজসনি'। সেজন্য তাঁর লব্ধ বা দৃষ্ট যজুর্বেদের নাম 'বাজসনেয়ি সংহিতা'।

অনেকে কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুঃ-সংহিতার এই কাহিনীকে নিছক কাহিনী বা গল্প বলেই মনে করেন। যাঁরা এইরূপ মনে করেন তাঁরা যজুর্বেদ-সংহিতার কৃষ্ণ ও শুক্ল এরূপ পরস্পর বিরোধী নাম করণের ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দেশ করেন। কারণগুলি হল—'বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য দুই স্থানে দুই প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যভূমিকায় তিনি বলেছেন— বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদি সকল শিষ্যদের বেদশিক্ষা দেন, তাঁর যাস্ক নামে এক শিষ্য বা ঋষি সেই বেদসমূহ তিত্তিরি নামক ঋষিকে শিক্ষা দেন, তিত্তিরি নামক ঋষি আবার উখ নামক ঋষিকে শিক্ষা দেন, উখ শিক্ষা দেন আত্রেয় ঋষিকে। এইরূপে বেদ-বিদ্যা তিত্তিরি ঋষির অধীত বলেই একে তৈত্তিরীয়-সংহিতা বলা হয়। আবার আত্রেয় ঋষি অধ্যয়ন করেছিলেন বলে একে আত্রেয়ী শাখাও বলা হয়ে থাকে। পাণিনির মতেও তিত্তিরি নামক ঋষির নাম হতেই তৈত্তিরীয়-সংহিতা নামটি এসেছে।

আবার সায়নাচার্য অন্যত্র অন্যরূপে শুক্ল ও কৃষ্ণের ব্যাখ্যা করেছেন বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে কৃষ্ণ-যর্জুবেদীয় পুরোহিত অধ্বর্যু এবং ঋক্

বেদীয় পুরোহিত হোতার কর্তব্য একত্রে কথিত হয়েছে—এজন্য অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হয় কোনটি ঋক্ বেদের পুরোহিতের করণীয় এবং কোনটি যজুর্বেদের পুরোহিতের করণীয়। এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায়—দিগ্‌ভ্রান্ত হতে হয়। এইরূপে বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত বা আছন্ন করে বলেই যজুর্বেদের এই অংশকে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ বলা হয়। অন্যদিকে শুক্ল-যজুর্বেদে অধ্বর্যুর কর্তব্যের উল্লেখ থাকায় করণীয় কী তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই বুঝতে পারার সুগমতা ও শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্যই যজুর্বেদ-সংহিতার অপর ভাগের নাম শুক্ল-যজুর্বেদ-সংহিতা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুটি ছাড়াও তৃতীয় আরও একটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এবং এই ব্যাখ্যাই বিদ্বৎসমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। এই ব্যাখ্যা মতে, ঋক্, সাম ও অথর্ব বেদের মধ্যে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণের বিভাগ সুস্পষ্ট এবং এগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনওরূপ মিশ্রণ ঘটেনি। কিন্তু যজুর্বেদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মিশ্রণ ঘটেছে এবং এই মিশ্রণের জন্যই 'কৃষ্ণ-যজুর্বেদ' নাম হয়েছে। সংস্কৃতে 'কৃষ্ণ' শব্দটির এক অর্থ মিশ্রণ। যা মিশ্রণহীন তা শুদ্ধ বা শুক্ল এবং যা মিশ্রিত তা শুদ্ধ বা শুক্ল নয়, তা কৃষ্ণ।

আবার শুক্ল-যজুর্বেদপন্থী বিদ্বৎগণ বেদের উপাকর্মে (বর্ষা শুরু হওয়ার পর বা পশ্চাৎ বেদ পাঠ শুরু করার পূর্বে যে অনুষ্ঠান করণীয়, তাকে উপাকর্ম বলে) শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমাকে গ্রহণ করতেন। অপরদিকে কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় বিদ্বৎগণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমাকে বেদের উপাকর্ম অনুষ্ঠানের তিথি বা দিন হিসাবে গ্রহণ করতেন। এইরূপে কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় বিদ্বৎগণের উপাকর্মে কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণিমাকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার নাম 'কৃষ্ণ-যজুর্বেদ' রাখা হয়েছে।

সমগ্র যজুর্বেদের মন্ত্র সংখ্যা, মন্ত্রের পদ সংখ্যা এবং পদের অক্ষর সংখ্যা, এবং এই বেদের গদ্যাত্মক বাক্য সংখ্যার বিস্তৃত বিবরণ 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'চরণব্যূহ' গ্রন্থ মতে যজুর্বেদে সর্বসমেত ১৯০০ ঋক্ বেদের মন্ত্র ও অবশিষ্ট যজুর্মন্ত্র সমাহৃত (সংগৃহীত) আছে। ওই মন্ত্রসমূহের পদের সংখ্যা ১৯২৫৭০, এবং অক্ষরের সংখ্যা ২৫৩৮৬৮। বাক্যের সংখ্যা ১৯৪৮৮, এই গণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যজুর্বেদেও কোনও মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত হয়নি। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ

সংহিতা বা তৈত্তিরীয় সংহিতা সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রপাঠকের আর এক নাম প্রশ্ন। প্রত্যেকটি প্রপাঠক বা প্রশ্ন কতিপয় অনুবাকে এবং প্রতি অনুবাক কতকগুলি মন্ত্রে বিভক্ত। এই সংহিতায় প্রথম হতেই দর্শপূর্ণমাস নামক ইষ্টির (যাগ) বিষয় বলা হয়েছে। দর্শপূর্ণমাস অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা। সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গম বা মিলনকে দর্শ বলে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যে ইষ্টি নামক যাগের অনুষ্ঠান করতে হয় তার নাম দর্শপূর্ণমাস। পূর্ণমাস বা পৌর্ণমাসীর অর্থ পূর্ণিমা। এই ইষ্টিযাগ প্রধানত তিন প্রকার মন্ত্রদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। যথা—(১) আধ্বর্যব মন্ত্র (২) যাজমান মন্ত্র এবং (৩) হৌত্রমন্ত্র। আধ্বর্যব মন্ত্র অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের পাঠ্য। যাজমান মন্ত্র যজমানের পাঠ্য এবং হৌত্রমন্ত্র হোতা নামক ঋত্বিকের হোমকালে পাঠ্য।

শুক্ল-যজুর্বেদ বা বাজসেনেয়ি সংহিতা চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় কতকগুলি অনুবাকে এবং প্রতিটি অনুবাক কতকগুলি কণ্ডিকায় (অনুচ্ছেদ বা পর্ব) বিভক্ত। সর্বসমেত এই সংহিতায় চল্লিশটি অধ্যায়, তিনশত তিনটি অনুবাক এবং এক হাজার নয়শত পনেরটি কণ্ডিকা আছে। চল্লিশটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে দর্শপূর্ণ মাস যাগের কথা এবং পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞের বিষয় বিবৃত হয়েছে। এই পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞই বর্তমানে পিতৃশ্রাদ্ধরূপে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, চাতুর্মাস্যাদি যাগের বিবরণ, গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ, সোমযাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম বা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিধান বর্ণিত আছে। এছাড়াও রাজসূয় যজ্ঞ, সৌত্রামনী-যোগ, অগ্নি চয়নের বিধি-বিধান, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও পিতৃ-মেধাদি যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ এই সংহিতায় পাওয়া যায়। বৈদিক সনাতন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে শুক্ল-যজুর্বেদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ ও জীবনযাত্রা ব্যবস্থা, জীবিকা নির্বাহের জন্য বিবিধ বৃত্তি বা পেশা, কুটিরশিল্প, আদিবাসীগণের ধর্ম, শৈবধর্মের মূল, রুদ্র-শিবতত্ত্ব প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংহিতায় পাওয়া যায়। রুদ্র-শিবধর্ম বা শৈবধর্মের উৎপত্তি ও প্রসারের ক্ষেত্রে শুক্ল-যজুর্বেদের বা যজুর্বেদ সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়টি রুদ্রাধ্যায় নামে অভিহিত। রুদ্র অর্থাৎ ভীষণ বা ভয়ংকর। ঋক্ বেদের রুদ্র সূক্তগুলিতে রুদ্রের ভীষণ সংহারমূর্তি

প্রকটিত। রুদ্রের কল্যাণ বা মঙ্গলময়রূপের সন্ধান আমরা সেখানে পাই না। কিন্তু শুক্ল-যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায় বা রুদ্রাধ্যায়ে যে রুদ্রের সন্ধান আমরা পাই তিনি কেবল ভীষণ বা ভয়ংকর নন, সংহারকও নন— তিনি একই সঙ্গে শিব, শংকর, শম্ভু। বেদের ঋষি এই রুদ্রকে যেমন রুদ্রাধ্যায়ের একটি মন্ত্রে—'নমঃ উগ্রায় চ ভীমায় চ' সম্বোধনে প্রণাম জানিয়েছেন, তেমনি ঠিক তার পরবর্তী মন্ত্রেই সমস্ত মঙ্গলবাচক বিশেষণ প্রয়োগ করে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণাম জানিয়ে বলছেন—

'নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
'নমঃ শঙ্করায় চ ময়োস্করায় চ
'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।।'

—এই মন্ত্রে ঋষি রুদ্রকে শংকর, শম্ভব, ময়োভব, শিব, শিবতর ইত্যাদি প্রতিটি শব্দের একই অর্থ—মঙ্গল, কল্যাণ ও কল্যাণজনিত সুখ। শুধু শিব নয়, শিবতরও বলেছেন—অর্থাৎ অধিকতর মঙ্গল ও কল্যাণজনক। তিনি শুধু আর্যগণের দেবতা নন, তিনি অনার্যগণেরও দেবতা। তিনি যুগপৎ উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণ, আর্য ও অনার্য, সাধু ও অসাধু সকলেরই উপাস্য ও পালক। আবার কাব্য হিসাবেও শুক্ল-যজুর্বেদ সংহিতা অতুলনীয়। রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রকে পশুপতি, শম্ভু, শিব, শঙ্কর, কৃত্তিবাস, গিরিশ, শিতিকণ্ঠ (নীলকণ্ঠ), নীলগ্রীব, কপর্দী ইত্যাদি বহুনামে ভূষিত করা হয়েছে। ঋক্ বেদের রুদ্র কেবল বজ্রের দেবতা। কিন্তু শুক্ল-যজুর্বেদের রুদ্র কেবল বজ্রের দেবতা নন, তিনি সূর্যের সাথে অভিন্ন। রুদ্র সূর্যেরই একটি রূপ। সূর্যের উদয় বা অস্তকালীন ভিন্ন ভিন্ন রূপানুযায়ী রুদ্রের এক-একটি নামপ্রাপ্তি হয়েছে। উদয় ও অস্তের সময়ে সূর্যের সহস্র-সহস্র কিরণ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বেদের ঋষি কল্পনা করছেন, সূর্যের বিম্বটি মস্তক সদৃশ এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া কিরণমালা দীর্ঘ জটাতুল্য, জটার একটি প্রতিশব্দ কপর্দ। যাঁর জটা আছে তিনি কপর্দী। এইজন্য সূর্যের সাথে একাত্ম রুদ্রের একটি নাম কপর্দী। রুদ্রের নীলকণ্ঠ নামটি অস্তগামী সূর্য হতে এসেছে। সূর্য যখন অস্তাচলে গমন করেন তখন গগনমণ্ডল রঙের উৎসবে মেতে ওঠে। স্বর্ণথালিকাবৎ সূর্যবিম্বের চারিদিকে বিচ্ছুরিত গাঢ় সিন্দুরবর্ণে পশ্চিম-গগন রক্তিমরাগে রঞ্জিত হয়। কেবল সূর্যবিম্বের মধ্যস্থলে

নীলবর্ণের রেখা দৃষ্ট হয়। মধ্যস্থল কণ্ঠসদৃশ, সেখানে নীলরঙ থাকে বলে সেই অবস্থায় সূর্যের আর এক নাম নীলকণ্ঠ বা নীলগ্রীব। সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন রুদ্রের নামও সেই জন্য নীলকণ্ঠ। রুদ্রাধ্যায়ের সপ্তম মন্ত্রে ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

'অসৌ যোহবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ।
উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নুদহার্যঃ, স দৃষ্টো মৃড়য়তি নঃ।।'

অর্থাৎ ওই যে নীলকণ্ঠ রক্তিম বর্ণ সূর্যরূপী রুদ্রদেব গগনপটে ধীরে ধীরে গমন করছেন, তাঁর অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হয়ে গোধূলিলগ্নে মাঠ হতে গোরুর পাল নিয়ে গোষ্ঠে বা গোশালায় প্রত্যাবর্তনকালে মুগ্ধ হয়ে গোপালেরা বা রাখাল বালকেরা তাঁকে দর্শন করে। গ্রামের রমণীবৃন্দা সন্ধ্যালগ্নে সরোবরে জল নিতে এসে মুগ্ধ হয়ে রুদ্রের এই অতুলনীয় রূপ দর্শন করতে থাকে। কী অপূর্ব কাব্যিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ! ঋষি-কবির কল্পনা, ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। এই অপরূপ কাব্যিক কল্পনার প্রশংসা সকল সুধী কাব্যরসিকজন শতমুখে করতে বাধ্য।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সংহিতার পঠন-পাঠন, প্রচলন দাক্ষিণাত্যে দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কৃষ্ণ-যজুর্বেদী। শুক্ল-যজুর্বেদের পঠন-পাঠন ও প্রচলন আর্য্যাবর্তেই অধিক দেখা যায়। আর্য্যাবর্ত অর্থাৎ বিন্ধ্যগিরি ও হিমালয়পর্বত এই উভয়ের মধ্যবর্তী দেশসমূহ।

যজুর্বেদের শাখা—মহাভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, যজুর্বেদের ১০১ শাখা ছিল। এর মধ্যে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ৮৬ এবং শুক্ল-যজুর্বেদের ১৫টি শাখা ছিল। বর্তমানে এইসব শাখাগুলি পাওয়া যায় না। স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, সূত্রসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থমতে যজুর্বেদের ১০৭, মুক্তকোপনিষদের মতে ১০৬ শাখা ছিল। সংখ্যার এই তারতম্য হতেই বোঝা যায় যে, শাখাগুলি বর্তমানে অবলুপ্ত। মহর্ষি শৌনক তাঁর 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে যজুর্বেদের ৮৬টি শাখার কথা বলেছেন, কিন্তু সব শাখাগুলির নাম উল্লেখ করেননি। তিনি কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ২৭টি এবং শুক্ল-যজুর্বেদের ১৬টি শাখার নাম উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ৮৬টি শাখার মধ্যে মাত্র ৪টি শাখা গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। এই চারটি শাখার নাম হল—(১) তৈত্তিরীয় শাখা (২) মৈত্রায়নীয়, (৩) কঠ, (৪) কপিষ্ঠল। মহর্ষি শৌনক কৃত 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে শুক্ল-যজুর্বেদের ১৬টি

শাখার কথা জানা যায়। এই ১৬টি শাখার মধ্যে বর্তমানে মাত্র দুটি শাখা গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। শাখা দুটির নাম—(১) মাধ্যন্দিন শাখা ও (২) কাণ্বশাখা। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য শুক্ল-যজুর্বেদের কান্বশাখার ভাষ্য-ভূমিকায় শুক্ল যজুর্বেদের ১৫টি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শৌণকের 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে শুক্লযজুর্বেদের ১৫টি শাখার নাম উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের যে চারটি শাখা বর্তমানে পাওয়া যায়, সেই শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

তৈত্তিরীয় শাখা—তিত্তিরি নামক ঋষি বা আচার্য দ্বারা প্রচারিত যজুঃ মন্ত্রসমূহকে পরবর্তী শিষ্যরা তৈত্তিরীয় শাখা নামে ঘোষণা করেন। এই শাখাই 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' নামে অভিহিত। কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রসার ও প্রচার দক্ষিণ ভারতে দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও এই শাখার অনুগামীদের অল্প সংখ্যায় দেখা যায়। তৈত্তিরীয় শাখার নিজস্ব সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, শ্রৌতসূত্র তথা গৃহ্যসূত্র আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার পাঠক্রমে সারস্বত (ব্রাহ্মণ ধারানুযায়ী) এবং আর্ষেয় (ঋষি ধারানুযায়ী) এই দুই ভেদ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে এই শাখার যে সংহিতা পাওয়া যায় তা সারস্বত পরম্পরা অনুযায়ী—যেখানে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের পূর্ণ সাংকর্য বা মিশ্রণ দেখা যায়। এই সাংকর্য বা মিশ্রণ সত্ত্বেও সারস্বত পরম্পরায় প্রাপ্ত তৈত্তিরীয় সংহিতাতে মোট ৭টি কাণ্ড, ৪৪টি প্রপাঠক, ৬৫১টি অনুবাক আছে। এখানে প্রপাঠক এবং প্রশ্ন একই বুঝতে হবে।

তৈত্তিরীয় সংহিতার আর্ষেয় পাঠক্রম অনুযায়ী, সংহিতা, ব্রাহ্মণ তথা আরণ্যক এসব আলাদা আলাদা গ্রন্থ নয়। বরং মিলিত হয়ে তৈত্তিরীয় সংহিতা বা তৈত্তিরীয় যজুর্বেদ নামে অভিহিত হয়। কাণ্ড-অনুক্রম অনুসারে এই তৈত্তিরীয় সংহিতা বা তৈত্তিরীয় যজুর্বেদ পাঁচ কাণ্ডে বিভক্ত। যথা—(১) প্রাজাপত্য কাণ্ড, (২) সৌম্য কাণ্ড, (৩) আগ্নেয় কাণ্ড, (৪) বৈশ্বদেব কাণ্ড, (৫) স্বায়ম্ভুব কাণ্ড।

মৈত্রায়নীয় শাখা—'মিত্রয়ু' নামক আচার্যের নাম অনুসারে এই শাখার নাম মৈত্রায়নীয় শাখা। এই শাখার সংহিতার নাম 'মৈত্রায়নী সংহিতা'।

মৈত্রায়নীয় সংহিতা গদ্য-পদ্যাত্মক। এই সংহিতাতেও মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সংহিতাটি ৪ কাণ্ডে বিভক্ত। যথা—আদিম (প্রথম), মধ্যম (দ্বিতীয়), উপরি (তৃতীয়), খিল (চতুর্থ)। প্রথম কাণ্ডে ১১টি প্রপাঠক, দ্বিতীয়ে ১৩টি প্রপাঠক, তৃতীয় কাণ্ডে ১৬ এবং চতুর্থ কাণ্ডে ১৪টি প্রপাঠক আছে। এইভাবে মোট প্রপাঠক সংখ্যা ৫৪। প্রত্যেক প্রপাঠক অনুবাক ও কণ্ডিকায় বিভক্ত। এইরূপে সমগ্র সংহিতায় ৫৪টি প্রপাঠক, ৬৫৪ অনুবাক এবং ৩১৪৪টি কণ্ডিকা আছে। বিভিন্ন যাগের (বৈদিক) বিবরণ ও গো-মহিমার কথা এই সংহিতায় পাওয়া যায়।

কঠশাখা—কঠ নামক আচার্য এই শাখার উপর প্রবচন করতেন—সেই কারণে এই শাখার সংহিতার নাম 'কাঠক সংহিতা' বা কঠশাখা। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ২৭ মুখ্য শাখার মধ্যে 'কাঠক সংহিতা' বা কঠশাখা অন্যতম। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে-"গ্রামে গ্রামে কাঠকং কালাপকং চ প্রোচ্যতে" (মহাভাষ্য)। অর্থাৎ কঠশাখার প্রচার গ্রামে গ্রামে ছিল। এই সংহিতা—ইঠিমিকা, মধ্যমিকা, ওরিমিকা, যাজ্যানুবাক্যা এবং অশ্বমেধাদ্য অনুবচন ইত্যাদি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। এইসব খণ্ডের অংশের নাম 'স্থানক'; এইরূপে মোট স্থানকের সংখ্যা ৪০, অনুবচন বা অনুবাচনের সংখ্যা ১৩ (যজ্ঞে মন্ত্রের বিধি অনুসারে পাঠ-কে অনুবাচক বলা হয়), অনুবাকের সংখ্যা ৮৪৩, মন্ত্র সংখ্যা ৩০৯১, এবং মন্ত্র ব্রাহ্মণের সম্মিলিত সংখ্যা ১৮ হাজার।

কপিষ্ঠল শাখা—কপিষ্ঠল ঋষির দ্বারা কথিত যজুঃ মন্ত্রের নাম কপিষ্ঠল। পাণিনি মতে 'কপিষ্ঠল' শব্দ গোত্রবাচী। সম্ভবত কপিষ্ঠল ঋষিই এই গোত্রের প্রবর্তক ছিলেন। কপিষ্ঠল সংহিতা বর্তমানে পাওয়া যায় না। সেই কারণে এই সংহিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। বেদ-মনীষী আচার্য বলদেব উপাধ্যায়-এর 'বৈদিক সাহিত্য ওঁর সংস্কৃতি' গ্রন্থ মতে—এই সংহিতার একটি অসম্পূর্ণ Copy (নকল) বারাণসীর সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী ভবন পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত আছে। শ্রীউপাধ্যায়ের মতে 'কাঠক সংহিতার' সঙ্গে এই সংহিতার অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। ঋক্ বেদের ন্যায় এই সংহিতা অষ্টক এবং অধ্যায়ে বিভক্ত। শুক্ল যজুর্বেদের যে দুটি শাখা বর্তমানে পাওয়া যায় তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

(১) মাধ্যন্দিন শাখা—যাজ্ঞবল্ক্যের ১৫/১৬ জন শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম মাধ্যন্দিন ছিল। তিনি যেসব যজুঃ মন্ত্রের উপর প্রবচন দিতেন, পরবর্তীকালে তা মাধ্যন্দিন শাখা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই নামকরণের দ্বিতীয় কারণ—যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের 'বাজী' অর্থাৎ কিরণ বা আলোয় দিনের মধ্যকাল সময়ে যজুঃমন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন—সেই কারণে এই শাখাকে মাধ্যন্দিন শাখা বলা হয়। আবার কোনও কোনও বেদ-মনীষীর মতে এই শাখা বিহিত শ্রৌতকর্ম দিনের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত হয় বলেই এই শাখার নাম মাধ্যন্দিন হয়েছে। এই শাখার সংহিতা 'বাজসেনেয়ি মাধ্যন্দিন সংহিতা' নামে প্রসিদ্ধ। এতে ৪০টি অধ্যায় আছে। ৪০টি অধ্যায়ে ৩০৩টি অনুবাক এবং ১৯৭৫ টি কণ্ডিকা আছে। সংহিতাটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শ্রৌতকর্মকাণ্ড। ৩৯টি অধ্যায় জুড়ে নানা যজ্ঞের বিবরণ দৃষ্ট হয়। শেষ বা ৪০-তম অধ্যায়ে ঈশাবাস্যোপনিষদ উপদিষ্ট হয়েছে।

(২) কান্ব শাখা—এই শাখার প্রবচনকর্তা আচার্য কান্ব। এই কারণে শাখাটির নাম কান্বশাখা। এই শাখার সংহিতার নাম কান্ব সংহিতা। 'মাধ্যন্দিন সংহিতার' ন্যায় এই সংহিতায় ৪০টি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে কতকগুলি অনুবাক, প্রত্যেক অনুবাকে কতিপয় মন্ত্র আছে। মোট অনুবাকের সংখ্যা ৩২৮ এবং মন্ত্রের সংখ্যা ২০৮৬। অধ্যায়গত প্রত্যেক অনুবাকের মন্ত্রসংখ্যা অনুবাকের সাথে শুরু হয় এবং অনুবাকের সাথেই সমাপ্ত হয়। মাধ্যন্দিন সংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়ই 'কান্বসংহিতার' প্রতিপাদ্য বিষয়।

শুক্ল-যজুর্বেদীয় বা বাজসনেয়ী সংহিতার ব্রাহ্মণ—সমস্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক মহত্বপূর্ণ শুক্ল-যজুর্বেদের 'শতপথ ব্রাহ্মণ', 'শুক্ল-যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতার' এই একটিই ব্রাহ্মণ সমস্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থরাজির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে স্বমহিমায় বিরাজমান। গুরুত্বেও যেমন গভীর, তেমনি আয়তনেও গ্রন্থটি বিশাল। এতে একশত অধ্যায় আছে। এই কারণে গ্রন্থটির নাম 'শতপথ ব্রাহ্মণ'। এই ব্রাহ্মণ শুক্ল-যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন তথা কান্ব এই দুই শাখাতেই দৃষ্ট হয়। যথা—'মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ' এবং 'কান্ব শতপথ ব্রাহ্মণ' উভয়গ্রন্থের বিষয় এক হলেও বর্ণনাক্রম তথা অধ্যায়ের সংখ্যায় কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪ কাণ্ড, ১০০ অধ্যায়, ৪৩৮টি ব্রাহ্মণ (বেদের সেই ভাগ বা অংশ যেখানে বিবিধ যজ্ঞ-বিষয়ক মন্ত্রের বিনিয়োগ তথা বিধি সমূহের প্রতিপাদন করা হয়েছে, বেদের মন্ত্রভাগ হতে এটা একেবারেই পৃথক) এবং ৭৬২৪টি কণ্ডিকা আছে। অন্যদিকে কান্ব শাখার 'কান্বশতপথ ব্রাহ্মণে' ১৭টি কাণ্ড, ১০৪ অধ্যায়, ৪৩৫ ব্রাহ্মণ এবং ৬৮০৬টি কণ্ডিকা আছে। 'মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণে' ৬৮টি প্রপাঠক আছে। কিন্তু 'কান্ব শতপথ ব্রাহ্মণে' কোনও প্রপাঠক নেই। শতপথ ব্রাহ্মণে বিবিধ শ্রৌত যজ্ঞের তথা বৈদিক অনুষ্ঠানের যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তা অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলিতে দৃষ্ট হয় না। যিনি ঋক্ বেদ অধ্যয়ন করেন তাঁর কাছে অন্য বেদ অধ্যয়ন যেরূপ সরল হয়ে যায়, সেরূপ যিনি শতপথ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন, তাঁকে বৈদিক যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মনে করা হয়। এই ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ হতে দশম এই পাঁচটি কাণ্ডে আমরা পাই—অগ্নিরহস্য, বিচিত্র বিশাল যজ্ঞবেদী নির্মাণ এবং সেই বেদীর অধ্যাত্মিক ও রূপক ব্যাখ্যা। এই অগ্নিবিদ্যা বা অগ্নিরহস্য ঋষি শাণ্ডিল্য কর্তৃক প্রকাশিত সেইজন্য একে শাণ্ডিল্যবিদ্যাও বলা হয়। 'শতপথ ব্রাহ্মণের' মুখ্য প্রবক্তা ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং। কিন্তু অগ্নিরহস্য নামক পাঁচটি কাণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের নাম দৃষ্ট হয় না। সেখানে শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায়। বেদ-মনীষীদের মতে শতপথ ব্রাহ্মণ, বেদার্থ বা বেদ-জ্ঞানের রহস্যময় কুঞ্জী বা চাবিকাঠি। বৈদিক বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান, বৈদিক ঐতিহ্যের প্রামাণিক কথনে, 'শতপথ ব্রাহ্মণ' সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থের শিরোমণি।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতার ব্রাহ্মণ— কৃষ্ণ-যজুর্বেদ শাখার মহত্বশালী একমাত্র ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বর্তমানে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ তিনটি কাণ্ড বা তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগ বা কাণ্ডকে তিন অষ্টকও বলা হয়। প্রথম দুই কাণ্ডে আট-আট অধ্যায় অথবা ১৬টি প্রপাঠক আছে। তৃতীয় কাণ্ডে বারো অধ্যায় বা ১২টি প্রপাঠক আছে। সর্বমোট ২৮টি প্রপাঠক এতে আছে। বেদাচার্য ভট্টভাস্কর প্রপাঠকগুলিকে 'প্রশ্ন' বলে অভিহিত করেছেন। এই ব্রাহ্মণে মোট ৩৫৩টি অনুবাক আছে।

সংক্ষেপে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, অগ্ন্যাধান, গবাময়ন, বাজপেয়, রাজসূয়, অগ্নিহোত্র, সৌত্রামনী ইত্যাদি যাগের বিবরণ। এছাড়াও উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে ভরদ্বাজ, নচিকেতা, প্রহ্লাদ এবং অগস্ত্য বিষয়ক আখ্যায়িকা বা

আখ্যান, সত্যভাষণ, বাণীর মধুরতা, তপোময় জীবন, অতিথি সৎকার, ব্রহ্মাচর্য পালন এবং সৃষ্টি বিষয়ক বর্ণনা।

শুক্ল-যজুর্বেদের আরণ্যক—'শতপত ব্রাহ্মণের' চতুর্দশ কাণ্ডটির নাম বৃহদারণ্যক। এই বৃহদারণ্যকই শুক্ল-যজুর্বেদের একমাত্র আরণ্যক। অধিকাংশ আরণ্যকই ব্রাহ্মণগ্রন্থের অন্তিম ভাগ নিয়ে রচিত। প্রায়ই দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রবচন কর্তাই আরণ্যকগ্রন্থের প্রবচনকর্তা। এই কারণে শুক্ল-যজুর্বেদের বা শুক্ল-যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকের প্রবচনকর্তা তথা আচার্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। শুক্ল-যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন এবং কান্ব এই দুই শাখারই সুপ্রসিদ্ধ আরণ্যক বৃহদারণ্যক। দুই আরণ্যকেরই অধ্যায় সংখ্যা ছয়। বিষয়গত দৃষ্টিতে আরণ্যক এবং উপনিষদের মধ্যে সমতা বা মিল থাকা সত্ত্বেও বৃহদারণ্যকাদি আরণ্যক গ্রন্থকেও উপনিষদরূপে মানা হয়। কিন্তু বিষয়গত বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও দেখা যায়। আরণ্যকের মুখ্য বিষয় প্রাণ-বিদ্যা ও প্রতীক উপাসনা। অন্যদিকে উপনিষদের মুখ্যবর্ণনীয় বিষয় হচ্ছে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ তথা তার প্রাপ্তির বিবেচন (বিশেষরূপে আলোচনা, বিচার-বিতর্ক)। আরণ্যকের মুখ্যবিষয় যজ্ঞ নয়, বরং যজ্ঞের ভিতর বিদ্যমান আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মীমাংসাকরণ।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের আরণ্যক—কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার আরণ্যকের নাম—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। এতে ১০টি প্রপাঠক এবং ১৭০টি অনুবাক আছে। প্রথম প্রপাঠকে 'আরুণক কেতু' নামক অগ্নির উপাসনা এবং এই উপাসনার জন্য ইষ্টিকা চয়নের (যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য ইট সংগ্রহ) বিধি-বিধানের বিবরণ আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকে ব্রহ্ম স্বাধ্যায় এবং পঞ্চ-মহাযজ্ঞের বর্ণনা আছে। তৃতীয় প্রপাঠকে চাতুর্হোত্র (চার হোতা বা চার ঋক্‌বেদীয় ঋত্বিক দ্বারা সম্পন্ন যজ্ঞবিশেষ), চিতি (যজ্ঞবেদী), এবং চতুর্থ প্রপাঠকে প্রবর্গ্য যজ্ঞের (সোমযাগের পূর্বে করণীয় অনুষ্ঠান) মন্ত্রের সংকলন করা আছে। পঞ্চম, ও ষষ্ঠ প্রপাঠকে অনেক যাজ্ঞিক বর্ণনার সাথে সাথে পিতৃমেধ যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। শিক্ষা, ব্রহ্ম, বিদ্যা, ভৃগু (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) নামক এই আরণ্যকের সপ্তম হতে নবম প্রপাঠক—তৈত্তিরীয় উপনিষদ নামে অভিহিত। অন্তিম দশম প্রপাঠক 'মহানারায়ণ' উপনিষদ নামে বিখ্যাত। এই আরণ্যকে ব্যাস ও

বৈশাম্পায়নের নামের উল্লেখ আছে এবং অনেক বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যাও এই আরণ্যকে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই আরণ্যক অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। কেন না এই আরণ্যকেই কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, খাণ্ডব, কাশী, অহিল্যা, শুনঃশেপ, পারাশর্য, ব্যাস আদির উল্লেখ পাওয়া যায়। সায়নাচার্য ও ভট্টভাস্কর উভয়েই এই আরণ্যকের ভাষ্য রচনা করেন।

মৈত্রায়নী আরণ্যক—কৃষ্ণ-যজুর্বেদের মৈত্রায়নী শাখার আরণ্যক বর্তমানে স্বতন্ত্ররূপে পাওয়া যায় না। আজকাল মৈত্রেয়োপনিষদ অথবা মৈত্র্যুপনিষদ নামে যে উপনিষদ পাওয়া যায় তা-ই মৈত্রায়নী আরণ্যক নামে অভিহিত। বস্তুত এই গ্রন্থটিতে উপনিষদ ও আরণ্যকের একত্র সমাবেশ হয়েছে। এর সাতটি প্রপাঠক—সর্বমোট ৭৩টি খণ্ডে বিভক্ত। এতে হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ, অশ্বপতি কুবলয়াশ্চ, যৌবনাশ্ব, শর্যাতি, যযাতি, অক্ষসেন, মরুত্ত, ভরত, সুদ্যুম্ন প্রভৃতির উল্লেখ আছে যা ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচ্য বলে মনে হয়।

শুক্ল-যজুর্বেদের ২টি উপনিষদ। বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ—এই উপনিষদ 'শতপথ ব্রাহ্মণের' অন্তর্গত। 'শতপথ ব্রাহ্মণের' মতোই উপনিষদটি আয়তনে এবং গুরুত্বে বৃহৎ। অনেকের মতে বিষয়-গাম্ভীর্যে তথা সিদ্ধান্ত বিবেচনায়—এই উপনিষদটি সকল উপনিষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সম্পূর্ণ উপনিষদের মধ্যে ছয়টি অধ্যায় এবং প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি ব্রাহ্মণের সমষ্টি। গ্রন্থটিতে ৪৭টি ব্রাহ্মণ আছে। এই উপনিষদেও আরণ্যক এবং উপনিষদের সমাবেশ ঘটেছে। উপনিষদটির প্রধান প্রবক্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি শুক্ল-যজুর্বেদেরও প্রবক্তা।

প্রথম অধ্যায়ে—ঋষিপ্রবর ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে অন্যান্য ঋষিদের রাজা জনকের সভায় ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক বিচার-বিতর্ক এবং বিশেষ করে বৈদিক ভারতের ব্রহ্মবাদিনী পরমবিদুষী গার্গীর সঙ্গে বিচার বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি বিশেষ গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। এই উপনিষদেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর বৈরাগ্যময়ী ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসিনী পত্নী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন এবং ঋষি কর্তৃক মৈত্রেয়ীকে পরমজ্ঞান দানের কথা সুন্দরভাবে বিবৃত আছে।

ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত দিব্যবাণী—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"—অর্থাৎ যা আমাকে অমৃত প্রদান করবে না, তা নিয়ে আমি কী করব? মৈত্রেয়ীর এই উক্তিতে সনাতন ভারতাত্মার চিরন্তনী মর্মবাণী ঘোষিত হয়েছে। কান্ব এবং মাধ্যন্দিন দুটি শাখাতেই উপনিষদটি পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ের শুরু অশ্বমেধ যজ্ঞের আধ্যাত্মিক রূপের বর্ণনা দিয়ে, এরপর সৃষ্টি-রহস্যের বিশেষ আলোচনা-বিচার-বিতর্ক অন্তে প্রাণতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতার নিরূপণ বা নির্ণয়করণ।

"তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়" (অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে চলো) ইত্যাদি প্রেরণা প্রদানকারী দিব্য সন্দেশ এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়েই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—বালাকি গার্গ্য এবং কাশী নরেশ অজাতশত্রুর সংবাদের মাধ্যমে ব্রহ্মের ব্যাপকতা বা অনন্ততা প্রতিপাদন করা হয়েছে। সৃষ্টির প্রতি কণায় কণায় ওতপ্রোত রয়েছেন যে ব্রহ্ম, তাঁর উপাসনা করার উপদেশও দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়েই যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই পত্নী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে পার্থিব সম্পদ দান করে যখন সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন তখন মৈত্রেয়ী পূর্বকথিত দিব্যবাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন। (যেনাহং নামৃতা স্যাং....)।

তৃতীয় অধ্যায়ে— জনক কর্তৃক আয়োজিত বিদ্বৎসভায় যেজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ, তিনি সুবর্ণশৃঙ্গ মণ্ডিত সহস্র ধেনু প্রাপ্ত হবেন—এরূপ ঘোষণা করলে, সভার উপস্থিত ঋষিদের মধ্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্যদের গো বা ধেনুসমূহকে তাঁর নিজ আশ্রম অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন। ফলে শুরু হয় সভায় উপস্থিত বিদ্বৎঋষিদের মধ্যে শাস্ত্রার্থ নিয়ে বিচার-বিতর্ক। এই বিতর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বিজয়ী হন এবং নিজেকে ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠহিসাবে সিদ্ধ বা প্রমাণিত করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে—মহর্ষি জনক যিনি বিতর্ক সভার রসগ্রহণ করছিলেন, তিনি বিতর্ক সভার শেষে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট আত্ম বা অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

পঞ্চম অধ্যায়ে—বিবিধ দার্শনিক বিষয়ের উপর বিচার বিশ্লেষণ-এর বিবরণ পাওয়া যায় এবং বেদ ও গায়ত্রীমন্ত্রের মহিমার বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়।

ষষ্ঠ বা সর্বশেষ অধ্যায়ে—জাবালি এবং শ্বেতকেতুর সংবাদ মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তসমূহের সাথে সাথে অনেক তান্ত্রিকবিদ্যার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাছাড়াও সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের যুগপৎ আলোচনা, এবং ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের শ্রৌত-স্মার্ত চিহ্নাদির পরিহার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাও এই উপনিষদে দেখা যায়।

শুক্ল-যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদ—'ঈশ' বা 'ঈশা' শব্দ দিয়ে উপনিষদটি শুরু হয়েছে, তাই এর নাম ঈশা উপনিষদ বা ঈশোপনিষদ। আবার 'ঈশাবাস্যম' এই উপনিষদের প্রথম দুটি শব্দ বলে একে ঈশাবাস্যোপনিষদও বলা হয়। সংহিতা বা মন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত বলে এই উপনিষদকে মন্ত্রোপনিষদও বলা হয়। শুক্ল-যজুর্বেদের অন্তিম অধ্যায় অর্থাৎ চল্লিশতম অধ্যায়ের নামই ঈশোপনিষদ। এই উপনিষদে জ্ঞান এবং কর্মের সমন্বয় সাধন করে সারা জীবন কর্মরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত জ্ঞান বিনা কর্ম অসম্পূর্ণ। আবার কর্ম বিনা জ্ঞানও পঙ্গু। ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্লেষণের সাথে সাথে এই উপনিষদের মধ্যে বিদ্যা-অবিদ্যা, সম্ভূতি-অসম্ভূতি (সম্ভূতি অর্থাৎ সৃষ্টিতে আসক্ত ব্যক্তি, অসম্ভূতি অর্থাৎ নির্বাণ বা মুক্তির প্রতি আসক্ত ব্যক্তি) ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা দেখা যায়। এই উপনিষদে সূত্রাকারে বর্ণিত নিষ্কাম কর্মযোগেরই বিস্তৃত বর্ণনা 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায়' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছেন এবং এই কারণেই উপনিষদটির মহত্ব বা গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় উপনিষদ—কৃষ্ণ-যজুর্বেদের উপনিষদ হল পাঁচটি—মহানারায়ণ, মৈত্রায়ন, তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর।

মহানারায়ণ উপনিষদ—কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার, আরণ্যকের অন্তিম বা দশম প্রপাঠক 'মহানারায়ণ' উপনিষদ নামে অভিহিত। এই উপনিষদটিকে বৈষ্ণব উপনিষদ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করা হয়। এই উপনিষদ নারায়ণ ও রুদ্রকে ব্রহ্মের প্রথম প্রতিমূর্তি হিসাবে বর্ণনা করেছে। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় উপনিষদটি পাওয়া যায়।

মৈত্রায়ন উপনিষদ—কৃষ্ণ-যজুর্বেদের মৈত্রায়নী শাখার অন্তর্গত এই উপনিষদ। মৈত্রায়নী শাখার অন্তর্গত বলে, এই উপনিষদের নাম মৈত্রায়ন উপনিষদ বা মৈত্রায়নী উপনিষদ। উপনিষদটি গদ্যে রচিত হলেও, মাঝে মাঝে পদ্য বা পদ্যছন্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। এতে ঈশ, কঠ, কেন ও মুণ্ডক উপনিষদাদির অনেক মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এছাড়াও এতে সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তের সাথে সাথে ষড়ঙ্গ যোগ, বিশেষ করে হঠযোগ আদির বিশেষ আলোচনা বা বিবরণ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ভাষায় এই উপনিষদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে এবং এগুলিতে প্রপাঠকের সংখ্যার তারতম্য আছে। কোথাও বলা হয়েছে এই উপনিষদের সাতটি প্রপাঠক, আবার কোথাও চার-পাঁচ প্রপাঠকের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ—কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত এই উপনিষদটি সবদিক থেকেই একটি মূল্যবান উপনিষদ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের কিছু অংশ (সপ্তম থেকে নবম প্রপাঠক পর্যন্ত) তৈত্তিরীয় উপনিষদ নামে অভিহিত। তিনটি বল্লী বা অধ্যায়ে গ্রন্থখানি বিভক্ত এবং প্রতিটি অধ্যায়ই বিশেষভাবে পঠনীয় বা লক্ষণীয়। প্রকৃত জ্ঞান যা মানুষের সংকীর্ণতা, অজ্ঞানতা এবং আত্মপর বিভেদ দূর করে দিতে পারে, সেই জ্ঞান লাভ করতে হলে শিক্ষাটি কেমন হবে, আচার্য কিভাবে সেই শিক্ষা দেবেন, শিষ্য বা ছাত্র কিভাবে তা গ্রহণ করবে, এই উপনিষদের প্রথম বল্লী বা প্রথম অধ্যায়ে তারই আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার নিরূপণ, ব্রহ্ম কী বস্তু এই ব্রহ্ম মানুষ কিভাবে পেতে পারে তারই নেতি নেতি বিচারের বিবরণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম ভৃগুবল্লী, অধ্যায়টি দশটি অনুবাক বা অনুচ্ছেদে বিভক্ত। এর মধ্যে ছয়টি অনুচ্ছেদে—বরুণ-ভৃগু সংবাদ। পরের অনুচ্ছেদগুলো অন্নের প্রশস্তি অর্থাৎ অন্নের যেন অমর্যাদা না করা হয়। এই উপনিষদের কয়েকটি প্রবচন অত্যন্ত মূল্যবান। যথা—'মাতৃদেবোভব। পিতৃদেবোভব। আচার্য দেবোভব। অতিথিদেবো ভব'—অর্থাৎ মা, বাবা, আচার্য, অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করবে। 'রসো বৈ সঃ'—অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খাল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং

প্রযন্ত্যভি সংবিশান্তি'। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর জন্ম আনন্দ থেকে। আনন্দের মধ্যেই জীবের জীবন, আবার আনন্দেই তার প্রতিগমন— ইত্যাদি।

কঠ উপনিষদ—কৃষ্ণ-যজুর্বেদে কঠ বা কাঠক নামে এক ব্রাহ্মণ (বেদাঙ্গ) আছে, এই উপনিষদটি তার অন্তর্গত বলেই এর নাম কঠোপনিষদ বা কঠ উপনিষদ। উপনিষদটির দুটি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায়ের তিনটি করে বল্লী বা ভাগ অর্থাৎ দুটি অধ্যায়কে আবার ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বৈদিক দার্শনিকদের এই উপনিষদটি অত্যন্ত প্রিয়। প্রথম অধ্যায়ের তিনটি বল্লী বা ভাগে ৭১টি মন্ত্র এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৬টি মন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত আখ্যায়িকার তত্ত্বকথা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে এই উপনিষদে। যম ও ঋষিপুত্র নচিকেতার কথোপকথনের মাধ্যমে অদ্বৈত তত্ত্বের অপূর্ব চিত্রণশৈলীর বিবরণে উপনিষদটি, সকল উপনিষদের মধ্যে কৌস্তুভমণি সদৃশ। এই উপনিষদের আচার্য যম ঋষিপুত্র নচিকেতাকে আত্মবিদ্যার পরিবর্তে স্বর্গীয় সুখ, ত্রৈলোক্যসুন্দরী দীর্ঘযৌবনা নারী, অতুল ধন-সম্পত্তি ও দীর্ঘ আয়ু দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঋষিপুত্র নচিকেতা তা প্রত্যাখ্যান করে যমরাজের নিকট যেভাবে আত্মবিদ্যালাভ করেন—তা বেদ-উপনিষদের জ্ঞানানুরাগী সকল পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। প্রকৃত সুখ বা আনন্দ ভোগে নয়—ত্যাগে। বেদের এই মর্মবাণী ঋষিপুত্র নচিকেতার জীবনে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে দেখে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—শ্বেতাশ্বতর নামে জনৈক ঋষি ছিলেন। তিনি ছিলেন তপোসিদ্ধ, মহাজ্ঞানী ও ব্রহ্মজ্ঞ। একদা সনৎকুমার প্রমুখ কয়েকজন আশ্রমিক ব্রহ্মচারী তাঁর কাছে সম্যক জ্ঞান আহরণের জন্য গিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসু সেইসব আশ্রমিক ব্রহ্মচারীদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য তিনি তাঁর উপলব্ধ তত্ত্ব এবং তথ্যকে তাঁদের কাছে অতি সহজ-সরলভাবে পরিবেশন করেছিলেন। জ্ঞান-পরিবেশক ঋষির নাম অনুসারেই উপনিষদটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ নামে পরিচিত।

শ্বেতাশ্বতর কথাটি ভাঙলে দাঁড়ায়—শ্বেত-অশ্বতর অর্থাৎ বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়। তিনি (ঋষি) ইন্দ্রিয় সংযমে, পবিত্রতায় ছিলেন অনন্যসাধারণ।

এই উপনিষদে আছে ছয়টি অধ্যায় এবং মোট মন্ত্রসংখ্যা ১১৩। ছয়টি অধ্যায়ে ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মার প্রাপ্তির উপায়ের কথা বলা হয়েছে। দেবভক্তি ও গুরুভক্তির মহিমাও এতে বর্ণিত আছে। ভক্তিতত্ত্বের উপপাদন (যুক্তিদ্বারা সংস্থাপন বা মীমাংসা) এই উপনিষদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উপনিষদটিতে শিব পরতত্ত্বরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

অথর্ব বেদ পরিচয়—অথর্ব বেদের মন্ত্রসাধন, উপাসনা এবং তন্ত্রসাধনা দ্বারা অধ্যাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। অথর্ব বেদের সাধনায় সঠিক নিজেকে 'স্থিতপ্রজ্ঞের' পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হয়। 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নিষ্কামভাবে ভাবিত, সদা সন্তোষচিত্ত ব্যক্তিকে বলা হয়। অথর্ব বেদ বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার অথবা বিশ্বকোষ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অথর্ব বেদের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে নিরুক্তিকার যাস্ক বলেছেন—'ন থর্বতি অর্থবা, অর্থাৎ যে তত্ত্ব থর্বন (স্বত কম্পন) রহিত তাই অথর্ব।

'অথর্ব বেদ' কথাটি দুটি শব্দের মিলনে গঠিত। যথা—অথর্বন্ + বেদ = অথর্ব বেদ। 'অথর্ব' শব্দের অন্তর্গত 'থর্ব' ধাতুর অর্থ গমন বা গতি। ধাতুটির পূর্বে 'অ' উপসর্গ থাকার ফলে অর্থ হয় স্থির বা নিশ্চল। আবার 'থর্ব' ধাতুর আর এক অর্থ কম্পন। অর্থাৎ যে-বেদে স্থির, অচঞ্চল কম্পনরহিত জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা-ই অথর্ব বেদ। এই স্থির বা অচঞ্চল জ্ঞান হল সর্বব্যাপক পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের জ্ঞান। অথর্ব বেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ (বেদাঙ্গ) 'গোপথ' ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—'যত্ অর্বাঙ্ অবশিষ্যতে তত্ অথর্বা' অর্থাৎ তিন বেদ মন্থন করে যে সারাংশ অবশিষ্ট রইল তাই অথর্ব বেদ। 'তৈত্তিরীয় সংহিতার' প্রবচনকর্তা মহর্ষি তিত্তির বলেছেন—

"ঋগ্‌ভ্যো জাতান্ সর্বশো মূর্তিমাহুঃ সর্বা
গতির্যাজুষী হৈ ব শশ্বত্।
সর্বং তেজঃ সামরূপ্যং হ শশ্বত্ সর্বং
হেতত্ ব্রহ্মণৈব প্রসৃষ্টম্।।

"অর্থাৎ বস্তুগত পিণ্ড (শরীর বা মূর্তি) ঋগ্‌বেদ হতে উৎপন্ন হয়। প্রতিটি বস্তুমাত্রে বিদ্যমান সর্বপ্রকারের গতি-সামর্থ তা যজুর্বেদ থেকে উৎপন্ন হয়। বস্তুমাত্রে বিদ্যমান সব প্রকারের প্রকার (বিভেদ বা সাদৃশ্য) হচ্ছে সামরূপ"।

শুক্ল-যজুর্বেদেও বলা হয়েছে—'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ' (৩৩/৯২), অর্থাৎ জ্যোতি হতে অন্ধকার নাশ হয়। বেদ-মনীষীদের মতে অথর্ব বেদ, জ্যোতির্বেদ, বিবেক বেদ এবং বিজ্ঞান বেদও। অথর্বের জ্যোতি মানবমাত্রকে অ-থর্ব (অকম্প), স্থিরমতি এবং স্থিতপ্রজ্ঞ করে। অথর্ব বেদোক্ত সাধনায় স্থির বা নিশ্চল জ্যোতি এবং ধ্রুব বিবেক লাভ হয়। শুক্ল-যজুর্বেদের ছত্রিশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে—"ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোতং প্রপদ্যে। বা গোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপ্রানৌ।।"

উল্লিখিত মন্ত্রে চতুর্বেদী (চার বেদজ্ঞ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। যথা—

প্রথমত, আমি বাণীর সাধনা দ্বারা ঋক্ বেদের ফল লাভ করি। বাণীর সাধনায় আমি ঋক্‌বেদী হই। ঋক্ ঋক্ বেদের মন্ত্রকে বলে। ঋকের অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ। ঋক্ বেদের মধ্যে সমস্ত পদার্থের জ্ঞান বিদ্যমান আছে। এই জন্যেই ঋক্ বেদকে জ্ঞান বেদ বা প্রকাশবেদ বলা হয়। বাণী জ্ঞানের প্রকাশিকা শক্তি—কারণ মনুষ্য আপনার প্রাপ্ত জ্ঞান বাণীর দ্বারা প্রকাশ করে। অতএব জ্ঞান প্রকাশের জন্য বাণীর সাধনা করা উচিত। সত্যকথা বলা, সত্যকে হিত বা কল্যাণ-ভাবনার সঙ্গে, প্রিয়তার সঙ্গে, মধুরতার সঙ্গে বলাই বাণীর সাধনা। যিনি এইরূপে বাণীর সাধনা করেন, তিনিই ঋক্ বেদের ফল প্রাপ্ত হন এবং এরূপ ব্যক্তিকেই 'ঋগ্বেদী' বলা হয়। যিনি ঋক্ বেদ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু বাণীর সাধনা করেন না, তিনি ঋক্ বেদের বিদ্বান বা পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু তিনি ঋক্‌বেদী বা ঋক্ বেদজ্ঞ নন। দ্বিতীয়ত, ওই মন্ত্রে বলা হয়েছে—আমি মনের সাধনা দ্বারা যজুর্বেদের ফল লাভ করি। মনের সাধনায় আমি হই যজুর্বেদী। যজুর্বেদ হচ্ছে যজ্ঞবেদ। শ্রেষ্ঠতম কর্মের নামই যজ্ঞ। মন শুদ্ধ হলে, শুদ্ধ মন দ্বারা সদা শুভকর্ম সম্পন্ন বা অনুষ্ঠিত হয়। মনই কর্মের প্রেরক। সংকল্প-বিকল্প মনের ধর্ম; মন কখনও সংকল্প-বিকল্পশূন্য হয় না। অতএব মনকে শিবসংকল্পে সংকল্পী করতে হবে। এর ফলে ইন্দ্রিয়-মন দ্বারা যে কর্ম সম্পন্ন করা হবে, তা হবে শিব বা ঈশ্বরের কর্ম। যিনি মনকে শুদ্ধ করে শিব-সংকল্পী মনে রূপান্তরিত করেন, তিনিই যজুর্বেদের ফল প্রাপ্ত হন—তাঁকেই যজুর্বেদী বলা হয়। যিনি যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেছেন অথচ মনকে শুদ্ধ করে শিবসংকল্পী মন তৈরি করেননি, তিনি যজুর্বেদে বিদ্বান হলেও, তাঁকে যজুর্বেদী বলা যাবে না।

তৃতীয়ত, ওই মন্ত্রে প্রাণের সাধনার কথায় বলা হয়েছে, আমি প্রাণের সাধনা করে সামবেদী হব। সাম বেদের অপর নাম গীতিবেদ বা সংগীতবেদ। সাম বেদ সমতারও বেদ। প্রাণের সমতায় গান গীত হয়। প্রাণের প্রিয়তা সম্পাদন করলে সাধক বা মানব সমতায় সিদ্ধিলাভ করে। যিনি প্রাণবৎ নির্বিশ্রাম, নির্বিষয়, নির্বিকার এবং নিরাসক্ত হয়ে সাধনা করেন, তিনি সমতা ও প্রিয়তার দ্বারা অথবা সমতা-প্রিয়তার সাধনা দ্বারা সাম বেদের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনিই সামবেদী। যিনি সাম বেদ অধ্যয়ন করেন অথচ সমতা এবং প্রাণ প্রিয়তার সম্পাদন বা অনুশীলন করেন না, তিনি সাম বেদে বিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু সামবেদী নন।

চতুর্থত, ওই মন্ত্রে আরও উক্ত হয়েছে, আমি নেত্র ও শ্রোত্রের (শ্রবণ) সাধনা দ্বারা অথর্ব বেদের ফল প্রাপ্ত হব। আমি নেত্র ও শ্রোত্রের সাধন করে অথর্ববেদী হব। অথর্ব-এর অর্থ অকম্প বা কম্পহীন হওয়া। যিনি নেত্র দ্বারা দর্শন এবং শ্রোত্র দ্বারা (শ্রবণ ইন্দ্রিয়) শ্রবণ করে বিবেককে (ভালো-মন্দ বোধ বা সত্য জ্ঞান) ধারণ করেন তিনিই অ-থর্ব (স্থির বা অকম্প) বলে বিবেচিত হন। যিনি এই প্রকার নেত্র-শ্রোত্রের সাধন করে অথর্বতার (স্থির বা অকম্পতার) অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনিই অথর্ব বেদের ফল প্রাপ্ত হন। তিনিই অথর্ববেদী বলে বিবেচিত হন। অন্যথায় অথর্ব বেদ অধ্যয়নে তিনি বিদ্বান হতে পারেন কিন্তু অথর্ববেদী নন। যিনি এইরূপে চতুর্বেদী (বেদজ্ঞ) হন তাঁকেই চতুর্বেদ এর বিদ্বান বা চতুর্বেদ-বিদগ্ধ বলা হয়। চতুর্বেদের সাধনায় সিদ্ধ হলে মানুষের জীবন হয় বেদজ্ঞানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। জীবন-মৃত্যুর বন্ধনকে অতিক্রম করে মানুষ বা সাধক পরমপদ প্রাপ্ত হয়। চার বেদের মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম-এই তিন বেদ মন্ত্রলক্ষণের আধার রূপে প্রসিদ্ধ, কিন্তু অথর্ব বেদকে এই তিন বেদ থেকে ভিন্ন নামে জানা যায়। চার বেদের সমষ্টিগত নাম 'ত্রয়ী' মূলত এই আধারকে অবলম্বন করে কতিপয় আধুনিক বিদ্বান অথর্ব বেদকে অর্বাচীন বা পরবর্তী সংযোজন মনে করেন। কিন্তু এই মনে করার পিছনে কোনও দৃঢ় বা ধারালো যুক্তি নেই। বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ তিন প্রকারের করা হয়। যথা—(১) যে-সকল মন্ত্রে অর্থের আধার পর পাদ-ব্যবস্থা (ছন্দোবদ্ধ পদ্যময় শৈলী) সুনিশ্চিত আছে সেগুলিকে ঋক্ বলে। (২) গীতাত্মক মন্ত্রকে

বলে সাম। (৩) এর অতিরিক্ত অর্থাৎ পদ্যময় এবং গীতি বা সংগীতময় মন্ত্র ব্যতীত যে-সকল মন্ত্র আছে তাকে যজুঃ বলে বা বলা হয়। যজুর্মন্ত্র গদ্যরূপে পঠিত হয়। অথর্ব বেদে এই তিন প্রকারের মন্ত্রই পাওয়া যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অথর্ব বেদকে অর্বাচীন বলা যুক্তিসম্মত নয়।

অথর্ব বেদকে অনেক নামে অভিহিত করা হয়। যথা—অথর্ব বেদ, অথর্বাঙ্গিরস বেদ, ব্রহ্মবেদ, ভিষগ্বেদ এবং ক্ষত্রবেদ। কতিপয় বিদ্বান বা পণ্ডিতের মতে 'অথর্বন' শব্দ শান্তিক (ভূতাবেশ ইত্যাদি দূর করার জন্য) এবং পৌষ্টিক (শ্রীলাভের জন্য) কর্মের বাচক। অপরদিকে 'আঙ্গিরস' শব্দ বা পদ ঘোর (অভিচারাত্মক অর্থাৎ শত্রুনাশের নিমিত্ত) কর্মের বাচক (বোধক, অর্থপ্রকাশক)। অথর্ব বেদে এই দুই প্রকার কর্মের উল্লেখ দেখা যায় এবং এই কারণে এই বেদের নাম অথর্বাঙ্গিরস হয়েছে। বিদ্বান পণ্ডিতদের এই মত পূর্ণত স্বীকার্য নয়। কেননা অথর্ব বেদে সবচেয়ে বেশি অধ্যাত্ম বিষয়ক মন্ত্রের সংকলন আছে। তারপর শান্তিক তথা পৌষ্টিক কর্মের সম্বন্ধযুক্ত মন্ত্রের উল্লেখ আছে। আভিচারিক কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মন্ত্রের উল্লেখ নগণ্যমাত্র।

অথর্ব বেদকে ব্রহ্মবেদ নামে অভিহিত করার মুখ্যত তিন কারণ দেখা যায়। প্রথমত, যজ্ঞকর্মে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন। দ্বিতীয়ত, ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তন্‌গাথা (কথা বৃত্তান্ত), তৃতীয়ত, ব্রহ্মানামক ঋষিদ্বারা দৃষ্ট মন্ত্রের সংকলন। 'ব্রহ্মবেদ' নামের আর এক কারণ, ব্রহ্ম বিষয়ক দার্শনিক চিন্তাধারা, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ক বা অধ্যাত্ম বিষয়ক চিন্তনাধিক্যের কারণেও এই বেদকে 'ব্রহ্মবেদ' বলা হয়। অথর্ব বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে ব্রহ্মাঋষির দ্বারা দৃষ্ট মন্ত্রের সংখ্যা ৮৮৪, এই আধারের পরিপ্রেক্ষিতেও অথর্ব বেদের নাম ব্রহ্মবেদ হতে পারে। বিদ্বৎগণ এরূপও মনে করেন।

অথর্ব বেদকে ভিষগ্বেদও বলা হয়—কারণ এই বেদে বিভিন্ন রোগ এবং রোগের উপশমের জন্য প্রচুর ঔষধি বা ভেষজের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব এই নামও যথোপযুক্ত আবার অথর্ব বেদকে ক্ষত্রবেদও বলা হয়। স্বরাজ্য রক্ষার জন্য রাজকর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রচুর সূক্তের উল্লেখ এই বেদে আছে—এই জন্য অথর্ব বেদকে 'ক্ষত্রবেদ' নামে ও অভিহিত করা হয়।

অথর্ব বেদে তিনজন ঋষির নাম পাওয়া যায়। অথর্বা, অঙ্গিরা ও ভৃগু। এই তিনজন ঋষিই ঋক্ সংহিতার সুপ্রাচীন পিতৃপুরুষরূপে পরিচিত। ঋক্ সংহিতার

সঙ্গে অথর্ব সংহিতার যোগও ঘনিষ্ঠ। কেননা অথর্ব সংহিতার মন্ত্রের প্রায় এক পঞ্চমাংশ ঋক্ সংহিতা থেকে গৃহীত। আবার অথর্ব সংহিতার এক ষষ্ঠাংশ যজুর্বেদ সংহিতার মন্ত্রের ন্যায় গদ্যে রচিত।

অথর্ব বেদ সংহিতা কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত, প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি প্রপাঠকে, প্রতি প্রপাঠক কয়েকটি অনুবাকে, প্রতি অনুবাক কয়েকটি সূক্তে বা পর্যায়ে এবং প্রতি পর্যায় কতিপয় মন্ত্রে বিভক্ত। কুড়িটি কাণ্ডে, আটত্রিশটি প্রপাঠক, নব্বইটি অনুবাক, সাতশত একত্রিশটি (৭৩১) সূক্ত বা পর্যায় এবং প্রায় ছয়হাজার (৬০০০) মন্ত্র আছে। অথর্ব বেদ সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখা যায়। আর্যসমাজী বেদপন্থীদের মতে অথর্ব বেদের অনুবাক সংখ্যা ১১১, এবং মন্ত্রসংখ্যা ৫৯৭৭। এই সংহিতায় পদ্য এবং গদ্য উভয়রূপ মন্ত্রই দৃষ্ট হয়। পদ্যাত্মক মন্ত্রে ঋক্ মন্ত্রের লক্ষণ এবং গদ্যাত্মক মন্ত্রে যজুঃ লক্ষণ দেখা যায়।

বিষ্ণুপুরাণমতে ব্যাসদেবের শিষ্য সুমন্তর নিকট কবন্ধ অথর্ব বেদ শিক্ষা করেন। পরে কবন্ধ তাঁর দুই শিষ্য দেবদর্শ ও পথ্যকে এই বেদবিদ্যা দান করেন। দেবদর্শের চারজন শিষ্য ছিল—মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্তায়নি ও পিপ্পলাদ। কবন্ধের অপর শিষ্য পথ্যের প্রধান শিষ্য ছিলেন তিনজন—জাজলি, কুমুদ ও শৌনক। দেবদর্শ এবং পথ্য আপন আপন শিষ্যবর্গকে অথর্ব বেদ শিক্ষা দেন। শৌনকেরও আবার বভ্রু এবং সৈন্ধবায়ন নামে দুই শিষ্য ছিল। বভ্রু ও সৈন্ধবায়নেরও শিষ্য ছিল। বভ্রুর শিষ্যের নাম মুঞ্জদেশ এবং সৈন্ধবায়নের শিষ্যের নাম সৈন্ধবগণ। বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন আপন আপন শিষ্যদের এই বেদবিদ্যা দান করেন।

বিষ্ণুপুরাণমতে অথর্ব বেদের পাঁচটি খণ্ড। যথা—নক্ষত্রকল্প, বৈতানিককল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প এবং শান্তিকল্প। এগুলি অথর্ব বেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে এগুলিকে অথর্ববেদীয় কল্পসূত্র বা লক্ষণগ্রন্থও বলা হয়।

শাখা—অথর্ব বেদের নয়টি শাখা ছিল। যথা—(১) পৈপ্পলাদ, (২) তৌদ, (৩) মৌদ, (৪) শৌনক, (৫) জাজল, (৬) জলদ,(৭) ব্রহ্মবদ, (৮) দেবদর্শ, এবং (৯) চারণবৈদ্য। এইসব শাখাসমূহের মধ্যে বর্তমানে শৌনক এবং পৈপ্পলাদ

বা পিপ্পলাদ এই দুটি শাখা পাওয়া যায়। শৌনক শাখার শৌনক সংহিতা সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। কিন্তু পৈপ্পলাদ বা পিপ্পলাদ শাখার পিপ্পলাদ সংহিতা অসম্পূর্ণ রূপে পাওয়া যায়।

শৌনক সংহিতা—এই সংহিতাটিকে অথর্ব বেদের প্রধান শাখা মনে করা হয়। শৌনক সংহিতায় ২০টি কাণ্ড, ৩৪ প্রপাঠক, ৭৩১ সূক্ত, এবং ৫৯৮৭টি মন্ত্র আছে। এর মধ্যে ঋক্ বেদের ১২০০ মন্ত্র এই সংহিতায় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডে শ্বেতকুষ্ঠ, পলিত রোগ (চুলের অকাল পক্কতা), ইত্যাদির উপশম করার প্রার্থনা তথা প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়। তৃতীয় কাণ্ডে নানা বালরোগ উপশম ও বশীকরণাদির বর্ণনা দেখা যায়, চতুর্থ কাণ্ডে নানা উৎপাত, ব্যাধির আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ বা শান্তি পাওয়ার উপায় বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম কাণ্ডে চোর এবং শত্রুদের পরাভূত করার জন্য প্রয়োগ বা অনুষ্ঠানবিধির উল্লেখ দেখা যায়। ষষ্ঠ কাণ্ডে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি, শ্লেষ্মা, অগ্নিদাহ আদির শান্তির জন্য মান্ত্রিক সাধনার বিবরণ দৃষ্ট হয়। সপ্তম কাণ্ডে সভার মধ্যে জয়ের নিমিত্তকৃত অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। অষ্টম কাণ্ডে দীর্ঘায়ু কামনা, মৃত্যুবিজয়ে ইত্যাদির বর্ণনার সাথে সাথে ঋক্‌বেদীয় গায়ত্রী আদি সাত ছন্দের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। নবম কাণ্ডে অতিথি সেবা এবং মধুকশা নামক এক অমৃতময়ী ঔষধির বর্ণনা দেওয়া আছে। এই ঔষধি মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের শক্তিবর্ধনকারী এবং নানা ঔষধ তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়। দশম কাণ্ড অধ্যাত্মজ্ঞান বিষয়ের ভাণ্ডার এবং এত আকর্ষণীয় যে একবার পড়তে শুরু করলে মন অপার্থিব আনন্দ-সাগরে ডুবে যায়। একাদশ কাণ্ডে, ব্রহ্মচর্য ব্রতমাহাত্ম্যের কথা এবং ব্রহ্মচর্যের ফলে মানুষ যে দেব পর্যায়ে উন্নীত হয় তার বিবরণ। দ্বাদশ কাণ্ড মাতৃভূমির প্রতি অপার প্রেমে পরিপূর্ণ। গাভীকে বিশ্বমাতায় সম্বোধিত করে, তার পূজার বিধিও এই কাণ্ডে দৃষ্ট হয়। ত্রয়োদশ কাণ্ড বিবিধ বিষয়াত্মক এবং নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ক সিদ্ধান্তের বর্ণনায় মুখরিত। চতুর্দশ কাণ্ডে বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্রের সংকলন। পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যদের প্রায়শ্চিত্ত সংস্কারের বর্ণনা। ষোড়শ কাণ্ডে অনেক বিষয়ের সাথে সাথে দুঃস্বপ্ননাশক মন্ত্রের সুন্দর সংগ্রহীকরণ। সপ্তদশে মনোজ্ঞ দার্শনিক চর্চার

বিবরণ। অষ্টাদশ কাণ্ডে শ্রাদ্ধের বিস্তৃত বিবরণের সাথে সাথে পিতৃমেধ যজ্ঞের মন্ত্রের সংকলন করা হয়েছে। ঊনবিংশ কাণ্ডে ভৈষজ্য, রাষ্ট্রসমৃদ্ধি, রাজসূয় যজ্ঞ, অধ্যাত্মবিষয় তথা নক্ষত্রাদির বর্ণন। বিংশতি কাণ্ডে সোমযাগের কথা বলা হয়েছে। শেষের দুই কাণ্ডকে খিলকাণ্ড বা পরিশিষ্ট কাণ্ডও বলা হয়।

অন্তিমকাণ্ডে কুন্তাপ সূক্ত নামক ১০টি সূক্ত আছে, যাতে রাজা পরীক্ষিত এবং তাঁর রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। 'গোপথ ব্রাহ্মণ' মতে 'কুন্তাপ' শব্দের অর্থ পাপবিনাশক। এই সূক্তগুলি যাগ-যজ্ঞাদির সময় পঠিত হতো। আচার্য সায়ন এই সংহিতার উপর ভাষ্য রচনা করেছেন।

পৈপ্পলাদ বা পিপ্পলাদ সংহিতা—মহর্ষি পিপ্পলাদ দ্বারা সুরক্ষিত তথা প্রবর্তিত সংহিতাই পৈপ্পলাদ সংহিতা নামে অভিহিত। বর্তমানে এই সংহিতাটি পাওয়া যায় না। ঋষি অনির্বাণ তাঁর 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পাদটীকায় বলেছেন—"পৈপ্পলাদ শাখার একটি মাত্র প্রতিলিপি পাওয়া গিয়েছিল কাশ্মীরে। তাতে সূক্তের বিন্যাস অন্যরকম, অনেক পাঠভেদ আছে। কিছু কিছু নতুন মন্ত্রও পাওয়া যায়। সম্প্রতি উড়িষ্যাতেও পৈপ্পলাদ সংহিতা আবিষ্কৃত হয়েছে।"

অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ—অথর্ব বেদের একমাত্র ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। এর দুটি ভাগ বা কাণ্ড আছে। প্রথম কাণ্ডে পাঁচটি প্রপাঠক বা অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় কাণ্ডে ছয়টি প্রপাঠক বা অধ্যায় আছে। প্রথম কাণ্ড বা প্রথম ভাগকে বলা হয় পূর্বভাগ, দ্বিতীয় কাণ্ড বা দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় উত্তরভাগ। এই ব্রাহ্মণের পূর্বভাগে ওঁকার এবং গায়ত্রীর মাহাত্ম্য, ঋত্বিক বা পুরোহিতগণের কর্তব্য ও মহত্ত্ব, সম্বৎসর সূত্র, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ আদি যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়।

উত্তরভাগে অথর্ব বেদের মহত্ত্বর সাথে বিভিন্ন যাজ্ঞিক প্রক্রিয়ার বিশদ আলোচনা এবং তৎসম্বন্ধিত নানা আখ্যায়িকার বর্ণনা পাওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায়।

অথর্ববেদের কোনও আরণ্যক গ্রন্থ নেই। অথর্ব বেদের উপনিষদ তিনটি— প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য।

প্রশ্নোপনিষদ— প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হয়েছে বলে এই উপনিষদটির নাম প্রশ্নোপনিষদ। উপনিষদটি অথর্ব বেদের পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত। এই উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি পিপ্পলাদের নিকট পরমব্রহ্মতত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তপোপরায়ণ সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়নী, কৌসল্য, ভার্গব, কবন্ধ আদি ঋষিগণ আচার্য পিপ্পলাদকে ছয়টি প্রশ্ন করেছেন। এই ছয়টি প্রশ্ন ও ঋষি পিপ্পলাদপ্রদত্ত উত্তরের মাধ্যমে এই উপনিষদটি গ্রথিত হয়েছে। প্রশ্নকর্তা ঋষিগণের প্রশ্নগুলি হচ্ছে—জীবের জন্ম কোথা থেকে? কোন কোন দেবতা জীবের দেহ ধারণ করেন; তাঁদের মধ্যে প্রধান কে? প্রাণের জন্ম কোথা থেকে? কিভাবে প্রাণ জীবের দেহে আগমন করে? প্রাণ কিভাবে জীবের দেহ থেকে উৎক্রমণ করে? কী প্রকারে বাহ্য, অধিভূত ও অধিদৈব বিষয়সমূহ ধারণ করে? এই পুরুষে (জীবশরীরে) কোন কোন ইন্দ্রিয় নিদ্রা যায়, কোন কোন ইন্দ্রিয় জেগে থেকে নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে? কোন কোন দেবতা স্বপ্নসকল দর্শন করেন? সুষুপ্তিকালে যে সুখের অনুভূতি হয় সেই সুখ কার? কার মধ্যে বা কোথায় সমস্ত কারণবর্গ একীভূত হয়? ওঁকারের উপাসনা দ্বারা সাধক কোন কোন লোক জয় করেন? ষোড়শকলা বিশিষ্ট পুরুষ কে? কোথা থেকে কলাসমূহের উদ্ভব এবং কোথায় তাদের গতি?

আচার্য পিপ্পলাদ ঋষিদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করে তাঁদের পরব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে, সংশয় দূরীভূত করেছেন। তিনি প্রশ্নকর্তা ঋষিদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সৃষ্টির রহস্যের বর্ণনা, দেবযান ও পিতৃযান পথের বর্ণনা; দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রাণ, অপান,সমান, উদান, ব্যান আদি পঞ্চপ্রাণের বর্ণনা, প্রাণের লোকোত্তর মহিমা, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা; তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রাণের বিশদ বর্ণনা, জগৎ সৃষ্টির মূলে এই প্রাণের আহুতির বর্ণনা, যথা—"অহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" (আমি নিজেকে বহুরূপে সৃষ্টি করব)। প্রাণই পরমাত্মার সৃষ্টি; চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে অক্ষর তত্ত্ব, পরমপুরুষের তত্ত্বের বর্ণনা; পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে প্রণব তথা ওঁকারের উপাসনা করে সৃষ্টির সপ্তলোকের (ভূঃ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য) কোন কোন লোক জয় করা যায়

তার বর্ণনা; ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে প্রাণাদি ষোড়শকলা পুরুষের বর্ণনা, ষোড়শকলার মধ্যে প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের মহিমার বিশদ বর্ণনাপূর্বক যথাযথভাবে পরমব্রহ্মতত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। যারা বেদ উপনিষদভিত্তিক সাধনমার্গে উন্নীত হতে ইচ্ছুক, এই উপনিষদটি তাঁদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে। সাধনমার্গের নানা সংশয় এই উপনিষদ পাঠে দূরীভূত হবে। এই উপনিষদে লক্ষণীয় হল ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিদের প্রশ্নগুলি। পরব্রহ্মকে জানতে হলে, বিজ্ঞান পুরোপুরি আয়ত্ত হলে, কিভাবে সাধনপথে অগ্রসর হতে হবে, এই প্রশ্নগুলিই তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

মুণ্ডক উপনিষদ—অথর্ব বেদের শৌনক শাখার উপনিষদের নাম মুণ্ডক উপনিষদ। উপনিষদটির নাম মুণ্ডক কেন হয়েছে, সে বিষয়ে বিদ্বৎজনদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন মুণ্ডক নামে এক ব্রহ্মবিদ ঋষি ছিলেন—তাঁর নামেই এই উপনিষদের নামকরণ হয়েছে, কারও কারও মতে অথর্ব বেদের সকল উপনিষদের মধ্যে এটি 'মুণ্ড' বা 'মস্তিষ্ক' সদৃশ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তাই উপনিষদটির নাম মুণ্ডক উপনিষদ হয়েছে। অন্যায়, অধর্ম, পাপ, মিথ্যাচার, কুসংস্কার প্রবল আকার ধারণ করে সত্যকে ঢেকে রাখে অথবা আবরণ দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখে, এই উপনিষদ সেই আবরণ ধারালো যুক্তি দিয়ে মস্তক মুণ্ডনের ন্যায় পরিষ্কার করে দিয়ে সত্যকে সবার শীর্ষে বা উপরে তুলে ধরেছে—তাই এই উপনিষদের নাম মুণ্ডক উপনিষদ। সত্যই এই উপনিষদের প্রাণ। আমার আচার্যদেব বিশ্ববন্দিত শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ তাঁর 'মুণ্ডক' উপনিষদ গ্রন্থের ভাষ্যে, এই উপনিষদের নামকরণ প্রসঙ্গে বলছেন—"এই উপনিষদের নাম মুণ্ডক উপনিষদ। মস্তক মুণ্ডনকারী সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করিয়াই এই উপনিষদখানি রচিত হইয়াছে—এই জন্যই ইহার নাম মুণ্ডক উপনিষদ।" যাঁরা অধ্যাত্ম-পিপাসু, ত্যাগী ও মুমুক্ষু, এই উপনিষদটি তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে। অথর্ব বেদের এই উপনিষদটির প্রবক্তা মহর্ষি অঙ্গিরা। শ্রোতা ঋষি শৌনক। উপনিষদটির তিনটি ভাগ। প্রতিটি ভাগই মুণ্ডক নামে অভিহিত। প্রত্যেক ভাগে দুটো করে অধ্যায়। মন্ত্র সংখ্যা চৌষট্টি। গদ্য পদ্যের সংমিশ্রণে গ্রন্থটি গ্রথিত, উপনিষদটির মধ্যে এমন কিছু

মহাবাক্য আছে যা প্রায়ই অনেকের মুখে শোনা যায়। যথা—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য।" অর্থাৎ এই আত্মাকে প্রবচনের দ্বারা লাভ করা যায় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—বল বা শক্তিহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। "সত্যমেব জয়তে"—সত্যের জয় হয় ইত্যাদি।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ—অথর্ববেদীয় এই উপনিষদটিতে কোনও প্রবক্তার নাম নেই। 'চরণব্যূহের' মতে ঋক্ বেদের একজন শাখা-প্রবর্তক ঋষি হচ্ছেন মাণ্ডুকায়ন্, সম্ভবত, এই ঋষির নাম অনুসারেই উপনিষদটির নাম মাণ্ডুক্যোপনিষদ—কোনও কোনও বেদবিদ্ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। এই উপনিষদের মতে ওঁকার ধ্বনিই হল সৃষ্টির মূল। তিনটি অক্ষর 'অ', 'উ' এবং 'ম' মিলিত হয়ে যে ধ্বনি তুলল, সেই 'ওঁ'-এর স্পন্দন থেকেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ওঁ-ই স্রষ্টা। ওঁ-ই সেই বিরাট অক্ষরপুরুষ বা পরব্রহ্ম। বেদ-ঋষি অনির্বাণের ভাষায়— "উপনিষদটির প্রতিপাদ্য হল চতুর্মাত্র ওঙ্কারের তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সমীকরণ পাওয়া যাচ্ছে; ওঙ্কারই সব, ব্রহ্মই সব, এই আত্মাই ব্রহ্ম, ওঙ্কার আত্মা।" (বেদ-মীমাংসা, প্রথমখণ্ড, অনির্বাণ)। গদ্যাকারে মাত্র বারোটি মন্ত্রে (১২) স্বল্পাকারে উপনিষদটি প্রকাশিত। উপনিষদটির কলেবর ক্ষুদ্র হলেও, ব্রহ্ম এবং অদ্বৈতজ্ঞানের অপূর্ব ভাণ্ডার।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বেদ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পেলাম, আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখলাম যে বেদ বলতে শুধু একটা গ্রন্থ বোঝায় না। বরং প্রতি বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ নিয়ে বেদ যেন এক বিশাল গ্রন্থালয়। বেদ অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় শুধু একটি গ্রন্থ নয়, নয় মনোরঞ্জনের জন্যে নাটক, উপন্যাস বা রোমান্টিক কাব্য। বেদ মূলত মনোগঠনের মনোবিকাশের তথা আত্মজ্ঞান বা আত্মদর্শনের অনুপম গ্রন্থ। বেদের প্রতিটি মন্ত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষির নয়নস্বরূপ। বেদের স্বর ঋষির শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ। বেদের সংগীত ঋষিহৃদয়ের ললিত (সুন্দর, চলন, ক্রীড়া) লীলায়িত স্পন্দন। ঋষির জীবন বেদ অথবা বেদই ঋষির জীবন। তাই তাঁদের কথা গভীর রহস্যব্যঞ্জক। আপাত অধ্যয়নে বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ঋষির মতো জীবন যখন তপোময় বা তপের প্রভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, তখনই সদগুরু

বা সত্যদ্রষ্টা আচার্যর সন্নিধ্যে থেকে বেদ অধ্যয়ন করতে হয়। বেদের সার উপনিষদ। উপনিষদের সার বেদান্ত। বেদান্তের প্রতিপাদ্য বস্তু পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্মই বেদের সাধ্যবস্তু। এই পরব্রহ্মে আত্মবলিদান বা আত্মাহুতিই বেদ বা বেদের ঋষির সাধনা।

বেদ অপৌরুষেয়। এই অপৌরুষেয় হওয়ার অর্থ হল—আমি অকর্তা; অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিসত্তা বা পৌরুষসত্তাকে সার্বিকভাবে বিসর্জন দেওয়াই অপৌরুষেয়তা বা কর্তাহীন অবস্থার উপনীত হওয়া। আমি কর্তা এই অভিমান যার সর্বতোভাবে দূর হয়েছে, তিনিই বেদের অপৌরুষেয় বাণী গ্রহণের যোগ্য। সেই সঙ্গে বেদকে কেন অপৌরুষেয় বলা হয়—এই কথাটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। বেদ-মন্ত্রের যথার্থ অর্থটিও তাঁর কাছে প্রকটিত হয়।

বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ যেন আমিত্বহীন, সীমাহীন, অর্থাৎ বেদ-প্রতিপাদিত সত্য বা পরব্রহ্মের কোনও রূপ আমিত্ব বা কোনও আমিরূপ গণ্ডী নেই, সীমা নেই। এই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম, অসীম, অনন্ত ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েও তিনি ফুরিয়ে যান না। তাঁর অনন্তত্বের হানি হয় না। তিনি জগৎকর্তা এই বোধের গণ্ডীতে তিনি নিজেকে কখনও আবদ্ধ করেন না। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩ সংখ্যক শ্লোকের ভাষায়—"মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম" অর্থাৎ আমাকে অব্যয় ও অকর্তা বলে জেনো। এই জন্যেই বেদ অপৌরুষেয়।

আমরা গীতার ভাষায়—'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে" (তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা, ২৭)। অর্থাৎ, অহঙ্কার দ্বারা আমাদের চিত্ত বিমূঢ় বা মোহগ্রস্ত হয়েছে—তাই কোনওকিছু করার পর আমিই কর্তা, এরূপ মনে করে থাকি। এই জন্যেই আমাদের কাছে বেদবাণী বা বেদমন্ত্রের রহস্য প্রকটিত হয় না। যিনি অহঙ্কার-এর গণ্ডী ভেঙে বা ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী ভেঙে বৃহৎ আমিত্বে নিজেকে আহুতি দিয়েছেন, বেদের কথা, বেদের ঋষির কথা, তিনিই বুঝতে পারেন। ঋষির বাক্যকে বলে 'সন্ধ্যাভাষা'—প্রহেলিকা বা আলো-আঁধারি ভাষা। বেদের ঋষিদের বলা হয় মর্মজ্ঞ বা মরমিয়া অর্থাৎ রহস্যবিদ্ বা তত্ত্ববিদ্।

তাঁরা ছিলেন জীবন্মৃতবৎ অর্থাৎ জীবিত থেকেও মৃত ছিলেন। আমরা সকলে দিনরাত 'আমি-আমি' করে যে আমিটি নিয়ে বেঁচে আছি, ঋষিদের সেই আমিটি জীবদ্দশায় মরে গেছে বা মরে গিয়েছিল। তাঁদের আমিটি বৃহৎ বা অনন্ত আমির সাথে মিলেমিশে একাকার ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই অপৌরুষেয় বেদবাণী তাঁদের কাছে সত্যরূপে, মন্ত্ররূপে অর্থসহ দৃষ্ট হয়েছিল। তাই তাঁরা সত্যদ্রষ্টা ও মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋষির দৃষ্টি স্বচ্ছ উদার ও অখণ্ড। এই স্বচ্ছ-উদার-অখণ্ড দৃষ্টিতে তাঁরা বেদমন্ত্রকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাই তাঁরা ঋষি। বেদের ঋষির কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছে, সকল সাধনার মূল মন্ত্র "সত্যং, ঋতং ও বৃহৎ।" সত্য সর্বব্যাপী ও স্থানুবৎ, অচল ও সনাতন—তার মধ্যে ছন্দের গতি আনে যা তা-ই ঋতম্। বেদ-মনীষী মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাষায় "সত্যের মধ্যে ক্রীড়া কৌতুক আনে, ভাগবতী-লীলার উদ্বোধন করে 'ঋতম্'। ঋতের ক্রীড়ায় সত্যের অমোঘ বিস্ফোরণই বৃহৎ।" ব্রহ্মচারীজির ভাষায়—"বেদ যেন একটি বিশাল সংগীত। সংগীতের একটি ধ্রুবপদ বা ধূয়া থাকে। বেদের ধ্রুবপদটি হল—

"বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ" (ঋগ্বেদ, ২/১/১৬)। বৃহতের কথা বলিব, বৃহতের মহিমার কথা বলিব, বীরের মত বলিব। বীরোচিত বীর্যবত্তার সঙ্গে বলিব..যেন বৃহতের মহাশক্তি বা মহামহিমাকে মানব সমাজে জানাইতে পারি। ইহাই বৈদিক ঋষিসংঘের আশা, আকূতি ও সংকল্প।" (বেদ-বিচিন্তন, উত্তরখণ্ড, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী)।

বস্তুত বেদ হচ্ছে ঋষিদের আকূতি ও সংকল্পময় সাধনার পূর্ণ সিদ্ধিরূপ। ব্রহ্মচারীজির ভাষায়—"ঋষিদের ধ্যানে মননে ক্রিয়ায় কর্মে সর্বদা এই তিনটি মহাবাক্য কখনও উচ্চারিত কখনও বা অনুচ্চরিতভাবে মন্ত্রিত হইয়াছে। যাহা বৃহৎ তাহাই সত্য। ক্ষুদ্র কখনও সত্য হইতে পারে না। এবং সত্য সতত ক্রিয়াশীল, গতিময়, তাহাই ঋতম্। বেদ অর্থই অনন্ত বৃহৎ। তাহা গতিময় ছন্দোময় এক মহাসংগীত।... বৃহতের অনন্তের এই নিবিড় আবেশ ধরিয়াই বেদে প্রবেশ হয়। অসীমের এই আকাশ-দৃষ্টি যাহার লাভ হয় নাই, তাহার পক্ষে বেদে প্রবেশ সম্ভব নহে।" (বেদ-বিচিন্তন, উত্তরখণ্ড, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী)।

বেদের গহণ অরণ্যে প্রবেশ করতে যিনি সমর্থ, তিনিই বেদ-তত্ত্বের জ্ঞাতারূপে পরিগণিত হন। বেদরূপ সমুদ্র-মন্থনে যে অমৃতের উদয় হয়—বেদজ্ঞ বা বেদতত্ত্বের জ্ঞাতাই সেই অমৃতের অধিকারী। মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের ২৮/৬ মন্ত্রে বলা হয়েছে—

“তস্মাদৃচঃ সাম যজুংসি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমোনশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ।।

“সেই পুরুষ ঋক্, সাম, যজু অর্থাৎ বেদ, দীক্ষা, যজ্ঞ অশ্বমেধাদি বৃহত্তর যজ্ঞ, দক্ষিণা, সংবৎসর কাল প্রভৃতি বৈদিক কর্ম, যজমান অর্থাৎ কর্মকর্তা, এই সপ্তলোক, সোম যাঁহার পবিত্রতা বিধান করিতেছেন, সূর্য যেখানে আলো ছড়াইতেছেন, এই সমস্ত সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।” উপরোক্ত মন্ত্রটির ভাষ্যবিবৃতিতে মদীয় আচার্যদেব শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেছেন—“সৃষ্টিতে স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি যত কিছু আমরা দেখতে পাই সমস্তই পুরুষ (পরমাত্মা) হতে উৎপন্ন। সৃষ্টি যেন তাঁর অঙ্গ, তাঁর সত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই পার্থিব সৃষ্টির সার বা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ। মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার বাক্শক্তি। এই বাক্শক্তিরই সার বা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বেদ বা জ্ঞান। বৈদিক যজ্ঞ সেই পরমপুরুষেরই সৃষ্টি লীলা মাধুর্যেরই অভিনয়, তাঁর ত্রিগুণে বা প্রকৃতির আত্মাহুতিই সৃষ্টি। আমরাও সেই পরমপুরুষে আত্মহুতি দ্বারা বা আত্মসমর্পণের দ্বারা আমাদের মৃন্ময় সত্তাকে চিন্ময় করে তুলবো, মনুষ্য জন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে দেবজন্ম লাভ করবো—এ-ই বৈদিক যজ্ঞের লক্ষ্য। সুতরাং যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য আত্মার জাগরণ, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।”

সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই তিনরূপ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। চেতনারও তেমনি সৃষ্টিতে ত্রিবিধ অভিব্যক্তি ঘটেছে—পার্থিব চেতনা বা স্থূল চেতনার অভিব্যক্তি স্থানই ভূলোক (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিন লোককেই একত্রে ভূলোক বলা হয়)। চেতনার সূক্ষ্ম প্রকাশ বা অধিকতর নির্মল প্রকাশ স্থানই অন্তরীক্ষলোক (মহঃ জনঃ ও তপোলোক)। চেতনার যেখানে দিব্য প্রকাশ তাহাই দ্যুলোক বা

সত্যলোক। এই ভূলোকের দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষলোকের দেবতা বায়ু আর দ্যুলোকের দেবতা সূর্য্য—“এক এব ত্রিধা স্থিতঃ”—ইহা একই দেবতার ত্রিবিধ প্রকাশ। “একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি” সেই এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষই সৃষ্টিতে বহুনাম ও রূপ গ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন।

“তস্মাৎ ঋচঃ সাম যজুংসি”—ঋক্ সাম ও যজু এই তিন বেদকে ঋষি তিনলোকে স্থাপনা করেছেন। এই তিনলোককে ত্রিবিধ চেতনার প্রতীকরূপে বর্ণনা করেছেন। পার্থিব চেতনাই সব চেতনার মূলে। ঋক্ আবাহন মন্ত্র, চেতনার প্রথম জাগরণ, আত্মস্বরূপ উপলব্ধির প্রথম আকুতি। আত্মোন্নতি বা দেবজন্ম লাভের প্রথম প্রচেষ্টা। এই জন্যই ঋক্ বেদ ভূলোকের বেদ বা জ্ঞান। যাহা দ্বারা যজনা করা যায় তাহাই যজু। যজনা শব্দের অর্থ পূজা বা সাধন। সুতরাং যজু হচ্ছে সাধনবেদ। সাধনা দ্বারাই মানুষ দেবজন্ম লাভ করে। সাধন দ্বারাই মানুষ মহঃ ও তপঃলোকের অধিব সী দেবতাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। তাই যজুর্বেদ হচ্ছে অন্তরীক্ষলোকের জ্ঞান।

সাধনার সিদ্ধিই সাম। চিত্তের বিক্ষিপ্ততা দূর হয়ে চিত্ত যখন একাত্ম অনুভবে, আত্মস্বরূপের অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সাম বেদের বা দ্যুলোকের জ্ঞান সাধক লাভ করেন।

সাধনার সিদ্ধিতে সাধকের যে জ্ঞানরূপ আনন্দপ্রসাদ লাভ হয়, সেই জ্ঞানরূপ আনন্দপ্রসাদের বিতরণই অথর্ব বেদ। আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরকে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎকে সাতটি ভাগে বা সপ্তলোকে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—“সপ্ত ইমে লোক যেষু চরন্তি প্রাণাঃ”—এই সপ্তলোকই জীবের বাসস্থান। এই সপ্তলোকের নাম-ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিনটিকে এককথায় বলে নিম্নত্রিলোকী, জনঃ, তপঃ ও সত্যকে বলে উর্ধ্বত্রিলোকী। এই নিম্নত্রিলোকী ও উর্ধ্বত্রিলোকীর মধ্যবর্তী স্থানের নাম মহর্লোক। এই মহর্লোকই নিম্নত্রিলোকী এবং উর্ধ্বত্রিলোকীয় সংযোগসূত্র বা মিলনস্থান।

ভুবর্লোকের অপর নাম পিতৃলোক। স্বঃলোক বা স্বর্গলোকের অপর নাম ইন্দ্রলোক। মহর্লোকের অপর নাম প্রজাপতিলোক। উর্ধ্বত্রিলোকী অর্থাৎ জনঃ,

তপঃ ও সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক। বৃহদারণ্যকের ভাষায়—"ভূলোক দেবলোক দ্বারা ওতপ্রোত বা আবৃত। দেবলোক ইন্দ্রলোক দ্বারা আবৃত। ইন্দ্রলোককে আবৃত করে আছে মহর্লোক বা প্রজাপতিলোক। প্রজাপতিলোককে আবৃত করে আছে ব্রহ্মলোক। প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেকটি সৌরজগতেই এইরূপ সপ্তলোকের সংস্থান রয়েছে। এই সপ্তলোকই পাঞ্চভৌতিক স্থূল ও সুক্ষ্ম উপাদানে গড়া। প্রত্যেক লোকের আকৃতি ও তার অধিবাসীদের গঠনও তাই পৃথক। কোনও লোকই জীবশূন্য নয়। সৃষ্ট জীবের ক্রমোন্নতির ধারা মনুষ্যস্তরে এসেই সমাপ্ত হয়নি। বর্তমান যুগের পশুতুল্য মানুষকেও আত্মশুদ্ধির সাধনা দ্বারা দেবতুল্য হতে হবে। দেবত্বকেও অতিক্রম করে ভগবত্তুল্য হয়ে ব্রহ্মধামে প্রবেশ করতে হবে—মানবজীবনের এটাই লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কথাই আমাদের চার বেদে বলা হয়েছে।

আমাদের এই ভূলোক ক্ষিতিতত্ত্ব প্রধান। ক্ষিতিতত্ত্বের প্রাধান্যের জন্যই এই লোকের জীব বা জীবাত্মাকে অন্নময় কোষ অর্থাৎ অন্নপুষ্ট স্থূলদেহ ধারণ করতে হয়। ভুবর্লোক অপ্‌তত্ত্ব প্রধান। তাই এই লোকের জীবদেহ স্থূল নয়—সূক্ষ্ম বাষ্পীয় উপাদানে গড়া। উপনিষদের ভাষায় প্রাণময় কোষ অর্থাৎ কাম-কামনাময় সূক্ষ্ম দেহ। এই লোকে প্রাণ জড়ের বাধামুক্ত হয়ে নিজের কাম-কামনানুযায়ী রূপ সৃষ্টি করতে পারে।

স্বর্লোকে তেজস্তত্ত্বের প্রাধান্য, তাই স্বর্লোকের রূপ জ্যোতির্ময়। এই লোকের জীবদেহকে তাই বলে তৈজস দেহ ,অর্থাৎ জ্যোতি দিয়ে আলো দিয়ে গড়া দেহ। উপনিষদাদি শাস্ত্রের ভাষায় মনোময় কোষ। এই জগতের অধিবাসীরা উদ্দীপ্ত মন-বুদ্ধিময় দেহের অধিকারী। এই উদ্দীপ্ত মন-বুদ্ধি সহজেই স্থির হয়ে শান্ত হয়ে স্বীয় কারণে অর্থাৎ অব্যক্তে বিলীন হতে পারে। এই জন্যেই এই স্বর্লোকের দুইটি বিভাগ আছে। একটি মনোময়, আর একটি বিজ্ঞানময়। স্বর্লোকে প্রবেশ করে জীবাত্মা স্বীয় দেবমনের ঐশ্বর্য আস্বাদন করে পরমসুখ, পরমতৃপ্তি অনুভব করে। বিজ্ঞানময় ভূমিতে প্রবেশ করে জীবাত্মা গভীর শান্তিসুখ আস্বাদন করে।

মহর্লোকে বায়ুতত্ত্বের প্রাধান্য। এইজন্য এই লোকের অধিবাসীদের দেহ

বায়বীয় দেহ। অধঃ ত্রিলোকীকে এক কথায় বলা যায় মন-বুদ্ধির জগৎ। শুদ্ধ মন-বুদ্ধির সাহায্যে আমরা আত্মতত্ত্ব কিছুটা ধারণা করতে পারি, কিন্তু এর দ্বারা আত্মতত্ত্বের সম্যক্ অনুভব হয় না। সুতরাং ক্রমবিকাশের ধারণানুযায়ী মন-বুদ্ধির পরই বোধি বা অনুভবশক্তির উন্মেষের প্রয়োজন। এই মহর্লোক হতেই বোধির জগৎ, অনুভবের জগৎ আরম্ভ। এই মহর্লোকই শুদ্ধ মন-বুদ্ধি ও বোধির মিলনক্ষেত্র। মন বা শুভ বুদ্ধি এই লোকে এসে যেন বোধিত রূপায়িত হয়ে ওঠে। মন-বুদ্ধির জগৎ অহং বা ব্যষ্টিভাব দ্বারা খণ্ডিত। বোধির জগৎ এই অহং বা ব্যষ্টিভাব হতে মুক্ত। বোধির জগতে ভূমা বা বৃহৎ চেতনারই প্রাধান্য।

জনঃ তপঃ ও সত্য—এই উর্ধ্বত্রিলোকীকে এককথায় বলা যায় বোধির জগৎ । এই জগৎ মন-বুদ্ধির সংস্পর্শের অতীত ও আকাশতত্ত্বে নির্মিত। এই আকাশতত্ত্ব হিরণ্ময় আত্মজ্যোতি স্বরূপ। এইজন্য উর্ধ্বত্রিলোকী অধিবাসীদের দেহও হিরণ্ময়। এই হিরন্ময় কোষ অর্থাৎ হিরণ্ময় দেহ অবলম্বনে আত্মা সগুণ ব্রহ্মকে আস্বাদন করে। "হিরণ্ময় পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্"—এই হিরণ্ময় কোষ, হিরণ্ময় আবরণ হতে মুক্ত হতে পারলে নির্গুণ ব্রহ্মের, নিষ্কল ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ হয়। জনঃ লোকে আত্মার আনন্দশক্তির প্রাধান্য। আত্মস্বরূপ অনুভূতির আনন্দে প্রতিষ্ঠিত থেকে এই লোকের অধিবাসীরা সমগ্র জীবের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। তপঃলোকে আত্মার চিৎশক্তি বা জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য। এই লোকের অধিবাসীরা আত্মার দ্রষ্টাস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে সাক্ষীরূপে সৃষ্টি-লীলাকে আস্বাদন করেন।

সত্যলোকে আত্মার সত্যস্বরূপ অনুভূতির, সত্য অস্তিত্ব অনুভূতির প্রাধান্য। এই সত্যলোকই সকল লোকের উৎপত্তিস্থান বা মিলনভূমি। এই সত্যলোকই একাধারে ভক্তের ভাবলোক অর্থাৎ চিন্ময় গোলক বা চিন্ময় বৃন্দাবন। শৈব বা শাক্ত সাধকের চিন্ময় কৈলাস। জ্ঞানী ও যোগীর সগুণ ব্রহ্মলোক। পূর্বে কথিত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ— এই তিনলোকই ভূলোক, মহঃ জনঃ ও তপঃ,এই তিনটি অন্তরীক্ষলোক এবং সত্যলোকই দ্যুলোক। সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত এই সপ্তচেতনাই সপ্তলোক।

আমাদের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও এই সপ্তচেতনার স্তর বিদ্যমান রয়েছে। দেহের নাভি হতে নিম্নদিক ভূলোক। নাভির ঊর্ধ্বদিকে ভ্রূ-মধ্য বা ললাট পর্যন্ত অন্তরীক্ষলোক এবং ললাট বা ভ্রূ-মধ্যের উপরিভাগই দ্যুলোক।

বৈদিক মতে ব্রহ্মের যে শক্তি, ব্রহ্মের যে আনন্দধারা সৃষ্টিতে নেমে এসেছে তা-ই প্রাণ। এই প্রাণ বা মহাপ্রাণ, এই বিশ্বমন, নরলোক হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যার বিচিত্র প্রকাশ, এই ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক ও দ্যুলোক যাতে প্রতিষ্ঠিত, 'এবং একং আত্মানং জানথ'—সেই এক অদ্বিতীয় আত্মাকেই বা ব্রহ্মকেই জানতে হবে। এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মলাভই মানবজীবনের লক্ষ্য ও একমাত্র গতি। ভারতের চার বেদের এটাই মর্মবাণী।

অষ্টম অধ্যায়

বৈদিক সূক্ত

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা বেদ, বেদের মর্মবাণীর সাথে পরিচিত হয়েছি। এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি বৈদিক সূক্তের সাথে পরিচিত হব। সূক্তের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে, আমাদের জানা দরকার 'সূক্ত' কাকে বলে? 'সূক্ত' শব্দ 'সু' উপসর্গ পূর্বক 'বচ্' ধাতু 'ক্ত' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ যা সুন্দররূপে কথিত হয়েছে। 'সূক্ত' অর্থাৎ যা সুন্দররূপে উক্ত বা বলা হয়েছে। 'সূক্ত' হচ্ছে বেদমন্ত্রের মর্মার্থ প্রকাশক। 'সূক্ত' অন্তগর্ত মন্ত্রেই 'সূক্তের' পরিচয়টি নিহিত থাকে। মহর্ষি শৌনক তাঁর 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে, সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—'সম্পূর্ণং ঋষিবাক্যং তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে'—অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঋষির বচনকে 'সূক্ত' বলা হয়। 'সূক্ত' সাধারণত দু-প্রকার—ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত। যে-সকল সূক্তে কমপক্ষে তিনটি ঋচা বা মন্ত্র আছে তাকে 'ক্ষুদ্র সূক্ত' বলে। যে-সকল সূক্তে তিনের অধিক মন্ত্র আছে সেগুলিকে মহাসূক্ত বলা হয়।

মহর্ষি শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে চার প্রকার সূক্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা—(১) দেবতাসূক্ত (২) ঋষিসূক্ত (৩) অর্থসূক্ত (৪) ছন্দসূক্ত। কোনও দেবতার স্তুতিতে যে-সকল 'সূক্ত' মুখরিত ও সমাপ্ত সেগুলিকে 'দেবতাসূক্ত' বলা হয়। অনুরূপভাবে একই ঋষির স্তুতিতে যে-সকল 'সূক্ত' প্রবৃত্ত সেগুলিকে 'ঋষি সূক্ত' বলা হয়। যে-সকল 'সূক্তিতে' সকল প্রয়োজনের পূর্তি বা পূরণ হয় সেগুলিকে 'অর্থসূক্ত' বলা হয়। একই প্রকারের ছন্দ যে-সকল সূক্ততে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলিকে 'ছন্দঃ সূক্ত' বলা হয়। সূক্ত সমূহের পাঠ ও জপের মাহাত্ম্য বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে। বৈদিক 'সূক্তের' নিত্যপাঠ ও জপের দ্বারা মানুষ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ক্লেশ থেকে মুক্তি পায়। বৈদিক 'সূক্ত' পাঠের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহর্ষি অত্রি বলেছেন—

"এতানি জপ্যানি পুনন্তি জন্তুজ্ঞাতিস্মরত্বং লভতে যদীচ্ছেত।" অর্থাৎ সূক্ত পাঠে মানুষ পবিত্র হয়। অন্তকরণ শুদ্ধ হয় এবং পূর্বজন্মের স্মৃতিকে প্রাপ্ত হয় এবং মনোভিলষিত বস্তু অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়। বেদের সব সূক্তই মূল্যবান ও মহত্বপূর্ণ। পাঠকের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি 'সূক্ত' মূল বেদ থেকে পরিবেশিত হল। ঋক্ বেদ সংহিতার প্রথম সূক্তটিই 'অগ্নিসূক্ত'। এই সূক্তে অগ্নির মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে। ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রই শুরু হয়েছে অগ্নি শব্দ দিয়ে, যথা—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।।১
অগ্নি পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরূত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি।।২
অগ্নিনা রয়িম শ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমম্।।৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।।৪
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরা গমৎ।।৫
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ।।৬
উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি।।৭
রাজন্তমধ্বরানাং গোপামৃতস্য দীদিবিম। বর্ধমানং স্বে দমে।।৮
স নঃ পিতেব সূনবেহগ্নে সূপায়নোভব। সচস্বানিঃস্বস্তয়ে।।৯

অনুবাদ ঃ "(১) সর্বহিতকারী যজ্ঞের পুরোহিত যজ্ঞের প্রকাশক সদা অনুকূল যজ্ঞকর্ম সম্পাদনকারী দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী; হে অগ্নি আমি তোমার স্তুতি করি।

(২) অগ্নি পূর্বে ঋষিদের স্তুতিভাজন ছিলেন। নূতন ঋষিদেরও স্তুতিভাজন। অগ্নিদ্বারাই শরীরে দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। শরীর থেকে অগ্নিদেব নির্গত হলে বা চলে গেলে সমস্ত দেব এই শরীরকে ত্যাগ করেন।

(৩) অগ্নিদ্বারা যজ্ঞকর্তা, যজমান ধনলাভ করেন, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধি পায় ও যশযুক্ত হয় এবং তা দিয়ে অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

(৪) হে অগ্নি, তুমি যে যজ্ঞকে সকল দিক দিয়ে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছ, তা নিশ্চয়ই হিংসাশূন্য বা হিংসারহিত এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহে দেবগণের সমীপে গমন করে।

(৫) দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞ নিষ্পাদনকারী, জ্ঞানীগণের কর্মশক্তির প্রেরক, সত্যপরায়ণ, প্রভূত ও বিবিধ কীর্তিযুক্ত, হে তেজস্বী অগ্নি, দেবগণের সঙ্গে এই যজ্ঞে আগমন করো।

(৬) হে অগ্নি, তোমাকে যাঁরা অর্ঘ্যদান অথবা আত্মদান করে তুমি সেই দানশীলদের মঙ্গল বা কল্যাণ করো। এই মঙ্গল বা কল্যাণকর্ম প্রকৃতই তোমার যোগ্য।

(৭) হে অগ্নি, আমরা তোমার যজমানেরা, প্রতিদিন-প্রতিরাত তোমাকে প্রণাম করতে করতে যেন তোমার নিকট উপনীত হই। যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই এবং ধ্যানের দ্বারা তোমাতে যেন মিশে যাই।

(৮) দীপ্যমান, হিংসারহিত, যজ্ঞের রক্ষক, অটল সত্যের প্রকাশক অথবা সম্পদে বিপদে তুমি সত্যের রক্ষক। স্বভবনে নিত্য বর্ধিষ্ণু ও সত্যস্বরূপ পরম ঈশ্বর তুমি। এই কারণে তোমার ভজনা করি।

(৯) পিতা যেমন পুত্রের কল্যাণকারী ও সহায়ক, হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকট সেরূপ হও। হে অগ্নি কল্যাণময় জীবন-যাপনের জন্য তুমি আমাদের নিকট বাস করো।"

তাৎপর্য ঃ উল্লিখিত 'অগ্নিসূক্তে' অগ্নির উদ্দেশে যে-সকল বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, এ সকল বিশেষণ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতার উদ্দেশেই বলা হয় এবং বলা হয়েছেও। এটি ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বিশ্বমিত্রের পুত্র মধু ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। মন্ত্রের দেবতা অগ্নি—দেবতা কী? দিব্যগুণযুক্ত পদার্থকে দেবতা বলা হয়। 'দিব্' থেকে 'দেব' কথাটি এসেছে। বেদে প্রাতিপাদিকরূপে (নাম বা শব্দের পরিপক্ক বা সিদ্ধরূপ, যাতে ধাতু এবং বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়নি) 'দিব' এর ব্যবহার আছে, ধাতুরূপে নেই। ঋষি অনির্বাণের ভাষায়—"প্রাতিপাদিক 'দিব' দ্যুলোক, আলোঝলমল আকাশ। আকাশে যতক্ষণ আলো আছে, ততক্ষণ 'দিবা'। দিব্ দিবা দেব তিনটি শব্দে একই ভাবনার প্রকাশ। সে-ভাবনা আলোর। অতএব দেবতার স্বরূপ হল আলো। বাইরে যা আলো, অন্তরে তাই বোধ বা জেগে ওঠা, 'চিত্তি' বা বিবেক; তার ফলে 'প্রজ্ঞান' 'সংজ্ঞান' ও 'সংবিৎ'। এমনি করে সাধ্য দেবতা সাধকের আত্মভূত হন।" (বেদ-মীমাংসা, ২য় খণ্ড, অনির্বাণ)।

বেদ বলেছেন—এই মহাবিশ্বে সত্য বা নিত্যবস্তু একটিই—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের অনেক নামের মধ্যে একটি নাম 'অগ্নি'। অর্থাৎ অগ্নি পরব্রহ্মেরই নাম। অগ্নি ভাগবতী ইচ্ছাশক্তি তথা ব্রহ্মের জ্ঞানময় তপশক্তি।

মানুষের মধ্যে এই অগ্নিই তাঁর অন্তরাত্মার ঊর্ধ্বায়নের শক্তি। সাধারণ বা প্রকৃত অবস্থায় এই অগ্নিশক্তি থাকে দেহগত চেতনার মধ্যে সুপ্ত বা বিমূঢ় অবস্থায়। আমাদের দেহগত চেতনার মধ্যে যে অগ্নিশক্তি সুপ্ত বিমূঢ় অবস্থায় আছে, তাকে সাধন-যজ্ঞের বা জীবন-যজ্ঞের পূর্ণতার জন্য আগে জাগাতে হবে। কারণ সাধককে সাধনার উত্তুঙ্গভূমিতে আরোহণ করতে হবে। এই উত্তুঙ্গ ভূমিতে সাধককে আরোহণ করাতে সক্ষম এক দেহাধিষ্ঠিত পুরুষের সুদৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্পশক্তির তপস্তেজ—এই তপস্তেজই অগ্নি, তাই তিনি যজ্ঞের পুরোহিত। এই তপস্তেজরূপী অগ্নিশক্তি যা সাধকের দেহগত চেতনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকে তা সাধনায় জাগ্রত হয়ে সাধককে পার্থিব বা ভৌমচেতনা থেকে নিয়ে যায় ভূমাচেতনায়। যেখানে পৌঁছে সাধকরূপী নর হয় নারায়ণ অথবা সাধকরূপী জীব হয় শিব। সাধকের তপোরূপ, সংকল্পরূপ অগ্নিই, সাধকের আসুরী বা জড়ীয় সত্তাকে দেবসত্তা বা পরম সত্তার কাছে নিবেদন করে। এটাই অগ্নির হবি বহন কর্ম। অগ্নি হল সৃষ্টির, স্থূলসৃষ্টির অন্তরে ভাগবত শক্তি। মর্ত্যে মানুষের মধ্যে অমর্ত্য আস্পৃহা। অগ্নির ব্রত হল দেবতাদের কাছে হবিভাগ (যজ্ঞে অর্পিত দ্রব্য, ঘৃত ইত্যাদি) পৌঁছে দেওয়া। তাই তাঁর আর এক নাম হব্যবাহন। যজ্ঞোপলক্ষে আমাদের যে দান তা তিনি দেবতাদের নিকট নিয়ে যান। যজ্ঞ অর্থ উৎসর্গ বা আহুতি প্রদান। ঊর্ধ্বস্তর চেতনায় অধস্তর চেতনার আহুতি প্রদানই যজ্ঞ। তাই আহুতি বা হবিদানের অর্থ আত্মনিবেদন বা আত্মহুতি। এইভাবেই দেবতাদের আহ্বান করা হয়, তাঁরাও অর্থাৎ দেবতারাও মানুষী চেতনায় এসে প্রকাশিত বা প্রকটিত হন। মানুষ ও দেবতার মধ্যে তিনি দৌত্যকর্ম সম্পন্ন করেন। তাই তিনি আমাদেরও পুরোহিত, দেবতাদেরও পুরোহিত।

উল্লিখিত 'অগ্নিসূক্তে' 'অগ্নি' শব্দটির সঙ্গে পাঁচটি বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে—'পুরোহিতম্', 'যজ্ঞস্য দেবম্', 'ঋত্বিজম্', 'হোতারম্' ও 'রত্নধাতমম্'।

'অগ্নি' পুরোহিত, কেন না তিনি পুরঃ অর্থাৎ অগ্রে বা সম্মুখে থেকে সাধক বা যজমানের হিতসাধন করেন। হিতের জন্য তিনি অগ্রে অগ্রণী বা অগ্রবর্তী হন, তাই অগ্নি নামে অভিহিত হন। আবার 'পুর' শব্দের অর্থ দেহ, গৃহ, নগর। তিনি দেহরূপ গৃহে থেকে সাধক বা যজমানের সর্ববিধ হিতসাধন করেন—তাই তিনি পুরোহিত। আবার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুর বা দেহেও তিনি অন্তর্যামীরূপে বিরাজিত থেকে সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করেন। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করেন।

'যজ্ঞস্যদেবম্'—অর্থাৎ অগ্নিই যজ্ঞের দেব। এই অনন্ত বিশ্ব এক বিশাল বা অন্তহীন যজ্ঞ বিশেষ। এই যজ্ঞে পরম পুরুষ সর্বদা নিজেকে আহুতি দিচ্ছেন যজ্ঞীয় দ্রব্যরূপে, আবার আহুতি গ্রহণ করছেন অগ্নি হয়ে অগ্নিমুখে। তাঁর এই আহুতি দেওয়া এবং নেওয়ার শেষ নেই—তাই এ যজ্ঞ অন্তহীন। তিনিই অগ্নিরূপে এই যজ্ঞের দেব।

'ঋত্বিজম্' পরমাত্মার তপঃ শক্তিরূপ অগ্নি, সৃষ্টিরূপ যজ্ঞের ঋত্বিক। 'ঋত্বিক' পদটি আবাব ঋতুবাচকও। যজ্ঞের সাধনার সাথে ঋতুর যোগাযোগ আছে। সৃষ্টিতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ষড়ঋতু বছরে বছরে বারবার আসে এবং পরমাত্মার গুণগান করে। "ঋতৌ ঋতৌ যজতি"—অর্থাৎ ঋতুতে ঋতুতে যাঁর আরাধনা হয় তিনিই ঋত্বিজ্ বা ঋত্বিক। আবার ঋত্বিজ বা ঋত্বিক্ শব্দটির মূলে আছে ঋত—যার এক অর্থ সত্য। অগ্নিই 'ঋত্বিজ্ বা ঋত্বিক' কেন না তিনি ঋতসাধক বা সত্যসাধক দ্বারা আরাধিত।

'হোতারম্'—অগ্নি হোতা বা আহ্বায়ক। পরম পুরুষসহ সকল দেবগণকে, সমগ্র জগৎকে তিনি আহ্বান করে নিয়ে আসেন, তাই তিনি হোতা। আর্য সমাজী বেদানুগামীদের মতে, তিনি (অগ্নি) সাংসারিক ভোগ্য পদার্থসমূহ দান করেন তাই তিনি হোতা।

অগ্নি 'রত্নধাতমম্'। সকল দেবতাই 'রত্নধা' অর্থাৎ ধনরত্ন প্রদান করেন। অগ্নি রত্নধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—কারণ তিনি পার্থিব রত্নের সাথে সাথে আমাদের জ্ঞান-ভক্তিরূপ রত্নও প্রদান করেন। আর্য সমাজের বেদানুগামীদের মতে 'রত্ন ধাতমম্' শব্দটির অভিপ্রায় হচ্ছে, সৃষ্টির সাথে সাথে কিছু অমূল্য উপকারী পদার্থ বা রত্ন আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। যথা—আমাদের এই শরীররূপ রত্ন অদ্ভুত

গুণযুক্ত। এই শরীররূপ রত্ন পালন-পোষণের জন্য আমরা এমন অনেক পদার্থ বা রত্ন পেয়েছি, যার দ্বারা আমাদের জীবনরত্ন চলতে থাকে। যথা—বায়ু, অগ্নি, জল, প্রকাশ ইত্যাদি। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী 'অগ্নি' শব্দের অর্থ করেছেন—পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, জীবাত্মা, অধ্যাপক, রাজা, সেনাপতি, পার্থিব অগ্নি, সূর্য, প্রাণ, মন, বাণী ইত্যাদি। এই অর্থগুলির মধ্যে অগ্নি শব্দের একটি অর্থ হল পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। ঋষি অরবিন্দের মতে অগ্নি পরব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের তপঃশক্তি। এই শক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। এই তপঃশক্তি দ্বারা পরমেশ্বর সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করেন বা সবকিছু সৃষ্টি করেন। তপঃশক্তি থেকে নির্গত হয় যে শক্তি তার নাম তেজশক্তি। বেদ মতে এই তেজের তিনটি মূর্তি,—উর্ধ্বলোকে তিনি সূর্য, মধ্যে বা অন্তরীক্ষে তিনি বিদ্যুৎ এবং মর্ত্যভূমিতে তিনি 'অগ্নি'। অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে বস্তুত একই। আর্য ঋষির সাধনায় সূর্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বেদ মতে সূর্যই বিশ্বাত্মা বিশ্বজীবন। উর্ধ্বলোক হতে তাঁর তাপ এবং আলো ঝরে পড়ছে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু এই মর্ত্যলোকে জ্যোতির উৎস সূর্যকে স্বরূপে আমরা কোথায় পাচ্ছি? ঋষি অনির্বাণের ভাষায়—"পাচ্ছি অগ্নিতে। যেমন দ্যুলোক সূর্য, তেমনি পৃথিবীতে অগ্নি এই দুটি বিবস্বৎ জ্যোতি আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ। জ্যোতিই দেবতার স্বরূপ। একটি দেবতা 'অবম' বা সবার নিচে, আরেকটি দেবতা 'পরম' বা সবার উপরে। এখানকার এই দেবতাকে ধরে পৌঁছাতে হবে ওখানকার ওই দেবতাতে; এই জ্যোতিরুদ্‌গমনই আর্যের পুরুষার্থ।

পার্থিব অগ্নির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাতে তাকে অতি সহজেই অধ্যাত্ম ভাবনার আলম্বনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। অগ্নির আলো আছে এবং তাপ আছে; এ দুটি যথাক্রমে প্রজ্ঞা এবং প্রাণের (শক্তির) প্রতীক। অগ্নির শিখা কখনও নিম্নগামী হয় না; এটিকে অধ্যাত্ম চেতনার উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দ্যোতকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিখা উর্ধ্বে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়; অভীপ্সারও শেষ পরিণাম ব্রহ্মনির্বাণ, আবার অগ্নি ইন্ধনে নিগূঢ় থাকে, প্রথমটায় তার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় না; কিন্তু মন্থনে বা অন্য অগ্নির সংস্পর্শে ওই ইন্ধনেই অগ্নির আবির্ভাব হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা

ইন্ধনকে আত্মসাৎ করে অগ্নিময় করে তোলে। দিব্যভাবনায় মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার এটি চমৎকার উপমা।" (বেদ-মীমাংসা, ২য় খণ্ড, অনির্বাণ)।

অগ্নির তেজ বা দহন শক্তি ইন্ধনকে যেমন অগ্নিময় করে তোলে, তেমনি মানুষের অন্তরস্থিত চিদাগ্নি বা জ্ঞানাগ্নি তপঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এবং মানুষের অন্তরস্থিত পাপসমূহকে দগ্ধ করে তাকে শুচিসুন্দর ও চিন্ময়ত্ব প্রদান করে।

উল্লিখিত মন্ত্রে অগ্নিদেবকে 'কবিক্রতু' বলা হয়েছে। কবি বলতে মন্ত্রদ্রষ্টা বা সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বোঝায়। বেদমন্ত্রের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যকে যাঁরা দর্শন করেছেন তাঁরাই কবি। নিরুক্তকার যাস্ক-এর মতে 'কবি' অর্থ ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ যারা ত্রিকালদর্শী বা সর্বজ্ঞ। বেদে কবি বা ঋষি সমার্থক। আমার আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেছেন, "'কূ' ধাতু হতে কবি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'কূ' ধাতুর অর্থ আকুতি প্রকাশ করা। তাঁর (অগ্নিরূপী পরমাত্মার তপঃশক্তি) আকুতিই এই সৃষ্টি। সহজ ভাষায় কবির অর্থ সর্বজ্ঞ। যিনি সৃষ্টি রহস্যের সবকিছু জেনে নিজের ভাবে নিজে বিভোর হয়ে থাকেন। এই কবির ভাব বা কল্পনাই সৃষ্টিরূপে ফুটে ওঠে। এই মহাকবির স্বপ্নই এই বিচিত্র জগদাকারে মহাকালের বক্ষে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। বেদ ঘোষিত এই মহাকবির সৃষ্টিরূপ মহাকাব্যই মহাকালের রঙ্গমঞ্চে সর্বদা অভিনীত হচ্ছে। বেদের ঋষিকবি বিচরণ করেন বোধি বা আত্মানুভূতির মাঝে। কবির ভাব বা স্বপ্নকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করতে পারে তপোদৃপ্ত বুদ্ধি বা মনীষা। এই তপোদৃপ্ত মনীষাই সৃষ্টিশক্তি। তাই তিনি কবি। শুধু কবি নন, তিনি (অগ্নি) কবিক্রতুও। ক্রতু শব্দের সাধারণ অর্থ যজ্ঞ। যজ্ঞের অগ্নিতে অর্পিত দ্রব্য যেমন অগ্নিময় হয়ে অগ্নি স্বরূপতা লাভ করে, তেমনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, ভগবৎ চিন্তায় তন্ময় হয়ে সাধক ভগবৎ স্বরূপ লাভ করে। 'কৃ' ধাতু হতে ক্রতু শব্দ নিষ্পন্ন। 'কু' ধাতুর অর্থ সৃষ্টি প্রতিভা বা সৃষ্টি সামর্থ্যতা। বেদে ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি—এই তিনটি দেবতার বিশেষ প্রাধান্য আছে। ইন্দ্র বিশ্বমনের (Universal mind) প্রতীক। এই বিশ্বমনের ভাবনাই বিশ্বরূপে, সৃষ্টিরূপে ফুটে উঠেছে। বায়ু বিশ্বপ্রাণের (Univerrsal life force) প্রতীক। এই বিশ্বপ্রাণ হতেই ব্যষ্টিপ্রাণ বা ব্যষ্টিজীবের আবির্ভাব। অগ্নি বিশ্বশক্তির (Universal energy)

প্রতীক। এই অগ্নিই বিশ্বভুবন সৃষ্টি বা রচনা করে চলেছে—এই জন্যই অগ্নিকে বলা হয় 'কবিক্রতু'। অর্থাৎ, অরূপকে রূপে পরিণত করার দিব্যপ্রতিভা বা দিব্যশক্তি যাঁর মাঝে আছে তিনি 'কবিক্রতু'। উপনিষদের ঋষির ভাষায়—'অগ্নির্যথৈকং ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'। এই ব্রহ্ম শক্তি রূপী অগ্নি বিশ্ব ভুবন গড়ে তুলেছেন। এই অগ্নি বিশ্বভুবনে প্রবেশ করে ব্যষ্টিজীবরূপে অসংখ্য দেহধারী প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। এই অগ্নিই "জাতং জাতং বেত্তি ইতি জাত বেদা"—অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে যিনি জানেন তিনিই জাতবেদা অগ্নি, অথবা "জাতানি সর্বানি ভূতানি বেদ"—অর্থাৎ যিনি সমস্ত উৎপন্ন জীবসমূহকে জানেন তিনিই জাতবেদ।" (শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রণীত উপনিষদ গ্রন্থাবলী)। বৈদিক 'নিরুক্ত' মতে এই জাতবেদা অগ্নির তিনরূপ—অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্য। পৃথ্বীলোকের দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষলোকের দেবতা বিদ্যুৎ এবং দ্যুলোকের দেবতা সূর্য। আধুনিক সভ্যতা পরোক্ষভাবে বহিরাগ্নিরই উপাসক। কাঠ, কয়লা, কেরোসিন, জল ও পেট্রল প্রভৃতিতে যে fire captivated হয়ে আছে সেই fire-কে মোক্ষণ করে আধুনিক সভ্যতার ইমারত তৈরি হয়েছে বা গড়ে উঠেছে।

ঋষির কাছে অগ্নি হচ্ছেন ইহলোক ও পরলোকের সেতুস্বরূপ। আচার্যদেব শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের ভাষায়—"অজ্ ধাতু হইতে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। অজ্ ধাতুর অর্থ অগ্রসর হওয়া। আমাদের এই মৃন্ময় দেহাধারে অন্তর্নিহিত আছে আত্মস্বরূপানুভবের আকৃতি, আত্মসাক্ষাৎকারের অভীপ্সা—ইহাই আমাদের অন্তঃস্থিত অগ্নির স্বরূপ। এই অগ্নিই আমাদের মৃন্ময় আধারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়ে দ্যুলোকের পানে লেলিহান শিখা বিস্তার করেন।" (শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রণীত উপনিষদ গ্রন্থাবলী)।

এই অগ্নিই Matereal energy এবং spiritual energy-র মধ্যে সেতুর কাজ করে। এই অগ্নিই Solar energy বা সৃষ্টি তত্ত্ব। আমাদের সবার মাঝে এই অগ্নি চেতনারূপে বিরাজ করেন। অগ্নিই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর ধারক। বেদের ভাষায় এই অগ্নিই 'এতদ্বৈতৎ'—অগ্নিই ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মস্বরূপ এই অগ্নির সাথে বেদের ঋষি একাত্মতা অনুভব করে বলেছেন—'অগ্নিরহমস্মি জন্মনা জাতবেদাঃ'—অর্থাৎ "যিনি সৃষ্টিকে জানেন, যিনি সৃষ্টিকে রূপায়িত করে

তোলেন—সেই অগ্নি আমারই আত্মস্বরূপ। আমিই সেই অগ্নিস্বরূপ।" পৃথিবীর সর্বমানবের প্রতিভূস্বরূপ হয়ে জীবন্মুক্ত ঋষি এই অগ্নিকেই আবাহন করেছেন—হে অগ্নি, কল্যাণময় জীবন অতিবাহিত করার জন্য তুমি আমাদের সাথে সর্বদা বিরাজ করো।

নাসদীয় সূক্ত

ঋক্ বেদ, ১০/১২৯ সূক্ত। দেবতা, পরমাত্মা।
ঋষি, প্রজাপতি। ত্রিষ্টুপ্, ছন্দ।

"নাসদাসীন্নো সদা সীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।। ১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্বান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস।। ২
তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেহ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম।
তুচ্ছোনাভ্ব পিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।। ৩
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেত প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।। ৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।। ৫
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব।। ৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।। ৭

অনুবাদ ঃ (১) মহাপ্রলয়কালে অসৎ অমূর্ত কিছু ছিল না, সৎ মূর্তও কিছু ছিল না।

তৎকালে লোকসকল ছিল না (পৃথিবী আদি লোক)। আকাশ ছিল না, আকাশের পর যাহা তাহাও ছিল না। কোথাও কিছু আবরণের যোগ্য পদার্থও ছিল না, কাহার সুখ দুঃখ ভোগের জন্য থাকবে? কোথায় কার আশ্রয় ছিল? জীব ছিল না, গহর গভীর সমুদ্র কি তখন ছিল? অর্থাৎ এসব অনিশ্চিত ছিল।

(২) তৎকালে মৃত্যু ছিল না, অমরত্ব বা অমৃত ছিল না। সূর্য ও চন্দ্রের অভাবে রাত্রি-দিন ছিল না—অর্থাৎ কালের অভাব ছিল। কেবল তিনি একমাত্র বস্তু বা তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, বায়ু ব্যতিরেকে শ্বাস নিচ্ছিলেন। অর্থাৎ তৎপদবাচ্য পুরুষ স্ব-স্বরূপে একক ছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য অপর কিছু তখন ছিল না।

(৩) সৃষ্টির পূর্বে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। এইসব দৃশ্য প্রপঞ্চ কারণ-সলিল সহ একীভূত ছিল। এই বিশ্ব ছিল মায়া বা অসৎ-এ আবৃত। জ্ঞানময় তপঃশক্তির মহিমায় জন্ম নিলেন সেই অদ্বিতীয় সত্তা বা এক।

(৪) সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথমে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মনে সৃষ্টি নির্মাণের সংকল্প জাগ্রত হল। এর ফলে মনেতে অগ্রে কামের উদয় হল বা আবির্ভাব হল এবং তাহাতে সর্বপ্রথম সৃষ্টির কারণ নির্গত হল। যখন প্রথম মানস সৃষ্টি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হলেন, তখন বিশুদ্ধ হৃদয়ে মনীষা সম্পন্ন ক্রান্তদর্শী কবিগণ বিচার করে জানলেন এই সৃষ্টির অর্থ অসতের দ্বারা সতের বন্ধন।

(৫) রেতোৎপন্ন জীব ও অচেতন ভোগ্য-মহিমা সকল উৎপন্ন হল। সূর্যকিরণ সদৃশ সৃষ্টির বীজ ধারণকারী পুরুষ অর্থাৎ ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তুসমূহ উৎপন্ন হল। ওদের রশ্মি দু-পাশে ও নিচের দিকে এবং ঊর্ধ্বদিকে বিস্তারিত হল। স্ব-স্বরূপে স্থিত পুরুষ রইলেন অন্তরালে এবং ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি উপরে স্থিত হলেন।

(৬) এই সৃষ্টি কোন উপাদানে কোন নিমিত্ত কারণে বা কারণ হতে 'জাত' তা কেই বা সম্যকরূপে জানে? কে ইহলোক তত্ত্ব বলতে পারে? দেবতারা তো সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হয়েছেন। অতএব এই সৃষ্টি কোথা হতে উৎপন্ন হল তা কেই বা জানে? অর্থাৎ কেউ জানে না।

(৭) এই সৃষ্টি যাহা হতে উদ্ভূত তিনি কি মায়া বা প্রভু? সেই পুরুষ কি ইহাকে ধারণ করেন বা ধারণ করেন না? হে বৎস, যিনি অধ্যক্ষ পুরুষ পরমব্যোমে বাস করেন (হৃদয়াকাশে অন্তর্যামীরূপে) তিনিই এইসব জানেন অথবা তিনিও জানেন না।

তাৎপর্য ঃ উল্লিখিত 'নাসদীয় সূক্তে' ৭টি ঋক্ আছে। ঋক্ বেদের এই সূক্তে পরমাত্মাই বিষয়। প্রাচীন ঋষিগণ ঋক্ বেদাদির অনেক সূক্তের নাম, সূক্তটির প্রথম শব্দে উল্লেখ করে রেখেছেন। যাতে শব্দ বা মন্ত্রনিহিত অর্থটি সুগম হয়। ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সংখ্যক সূক্তের এক থেকে সাত সংখ্যক পর্যন্ত মন্ত্রগুলিকে 'নাসদীয় সূক্ত' নামে অভিহিত করা হয়। **'নাসদীয় সূক্ত'টি সমগ্র বৈদিক দর্শনের মূলমন্ত্র বলে অনেক বেদবিদ্ মনে করেন।** অদ্বৈতবাদীরা নিজমত সমর্থনের পক্ষে সূক্তটির ব্যাখ্যা করেছেন বা করেন। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও নিজ দার্শনিক মত বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য সূক্তটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। যিনি পরমাত্মা তিনি অকর্তা, অভোক্তা, নিষ্ক্রিয়। জীবাত্মাকে কর্তা-ভোক্তারূপে অজ্ঞানীগণ দেখে থাকেন। এই অজ্ঞানের জন্য যে চিত্ত- বিভ্রম তা দূরীকরণের জন্য বেদের উপনিষদ ভাগের প্রয়োজন। 'ছান্দোগ্য-উপনিষদের' ঋষি আরুণিপুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিচ্ছেন—

"সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ একমেব অদ্বিতীয়ম্।
তৎ হ এক আহুঃ অসবেদগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্;
তস্মাৎ অসতঃ সজ্জায়তঃ।। ১।।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় খণ্ড)।

অনুবাদ ঃ "আরুণি বললেন হে সৌম্য, উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপই ছিল। এ-বিষয়ে অপরে বা কেহ কেহ বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ-অবিদ্যমান-অভাব স্বরূপই ছিল। সেই অসৎ হতেই এই সৎস্বরূপ জগৎ উৎপন্ন হয়েছে।" যা থাকে না তাকে অভাব বা অসৎ বলে। এক এবং অদ্বিতীয় সেই অসৎ থেকেই এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি। ঋষি আরুণি পরবর্তী মন্ত্রে পুত্রকে বললেন—"কুতস্তু খলু সৌম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথম্ অসতঃ সজ্জায়েতেতি? সত্তেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।।" অর্থাৎ "পিতা আরুণি বললেন, হে সৌম্য, কোন প্রমাণ অনুসারে এরূপ হতে পারে? কী প্রকারে অসৎ হতে সৎ-এর উৎপত্তি হতে পারে? পুত্র, যাঁরা বলেন আগে কিছুই ছিল না, এক এবং অদ্বিতীয় সেই অসৎ নামে কিছু-না বা অবিদ্যমানতা থেকে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। সবার আগে এক এবং অদ্বিতীয় একটি অখণ্ড সত্তা ছিল বা সৎবস্তু ছিল, তা থেকেই এই জগৎ উৎপত্তি হয়েছে।"

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ১৬ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"—অর্থাৎ "অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সৎবস্তুর অনস্তিত্ব বা নাশ নাই।" সৎ (আত্মা, ব্রহ্ম)-এর কখনও বিনাশ হয় না। কারণ আত্মার সত্তা তিনকালে অবাধিত বা অখণ্ডনীয়। আত্মা ব্যতীত অন্য সবকিছুই অসৎ। কারণ তাদের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র সৎ। তিনি অবিদ্যার দৃষ্টিতে উৎপত্তিবিনাশাদি ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রতিভাসিত হন।

সুতরাং 'নাসদীয় সূক্তে' অদ্বিতীয় পুরুষের অবস্থিতি মাত্র সত্য—আর সব অসত্য।

এটাই অপ্রকাশের প্রকাশ ও শ্রুতির মহিমা। ঋক্ বেদের এই 'নাসদীয় সূক্তে' পরব্রহ্মের কোনও বিশেষণ না দিয়েই জগতের আরম্ভে সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, যাহা কিছু ছিল একই ছিল। নাসদীয় সূক্তের মূল বক্তব্য বিষয় এটাই। সূক্তটিতে সৃষ্টির পূর্ব-অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত 'সূক্তে' সৃষ্টির মুহূর্তটি ছিল এক অনির্বচনীয় অবস্থার মধ্যে। সৎ-অসৎ তাঁর বিশেষণ মাত্র। বিশেষ্যটি হল—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। যিনি পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্বে জীব এবং জড় এই পরব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় লীন থাকে। এই অপূর্ব অব্যক্ত অবস্থার কাব্যিক বর্ণনা ঋক্ বেদের নাসদীয় সূক্তটি।

সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিতে ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থার বর্ণনা। সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে ঋষি বলছেন—"কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি"—অর্থাৎ প্রথমে কাম উৎপন্ন হল। কাম অর্থাৎ পরমব্রহ্মের দিব্য সংকল্পকেই এখানে কাম বলা হয়েছে। ফলে মায়াতীত ব্রহ্ম হলেন মায়াবিষ্ট। এই মায়া উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকেই হল জগতের সৃষ্টি। পরিশেষে 'নাসদীয় সূক্ত' আমাদের কী আদেশ বা নির্দেশ করে তা চিন্তনীয়। নির্দোষ অদ্বিতীয় পুরুষ বা পরমব্রহ্ম একই সমভাবে আছেন, শ্রুতি মতে এটা অতীব সত্য। মায়া বা অবিদ্যার স্থান সেখানে নেই—এই জন্যই সৃষ্টিকে মিথ্যা বলা হয়। তিনি প্রকাশস্বরূপ। সেখানে মায়া বা অবিদ্যা থাকতে পারে না। অঘটন-ঘটন পটিয়সী মায়ার জন্যই সৃষ্ট জগৎ নানা বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকট হয়। মায়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই সূক্ত অবলম্বনেই আচার্য শঙ্কর মায়াবাদ খণ্ডন করে তাঁর অদ্বৈতবাদ মত প্রতিষ্ঠা করেন। সূক্তটিতে

সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিচার বা মীমাংসা করা হয়েছে। এই জন্য সূক্তটিকে 'সৃষ্টিসূক্ত' বা 'সৃষ্ট্যুৎপত্তি সূক্ত' নামেও অভিহিত করা হয়। সূক্তটির তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে সৃষ্টির পূর্বেকার অবস্থা বা স্থিতির বর্ণনা। এই সময় বা এই অবস্থায় সৎ-অসৎ, মৃত্যু-অমৃত, রাত্রি-দিবস কিছুই ছিল না। কেবল একমাত্র পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় ভাগে বলা হয়েছে যে, নামরূপহীন একমাত্র সত্তা বা পরব্রহ্ম বিদ্যমান ছিল। তাঁর মহিমাতেই জগৎ-সংসার উৎপন্ন হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে, সৃষ্টিরহস্য যে দুর্জ্ঞেয় তা নির্ণয় করা হয়েছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ নেই যে বলতে পারে এই সৃষ্টি কেমন করে উৎপন্ন হয়েছে। এমনকি সামর্থ্যবান দেবতাদের কাছেও সৃষ্টিরহস্য অজ্ঞাত। কেন না সৃষ্টি রচনার পরই তাদের আবির্ভাব হয়েছে। সংসারে সৃষ্টির পরম গূঢ় রহস্যকে যদি কেউ জেনে থাকেন, তবে তিনি সৃষ্টির অধিকর্তা পরব্রহ্ম—তিনি ছাড়া এই সৃষ্টির রহস্যকে কেউই জানেন না। ভারতীয় বৈদিক দর্শনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে এক সর্বোচ্চ সত্তা বিদ্যমান। যার নাম রূপ কোনও কিছুই নেই। 'নাসদীয় সূক্তে' এই পরমসত্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

হিরণ্যগর্ভসূক্ত

ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের ১২১ সংখ্যক সূক্তটিকে হিরণ্যগর্ভ সূক্ত বলা হয়। এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতিপুত্র হিরণ্যগর্ভ। দেবতা 'কং' শব্দাভিধেয় প্রজাপতি। ছন্দ-ত্রিষ্টুপ। এবার সূক্তটির অধ্যয়ন শুরু করা যাক্—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূবস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ১
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ২
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৩
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যে মাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৪

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৫
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৬
আপো হ যদ্‌বৃহতীর্বিশ্বমায়ন গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৮
মা নোহিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৯
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্।। ১০"

অনুবাদ ঃ

১। সৃষ্টির উৎপত্তির প্রারম্ভে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম কেবল একাকী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলে। তিনি জাত হয়ে সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি ধারণ করে রয়েছেন এই পৃথিবী ও দ্যুলোক। ত্রিভুবনব্যাপী তাঁর দেহখানি, দ্যৌ মস্তক, অন্তরিক্ষ বপু, পৃথিবী তাঁর চরণ বা পাদস্থানীয়। সেই 'ক' স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

২। যিনি আত্মদা অর্থাৎ আত্মা বা দেহপ্রদাতা, বলপ্রদাতা, বিশ্বজগৎবাসী যাঁর উপাসনায় রত, দেবগণ যাঁর প্রশিষ্যস্থানীয়, মৃত্যু যাঁর ছায়া, কিংবা যাঁর ছায়া অমৃত এবং মৃত্যুও সেই 'ক' স্বরূপ সুখস্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

৩। যাঁর জন্য দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে থাকে, চক্ষু নিমেষ ফেলে, সেই মহান পুরুষ এই বিশ্বজগতের রাজা, যিনি দ্বিপদ দেব-মানবাদি এবং চতুষ্পদ পশু আদি সকলেরই শাসক। সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

৪। হিমবান আদি বৃহৎ পর্বতসকল যাঁর মহিমার প্রকাশক। রসময় জলধারা নদীসমূহ যার ঐশ্বর্য এবং জলপূর্ণ সমুদ্র যাঁর মহিমার কথা বলে, দশদিক যাঁর বাহুস্বরূপ, সেই পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

৫। যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকেন, যিনি সূর্যসহ স্বঃ-লোক বা স্বর্গলোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, অন্তরিক্ষ বা আকাশে যিনি জলবর্ষী মেঘরূপী বিমান সদৃশ—সেই পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

৬। আকাশ ও পৃথিবী তাঁর রক্ষণশক্তির দ্বারা দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হলে, তিনি তা মানসে অবলোকন করে আনন্দিত ও দীপ্যমান হলেন। সেই প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভকে আশ্রয় করেই সূর্য আকাশে উদিত ও উদ্ভাসিত হন। সেই হিরণ্যগর্ভরূপ পরমদেবতাকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

৭। বিশ্বমায়ায় বৃহৎ কারণ-সলিলে প্রতিবিম্বপাতে প্রজাপতির উৎপত্তি ঘটে। এটাই মায়ার গর্ভে হিরণ্যবর্ণ তেজোময় জ্যোতির্ময় পুরুষের গর্ভে শয়ন। সর্বদেবগণের প্রাণ স্বরূপ সূত্রাত্মা প্রজাপতি তখন একাই ছিলেন। তখন অন্য কিছু উৎপন্ন হয়নি। সেই হিরণ্যগর্ভরূপ পরমদেবতাকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

৮। কারণ-সলিল জাত প্রজাপতি জাত হওয়ার পরই নিজ মহিমা দ্বারা সেই বিপুল জলরাশি নিরীক্ষণ করলেন। তাঁর দর্শনের ফলে জলরাশি হতে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হল অর্থাৎ প্রজাপতি হতে দেবাদি জগতের সৃষ্টি হল। প্রজাপতি স্বয়ং দেবতাদেরও অদ্বিতীয় দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সেই হিরণ্যগর্ভরূপ পরমদেবতাকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

৯। যিনি জগতের জন্মদাতা, ধারণকর্তা ও সত্যস্বরূপ, তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন অর্থাৎ তিনি যেন আমাদের দূরে না রাখেন কিংবা তিনি যেন আমাদের প্রতি বিমুখ না হন। যিনি পৃথিবী ও দ্যুলোকের সৃষ্টিকর্তা, যিনি আনন্দবর্ধনকারী বিপুল জলরাশির মতো বিশ্বের ক্রিয়া বা কর্মধারাকে সৃষ্টি করেছেন, মনোলোকের স্নিগ্ধ আনন্দজ্যোতি চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন সেই হিরণ্যগর্ভরূপ পরমদেবতাকে আমাদের হবি-অর্ঘ্য প্রদান করব।

১০। হে প্রজাপতি আপনি ছাড়া এইসব অন্য আর কেউ নয়—অর্থাৎ সৃষ্টিতে সবকিছু রূপে আপনি নিজেকেই সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজগত জাত সমস্তকিছুই আপনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। যে কামনা নিয়ে আমরা আপনাকে আহুতি দিয়েছি, আমাদের সেই কামনা যেন সিদ্ধ হয়। আমরা যেন আধ্যাত্মিক ধনের বা সম্পদের অধিপতি হই।

তাৎপর্য ঃ ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে 'হিরণ্যগর্ভ' সূক্তটি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য হিরণ্যগর্ভের অর্থ করেছেন প্রজাপতি। তিনি হিরণ্যগর্ভ অর্থে সূত্রাত্মাও বলেছেন। পাশ্চাত্য বেদ-মনীষী পিটরসন তাঁর 'Hymns from the Rigveda' গ্রন্থে হিরণ্যগর্ভের অর্থ করেছেন 'স্বর্ণিম বীজ'।

বিদ্বৎজনদের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ বিষয়ক ধারণার মধ্যে মতান্তর থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সৃষ্টির আদিতে এমন এক দিব্যতত্ত্ব বিদ্যমান ছিল যাকে বিশ্বের বীজ, গর্ভ, ব্রহ্মের অণ্ড অথবা প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে হিরণ্যগর্ভ হচ্ছে সেই সত্তা যার গর্ভে প্রকাশক পদার্থ বীজরূপে বিদ্যমান ছিল। 'গর্ভ' গৃহেরই রূপান্তর। যেমন শিশু বা বাচ্চা বীজরূপে পিতা এবং মাতার শরীরে বিদ্যমান থাকে। বীজরূপী ওই বাচ্চা বা শিশু জন্মের সময় 'প্রজারূপে' (সন্তানরূপে) আবির্ভূত হয়, প্রজারূপী সন্তানের আবির্ভাবের ফলে পিতা 'প্রজাপতি' হয়ে যান। পিতা স্বয়ং পুত্র হয়ে যান না। যদি পিতার শরীররূপ গর্ভে পুত্রের আত্মার আগমন বা আবির্ভাব না হতো, তাহলে প্রজারূপী সন্তানও জন্মাত না এবং পিতাও 'প্রজাপতি'রূপে অভিহিত হতেন না। ঠিক এইরূপ প্রজাপতির গর্ভে সৃষ্টির বীজ বিদ্যমান ছিল। উল্লিখিত মন্ত্রে "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—এই অংশটুকুর অর্থ করতে গিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা নানা অনর্থের সৃষ্টি করেছেন। 'কস্মৈ' শব্দের অর্থ কাহাকে নয়, কিংবা "কস্মৈ দেবায়" শব্দের অর্থ কোনও দেবতাকে নয়। 'কস্মৈ' শব্দের অন্তর্গত 'ক' শব্দের অর্থ সুখস্বরূপ-আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম। "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—অর্থাৎ সুখস্বরূপ-আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আমরা উপাসনা করব।

বেদভাষ্যকার শবরস্বামী তাঁর জৈমিনীয় "পূর্ব মীমাংসা" ভাষ্যে হিরণ্যগর্ভের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াও, আরও একটি অর্থ করেছেন। তাঁর মতে 'কস্মৈ দেবায়'-র অর্থ হচ্ছে 'একস্মৈ'। এখানে ছান্দস বা বৈদিক 'এ' কার লোপ হয়ে গেছে। বেদে এইরূপ লোপের বহু উদাহরণ দৃষ্ট হয়। যথা—প্রেণা=প্রেম্না। 'ম' কারের ছান্দস বা বৈদিক লোপ (ঋক্ বেদ, ১০/৭১/১)। পরি=উপরি। তমসস্পরি। 'উ'কার-এর লোপ (ঋক্ বেদ, ১/৫০/১০)। ভাষ্যকার শবরস্বামীর মতানুযায়ী মন্ত্রটির তাৎপর্য কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনা করা, অন্য দেব-দেবীর নয়। উল্লিখিত 'সূক্তটির' মধ্যেও এই অর্থ নিহিত আছে। যথা 'সূক্তের' অন্তিম মন্ত্রে উক্ত হয়েছে—

"প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো"—অর্থাৎ হে প্রজাপতি তুমি ব্যতীত এইসব অন্য আর কেউ নয়। অর্থাৎ প্রজাপতির একত্বের উপর, গুরুত্ব বা মহত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'হবিষা' অর্থাৎ উপাসনার সমস্ত সামগ্রীর নাম হবি। ভৌতিক হোক অথবা অভৌতিক হোক, শারীরিক হোক অথবা মানসিক হোক, প্রজাপতি বা ব্রহ্মের উপাসনা মন-বচন-কর্ম এই তিনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া চাই। উল্লিখিত সূক্তটিতে যা বলা হয়েছে তার বিষয়গত সারমর্ম হচ্ছে—সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ছিলেন। ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ উপাদানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি (ঈশ্বর) সৃষ্টি নির্মাণ করেছেন এবং অদ্যাবধি ওই সৃষ্টিকে ধারণ করে আছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁরই উপাসনা করা কর্তব্য। অন্য কারোর নয়।

বেদ-মনীষী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাষায়—"সিসৃক্ষু পরমব্রহ্মের প্রথম অবস্থা, তার পরের অবস্থা হিরণ্যগর্ভ। কারণ হিরণ্যগর্ভকে প্রজাপত্য বা প্রজাপতি সম্ভূত বলা হইয়াছে, আর সর্বশেষ অবস্থা বিরাট পুরুষ—পুরুষোত্তম, তাঁহার মধ্যেই জগৎ রহিয়াছে।"

(বেদ-বেদান্ত, উত্তরখণ্ড বেদ বিচিন্তন, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী)।

আচার্যদেব শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ তাঁর উপনিষদ গ্রন্থাবলীর ভাষ্যে বলেছেন—"এই সৃষ্টির মূলে যে পরম তেজ তাহাই হিরন্ময় বা হিরণ্যগর্ভ। সমগ্র সৃষ্টি যেন একটি সপ্তদলবিশিষ্ট জ্যোতির্ময় পদ্ম, ইহার পর বা শ্রেষ্ঠ অংশই ঊর্ধ্বদ্যুলোক, অবর বা নিম্ন অংশই ভূলোক। অন্নরূপী এই বিরাট

ভূলোক, চেতনারূপী এই বিরাট দ্যুলোক—ইহারাই রজঃ বা সৃষ্টিপুষ্পের রেণু। ব্রহ্ম বিরজম্—ব্রহ্ম এই সৃষ্টির অতীত, তিনি গুণাতীত, তিনি নিষ্কলম্ বা অখণ্ড স্বরূপ। এই গুণাতীত নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম এই জ্যোতির্ময় সৃষ্টিরূপ পদ্মটিকে, হিরণ্যগর্ভকে তিনি উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছেন। এই হিরণ্যগর্ভরূপ পরমচেতনা পরমজ্যোতিঃ, তাঁহার জ্যোতিতেই উদ্ভাসিত ....। সমষ্টিভাবে যিনি হিরণ্যগর্ভকে, ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্মটিকে উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই ব্যষ্টি মানবদেহের হৃদয়পদ্মে বিরাজিত। তাঁহার চেতনাতেই জীবচেতনা প্রদীপ্ত, উদ্ভাসিত। যাঁহারা অন্তর্মুখী, যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা নিজের অন্তরে ও বাহিরে এই জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমচেতনাকে অনুভব করেন, পরব্রহ্মকে দর্শন করেন।"

পুরুষ সূক্ত

(ঋক্ বেদ, ১০/৯০), নারায়ণ ঋষি,
পুরুষ দেবতা, ছন্দ-অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্।

সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষং সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।১
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি।।২
এতবানস্য মহিমাতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।৩
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদেৎ পুরুষঃ পাদোহস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথোপুরঃ।।৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মইধ্ম শরদ্ধবিঃ।।৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষণ্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।৭
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।

পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারন্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।।৮
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসিজজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ জায়ত।।৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।।১০
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরুপাদা উচ্যেতে।।১১
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত।।১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।।১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্।।১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্তসমিধ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মানি প্রথমান্যাসন্।
তেহনাকং মহিমানঃ সচন্তযত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।১৬

অনুবাদ ঃ ১। পুরুষ সহস্র মস্তক সহস্রচক্ষু সহস্রপদযুক্ত, ভূমিসহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। যা দশ আঙুল দ্বারা নির্দেশিত দশ-দিশাস্থ তা অতিক্রম করে বিরাজিত।

২। পুরুষই এই বর্তমানে কিংবা ভূত-ভবিষ্যত দৃষ্ট দৃশ্য প্রপঞ্চ। এছাড়াও তিনি অমৃতত্ব বা মোক্ষ পদের অথবা অবিনাশী শাশ্বতের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর। যেহেতু তিনি অন্নের অর্থাৎ জাগতিক ভোগায়তনের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত বা বিরাজিত আছেন।

৩। সৃষ্টির যাবতীয় সব তাঁর মহিমা—এই মহিমা হতেও তিনি বৃহত্তর বা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তাঁর মহিমা অপার। এই বিশ্ব জীবজগৎ তাঁর একপাদমাত্র, অন্য ত্রিপাদ যা অমৃতস্বরূপ তা দ্যুলোকে অবস্থিত—অর্থাৎ চর্মচক্ষে দৃষ্ট হয় না।

৪। তাঁর তিনপাদ উর্ধ্বলোকে বিরাজিত। তাঁর অপর একপাদ এখানে এই ইহলোকে অভিব্যক্ত। সেই মায়াকবলিত পাদেই দেব-নর তির্য্যকাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হন। তিনি ভোজনকারী এবং ভোজনে রহিত—অর্থাৎ জড় চেতন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

৫। যিনি সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর হিরণ্যগর্ভরূপে স্থিত, তিনিই সমষ্টি স্থূলদেহে বিরাটরূপে প্রকট হন। তিনি জাত হওয়ার পর অপরাপর সব সৃষ্টি হল। ভূমি সৃষ্টির পর জীব দেহরূপ পুর অর্থাৎ দেহাবয়ব উৎপন্ন হয়েছে।

৬। দেবগণ পুরুষ দ্বারা প্রেরিত হয়ে হবি-দ্বারা যে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন তাতে বসন্ত ঋতু আজ্য বা ঘৃত হল, গ্রীষ্ম হল ইধম সমিধ (যজ্ঞের ইন্ধন কাষ্ঠ), এবং শরৎ হল যজ্ঞে অর্পিত হবি-স্বরূপ।

৭। অগ্রে জাত সেই পুরুষকে কুশ-বারি দ্বারা প্রোক্ষিত (সিক্ত) করে দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সৃষ্টিযজ্ঞ, পালনযজ্ঞ, সংহারযজ্ঞ।

৮। সেই যজ্ঞ হতে আহৃত হল পবিত্র যজ্ঞভাগ আজ্য, তা থেকে বায়ব্য অর্থাৎ বায়ুচর, আরণ্য বনচর এবং গ্রাম্যপশু সব সৃজন করলেন।

৯। সেই যজ্ঞ থেকে জাত হল ঋক্, সাম, যজু ছন্দসকল বা সপ্তছন্দ।

১০। সেই যজ্ঞ থেকে জাত হল অশ্বসকল এবং অন্যান্য প্রাণীসমূহ যাদের দু-পাটি দাঁত আছে। ওই যজ্ঞ থেকেই জাত হল গাভী, ছাগ ও মেষসমূহ—এইসব হতে ভিন্ন যা অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ তাও উৎপন্ন হল।

১১। পুরুষ যে দেহ ধারণ করেন তা কী প্রকার কল্পনা প্রসূত? তাঁর মুখ কী? উরু কী? হস্ত কী? শ্রীচরণ কী ? অর্থাৎ এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি সৃজিত হল?

১২। ব্রাহ্মণ হলেন তাঁর মুখস্বরূপ, রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হল তাঁর বাহু। বৈশ্য তাঁর উরুদ্বয় এবং তাঁর পদযুগল থেকে হল শূদ্রের সৃজন।

১৩। সেই বিরাট পুরুষের মন থেকে জাত হলেন চন্দ্রমা। চক্ষু হতে জাত হলেন সূর্য। মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হতে জাত হলেন বায়ু।

১৪। নাভি হতে অন্তরিক্ষ বা আকাশ, শির হতে দ্যুলোক বা স্বর্গ, চরণযুগল হতে ভূমি, কর্ণ হতে দিক্ ও লোকসকল নির্মাণ করা হল।

১৫। সেই যজ্ঞপুরুষের সপ্তআস্য (মুখ), ত্রিপরিধি ও সপ্তসমিধা ছিল। সেই যজ্ঞে যাতে দেবগণ পুরুষ পশুকে বন্ধন করে সৃষ্টি বিস্তার করেন।

১৬। যজ্ঞপুরুষ দ্বারা প্রেরিত হয়ে দেবগণ যে যজ্ঞ করেন তাহাই প্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা থাকেন, মহিমান্বিত দেবগণ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করলেন।

তাৎপর্য ঃ পুরুষ শব্দটি 'পৃ'-ধাতু থেকে উৎপন্ন—এর অর্থ পূর্ণ হওয়া। পৃ-উষ পুরুষ, যিনি পূর্ণ তত্ত্ব তিনিই পুরুষ। সমস্ত মানুষের দেহ-পুরে তিনি শায়িত আছেন, দ্রষ্টারূপে অবস্থিত আছেন। বৈদিক 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

"ইমে বৈ লোকাঃ পূরয়মেব পুরুষো যোঽয়ং পবতে সোঽস্যাং পুরিশেতে তস্মাৎ পুরুষ"—অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ ও পবিত্রকরত যিনি তাতে শয়ন করে থাকেন তাঁকেই পুরুষ বলা হয়। পুরুষ শব্দটি কর্ণগোচর হলেই আমাদের মনে একটা সাকার ভাব জাগে। হস্ত-পদ-মস্তক ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত একটা অবয়ব বা আকৃতি আমাদের মানসলোকে ভেসে ওঠে। কিন্তু মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে ঋষি জোর দিয়ে এই পুরুষ পরিচয় দিয়ে বলেছেন—"দিব্যোহ্যমূর্তঃ পুরুষঃ"—অর্থাৎ তিনি দিব্য বা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, তিনি সাকার বা সান্ত নন, তিনি অনন্ত। সমগ্র সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর এবং সমস্ত জীবের অন্তর-বাহিরে তিনিই সমভাবে বিদ্যমান। তাঁর ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, জন্ম-মৃত্যু নেই। এই ক্ষর বা সৃষ্টির মাঝে তিনি অক্ষর অবিনাশীরূপে, অনন্ত অব্যয়রূপে বিদ্যমান। গীতাকারের ভাষায় "সূত্রে মণিগণা ইব"—অর্থাৎ সূতায় গ্রথিত মণির মতো এই সৃষ্টিও তাতে গ্রথিত আছে। সমগ্র সৃষ্টিতে যে প্রাণের অভিব্যক্তি, মনের বিকাশ, তা তাঁরই শক্তি অথবা তাঁরই প্রকৃতির খেলা। মুণ্ডক উপনিষদের ভাষায়—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরূপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।।" অর্থাৎ প্রাণ-মন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, আকাশ, জ্যোতি, জল, বিশ্বধাত্রী এই পুরুষ হতে উৎপন্ন হয়। উল্লিখিত সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে দেবতারা এই পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সৃষ্টিসমর্থ প্রজাপতিগণ বা দেবগণ ও ঋষিগণ সেই পুরুষের দ্বারা মানবযজ্ঞ সম্পন্ন করলেন, স্রষ্টা পুরুষকে 'বলি' রূপে

ভাবনা করে। এটাই পুরুষ সূক্তের পুরুষ যজ্ঞ। সৃষ্টির মধ্যে পুরুষ নিজেই নিজেকে আহুতি দিয়েছেন। তিনিই যজ্ঞকর্তা ও যজমান। তিনিই ছিলেন যজ্ঞের 'বলি' বা আহুতির বস্তু (পশু)। মূলকথা, সেই পরম পুরুষ নিজেই নিজেকে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে সৃষ্টি করলেন এই বিশ্বসংসার। যজ্ঞের মাধ্যমেই তিনি হলেন বিশ্ব সৃষ্টির মূলকারণ। জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিটি বস্তুই তাঁর প্রকাশ। যজ্ঞের পূর্বে যিনি ছিলেন এক অখণ্ড, যজ্ঞ সম্পাদনের পর তিনি হলেন "বহুস্যাম্" অর্থাৎ নিজেকে তিনি বহুরূপে সৃষ্টি করলেন। যজ্ঞের সংকল্প বা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন আত্মবলিদান বা আত্মোৎসর্গ। যজ্ঞের মাধ্যমে বা প্রকারান্তরে সেই পরম পুরুষ তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জীবকুলকে—পরহিতে আত্মবলিদানের শিক্ষাও প্রদান করলেন। সূক্তটির প্রতিটি মন্ত্রে যেন ব্যাপ্ত হয়ে আছে গীতাকারের সেই মহান বাণী, যা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত হয়েছে—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা।।"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ হোমাগ্নিতে হবনীয় দ্রব্যের অর্পণকে ব্রহ্ম বলে বা ব্রহ্ম ভেবে দর্শন করেন অর্থাৎ অজ্ঞানী কর্তৃক যা হবি বা ঘৃত বলে গৃহীত হয়, তা ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। যে অগ্নিতে হোম করা হয় সেই অগ্নিকেও ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। হোমের কর্তাকে এবং হোম ক্রিয়াকেও ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন এবং সেই ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির প্রাপ্য ফলকেও ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। উল্লিখিত সূক্তটির প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" এখানে সহস্র শব্দের অর্থ অসংখ্য বা অনন্ত। সেই পুরুষের মস্তক অসংখ্য, নয়ন অসংখ্য, চরণ অসংখ্য। এর তাৎপর্য্য এই সংসারে অসংখ্য জীবের অসংখ্য মস্তক, নয়ন, চরণ সব তাঁরই। সকলের সকল অবয়ব তাঁরই অবয়ব। সকলের সকল অঙ্গই তাঁর অঙ্গ। সমগ্র বিশ্ব তাঁর মধ্যেই বিরাজিত। তিনি শুধু বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান থেকে বিশ্বময়ই নন, তিনি বিশ্বাতীতও। তাই 'সূক্তে' কথিত হয়েছে—'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'। বেদ-মনীষীদের মতে দশাঙ্গুল ব্রহ্মাণ্ডের উপলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড ও তার বাইরে সর্বদিক ব্যাপ্ত করে যিনি আছেন। আবার কোনও কোনও বেদ-মনীষীর মতে—নাভির ঊর্ধ্বে দশ আঙুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করে হৃদয়ে যিনি বিরাজ করেন।

যথা—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি" (শ্রীমদ্ভগবদ গীতা, অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৬১)। কোনও কোনও বেদ-মনীষীর মতে এই 'সূক্তের' প্রথম মন্ত্রে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ স্পষ্টকরণ করা হয়েছে। "পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ" নিরুক্তকার যাস্কাচার্যের এই মতানুযায়ী শরীরের মধ্যে অবস্থানকারী জীবাত্মাকে বা জীবাত্মারূপী পুরুষকে দশ অঙ্গুলীযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ দুই হাতওয়ালা পুরুষ বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরে শায়িত বা বিরাজিত আছেন যে পুরুষ তিনি দশ অঙ্গুলী বিশিষ্ট বা দুই হাত বিশিষ্ট পুরুষের ঊর্ধ্বে বিরাজিত। তিনি বিনা হাতে সৃষ্টি রচনা করেন, বিনা নয়নে দর্শন করেন, তিনি কর্ণ বিনাই শ্রবণ করেন। পুরুষ সূক্তের অন্তর্গত মূলতত্ত্বগুলি চার বেদেই দৃষ্ট হয়। যেমন ঋগ্বেদে ১০/৯০ সূক্ত, যজুর্বেদে ৩১ অধ্যায়ের ১-৩ মন্ত্র, সাম বেদে ৬১৭-৬২২ মন্ত্র এবং অথর্ব বেদে ১৯ কাণ্ডে ষষ্ঠ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্র। সকল বেদে মন্ত্রগুলি প্রায় একই রকম।

বেদ-মনীষী শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য তাঁর 'মর্ত্যেষু অমৃত' গ্রন্থে বলেছেন—"এই দশ অঙ্গুলী একটা আধ্যাত্মিক মুদ্রা। আমাদের অঙ্গের সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয় হাতের অঙ্গুলী দিয়ে—অর্থাৎ পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক।" পূর্বেই বলা হয়েছে—আমাদের এই দেহ-পুর যিনি পূর্ণ করে আছেন তিনিই পুরুষ। দেহের অন্তঃপুরে তিনি যেমন বিরাজ করেন তেমনি ব্রহ্মাণ্ডপুরের অভ্যন্তরেও তিনিই বিরাজ করেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডপুর ব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন তিনি। আবার 'পুর' অর্থ সকলের অগ্রবর্তী বা অগ্রে যিনি ছিলেন অর্থাৎ যার আগে আর কেউ ছিলেন না, সেই অনাদি পুরুষই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও তার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে বা ফুরিয়ে যাননি। তিনি একই সঙ্গে বিশ্বকে আবৃত করে আছেন, আবার তাকে অতিক্রম করেও আছেন।

উল্লিখিত 'সূক্তটিতে' তিনটি পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম সূক্তের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য পুরুষ। দ্বিতীয় 'তস্মাদ্বিরা জায়ত" অর্থাৎ সেই পুরুষ হতে বিরাট উৎপন্ন হলেন। ওই বিরাট হতে উৎপন্ন হলেন যিনি, তিনিই তৃতীয় পুরুষ—অধিপুরুষ।

ভাগবত মতে প্রথম পুরুষ কারণোদকশায়ী, দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী

এবং তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী। সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ যিনি, তিনি প্রথম পুরুষ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামীরূপে যিনি বিরাজ করেন তিনি দ্বিতীয় পুরুষ। দ্বিতীয় পুরুষ হতে জাত তৃতীয় পুরুষ পৃথক পৃথক ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্থূল জগৎ ব্যক্ত বা প্রকট করেন। স্বরূপত এই তিন পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, ক্রিয়া আধার ভেদে একই পুরুষের তিন নাম। সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রে বলা হয়েছে সেই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, জংঘা বা উরু থেকে বৈশ্য এবং দুই চরণ হতে শূদ্র উৎপন্ন হল। বলা বাহুল্য এই বৈদিক 'সূক্তের' দ্বাদশ মন্ত্রটির মধ্যে যে বর্ণভেদ পরিলক্ষিত হয় তা জাতিগত বা জন্মগত নয়, গীতাকারের ভাষায় তা হল "চাতুবর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ" (গীতা ২য় অধ্যায়, শ্লোক নং ১৩)। অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি। সমাজে বা রাষ্ট্রে যাঁরা জ্ঞানাদি গুণশ্রেষ্ঠ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে রত, নির্লোভী ও নিষ্কামী তাঁরাই ব্রাহ্মণ। শৌর্য বীর্য পরাক্রমাদি গুণে গুণবাণ ব্যক্তিরাই ক্ষত্রিয়। কৃষি-বাণিজ্য কর্মরূপ গুণের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরাই বৈশ্য। যাঁরা সেবারূপ কর্মগুণের দ্বারা ওই তিন বর্ণ তথা রাষ্ট্র বা সমাজের সেবা করেন তাঁরাই শূদ্র। সমস্ত সমাজ রাষ্ট্র বা বিশ্ব এবং বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি ওই বিরাট পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। কেউ ছোট বা বড় নয়। সকলেই সকলের সহযোগিতায় রাষ্ট্র বা বিশ্বের, সমাজের তথা প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশ বা উন্নয়নে ব্রতী হবে। কারণ অনেকে 'সূক্তটির' দ্বাদশ মন্ত্রের অভিধেয় অর্থের বিকৃত ব্যাখ্যা বা অর্থ করেন। অনেকে বৈদিক বর্ণব্যবস্থাকে শ্রমবিভাগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুলনা করেন। শ্রমবিভাগের আধার অর্থ-কেন্দ্রিকতা অর্থাৎ শ্রমবিভাগের মূল কেন্দ্র হচ্ছে অর্থ। অপরদিকে বৈদিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হচ্ছে প্রবৃত্তি অভিমুখীনতা। অতএব বৈদিক বর্ণব্যবস্থাকে যাঁরা শ্রমবিভাগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুলনা করেন, তাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির মূল তত্ত্বকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি।

ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতিতে শ্রমের বিভাগ বা বিচার 'চতুরাশ্রম' ব্যবস্থাতেই নিহিত আছে, বর্ণব্যবস্থায় নয়। 'শ্রম' শব্দের অর্থ পরিশ্রম বা ধনোপার্জনের নিমিত্ত কৃত কর্ম, বৈদিক চতুরাশ্রমে চারটি আশ্রমের কথা বলা হয়েছে—

ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। এই চার আশ্রমে চার প্রকার শ্রম বা মেহনতের কথা বলা হয়েছে। 'আশ্রম' শব্দের 'আ' অর্থ আবাস স্থান বা আশ্রয় স্থান। ওই চার আশ্রয় বা আবাসস্থান থেকে আপন আপন নির্দিষ্ট কর্ম দ্বারা আত্মচেতনাকে ভাগবত চেতনায় বা পরমাত্মিক চেতনায় উন্নীত করাই ছিল বৈদিক চতুরাশ্রমের লক্ষ্য। সত্ত্বঃ রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের অধীন মানুষ। সাংখ্যশাস্ত্র মতে এই তিনগুণের প্রভাবে মানুষ প্রবৃত্তির পথে চালিত হয়। বৈদিক যুগের ঋষিরা সাংখ্যশাস্ত্র বা দর্শনের এই তিন মৌলিক তত্ত্বের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে বর্ণব্যবস্থা প্রণয়ন বা প্রবর্তন করেছেন। এই বর্ণব্যবস্থা বা বর্ণবিভাগকে যথাক্রমে সাত্ত্বিক, সাত্ত্বিক-রাজসিক, রাজসিক-তামসিক এবং তামসিক এইরূপে চার পর্যায়ে বিন্যাস করে চার বর্ণের রূপ প্রদান করেছেন। এটা অর্থকেন্দ্রিক বা ব্যবসাকেন্দ্রিক পেশাগত বিভাজন নয়, এটা মানুষের মানসিক প্রবৃত্তির চার মুখ্য বিভাজন। বৈদিক বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে লিখতে গেলে একটি পৃথক বৃহৎ গ্রন্থের সৃষ্টি হবে। বৈদিক দৃষ্টিতে জীব দু-প্রকারের—প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধ । প্রবুদ্ধ জীব তিন প্রকার—জ্ঞানপ্রধান, শক্তিপ্রধান ও অর্থপ্রধান। যিনি নিষ্কাম প্রবৃত্তি পরায়ণ, সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন ও জ্ঞানের অনুরাগী, যিনি রাষ্ট্র, সমাজ তথা ব্যক্তি জীবনে জ্ঞানকেই সার্বিক উন্নতি বা বিকাশের প্রধান উপাদান বলে মনে করেন এবং এই কারণেই জ্ঞানকে প্রাধান্যতা প্রদান করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। সহজ কথায় যিনি জ্ঞান মেধা ও সত্যবাণী দ্বারা রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তির সেবা করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে তিনি সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন।

রাষ্ট্র, সমাজ তথা ব্যক্তিজীবনের উন্নতির মূল বা প্রধান হচ্ছে শক্তি—এই মনোভাব যিনি পোষণ করেন এবং তদনুযায়ী আপন শক্তি বা পরাক্রম দ্বারা রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির সেবা করেন তিনিই ক্ষত্রিয়। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে ইনি সাত্ত্বিক ও রাজসিক উভয়গুণের মধ্যে রাজসিক গুণের প্রাধান্যবশত ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হন। যিনি অর্থকে সব উন্নতির মূল বা প্রধান বস্তু বলে মনে করেন তিনি বৈশ্য। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে ইনি রাজসিক ও তামসিক গুণের সংমিশ্রণ। খাদ্য পানীয়; অর্থ সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে যিনি দেশ-দশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন তিনিই বৈশ্য। তমোগুণের প্রাধান্যবশত যাঁর

মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ বা জাগরণ ঘটেনি তিনি তমোগুণ বিশিষ্ট শূদ্র। যিনি শুধুমাত্র কায়িক শ্রমের দ্বারা অন্য তিন বর্ণের নির্দেশমতো দেশ ও দশের সেবা করেন তিনিই শূদ্র বা অপ্রবুদ্ধ জীব। বিষয়টি অন্য ভাবেও ভাবা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্র বা দেশে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা জ্ঞানে-গুণে শ্রেষ্ঠ, যাঁরা দেশের মানবসমাজের মস্তিষ্ক সদৃশ, যাঁদের ভাবনা-চিন্তা দ্বারা দেশ ও দশের মানুষ চালিত হয়, তাঁরাই ব্রাহ্মণ।

যাঁরা দেশ বা রাষ্ট্রকে বহিশত্রু এবং অন্তশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন তাঁরাই ক্ষত্রিয়। যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তোলেন তাঁরাই বৈশ্য। যাঁরা দেশের রাস্তা-ঘাটে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করে দেশের রাস্তাঘাটকে সুন্দর রাখেন তাঁরাই শূদ্র। সহজ কথায় যিনি বেদজ্ঞ ব্রহ্মবিদ এবং তপস্যাদি উত্তমগুণ যুক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি পরাক্রমী বা বলশালী, যিনি দেশের অভ্যন্তর এবং বহির্দেশ রক্ষায় সমর্থ তিনিই ক্ষত্রিয়। যিনি কৃষি বাণিজ্য, পশুপালন ও ব্যবহারে কুশল তিনি বৈশ্য। যিনি বিদ্যাহীন কিন্তু সেবায় শ্রেষ্ঠ তিনিই শূদ্র। পৃথিবীর সব রাষ্ট্র বা সব দেশেই এই বর্ণব্যবস্থা বিদ্যমান। বেদের কোনও মন্ত্রবাণীই দেশকালের সীমায় আবদ্ধ নয়—তা সর্বজনীন বা সবার জন্য। গীতার একাদশ অধ্যায়ে এই বিরাট পুরুষের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন তার অভিপ্রায় এই বিশ্বরূপী বিরাট পুরুষের শরীর দর্শন, কোনও কোনও বেদ-মনীষী এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার কোনও কোনও বেদ-মনীষী পুরুষের অর্থ করেছেন প্রাণ ও ভৌতিক জগৎ। এই ভৌতিক জগৎ ও সবার প্রাণকে যিনি পূর্ণ করে আছেন তিনিই পুরুষ। তিনিই বিশ্ব সংসারের পরমগতি ও পরমাশ্রয়। অথর্ব বেদেও এই পুরুষের বিরাট শরীরের বর্ণনা আছে।

শ্রীসূক্ত

ঋষি-আনন্দ, কর্দম, চিক্লীত ও শ্রীদ (ইন্দিরাসূত)।
দেবতা—শ্রী ও অগ্নি।
ছন্দ—অনুষ্টুপ, প্রস্তার পংক্তি এবং ত্রিষ্টুপ।

ওঁ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আ বহ।।১
তাং ম আ বহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষাণহম্।।২
অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদ প্রমোদিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপ হবয়ে শ্রীমা দেবীর্জুষতাম্।।৩
কাং সোস্মিতাং হিরণ্য প্রাকারামার্দ্রাং
জলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম।
পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং
তামিহোপ হবয়ে শ্রিয়ম্।।৪
চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মিনীমীং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে।।৫
আদিত্যবর্ণে তপসোহধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোহথ বিল্বঃ।
তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু মমান্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ।।৬
উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভূতোহস্মি রাষ্ট্রে অস্মিং কীর্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে।।৭
ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।
অভূতিম সমৃদ্ধিং চ সর্বাং নির্ণুদ মে গৃহাত্।।৮
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিনীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপ হবয়ে শ্রিয়ম্।।৯
মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি।
পশুনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ।।১০
কর্দমেন প্রজা ভূতা ময়ি সম্ভব কর্দম।
শ্রিয়ং বাসয় মে কূলে মাতরং পদ্মমালিনীম।।১১
আপঃ স্রজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে।।১২
আদ্রাং পুষ্করিনীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।

চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আ বহ।।১৩
আদ্রাং যঃ করিনীম্ যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।
সূর্যাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আ বহ।।১৪
তাং ম আ বহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবোদাস্যোহশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্।।১৫
যাঃ শুচিঃ প্রয়তো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্য মন্বহম্!
শ্রিয়ং পঞ্চদর্শর্চং চ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ।।১৬

অনুবাদ ঃ ১। হে জাতবেদা (সর্বজ্ঞ) অগ্নিদেব আপনি সুবর্ণসদৃশ রঙীন বা উজ্জ্বল প্রভা বিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ হরিতবর্ণ বিশিষ্ট, স্বর্ণ এবং রৌপ্যহার পরিহিতা, চন্দ্রবৎ প্রসন্নকান্তি, স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীদেবীকে আমার জন্য আবাহন করুন।

২। হে অগ্নিদেব! সেই লক্ষ্মী, যাঁর কখনও বিনাশ হয় না এবং যাঁর আগমনে আমি স্বর্ণ, গাভী, অশ্ব তথা পুত্রাদি লাভ করব, আমার জন্য সেই লক্ষ্মীদেবীকে আবাহন করুন।

৩। যে দেবীর অগ্রে অশ্ব এবং পিছনে রথ বিদ্যমান থাকে, যিনি হস্তীনাদ শ্রবণ করে আনন্দিত হন সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমি আবাহন করি। লক্ষ্মীদেবী আমার প্রাপ্ত হন অথবা আমি যেন লক্ষ্মীদেবীকে প্রাপ্ত হই।

৪। যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিনী, মন্দ-মন্দ বা মৃদু মৃদু হাস্যময়ী, স্বর্ণ আভরণে ভূষিতা, দয়ার্দ্র, তেজময়ী, পূর্ণকামা, ভক্তানুগ্রহকারিণী, কমলাসনে বিরাজিতা তথা পদ্মবর্ণা, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমি এখানে আবাহন করি।

৫। আমি চন্দ্র সদৃশ কান্তিপ্রভাবিশিষ্টা, সুন্দর দ্যুতিময়ী, যশ দ্বারা দীপ্তিময়ী, স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা পূজিতা, উদারশীলা, পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করি। মা, আপনার আগমনে আমার দারিদ্র্য দূরীভূত হোক। মা, আমি আপনাকে পরমাশ্রয়রূপে বরণ করি।

৬। হে সূর্যসদৃশা প্রকাশ স্বরূপা, আপনার তপোবলে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ মঙ্গলময় বিল্বতরু উৎপন্ন হয়েছে। এই বৃক্ষের ফল আপনার অনুগ্রহে আমার অন্তর এবং বাহিরের দারিদ্রকে দূর করুক।

৭। হে দেবী। আপনার প্রসাদে দেবসখা কুবের এবং তাঁর মিত্র মণিভদ্র তথা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা কীর্তি আমাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমি যেন আপনার

কৃপায় ধন এবং যশ প্রাপ্ত হই। আমি এই দেশে বা রাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়েছি। আমায় কীর্তি এবং ঋদ্ধি (সমৃদ্ধি) প্রদান করুন।

৮। মা, আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অলক্ষ্মী, যিনি ক্ষুধা এবং পিপাসায় মলিন শীর্ণকায়া, আমি তার নাশ কামনা করি। হে দেবী, আমার ঘর হতে সমস্ত রকমের দারিদ্র এবং অমঙ্গল আপনি দূর করে দিন।

৯। যিনি দুরাধর্ষা (অনতিক্রমনীয়া), নিত্যপুষ্টা, যিনি গোময়ের মধ্যে নিবাস করেন। যিনি সর্বভূতের অধীশ্বরী সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমি আমার ঘরে আবাহন করি।

১০। মা, আপনার কৃপায় আমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক, সংকল্প সিদ্ধ হোক এবং বাণী বা বাক্যের সততা আমার লাভ হোক। গাভী আদিপশু, বিভিন্ন অন্ন বা ভোগ্য পদার্থরূপে, যশরূপে হে দেবী আপনি আমার গৃহে আগমন করুন।

১১। মা, আপনার পুত্র কর্দমের সন্তান আমরা। হে কর্দম ঋষি! আপনি আমাদের এখানে আবির্ভূত হোন এবং পদ্মমালা বিভূষিতা মাতা লক্ষ্মীদেবীকে আমাদের কুলে বা বংশে স্থাপন করুন।

১২। জল স্নিগ্ধ পদার্থ সমূহ সৃষ্টি করে। হে লক্ষ্মীপুত্র চিক্লীত! আপনি আমাদের ঘরে নিবাস করুন এবং মাতা লক্ষ্মীকে আমাদের কুলে নিবাস করান।

১৩। হে অগ্নিদেব। আর্দ্রস্বভাবা, কমলহস্তা, পুষ্টিরূপা, পীতবর্ণা, পদ্মমালা বিভূষিতা চন্দ্র সদৃশ শুভ্রকান্তিযুক্তা, স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীদেবীকে আমাদের এখানে আবাহন করুন।

১৪। হে অগ্নে! যিনি দুষ্টদলনকারিণী সত্ত্বেও কোমল স্বভাবা, মঙ্গলদায়িনী অবলম্বন প্রদানকারিনী যষ্টিরূপা, সুন্দরবর্ণা, সুবর্ণমাল্যধারিণী, সূর্যস্বরূপা এবং হিরন্ময়ী, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার জন্য আবাহন করুন।

১৫। হে অগ্নে! যিনি কখনও বিনষ্ট বা নাশপ্রাপ্ত হন না সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার জন্য আবাহন করুন। যাঁর শুভ আগমনে প্রচুর ধনরত্ন, গাভী, অশ্ব, দাসদাসী এবং পুত্রাদি আমরা প্রাপ্ত হব।

১৬। যিনি লক্ষ্মীদেবীর কৃপা কামনা করেন, তিনি প্রতিদিন পবিত্র এবং সংযম পরায়ণ হয়ে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করুন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চদশ ঋচা বা মন্ত্র সমন্বিত এই শ্রীসূক্ত নিরন্তর বা নিত্য পাঠ করুন।

তাৎপর্য ঃ 'শ্রীসূক্ত' ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট বা খিল সূক্তে দৃষ্টিগোচর হয়। অথর্ব বেদেও এই সূক্তের বিবরণ পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা গ্রন্থে এই সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা ২৫ থেকে ২৮ পর্যন্ত দেখা যায়। তথাপি আমাদের দেশের বেদজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ এই সূক্তের অন্তর্গত ১৫টি মন্ত্রকে 'মুখ্য-সূক্ত' বলে মনে করেন এবং ওই ১৫টি মন্ত্রকে স্বীকারপূর্বক মান্যতা প্রদান করেন। ওই 'সূক্তের' ১৬ সংখ্যক মন্ত্রটি 'শ্রীসূক্তের' উপসংহার বলে মনে করেন। 'শ্রি' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'শ্রী' শব্দের অর্থ বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গানুসারে লক্ষ্মী, সরস্বতী, সম্পদ, শোভা, ঐশ্বর্য-আদি হওয়া সত্ত্বেও এর প্রধান অর্থ হচ্ছে পরম প্রকৃতিরূপা আদিশক্তি বা আদ্যাশক্তি। শাস্ত্রেও এই আদ্যাশক্তিকেই 'শ্রী' বলা হয়েছে। যথা শ্রীশ্রী চণ্ডীতে—'ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী'—অর্থাৎ তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী, 'শ্রী' শব্দের আর এক অর্থ বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে 'আশ্রয়'। অর্থাৎ 'শ্রী' হচ্ছে সেই মহা জাগতিক শক্তি যিনি হলেন সমস্ত জগতের আশ্রয়। তিনি জীবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাণবুদ্ধিরূপে সর্বজীবে বিদ্যমান। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে এই জন্যই বলা হয়েছে—

"যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা"—অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন। এই লক্ষ্মী তথা 'শ্রী'-ই সমস্ত জগতের আধার এবং আশ্রয়। যেমন শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বলা হয়েছে—

"আধারভূতা জগতস্তমেকা"
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশ..."

লক্ষ্মী শব্দের আর একটি অর্থ হল চৈতন্যের চিহ্ন বা বিভূতি। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে এই দেবীকে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোত্তম শক্তি ঈশ্বরীরূপে পূজা করা হয়েছে এবং শ্রী দেবীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কালিকাপুরাণে এই দেবীকেই আত্মবিদ্যা এবং মহাবিদ্যা—আত্মজ্ঞানের বিদ্যারূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বস্তুত 'শ্রীসূক্ত' কাম্য সূক্তরূপে [বাঞ্ছিত ফল প্রদানকারী] অধিক প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত। দেবীর আরাধনায় জপ, অভিষেক এবং হবন বা হোমের জন্য এই 'সূক্তে' কথিত মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। 'শ্রী' সূক্তে সম্পত্তি, বৈভব, কৃষি-ভূমি-বাড়ি, পশুধন, সন্তান-সন্ততি, সেবক-সেবিকা কীর্তি এবং পরিবার সুখ প্রভৃতি যাবতীয় লৌকিক সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে তার যথোচিত ব্যবহারপূর্বক নীরোগ শরীর ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির সুন্দর কল্পনা অভিব্যক্ত হয়েছে।

'শ্রীসূক্তে' প্রধানত দুটি কথায় অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রথমত বৈদিক জীবনাদর্শের অনুরূপ কর্মের অনুষ্ঠানকরত ঐশ্বর্যাদি সম্পন্ন হয়ে শতবর্ষ জীবন-যাপন করা। 'সূক্তে' দেবীর স্বভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋষি বলেছেন—তিনি দয়ালু, পূর্ণকামা, ভক্তানুগ্রহকারিণী। তাই সূক্তকার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য—রাষ্ট্র নিবাসী সকলের সুখ-শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন—

উপৈতু মাং দেবসুখঃ কীর্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেস্মিন্ কীর্তি মৃদ্ধিং দদাতু মে।।

[উল্লিখিত মন্ত্রটির অর্থের জন্য 'সূক্তের' ৭নং মন্ত্রের অনুবাদ দেখুন।]

বৈদিক ভারতের মানব কল্যাণকারী বৈদিক ঋষিগণ শুধুমাত্র ধন-ধান্য পূর্ণ ভাণ্ডার-এর জন্য প্রার্থনা করেন না, তাঁরা ওই প্রার্থনার সাথে "সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা" ভূমিরও প্রার্থনা করেন। শুধু দুধ নয়, দুগ্ধ প্রদানকারী কামধেনুর প্রার্থনাও ঋষিগণ করেন এবং একই সঙ্গে চাষযোগ্য বলদ, ঘোড়া, অন্যান্য উত্তম পশুপক্ষী, ঘরবাড়ি, কৃষিভূমি, পুত্র-পৌত্র বা সন্তান-সন্ততিতে-ধন-ধান্যে সবসময় পূর্ণতা বিরাজ করুক এই প্রার্থনাও করেন। সম্মানীয় জীবনযাপনের প্রার্থনার সঙ্গে, মায়ের কাছে কাতর স্বরে ঋষি বলেন—"হে মা লক্ষ্মী, তোমার স্মরণ-চিন্তন, পূজন-অর্চন যে সব সন্তানগণ বা ভক্তগণ করে থাকেন—তাদের হৃদয়ে যেন কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হিংসাদির বিষ প্রবেশ না করে।"

'শ্রী সূক্তের' দ্বারা অর্থ ব্যবহারের বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানের বোধ হয় এবং অর্থ-উপার্জনের নিঃস্বার্থ পথনির্দেশ তথা অর্থ-সম্পদাদির উপভোগের সুসংস্কৃত সম্যক নির্দেশ পাওয়া যায়। 'সূক্তটিতে' সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই শ্রীদেবীরূপে বন্দিতা হয়েছেন। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে—"জাতবেদা অগ্নিই শ্রীমূর্তি ধারণ করে হরিণীরূপে অরণ্যে সঞ্চরণ করেছিলেন।" এই আখ্যায়িকা দেবীপুরাণে বর্ণিত আছে। শ্রীদেবীর অনুগ্রহে যজমান সুবর্ণ গো বা ধেনু, অশ্ব, পুত্র, পৌত্র-মিত্র ইত্যাদি ধনলাভ করে থাকেন। 'সূক্তটিতে' ঋষি প্রার্থনা করছেন—'দেবতাগণ কর্তৃক বন্দিতা পদ্মবিভূষিতা উজ্জ্বল যশোময়ী আনন্দদায়িনী শ্রী দেবীর আমি শরণাপন্ন, তিনি আমার অশুভ লক্ষ্মীকে নাশ করুন।

নবম অধ্যায়

বৈদিক সংলাপ

পুরূরবা ও উর্বশী

ঋগ্বেদ—মণ্ডল ১০, সূক্ত ৯৫, ত্রিষ্টুপ ছন্দ

বেদের মধ্যে কিছু 'সংবাদ সূক্ত' দৃষ্ট হয়, যেখানে দুই বা ততোধিক পাত্রের সংবাদ বা কথোপকথনের দ্বারা কোনও গভীর রহস্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। সংবাদের দ্বারা শিক্ষা প্রদান, শিক্ষা দানের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয়। বেদের 'সংবাদ সূক্ত'গুলি ভাষা, ভাব, নাটকীয় শৈলীতে কথোপকথন ইত্যাদি বিবিধ দৃষ্টিতে অপরূপ কাব্যিক সৌন্দর্যে সুষমামণ্ডিত। বেদে এইসব নাটকীয় সংবাদ বা কথোপকথন দেখে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি বেদকেই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভবস্থল বলে মনে করেন। নাটকীয় ঢঙে বা শৈলীতে কথোপকথন বা বার্তা বিনিময়ের বিবরণ ঋগ্বেদেই অধিক দৃষ্ট হয়। অথর্ব বেদ ও যজুর্বেদে এইরূপ 'সংবাদ সূক্ত'র বিবরণ দৃষ্ট হয় না। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বেদের কয়েকটি 'সংবাদসূক্ত' নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হব। প্রথমেই আমরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ৯৫ সংখ্যক 'সংবাদ সূক্তটি' পাঠকের দরবারে উপস্থিত করছি। এই সূক্তটির অন্তর্গত নাটকীয় সংলাপের পাত্র-পাত্রী পুরূরবা ও উর্বশী। আসুন উভয়ের সংলাপ বা কথোপকথন শুনে নিই—

পুরূরবাঃ—হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্র কৃণবাবহৈনু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্ চ না হন্।।১।।
উর্বশীঃ—কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং প্রাক্রমিষমুষ সামগ্রিয়েব।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি।।২।।

পুরূরবা ঃ—ইষুর্ণ শ্রিয় ইষুধেরসনা গোবাঃ শতসা ন রংহিঃ
অধীরে ক্রতৌ বি দবিদ্যুতন্নোরা ন মায়ুং চিতয়ত ধুনয়ঃ।।৩।।
উর্বশীঃ—সা বসু দধতী শ্বশুরায় বয় উষো যদি বষ্ট্যন্তি গৃহাৎ।
অস্তং ননক্ষে যস্মিঞ্চাকান্দিবা নক্তং শ্নথিতা বৈতসেন।।৪।।
ত্রিঃ স্ম মাহ্নঃ শ্নথয়ো বৈতসেনোত স্ম মেহব্যত্যৈ পৃণাসি।
পুরূরবোহনু তে কেতমায়ং রাজা মে বীর তন্বস্তদাসীঃ।।৫।।
পুরূরবাঃ—যা সুজূর্ণিঃ শ্রেণিঃ সুম্ন আপির্হ্রদে চক্ষুর্ণ গ্রন্থিণী চরণ্যুঃ।
তা অঞ্জয়োহরুনয়ো ন সস্রুঃ শ্রিয়ে গাবো ন ধেনবোহনবন্ত।।৬।।
উর্বশীঃ—সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্না উতেমবর্ধন্নদ্য স্ব গূর্তাঃ।
মহে যত্বা পুরূরবো রণায়া বর্ধযন্দ স্যুহত্যায় দেবাঃ।।৭।।
পুরূরবাঃ—সচা যদাসু জহতীষ্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে।
অপ স্ম মত্তরসন্তী ন ভুজ্যস্তা অত্রসন্ রথস্পশোনাশ্বাঃ।।৮।।
যদাসু মর্তো অমৃতাসু নিস্পৃক্ সং ক্ষোনীভিঃ ক্রতুভির্ণ পৃঙক্তে।
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুম্ভতঃ স্বা অশ্বাসো ন ক্রীড়য়ো দন্দশানাঃ।।৯।।
বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দবিদ্যোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্য্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ।।১০।।
উর্বশীঃ—জজ্ঞিষ ইৎথা গোপীথ্যায় হি দধাথ তৎপুরূরবো মে ওজঃ
অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্ন হন্ন ম আশৃণোঃ কিমভূগ্বদাসি।।১১।।
পুরূরবাঃ—কদা সূনুঃ পিতরং জাত ইচ্ছাচ্চক্রন্নাশ্রু বর্তয়দ্বিজানন্।
কো দম্পতী সমনসা বি যূযোদধ যদগ্নিঃ শ্বশুরেষু দীদয়ৎ।।১২।।
উর্বশীঃ—প্রতি ব্রবাণি বর্তয়তে অশ্রু চক্রন্ন ক্রন্দদাধ্যে শিবায়ৈ।
প্রতত্তে হিনবা যত্তে অস্মে পরেহ্যস্তং নহি মূর মাপঃ।।১৩।।
পুরূরবাঃ—সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবা উ।
অধাশয়ীত নি ঋতেরুপস্থেহধৈনং বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ।।১৪।।
উর্বশীঃ—পুরূরবো মা মৃথা মা প্রপপ্তো মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষণ্
ন বৈ স্ত্রৈনানি সখ্যানি সন্তি সালা বৃকানাং হৃদয়ান্যেতা ।।১৫।।
যদ্বিরূপাচরণ মর্ত্যেষ্ববসং রাত্রীঃ শরদশ্চতস্রঃ।
ঘৃতস্যস্তোকং সকৃদহ্ন আশ্নাং তাদেবেদং তাতৃপানা চরামি।।১৬।।

পুরূরবাঃ—অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপ তা রাতি সুকৃস্য তিষ্ঠান্নি বর্ত্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে।।১৭।।
উর্বশীঃ—ইতি তা দেবা ইম আহুরৈল যথেমেতত্ত্ববসি মৃত্যুবন্ধুঃ।
প্রজা তে দেবান্ হবিষা যজাতি স্বর্গ উ ত্বমপি মাদয়াসে।।১৮।।

অনুবাদ ঃ ১। পুরূরবা—হে পত্নী, দাঁড়াও। তোমার হৃদয় কি নিষ্ঠুর। এত তাড়াতাড়ি চলে যেও না। এস, কিছু কথা আমরা বলি ও শুনি। আমাদের মনের কথা যদি মনেতেই রয়ে যায়, তবে তা ভবিষ্যতে সুখের বা কল্যাণের হবে না।

২। উর্বশী—তোমার সাথে কথা বলে আমার কী হবে? আমি যে প্রথম উষার ন্যায় চলে এসেছি, হে পুরূরবা, তুমি আপন গৃহে ফিরে যাও। বাতাসকে যেমন ধরে রাখা যায় না, তেমনি তুমিও আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

৩। পুরূরবা—তোমার বিরহে আমার তূণীর হতে বাণ নির্গত হয়নি, আমার বিজয়শ্রী লাভ হয়নি। আমি যুদ্ধে গমনপূর্বক শতসহস্রগাভী আনতে পারিনি। রাজকার্য বীরশূন্য হয়েছে, এর কোনও শোভা নাই। আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করবার চিন্তা একেবারে পরিহার করেছে।

৪। উর্বশী—হে উষা! শ্বশুরের জন্য উর্বশী সম্পদ ধরে আছে। ঐহিক গৃহ হতে মুক্ত হয়ে যে চাইছে বিস্তীর্ণ গতি। তাই সে চলেছে নিজের অধিষ্ঠানে যেখানে দিবারাত্র সে সুরতের আনন্দ উপভোগ করে।

৫। তিনবার দিবসে তুমি আমাকে উপভোগ করেছ। সত্যই তুমি আমাকে পরম তৃপ্তিতে পূর্ণ করে দিয়েছ। তাই পুরূরবা! তোমার সত্য উপলব্ধি অনুসরণ করে আমি চলে এসেছি। হে বীর! তাই তুমি আমার সকল তনুর রাজা হয়েছিলে।

৬। পুরূরবা— সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্ন, আপি, হৃদেচক্ষু, গ্রন্থিনী, চরণ্যু ইত্যাদি যে কয়েকজন রমণী আমার ছিল, তুমি আসার পর তারা আর আমার কাছে বেশভূষা করে আসত না।

৭। উর্বশী—পুরূরবা যখন জন্মগ্রহণ করলো দেবমহিলারা দেখতে এল, নিজ ক্ষমতায় যারা গমন করে, সেই নদীরা পর্যন্ত সংবর্ধনা করলো। হে পুরূরবা! দেবতারা দস্যুবধ উপলক্ষ্যে তোমাকে ভীষণ যুদ্ধে পাঠাবার জন্য সংবর্ধনা করতে লাগলেন।

৮। পুরূরবা— পুরূরবা যখন নিজে মানুষ হয়ে অপ্সরাদের দিকে অগ্রসর হলেন তখন তারা নিজরূপ ত্যাগ করে অন্তর্হিত হল। যেমন হরিণী ভয় পেয়ে পলায়ন করে অথবা রথে যুক্ত হয়ে অশ্বরা যেমন ধাবমান হয়, সেরূপ তারা চলে গেল।

৯। উর্বশী—পুরূরবা নিজে মানুষ হয়ে সুরলোকবাসিনী অপ্সরাদের সঙ্গে যখন কথা বলতে এবং তাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে অগ্রসর হলেন তখন তারা অদৃশ্য হল। নিজ শরীর দেখালো না, ক্রীড়াসক্ত অশ্বদের ন্যায় পলায়ন করলো।

১০। পুরূরবা— যে উর্বশী আকাশ হতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করেছিল এবং আমার মনোরথ পূর্ণ করেছিল, তার গর্ভে মানুষের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। উর্বশী তাকে দীর্ঘায়ু করুন।

১১। উর্বশী—হে পুরূরবা! তুমি পৃথিবীর পালনের নিমিত্ত পুত্রের জন্ম দিলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য নিক্ষেপ করলে। সর্বদা আমি তোমাকে বলেছি যে, কি হলে আমি তোমার নিকট থাকবো না—কারণ আমি তা জানতাম, তুমি তা কর্ণপাত করলে না, এখন পৃথিবীর পালন কার্য পরিত্যাগ করে কেন বৃথা বাক্য ব্যয় করছো?

১২। পুরূরবা—তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করবে? আর যদি সে আমার নিকট আসে তাহলে সে কি রোদন করবে না? অশ্রুপাত করবে না? পরস্পর প্রীতিযুক্ত স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাতে কার ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো অর্থাৎ তোমার বিরহ-সন্তাপ অসহ্য।

১৩। উর্বশী—আমি তোমার কথার উত্তরে বলছি—পুত্র তোমার নিকট গিয়ে রোদন বা অশ্রুপাত করবে না। আমি তার মঙ্গলচিন্তা করবো। আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেছ তাকে তোমার নিকট প্রেরণ করবো। হে নির্বোধ, গৃহে ফিরে যাও। আমাকে আর পাবে না।

১৪। পুরূরবা—তবে তোমার প্রণয়ী (পুরূরবা) অদ্য পতিত হোক। আর কখনও যেন উত্থিত না হয়। সে যেন বহুদূরে দুর হয়ে যায়। সে যেন মৃত্যুর কোলে শায়িত হয়। বলবান বৃকগণ তাকে উদরস্থ করুক।

১৫। উর্বশী—হে পুরূরবা! এইভাবে মৃত্যু কামনা কর না, উচ্ছন্নে যেও না, দুর্দান্ত বৃকরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না, স্ত্রীলোকের হৃদয় এবং বৃকের হৃদয় একই রকমের।

১৬। আমি পরিবর্তিত রূপে ভ্রমণ করেছি, মনুষ্যদের মধ্যে চার বৎসর রাত্রি বাস করেছি। দিনের মধ্যে একবার কিঞ্চিৎমাত্র ঘৃত পান করে তাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তি পূর্বক ভ্রমণ করেছি।

১৭। পুরূরবা—অন্তরিক্ষ যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, সকল আয়তন যে প্রসারিত করে ধরেছে, সেই উর্বশীর নিকট জ্ঞানশিক্ষা পেয়ে আমি জ্যোতির্ময়। কৃতকর্ম আমি, আমার আনন্দ উপভোগ যেন হয় তোমারই পার্শ্বে—এস তবে অন্তরে, হে উর্বশী ফিরে এস, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে।

১৮। উর্বশী—হে ইলার তনয়! এ-সকল দেবতা তোমাকে বলছেন যে, তুমি কোন উপায়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হবে। কোন উপায়ে তোমার সন্তান দেববৃন্দকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করবে। কোন উপায়ে তুমি স্বর্গে গিয়ে তীব্র আনন্দে উল্লসিত হবে।

তাৎপর্য ঃ উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা বা অপ্সরী। কোনও এক যজ্ঞোৎসবে সে স্বর্গের দেব মিত্র ও বরুণের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। ফলে দেবদ্বয়ের চিত্ত বিকার ঘটে। এই কারণে উভয় দেব উর্বশীকে অভিশাপ দেন যে সে মর্ত্যে এসে কোনও মানুষের পত্নী হবে। পৃথিবীতে যে মানুষ উর্বশীর প্রণয়াসক্ত হয়ে তার পতি হলেন, তিনি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ রাজা পুরূরবা। উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার একপুত্র হয় যার নাম আয়ু। শাপের অবসানে উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে যেতে হয় কিন্তু এতে পুরূরবা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। উর্বশী চলে যায়। পুরূরবা উর্বশীকে খুঁজতে থাকেন। দীর্ঘদিন খোঁজার পর অবশেষে একদিন তিনি উর্বশীর দেখা পান। দেখা হওয়ার পর পরস্পরের যে কথোপকথন হয় তা-ই বর্তমান 'সংবাদ-সূক্তটিতে' বিবৃত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি কীরূপ সম্বন্ধ এবং এক সুন্দর নবযৌবনসম্পন্না নারীর প্রতি নবযুবক কীরূপ আকর্ষিত হয়, কামার্ত হয়ে প্রণয়িনীর শর্তাধানে কীরূপে নিজেকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে তার একটি সুন্দর মনোরম চিত্র এই সংবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। উর্বশী শব্দের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে মহর্ষি যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—

"উরুভ্যামশুতে উরর্বা বশো অস্যাঃ উবর্শী"—

অর্থাৎ যে নারী আপনার উরুভাগ বা জংঘাদেশ দ্বারা পুরুষকে বশ করে তাকে উর্বশী বলা হয়। নিজ দৈহিক সৌন্দর্য দ্বারা পুরুষকে আকর্ষণকারিণী নারী উর্বশী, রাজা পুরূরবাকে বিবাহ করে, বিবাহ সুখ উপভোগান্তে অজুহাত খাড়া করে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য উদ্যতা হতেই, তার বিরহে বিলাপ করতে শুরু করেন পুরূরবা। পুরূরবা ইলার নন্দন অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান। পুরূরবা শব্দের অর্থ করতে গিয়ে মহর্ষি যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে বলেছেন—

"পুরূ বহু রৌতি শব্দং করোতি স পুরূরবা। বহুধা রোরূয়তে ইতি পুরূরবা"—অর্থাৎ যে খুব কাঁদে, অনুনয় বিনয় করে, বিলাপ করে অথবা অনেক কথা বলে বা শব্দ করে তাকে পুরূরবা বলা হয়। পুরূরবা উর্বশী বিশেষ কোনও ব্যক্তি নয়। বরং ইন্দ্রিয় ভোগপরায়ণ স্ত্রী-পুরুষ—যেখানে উভয়ই একে অন্যকে ঠকায়, আপন আপন শর্ত রাখে। শর্তভঙ্গের অপরাধে স্ত্রী-পুরুষকে ছেড়ে দেয় ফলে পুরুষ স্ত্রীর বিয়োগে কাঁদে, শোক করে—এ অবস্থা এক কামুক এবং ইন্দ্রিয় ভোগবিলাসী পুরুষেরই হয়—যার চিত্ররূপ সংবাদ 'সূক্ত'টিতে দেখান হয়েছে। বেদ এখানে এই 'সূক্ত'টির মাধ্যমে উপদেশ দিচ্ছে শারীরিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করে যে রমণী পুরুষকে আকৃষ্ট করে এরূপ রমণী থেকে সর্বদা পুরুষের সাবধান থাকা উচিৎ অন্যথায় তার অবস্থা পুরূরবার মতো হবে। এটা হল এই সূক্তের স্থূল ব্যাখ্যা।

বেদ-মনীষীদের মতে পুরূরবার অর্থ সূর্য। উর্বশীর অর্থ ঊষা, সূর্য উদিত হলে ঊষা আর থাকে না। সূর্য ঊষাকে আকাশের বুকে খুঁজে বেড়ায় এবং সন্ধ্যার প্রাক্ মুহূর্তে অন্য এক রূপে তাকে প্রাপ্ত হয়ে, তার সাথে থাকার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ঊষারূপী উর্বশী বলে অহোরাত্ররূপী শিশুর উৎপত্তির পশ্চাৎ আমি তোমার সাথে মিলিত হবো। পুনরায় পরের দিন উভয়ের মিলন হয়। কোনও কোনও বেদবিদ্-এর মতে আত্মা পুরূরবা, শরীর বা দেহ উর্বশী। আত্মা চার বৎসর এই দেহকে ভোগ করে।

বাল্য, কৌমার, যৌবন ও বার্ধক্য মানুষের জীবনের এই চার অবস্থাই চার বৎসর। এরপর আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়। তখন আত্মা পুনরায় দেহ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে।

আবার পুরূরবার অর্থ ভূপতি। উর্বশী অর্থ ভূ বা পৃথিবী। ভূপতি বা রাজা যদি পৃথিবীকে রক্ষা না করেন সর্বদাই পৃথিবীকে ভোগ করার জন্য সংলগ্ন থাকেন তাহলে পৃথিবী রাজার কাছ হতে চলে যায়। আবার কারও কারও মতে পুরূরবা হচ্ছে কৃষক, উর্বশী হচ্ছে ভূমি। কৃষক ভূমি কর্ষণ করে, তাতে লাঙল চালায়। ভূমি কর্ষণ হয়ে গেলে কৃষক জমিতে বীজ বপন করে। তখন ভূমিরূপা উর্বশী বলে এখন আমাতে হল বা লাঙল কর্ষণ কোর না, করলে যে বীজবপন করেছ তা নষ্ট হয়ে যাবে। ফসল পরিপক্ক হলে কর্ষণ কোর।

আবার কোনও কোনও বিদ্বানের মতে পুরূরবা হচ্ছে মেঘ, উর্বশী হচ্ছে বিদ্যুৎ। বর্ষা ঋতুর চার পক্ষই চার বৎসর যেখানে দুজনায় এক সাথে থাকে। পরবর্তী বর্ষায় আবার দুজনার সাক্ষাৎ হয়। কেউ কেউ বায়ুকে পুরূরবা এবং উর্বশীকে বিদ্যুৎ বলেছেন। ঋষি অরবিন্দের অনুগামী প্রখ্যাত বেদ-মনীষী শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'বেদমন্ত্র' গ্রন্থের টিপ্পনীতে বলেছেন-"উর্বশী হইতেছে বৃহতের ভোগ, অতিমানসের সিদ্ধি (উরূ অশ্), আর পুরূরবা, মনোময় পুরুষ, বহুল প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যাহার। মনোময় জীব বা মানুষ চাহিঁতেছে অতিমানসের জ্যোতির্ময় বৃহৎ আনন্দ কিন্তু মানুষীভাবে, তাই সে-দিব্যজ্যোতি স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছে: মানুষে যতটুকু সত্য আকাঙ্ক্ষা ছিল ততটুকুর জন্য উর্বশী নামিয়া আসিয়াছিল—আধারের পূর্ণ রূপান্তর না হইলে মন প্রাণ প্রণত নিষ্কাম "নিরপেক্ষ" না হইলে বৃহতের অবতরণ ও প্রতিষ্ঠা এই আধারে হয় না।"

সরমা ও পণিগণ

ঋগ্বেদ-মণ্ডল ১০, সূক্ত-১০৮, ত্রিষ্টুপ ছন্দ

আমরা সরমা ও পণিগণের মধ্যে যে সংলাপ বা কথোপকথন হয়েছিল তা জেনে নিই—

পণিগণঃ—কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড় দূরে হ্যধ্বা জুগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি।।১।।
সরমাঃ—ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পনয়োঃ নিধীন বঃ।
অতিস্কদো ভিয়সা তন্ন আবৎথা রসায়া অতরং পয়াংসি।।২।।
পণিগণঃ—কীদৃঙ্ঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।

আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধা মাথা গবাং গোপতির্নো ভবাতি।।৩।।
সরমাঃ—নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎ স যস্যেদং দূতীরসং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা হতা ইন্দ্রেন পনয়ঃ শয়ধ্বে।।৪।।
পণিগণঃ—ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ পরি দিবো অন্তানৎসুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অবসৃজাদযুধ্ব্যতাস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা।।৫।।
সরমাঃ—আসন্যা বঃ পনয়ো বচাংস্যনিষব্যাস্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃড়াৎ।।৬।।
পণিগণঃ—অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তংপনয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগন্থ।।৭।।
সরমাঃ—এহ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা অয়াস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
ত এতমূর্বং বি ভজন্ত গোনামথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ।।৮।।
পণিগণঃ—এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুণর্গা অপ তে গবাং সুভগে ভজাম।।৯।।
সরমাঃ—নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বমিন্দ্রো বিদুরঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্যদায়মপাত ইত পনয়ো বরীয়ঃ।।১০।।
দূরমিত পনয়ো বরীয় উদ্গাবো যন্তু মিনতীর্ঋতেন।
বৃহস্পতির্যা অবিন্দন্নিগূঢ়াঃ সোমো গ্রাবান ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ।।১১।।

অনুবাদ ঃ ১। পণিগণ—হে সরমা! কোন অভিলাষে তুমি এ-স্থানে ছুটে এসেছ? এ অতি দূরের পথ। এ পথে আসতে হলে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করলে আসা যায় না, আমাদের নিকট কী এমন বস্তু আছে যার জন্য এসেছ? কত রাত্রি ধরে এসেছ? নদীর জল পার হলে কিভাবে?

২। সরমা—হে পণিগণ। আমি ইন্দ্রের দূতী। তাঁরই প্রেরণায় আমি এসেছি। তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করেছ তা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। উল্লঙ্ঘনের ভয়ে নদীই আমাকে রক্ষা করেছে। তাই তার জলরাশি আমি পার হয়েছি।

৩। পণিগণ—হে সরমা! যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে তুমি এখানে এসেছ, সে ইন্দ্র কীরূপ? তাঁকে দেখতে কেমন? তিনি নিজেই আসুন না, আমরা তাঁকে মিত্র করে রাখবো। তিনি আমাদের গাভী নিয়ে গাভীগণের সত্বাধিকারী হোন।

৪। সরমা—যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে আমি দূরদেশ হতে এসেছি, তাঁকে পরাজিত করে এমন ব্যক্তিকে দেখি না। হে পণিগণ ইন্দ্রের হাতে নিহত নিপাতিত হবে তোমরা।

৫। পণিগণ—হে সরমা! এই যে গো-যূথে তোমার অভিলাষ, যার জন্য তুমি স্বর্গের ও-প্রান্ত হতে ছুটে এসেছ, বিনা যুদ্ধে কে সেই গো-যূথকে বা গাভীগণকে ছেড়ে দেবে? আমাদেরও আছে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রবাজি।

৬। সরমা—ব্যর্থ হোক তোমাদের বাক্, অচল হয়ে পড়ুক তোমাদের পাপ দেহ, চলবার পথ হোক তোমাদের অগম্য। দেব বৃহস্পতি স্বর্গ বা মর্ত্যের কোনও কল্যাণই তোমাদের দেবেন না।

৭। পণিগণ—হে সরমা! আমাদের এ ধন পর্বত দ্বারা রক্ষিত। গো, অশ্ব, অর্থে তা পরিপূর্ণ। এদের রক্ষা করছে সুরক্ষী পণির দল। বৃথা তুমি এসেছ গহণ তামসলোকে।

৮। সরমা—অয়াস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগন সোমপানে উৎসাহিত হয়ে আসছেন বা আসবেন। তাঁরা এ বহু পরিমাণ গাভী করে নেবেন, হে পণিগণ! তখন তোমাদের এ-প্রকার দর্পের উক্তি ত্যাগ করতে হবে।

৯। পণিগণ—হে সরমা! দেবতারা ভয় দেখিয়ে তোমাকে এস্থানে আসতে বাধ্য করেছে। এস, তুমি আমাদের ভগিনী হয়ে থাক, আর ফিরে যেও না। হে সুন্দরী! আমরা তোমাকে এ গোধনের ভাগ দিচ্ছি।

১০। সরমা—আমি ভ্রাতা-ভগিনী সংক্রান্ত কিছু বুঝি না। ইন্দ্র ও পরাক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানেরা সকলি জানেন, তাঁরা গাভী পাবার জন্য আমাকে রক্ষাপূর্বক পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁদের আশ্রয় পেয়ে এসেছি। হে পণিগণ! এস্থান হতে অতি দূরে পালাও।

১১। হে পণিগণ! যদি ভালো চাও তবে এখান হতে অতি দূরে পালাও। গাভীগণ কষ্ট পাচ্ছে, তারা ধর্মের আশ্রয়ে এ পর্বত হতে উঠে যাক বৃহস্পতি, সোম, সোম প্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ, ঋষিগণ, এবং মেধাবীগণ এ-সকল গুপ্ত স্থানস্থিত গাভীদের বিষয় জানতে পেরেছেন।

তাৎপর্য : সরমা ও পণিগণের বার্তালাপ এখানেই সমাপ্ত। এরপরে কী ঘটেছিল তা এই 'সূক্তে' বলা হয়নি। ঋগ্বেদের অন্য একটি সূক্ত যথা 'বিদত্

সরমাতনয়ায় ঋসিমথ' [ঋগ্বেদ, ১/৬২/৩] অর্থাৎ, সরমা পুত্রের জন্য অন্ন প্রাপ্ত হন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৬২নং সূক্তের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সরমার পণিদের সাথে যে বার্তালাপ হয়েছিল, সরমা তা ইন্দ্রকে জানায়। ইন্দ্র, বৃহস্পতি, আঙ্গিরস আদিদের নিয়ে পণিগণ যে পর্বতগুহায় গাভীদের লুকিয়ে রেখেছিল সেই পর্বতগুহা বিদীর্ণ করে, পণিদের যুদ্ধে পরাস্ত করে গো-ধন উদ্ধার করেন।

বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য এই সূক্তের ভাষ্য করেছেন ব্রাহ্মণগ্রন্থকে আধার করে, তিনি তাঁর ভাষ্যে লিখেছেন, অসুর পণিগণ দেবতাদের গোধন চুরি করে নিয়ে যায় এবং কোনও সুদূরবর্তী গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখে। ইন্দ্র সরমা নামের দেব-শুনি (দেবতাদের সারমেয়ী বা কুক্কুরী)-কে বললেন তুমি পণিদের ওখানে গিয়ে গোধনের খোঁজ নিয়ে এস। সরমা বললেন—আমার সন্তানদের যদি গোদুগ্ধ প্রদান কর তাহলে আমি যাব। ইন্দ্র সরমার কথায় রাজি হলেন। এরপর সরমা নদীপথ হয়ে দস্যু পণিগণের নিকট পৌছান এবং গাভীর সন্ধান পেয়ে যান। এরপর ইন্দ্র দস্যু পণিকে পরাস্ত করে গোধন উদ্ধার করেন। এইরূপ বর্তমান সূক্তে অসুর পণিগণ ও সরমার বার্তালাপ বিবৃত হয়েছে।

বেদ-মনীষী চন্দ্রমণি বিদ্যালংকার স্বীয়কৃত 'নিরুক্ত ভাষ্যে' সরমা শব্দের অর্থ দেববাণী করেছেন। তিনি ওই ভাষ্যে লিখেছেন "এ (সরমা) সর্বদা দেবতাগণের নিকটে থাকে। তাই একে দেবশুনী বলা হয়।" এই সূক্তে কৃপণ অসুর-স্বভাববিশিষ্ট দস্যু পণিগণের গো-ধন সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার বিবরণ দৃষ্ট হয়। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র দেবসঙ্গিনী বেদবাণীকে (সরমা) আপন রাজ্যে দস্যু পণিদের সন্ধান করতে বললেন। সমস্ত দেবগণই বেদবাণীর সন্তান। তাই বেদবাণী দেবরাজকে বললেন যদি ওই অপহৃত বা ছিনিয়ে নেওয়া ধন আমার সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দাও তাহলে আমি গো-ধন সন্ধানের জন্য পণিদের কাছে যাব। বিভিন্ন মন্ত্রে ইন্দ্র, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, সরমা, পণি, গাভী ইত্যাদি শব্দসমূহের যে উল্লেখ দেখা যায় তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বেদজ্ঞ বিদ্বান নিম্নলিখিত মত পোষণ করেন।

প্রথমত, এখানে ইন্দ্র শব্দের অর্থ হচ্ছে সূর্য। সরমা শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ। 'পণিগণ' অর্থাৎ মেঘ। গাভী বা গো-শব্দের অর্থ হচ্ছে কিরণ। পণিরূপী মেঘ

কিরণরূপী গাভীকে অন্ধকারে লুকিয়ে বা আবৃত করে রাখে, আবার অন্যদিকে জলরূপী গাভীকে (গাভী শব্দের আর এক অর্থ জল) মেঘরূপী পণিদের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, ইন্দ্ররূপী সূর্য মেঘরূপী পণিদের থেকে এই জল তথা কিরণকে মুক্ত করেন।

দ্বিতীয়ত, ইন্দ্র শব্দের এক অর্থ রাজা। মজুতদার, ধনসঞ্চয়কারী, কিন্তু কৃপণ, হিংস্র জনই পণি। মেঘ যেমন সূর্যের কিরণকে লুকিয়ে রাখে, পণিগণও সেইরূপ নিজের ধনকে লুকিয়ে রাখে। রাজারূপী ইন্দ্র, সরমা অর্থাৎ বিচরণকারী গুপ্তচরদের সহায়তায় ওই ধনের সন্ধান পেয়ে তা উদ্ধার করেন এবং অন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

তৃতীয়ত, জীবাত্মাই হচ্ছে ইন্দ্র। এই জীবাত্মারূপী ইন্দ্রের মধ্যে যখন হিংসা, বিদ্বেষ, কার্পণ্য, সৎকার্য বিরোধিতা, অধার্মিকতা ইত্যাদি দুর্গুণ বৃদ্ধি পায়—তখন এই জীবাত্মাই 'পণি' পদ প্রাপ্ত হয় বা 'পণি' নামে অভিহিত হয়। এই পণি-বৃত্তি বা পণি-স্বভাবই জীবাত্মার 'গৌঃ' অর্থাৎ গাভীরূপা জ্ঞানকে আড়াল করে বা লুকিয়ে রাখে। জীবাত্মার জ্ঞানানুসন্ধানী বৃত্তিই হচ্ছে সরমা। এর সাহায্যেই জীব 'গৌঃ' অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সম্পদকে ফিরে পায়। মন্ত্রে বর্ণিত ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং ব্রহ্মণস্পতি এই তিনটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পণিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছিলেন অঙ্গিরা ঋষি। অঙ্গিরা অগ্নিরই আর এক নাম। অগ্নিসাধনায় সিদ্ধ যে মানুষ, অগ্নি শক্তির সঙ্গে যিনি একীভূত হয়ে গিয়েছেন তিনিই অঙ্গিরা। জীবাধারে অগ্নি হচ্ছে চিন্ময় তপশক্তি। এই তপশক্তির প্রভাবে সাধক বা জীবাত্মা ঊর্ধ্বয়ণের পথে এগিয়ে চলে সকল বাধাকে অতিক্রম করে। তারপর অনন্তজ্ঞান ও দিব্যশক্তির মধ্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর "নবগ্ব" ঋষিদের কথা। সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে এই ঋষিদের কথা বলা হয়েছে। "নবগ্ব" অর্থাৎ নয়টি গো বা জ্ঞানের জ্যোতিলেখা যাঁদের আছে। ঋগ্বেদে "নবগ্ব" ও "দশগ্ব" বলে দুই শ্রেণীর ঋষিদের কথা বলা হয়েছে। "নবগ্ব" হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা নয় মাস সাধন-যজ্ঞ করেন। অন্যদিকে "দশগ্ব" হচ্ছেন যাঁরা দশ মাস সাধন-যজ্ঞ করেন। "দশগ্ব" হচ্ছে সাধকের সিদ্ধাবস্থা। "নবগ্ব" হচ্ছে যাঁরা এখনও সাধনা করছেন, সিদ্ধির দুয়ারে পৌঁছেছেন কিন্তু এখনও

সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হননি। নয় মাসের সাধনা পূর্ণ হলে সাধকের সঙ্গে এসে মিলিত হন 'মন্ত্রবর্ণিত' অয়াস্য ঋষি [সূক্তবর্ণিত অষ্টমমন্ত্র দ্রষ্টব্য] অয়াস্য ঋষি হচ্ছেন সাধকের সিদ্ধ জ্যোতি বা সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি। এইরূপ অবস্থায় "নবগ্ব" "দশগ্বে" পরিণত হন। তখন পণিশক্তি অর্থাৎ অজ্ঞান বা অন্ধ-জড়শক্তি দূর হয়ে পূর্ণ সূর্যশক্তির বা দিব্যজ্ঞান-শক্তির বিকাশ হয়। ঋষি অরবিন্দের ভাবধারায় বিশ্বাসী বেদ-মনীষী শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তর ভাষায়—"প্রকৃত মানুষ থাকে প্রথম অন্ধ জড়শক্তির দাস, তামস দেহায়তনের প্রেরণার মধ্যে আবদ্ধ। সর্বাগ্রে তাহাকে এই পণিশক্তির সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে। কী রকমে তাহার সকল শক্তিই বাঁধা পড়িয়াছে, ব্যবহৃত হইতেছে, ক্ষয় হইতেছে শুধু এই শারীরিক প্রচেষ্টার মধ্যে। জড়চেতনার মধ্যে শুভবুদ্ধির এই প্রথম বিকাশই হইতেছে পণিদের মধ্যে সরমার আবির্ভাব।.......।

কিন্তু এই সত্যবুদ্ধিকে সঠিক যদি একনিষ্ঠভাবে ধরিয়া থাকিতে পারে, অন্যান্য দিব্যশক্তিকে জাগাইয়া তাহাদের সহায়ে উহাকে একেবারে পণিদের গুহাভ্যন্তরে শারীর চেতনার মধ্যে নামাইয়া আনিতে পারে, তবে ক্রমে তামসশক্তিসকল হীনবীর্য হইতে থাকে, শেষে লুপ্ত হইয়া যায়। সকল পণিশক্তি যখন নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তখন শারীর প্রেরণা সব রূপান্তরিত হইয়া জ্যোতির্ময় বৃহতের সত্যছন্দের সহিত সম্মিলিত হয়। দেহ চেতনার মধ্যে সুপ্ত লুপ্ত সূর্যশক্তি সব—গোরাজী ঊর্ধ্বে উঠিয়া সেই সত্যের প্রতিষ্ঠানে স্বলোকের দিকে প্রধাবিত হয়। তখন সাধকের মধ্যে অন্তরাত্মার দিব্য পুরুষের (বৃহস্পতির) ঐশ্বর্য ফুটিয়া উঠে, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয় দিব্য আনন্দের অমৃত সম্পদ (সোমদেবতা), সোমলতাকে দুইটি পাষাণ ফলকের মধ্যে ফেলিয়া পিষিয়া তবে সোমরস বাহির করা হয় অর্থাৎ সহজ ইন্দ্রিয়গত আনন্দ যত, তাহারা স্বর্গ ও মর্ত্য, শুদ্ধমন ও শুদ্ধ দেহ, এই দুইয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে শুদ্ধ হইয়া উঠে, রূপান্তরিত হইয়া তাহারা হয় অমৃতত্বেরই আনন্দধারা। আধার ভরিয়া তখন লীলায়িত হইয়া উঠে তামস ভোগপ্রেরণা নহে, কিন্তু নিখিল ঋষিশক্তি যাবতীয় দিব্যদৃষ্টির শক্তি, পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধজ্ঞান, সিদ্ধ আনন্দ, সিদ্ধকর্ম।" [বেদমন্ত্র—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]।

২ অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা

ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল, ১৭৯ সংখ্যক সূক্ত, ত্রিষ্টুপ, বৃহতী ছন্দ।
অগস্ত্য লোপামুদ্রা সংবাদে লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে বলছেন—

লোপামুদ্রাঃ—পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমানা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যূ নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ।।১।।
সে চিদ্ধি পূর্বঋতসাপ আসন্ত্, সাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি।
তে চিদবাসুর্ণহ্যন্তমাপুঃ সমূ নু পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ।।২।।
অগস্ত্যঃ—ন মৃষা শ্রান্তং যদবন্তি দেবা বিশ্বা ইৎস্পৃধো অভ্যশ্নবাব।
জয়া বেদত্র শতনীথমাজিং যৎসম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব।।৩।।
নদস্য মা রুধতঃ কাম আগন্নিত আজাতো অমুতঃ কুতশ্চিৎ।
লোপামুদ্রা বৃষণং নী রীণাতি ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্।।৪।।

[এরপরের দুটি মন্ত্র কোনও কোনও বৈদিক গ্রন্থ যথা 'অনুক্রমণী', 'বৃহদ্দেবতা' ইত্যাদি গ্রন্থ মতে অগস্ত্য শিষ্য দ্বারা কথিত। কিন্তু অধিকাংশ বেদজ্ঞ ব্যক্তির মতে পরের দুটি মন্ত্রও অগস্ত্য দ্বারা কথিত।]

অগস্ত্যঃ—ইমং নু সোম মন্তিতো হৃৎসু পীতমুপ ব্রুবে।
যৎসীমাগশ্চকৃমা তৎ সু মৃলতু পুলুকামো হি মর্ত্যঃ।।৫।।
অগস্ত্যঃ খনমানঃ খনিত্রৈঃ প্রজামপত্যং বলমিচ্ছমানঃ।
উভৌ বর্ণাবৃষিরুগ্রঃ পুপোষ সত্যা দেবেষ্বাশিষো জগামঃ।।৬।।

অনুবাদ ঃ ১-২, লোপামুদ্রা—কত সম্বৎসর আমি পরিশ্রম করে চললাম। উষায় উষায় এনে দিয়েছে জরা। জরায় আমাদের প্রতি অঙ্গের শ্রী বা সৌন্দর্য্য মলিনতা প্রাপ্ত হল অর্থাৎ জরা শরীরের সৌন্দর্য নাশ করেছে। এখন তবে পুরুষ তার শক্তি অর্থাৎ স্ত্রীর কাছে আসুক।

যে সকল পুরাতন সত্যপালক ঋষিগণ দেবতাদের সাথে সত্য কথা বলতেন, তাঁরাও প্রণয়-সুখ সম্ভোগ করেছেন, অন্ত পাননি। পুরুষ স্ত্রীর নিকটে গমন করুক।

৩-৪, অগস্ত্য—আমরা বৃথা শ্রান্ত হইনি, দেবতারা রক্ষা করেছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করতে পারি। যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই, এ-জগতে আমরা শত ভোগ প্রাপ্তিসাধন লাভ করতে পারবো।

যদিও আমি জপ ও সংযমে নিযুক্ত, তথাপি এ কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক আমার প্রণয়ের উদ্রেক হয়েছে। লোপামুদ্রা সমর্থ পতিতে সঙ্গত হোন, অধীরা যোষিত, ধীর ও মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক।

৫-৬, শিষ্য—হৃদয়ের অভ্যন্তরে গিয়ে পান করেছি যে সোম মধু সেই সোমের নিকট একান্ত প্রার্থনা করছি—তার প্রসাদে যেন যত অধর্ম আমরা করেছি তা সকলই যেন বিশুদ্ধ হয়ে যায়—মর্ত্যপ্রাণা যে বহু কামনার সমষ্টি। উগ্র ঋষি অগস্ত্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে বহু পুত্রবল কামনা করে, প্রণয়-সুখ সম্ভোগ এবং তপ, জপসাধন, এ উভয় ধর্মই পোষণ করেছিলেন এবং দেবগণের নিকট সত্য আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য্য ঃ স্থূল দৃষ্টিতে এই সূক্তে পতি-পত্নী পরস্পর পরস্পরের প্রতি কীরূপ ব্যবহার করা উচিত তার একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। নিরন্তর তপোপরায়ণ সংযমী জীবনযাপনকারী তথা সন্তান প্রাপ্তির কর্তব্য থেকে বিরত তথা বিমুখকারী পতিকেই অগস্ত্য বলা হয়। এরূপ তপস্বী, সংযমী জীবনযাপনকারী পতির উদাসীনতায় যে নারীর সন্তানসুখ, তথা পতিসঙ্গ সুখপ্রাপ্তির আশা অপূর্ণ থাকার ফলে, তার শরীর তথা মনের আনন্দ লুপ্ত হয়ে যায়। এরূপ নারীকেই লোপামুদ্রা বলা হয়। কোনও কোনও বেদ-মনীষীর এইরূপ অভিমত।

অগস্ত্য-লোপামুদ্রার সংবাদ গার্হস্থ্য আশ্রমে সংযম এবং ভোগের মধ্যে সমন্বয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈদিক ঋষির আধিদৈবিক দৃষ্টিতে অগস্ত্য হচ্ছেন সূর্য্য এবং লোপামুদ্রা হচ্ছেন পৃথিবী। বেদে এঁদেরকে আমাদের পিতামাতা বলা হয় এবং এঁরা পরস্পরের পতি-পত্নী। এরা দু-জনই দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যারত থেকে সংযমী জীবনযাপন করেন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে লোপামুদ্রারূপা পৃথিবী প্রবল পিপাসার্ত হয়ে অগস্ত্যরূপ সূর্যের কাছে বা স্বামীর কাছে মিলন বা রতির প্রার্থনা করেন। লোপামুদ্রারূপা পৃথিবীর এই প্রার্থনা অগস্ত্যরূপ সূর্য্য বারিবর্ষণের দ্বারা পূরণ করেন। যার ফলে বনস্পতিরূপ সন্তানের জন্ম হয়।

বেদপন্থী সন্তদের মতে অগস্ত্য হচ্ছেন পরমেশ্বরের প্রতীক এবং লোপামুদ্রা পৃথিবীর প্রতীক। ভারতীয় কাল-গণনানুসারে যতবর্ষ ব্যাপী বা যত সময় ব্যাপী সৃষ্টি বিদ্যমান থাকে বা চলতে থাকে ঠিক ততবর্ষ ব্যাপী প্রলয়ও বিদ্যমান

থাকে বা চলতে থাকে। এই সময়কে শাস্ত্রীয় ভাষায় ব্রহ্মাদিন এবং ব্রহ্মারাত্রি বলা হয়। এইরূপে দীর্ঘসময় ব্যাপী পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি যেন তপস্যায়-সংযমে বিলীন হয়ে থাকেন। তারপর প্রলয় অন্তে পরমেশ্বর প্রকৃতিতে গর্ভসঞ্চার করেন—যার ফলে ব্রহ্মাণ্ডরূপ শিশুর জন্ম হয়।

অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে মানুষের মন অগস্ত্য এবং শরীরই লোপামুদ্রা। কখনও কখনও মন শরীরকে উপেক্ষা বা অনাদর করে। কিন্তু একসময় মন অনুভব করে যে সাধনপথে অগ্রসর হতে হলে শরীরের সহায়তাও প্রয়োজন—এই ভেবে মন তখন শরীরের প্রতি যত্ন নেয়। এটাই যোগ ও ভোগের সমন্বয়। অন্তরাত্মার রূপান্তরিত সত্তাই হচ্ছে সন্তানসুখ-প্রাপ্তি। দেহচেতনার মধ্যে ভাগবত চেতনাকে বা পরমচেতনাকে ফুটিয়ে তোলাতেই দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা, সুখ ও আনন্দ নিহিত।

যম ও যমী সংবাদ

ঋগ্বেদ-মণ্ডল ১০, সূক্ত ১০, ত্রিষ্টুপ ছন্দ

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম বা দশসংখ্যক সূক্ত 'যম-যমী সংবাদ' সূক্ত নামে অভিহিত। যম-যমী বিবস্বান (সূর্য) ও সরণ্যুর সন্তান। এরা দু-জনে যমজ ভাইবোন। যৌবনে পদার্পণ করে যমী কামাতুরা হয়ে স্বীয় ভ্রাতার কাছে মিলন বা সহবাস প্রার্থনা করে। যমীর এই অনুচিত প্রস্তাব যম প্রত্যাখ্যান করে। 'সূক্তটি'তে উভয়ের সংলাপের মধ্যে দিয়ে উচিত অনুচিত বোধের বক্তব্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে গভীর দার্শনিক তত্ত্বও উন্মোচিত হয়েছে, উচিত-অনুচিত বিচার না করে যৌবনমদে মত্তা যমী যমকে বলছে—

যমীঃ—ও চিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরূ চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্ন পাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ।।২।।
যমঃ—ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎ সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরিখ্যন্।।৩।।
যমীঃ—উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিৎ ত্যজসং মর্তস্য।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বমা বিবিশ্যাঃ।।৩।।

যমঃ—ন যৎ পুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।
গন্ধর্বো অপস্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ।।৪।।
যমীঃ—গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতি কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ।।৫।।
যমঃ—কো অস্য বেদ প্রথম স্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্রবোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৃন্।।৬।।
যমীঃ—যমস্য মা যমং কাম আগনৎসমানে যোনৌ সহশেয্যায়।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বৃহের রথ্যেব চক্রা।।৭।।
যমঃ—ন তিষ্ঠন্তি ন নিমিষন্ত্যেত দেবানাং স্পর্শ ইহ যে চরন্তি।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বিবৃহ রথ্যেব চক্রা।।৮।।
যমীঃ—রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধু যমীর্যমস্য বিভৃয়াদজামি।।৯।।
যমঃ—আ ঘা তা গচ্ছনুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্ন জামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহু মন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ।।১০।।
যমীঃ—কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্ব সা যন্নি ঋতির্নিগচ্ছাৎ।
কামমূতা বহ্বেতদ্র পামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি ।।১১।।
যমঃ—ন বা উ তে তন্বা তন্বং সং পপৃচ্যাং পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ।
অন্যেন মৎ প্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ।।১২।।
যমীঃ—বতো বাতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চা বিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরিষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।।১৩।।
যমঃ—অন্যমুষু ত্বং যমান্য উ ত্বাং পরিষ্বজাতে লিবুজের বৃক্ষম।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃনুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্।।১৪।।

অনুবাদ ঃ

১। যমী—বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যবর্তী এই দ্বীপে এসে, এই নির্জন প্রদেশে তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি আকুল, কারণ গর্ভাবস্থা পর্যন্ত তুমি ছিলে আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর পৌত্র জন্মাবে।

২। যম—তোমার গর্ভসঙ্গী তোমার সঙ্গে এ সম্পর্ক কামনা করেন না, যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এস্থান নির্জন নহে যেহেতু

শক্তিময় মহতের বীরপুত্ররা স্বর্গ ধারণ করে আছেন, তাঁরা পৃথিবীর সর্বভাগ দেখছেন।

৩। যমী—দেবতারা যা চায়, কেবল মর্ত্যেরই পক্ষে ত্যাজ্য তা? তোমার মনকে তবে আমার মনের মধ্যে স্থাপন করো; জনকরূপে, পতিরূপে আমার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করো।

৪। যম—এরূপ কার্য পূর্বে আমরা কখনও করিনি। আমরা সত্যবাদী—কখনও মিথ্যা বলিনি, অন্তরিক্ষবর্তী গন্ধর্ব (সূর্য) এবং অন্তরিক্ষস্থ আপ্যাযোষা (সরণ্যু) আমাদের পিতামাতা। আমাদের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক।

৫। যমী—আমাদের জনয়িতা যে দেব হলেন নির্মাতা, স্রষ্টা, বিশ্বরূপী, তিনি আমাদের উভয়কেই গর্ভে থেকেই জায়াপতি করে রেখেছেন। তাঁর কর্মধারায় কোনও কিছু বাধা দিতে পারে না। আমাদের একথা পৃথিবী জানে, দ্যুলোকও জানে।

৬। যম—কে জানে সেই প্রথমদিনের কথা? কে তা দেখেছে? কে বলবে এখানে সে-কথা? মিত্র তথা বরুণের ধাম হল বৃহৎ। তোমার কথা কি? মানুষকে তুমি আঘাত হেনেছ, তুমি মনুষ্যকে কোনও নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারো যে, প্রথমদিন বিধাতা এ-বিধান রচনা করেছিলেন?

৭। যমী—আমি যমী, আমার অন্দরে যমের কামনা যেন এসে প্রবেশ করে। এস আমরা একস্থানে, একই সাথে শয়ন করি। কোনও পত্নী যেমন পতির শরীরের সাথে নিজের শরীর যোগ করে, ওইরূপ আমিও করি। এইরূপে আমরা দুইজনে একই রথের দুই চাকার ন্যায় পরস্পর মিলে উদ্যোগ করি।

৮। যম—এই যে সব দেবচর এখানে বিচরণ করে, তাদের গতি কখনও বন্ধ হয় না, চক্ষু নিমীলিত হয় না। হে ব্যথাদায়িনী, আমাকে ছেড়ে তুমি অন্য পুরুষের সঙ্গে যাও। তোমরা যুগলে রথচক্রের মতো এক কর্মে সংযুক্ত হও।

৯। যমী—কী দিবসে, কী রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়। সূর্যের তেজ যেন পরপর আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষবৎ সম্বন্ধ। যমী গিয়ে ভ্রাতা যমের আশ্রয় গ্রহণ করুক।

১০। যম—উত্তরকালে বা ভবিষ্যতে এমন যুগ আসবে যখন ভ্রাতা ভগ্নীর সাথে অভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করবে অর্থাৎ ভ্রাতা ভগ্নীকে বিবাহ করবে। অতএব হে সুন্দরী, এখন আমি ভিন্ন তুমি অন্যপুরুষকে পতিত্বে বরণ করো। তিনি যখন তোমাকে গ্রহণ করবেন তখন তাঁকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করো।

১১। যমী—সে কীসের ভ্রাতা, সে কীসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী থাকা সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়? আমি বাসনায় আকুল হয়ে বলছি, তোমার শরীরে আমার শরীর মিলিয়ে দাও।

১২। যম—তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর মেলাবার বা সংযুক্ত করার কোনও ইচ্ছা আমার নাই। নিজের ভগ্নিতে সংগত হওয়া পাপ। আমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে সুখ সম্ভোগের চেষ্টা করো। হে সুন্দরী, তোমার ভ্রাতার এরূপ ইচ্ছা বা কামনা নাই।

১৩। যমী—হায় যম! তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ মনে হচ্ছে। তোমার মন-অন্তঃকরণ কী রকম, তা আমি বুঝতে পারছি না। রজ্জু যেরূপ অশ্বকে বেষ্টন করে কিংবা লতা যেরূপ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে সেরূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করবে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ।

১৪। যম— হে যমী! তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন করো। যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে সেরূপ অন্য পুরুষকেই তুমি আলিঙ্গন করো। অন্য পুরুষও তদ্রূপ তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তারই মন তুমি হরণ করো। সেও তোমার মন হরণ করুক। এইভাবে হোক তোমাদের সমচিত্ততা বা দুয়ের মিলন। তাতেই মঙ্গল হবে।

তাৎপর্য্য ঃ যম-যমীর সংবাদ সমাপ্ত হল। এখন প্রশ্ন যম-যমীর বা ভ্রাতা-ভগ্নীর এইরূপ প্রেম সংলাপের তাৎপর্য্য কী? এই সূক্তের মূল উদ্দেশ্য ভাই-বোনের বিবাহ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করা। ভাই-বোনের বিবাহ যে অনুচিত বা অবৈধ তা বোঝাবার জন্য বেদ সুন্দর একটি কল্পিত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। বেদে যমকে 'দিন' এবং যমীকে 'রাত্রি' বলা হয়েছে। কিন্তু বেদে রাত্রি দিনের পত্নী একথা বলা হয়নি। বেদে উষাকে দিনের পত্নী বলা হয়েছে। এখানেও অর্থাৎ বর্তমান সূক্তটিতে যম-যমী পতি-পত্নী নয়, তারা সহোদর ভাইবোন। তারা সূর্যের পুত্র-পুত্রী। সূর্যের কারণেই দিনরাত্রি হয়। এই জন্যই এদের সূর্যের পুত্র-পুত্রী বলা হয়েছে। দিন আর রাত কখনও এক সঙ্গে থাকে না। অর্থাৎ যখন দিন হয় তখন রাত্রি হয় না, আবার যখন রাত্রি হয়

তখন দিন হয় না। দিন ও রাতের একসাথে মিলন হওয়া যেরূপ অসম্ভব সেরূপ ভাই-বোনের এক সাথে মিলন বা বিবাহও অসম্ভব। দিন এবং রাত্রি একে অন্যের পরে আসে এবং আকাশ প্রাঙ্গণে ভাইবোনের ন্যায় ক্রীড়া করে। রাত্রি আপন গৌরবর্ণ উজ্জ্বল ভ্রাতা দিনকে দেখে স্বভাবত তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য আকুল প্রার্থনা জানায়। কিন্তু দিন রাত্রিকে পত্নীরূপে স্বীকার করতে রাজি নয়—তাই সে রাত্রির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পূর্বেই বলা হয়েছে বেদে রাত্রি দিনের পত্নী নয় দিনের পত্নী উষা। সূক্তটিতে 'যম-যমীর' পিতার নাম বিবস্বান অর্থাৎ আদিত্য বা সূর্য এবং মাতার নাম সরণ্যু (আপ্যাঘোষা) বলা হয়েছে।

বেদ-মনীষীদের দৃষ্টিতে বিবস্বান হচ্ছেন অস্তোন্মুখ আদিত্য এবং সরণ্যু হচ্ছে সন্ধ্যা। উভয়ের সন্ধিতে বা মিলনে পৃথিবীর এক ভাগে যখন রাত্রিরূপা পুত্রী উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ পৃথিবীর অন্যভাগে দিনরূপ পুত্রও উৎপন্ন হয়। এবং এই অর্থে এরা দুজনায় সহোদর ভাইবোন। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে উৎপন্ন হওয়ার ফলে এদের কখনও মিলন বা বিবাহ হয় না।

কোনও কোনও বেদ-মনীষীর মতে যমী হচ্ছে মেঘ-বাণী বা মেঘের গর্জন এবং যম হচ্ছে অন্তরিক্ষ স্থানীয় বায়ু অথবা বৈদ্যুতাগ্নি। এরা যেন দুই ভাই-বোন। বর্ষাকালে এরা দুজনায় একসঙ্গে থাকে। বোন চায় ভাই সব সময় সখার মতো তার সঙ্গে থাকুক এবং তাকে বিবাহ করুক। কিন্তু ভাই তা চায় না। তাই বর্ষা শেষ হলে সে বোনকে পৃথক করে দিয়ে বলে—যাও, তুমি অন্য কাউকে গিয়ে আলিঙ্গন করো। এই জন্যেই বর্ষোপরান্ত শরৎঋতুতে মেঘবাণী শোনা যায় না।

সাংখ্য দর্শনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও প্রকৃতিই যম-যমী। এরা পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায় সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করে। যেমন সংসারে অনেক ভাই বোনকে অনেক ক্ষেত্রে বা কার্যে সহায়তা করে। আবার অনেক বোনও অনুরূপ সহায়তা ভাইয়ের জন্য করে। জড় প্রকৃতি এবং চেতন পুরুষের সংযোগ পরস্পরের উপকারের জন্যই হয়। পুরুষ প্রকৃতির সহায়তায় কৈবল্য বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃতিও পুরুষরূপ দ্রষ্টার উপস্থিতিতে জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়। ঋষি অরবিন্দের ভাবানুগামী শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তর ভাষায় "যম-যমী হচ্ছে জ্ঞান ও শক্তি অথবা পুরুষ ও প্রকৃতি।

সাধারণ মানুষী চেতনায় এ-দুটির মিল বা মিলন ঘটে না—এরা পরস্পর বিরোধী। জ্ঞানের, পুরুষ চেতনার স্বাভাবিক গতি হল উর্ধ্বদিকে, এ-পারকে প্রত্যাখ্যান করে ও-পারে চলে যাওয়া, সাক্ষীভাবে বা ব্রহ্মচেতনায় লোপ হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে শক্তির বা প্রকৃতির গতি হল নিচের দিকে, প্রকাশের, ভোগের কর্মের মধ্যে—ও-পারকে ভুলে গিয়ে। এ-দুয়ের মিলন সহজ, স্বাভাবিক ঐক্য ও একত্ব হল, যেখানে তাদের জন্মস্থান বৃহৎ অর্ণবে, পরম ব্যোমে,.....।

উর্ধ্বের চেতনা সাগরে, বরুণ মিত্রের (বৃহতের-সম্মেলনের) ধামে রয়েছে যে যুগল সূর্য ও সূর্যা (পুরুষোত্তম ও পরাশক্তি) তারাই যম-যমীর লক্ষ্য ও কাম্য—যম বলছেন। যমের 'নিবুজা' (প্রিয়া) যদি কেউ থাকে সেই পরাশক্তি, যমীরও চাই তবে অন্যপুরুষ সেই পুরুষোত্তমকে। নতুবা ক্ষর পুরুষ যদি যমীর প্রিয় হয় এবং ক্ষরা প্রকৃতি যদি হয় যমের প্রিয় তবে তা হবে পাপকর্ম। দেবতাদের মধ্যে যে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ রয়েছে তা এইরকম একটা চেতনার উর্ধ্বায়নের ফলে। মানুষী চেতনায় চাই এইরকম রূপান্তর, দেবায়ন, তবে একদিন দেখা দেবে স্ত্রী-পুরুষে পতি-পত্নীর প্রেম বা সহোদর-সহোদরার প্রীতি দিব্য আনন্দ। ভ্রাতা-ভগ্নির সম্বন্ধটি উদাহরণ হিসাবে, রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।" (বেদমন্ত্র—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)।

দশম অধ্যায়

বেদের দেবতা

বৈদিক দেবতা রহস্যের কথা মহর্ষি শৌনক কৃত 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের পাঁচটি শ্লোক হতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সমগ্র সৃষ্টির মূলে একই শক্তি বিদ্যমান এবং ওই শক্তিকেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। ওই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই 'একমেব দ্বিতীয় নাস্তি'—অর্থাৎ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। বেদে ওই একই ব্রহ্মকে নানা রূপে, নানা নামে তথা বিবিধ শক্তি সমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে স্তুতি বা উপাসনা করা হয়েছে। সমগ্র বা অনন্ত সৃষ্টির মূল নিয়ন্তা একজনই। সমস্ত দেব বা দেবী-শক্তির মধ্যে সেই একেরই প্রকাশ। যেমন একটি বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পমালার মধ্যে একই সূত্র বিদ্যমান থাকে এবং ওই সূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পসমূহ শুধুমাত্র 'মালা' নামেই অভিহিত হয়, তদ্রূপ বেদ-কথিত সূর্য, বায়ু, অগ্নি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, গণেশ, বাগ্দেবী,অদিতি ইত্যাদি সব দেব-দেবী আছে, সবই এক পরমাত্মা, রূপসূত্রে গ্রথিত অর্থাৎ সবই এক পরমাত্মার বিবিধ রূপ।

বৈদিক ঋষিরা যে-সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির প্রশংসা বা স্তুতি করেছেন, তা এইসব শক্তিসমূহের স্থূলরূপকে নয়, বরং ওইসকল স্থূলরূপের অন্তরালে যে চেতনশক্তি অধিষ্ঠিত আছেন, সেই চেতনশক্তির স্তুতি করা হয়েছে কিন্তু সেই স্তুতি অগ্নিদেবকে পরমাত্মা থেকে পৃথক ভেবে করা হয়নি। ঋষি স্থূল অগ্নিরূপের অন্তরালে পরমাত্মার শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাই অগ্নিকে সামনে রেখে পরমাত্মার শক্তিরূপকেই স্তুতি করেছেন। এইরূপে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবীকেও পরমাত্মার শক্তি থেকে পৃথক না ভেবে ঋষিরা, ওই সকল দেব-দেবীর মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই একই পরমাত্মা শক্তির স্তুতি করেছেন। বৈদিক

ঋষির দৃষ্টিতে পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। বিদ্বান ব্যক্তিগণ সেই এক পরমাত্মাকে নানারূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

ঈশোপনিষদের ভাষায়—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগত"

অর্থাৎ এই সৃষ্টিতে যত ব্রহ্মাণ্ড আছে তা সমস্তই ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত। জীব, জগৎ সবই একই ঈশ্বরের রূপ। ঈশ্বর দেবতাদেরও ঈশ্বর বা প্রভু। যেমন পরমাত্মা জীবাত্মার প্রভু বা স্বামী হয়েও জীবাত্মার সাথে এক বা অভিন্ন, তদ্রূপ পরমাত্মা দেবতাদের স্বামী বা প্রভু হওয়া সত্ত্বেও—পরমাত্মা ও দেবতা এক অভিন্ন সত্তা। বেদ তাই কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছে—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—অর্থাৎ সৃষ্টির সব কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

বেদ-পাঠকের বা বেদানুরাগীর বেদের প্রতি মন্ত্রের সম্যক জ্ঞানের জন্য দেবতার জ্ঞান অপরিহার্য। মহর্ষি শৌনক তাঁর 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে বলেছেন—

'বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ।
দৈবতজ্ঞো হি মন্ত্রানাং তদর্থমবগচ্ছতি।।'

অর্থাৎ বেদের প্রতি মন্ত্রে দেবতার জ্ঞান অতি যত্ন সহকারে অর্জন করা উচিত। কারণ দেবতার জ্ঞান বোধগম্য হলে মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। বৈদিক সাহিত্যে প্রধানত দুটি গ্রন্থে বেদের দেবতা তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থ দুটি হল—মহর্ষি শৌনক রচিত 'বৃহদ্দেবতা' এবং ঋষি যাস্ক বিরচিত প্রখ্যাত 'নিরুক্ত' গ্রন্থ। ঋষি যাস্ক 'নিরুক্ত' গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে দেবতাতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। বেদের প্রতিটি মন্ত্র এক-এক দেবতার উদ্দেশে প্রকাশিত হয়েছে।

"বেদে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য, বিষ্ণু, সোম, বরুণ পূষণ, মরুৎ, রুদ্র, সবিতা, অর্যমা, অপাং নপাৎ, অশ্বিন, আদিত্য, দৌ, ঋভু, যম, মিত্র প্রভৃতি বহু দেবতার নাম এবং বাক্ ঊষা, অদিতি, রাত্রি, পৃথিবী, সরস্বতী, শ্রী, ধিষণা প্রভৃতি দেবীর নাম পাওয়া যায়। কয়েকজন দেবতার নাম দ্বন্দ্ব-সমাসবদ্ধ যুগলরূপে সর্বদা কীর্তিত, যথা—মিত্রাবরুণৌ, ইন্দ্রাগ্নী, সূর্যাচন্দ্রমসৌ, দ্যাবাপৃথিবী, অগ্নিষোমী প্রভৃতি। অশ্বিন দেবতা সর্বদা যুগল বা যমজরূপে কল্পিত তজ্জন্য 'অশ্বিনৌ' দ্বিবচনান্ত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।"

বৈদিক দেবতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে এযুগের বেদজ্ঞ ঋষি অনির্বাণ তাঁর বেদমীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন—

"বৈদিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য দেববাদ। তার দুটি অঙ্গ—যজন ও উপাসনা। দেবতার যজনে ক্রিয়ার প্রাধান্য, উপাসনায় ভাবের। আপাতদৃষ্টিতে ক্রিয়ার চেতনা বহিরাবৃত্ত, ভাবে অন্তরাবৃত্ত। তবুও ক্রিয়াতে ভাবেরই অভিব্যক্তি, ভাবই তার ধারক এবং পোষক। এই ভাব সংহিতায় 'ধী' বা 'দীধিতি' অর্থাৎ ধ্যানচিত্ততা। ধ্যান দেবতার প্রাণ, ধ্যানেই তিনি যজমান বা উপাসকের প্রত্যক্ষ হন প্রাণরূপে। দেবতা সাধ্য—প্রজ্ঞা ও বীর্যরূপে; সাধ্য ও সাধকের মাঝে ধ্যানসেতু। 'নিদিধ্যান' বা ধ্যানতন্ময়তার ফলে দেববাদ পর্যবসিত হয় ব্রহ্মবাদে, আত্মা বিশ্ব ও পরমদেবতার সাযুজ্যে—সংহিতার আত্মস্তুতিগুলিতে যার পরিচয় পাই।"

ঋষি অনির্বাণ ওই গ্রন্থে [বেদমীমাংসা-২য় খণ্ড] দেবতার পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—"'দিব্' থেকে 'দেব'। কিন্তু বেদে প্রতিপদিক-দিব্-এর ব্যবহার আছে, ধাতুরূপে নাই। তার জায়গায় আছে 'দী' ধাতু অর্থাৎ 'দীপ্তি দেওয়া, ঝলমল করা'। প্রতিপদিক (বিভক্তি শূন্য ব্যক্তিবাচক বা বিশেষণ বাচক শব্দ, নাম, লিঙ্গ) 'দিব্' দ্যুলোক, আলো ঝলমল আকাশ। আকাশে যতক্ষণ আলো আছে ততক্ষণ 'দিবা'। দিব্ দিবা দেব তিনটি শব্দে একই ভাবনার প্রকাশ। সে ভাবনা আলো, অতএব দেবতার স্বরূপ হলো আলো। বাইরে যা আলো, অন্তরে তা-ই বোধ বা জেগে ওঠা, চিত্তি বা বিবেক, তার ফলে 'প্রজ্ঞান', 'সংজ্ঞান' ও 'সংবিৎ'। এমনি করে সাধ্য দেবতা সাধকের আত্মভূত হন।"

দেব শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'নিরুক্তি'-কার যাস্ক বলেছেন—

'দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা। বে দেবো সা দেবতা ইতি।' অর্থাৎ দাতা, বরপ্রদাতা, দ্যোতিমান, দিব্যমান অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দ্যুলোক নিবাসী ব্যক্তি বিশেষ। সহজ কথায় দিব্য চৈতন্যানুগ বিশিষ্ট সত্তাই দেবতা। যিনি দাতা বা দান করেন, যিনি দীপ্ত বা স্বপ্রকাশ, যিনি স্বয়ং দ্যুতিমান হয়ে অন্যকেও দ্যোতিত করেন অথবা দ্যুলোকে যাঁর অবস্থান তিনিই দেবতা। তাঁরা একদিকে অভীষ্টবর্ষী, অন্যদিকে পার্থিব বস্তুতে অধিষ্ঠাত্রী

চৈতন্য সত্তা। বেদ-মনীষীদের মতে দেবতা ও সৃষ্টি পরমাত্মারই বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। বেদের ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য, অশ্বিনীকুমার, সোম (চন্দ্র), পৃথিবী, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদি সকল দেবতার মধ্যে সর্বব্যাপী এক পরমাত্মার এক-এক গুণ বিদ্যমান। যেমন বেদে বরুণকে শান্তিপ্রিয় দেবতা বলা হয়েছে। বৈদিক যুগে এই দেবতার গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। বেদে বরুণকে এই জগতের নিয়ন্তা ও শাসকরূপে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি প্রাকৃতিক ও নৈতিক নিয়মের সংরক্ষকরূপে উপাসিত। এই নৈতিক নিয়ম বেদে 'ঋত' সংজ্ঞায় অভিহিত। অনুরূপভাবে 'ইন্দ্র' ঋগ্বেদে যুদ্ধের দেবতা বা যোদ্ধারূপে চিত্রিত। তিনি জগতের উৎপত্তি, প্রলয় আদির সঞ্চালক। ইন্দ্র বলিষ্ঠ এবং পরাক্রমী দেবতা। তিনি 'অন্তরীক্ষ' ও 'দৌ' কে ধারণ করে আছেন, তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও শক্তি যুদ্ধ জয়ে সমর্থ হয় না। একথা স্মরণে রেখে বীর যোদ্ধা যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে ইন্দ্রের স্তুতি করেন। বেদের আর এক বিশেষ দেবতার নাম অগ্নি। ইনি শুধু দেবতাই নন—ইনি যজ্ঞের পুরোহিতও, যজ্ঞে অর্পিত 'হবি' তিনি দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যান—তাই তিনি হব্যবাহন (অগ্নির একটি নাম)। ঋষি অরবিন্দের ভাষায় দিব্যপুরোহিত অগ্নির পৌরহিত্যে যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় সেই যজ্ঞ হল—"দিব্যশক্তির নিকট মানুষের নিরন্তর আত্মনিবেদন এবং মানবের মাঝে দিব্যশক্তির নিরন্তর অবতরণ—ইহারই প্রতীক মনে হয় যজ্ঞ।" বৈদিক দেবতাদের মধ্যে আর একজন উল্লেখযোগ্য দেবতা হলেন অশ্বিনীকুমার। বেদে এই দেবতার প্রচুর স্তুতি ও চর্চা পরিলক্ষিত হয়। ইনি বেদে আয়ুর্বেদের অধিষ্ঠাতা দেবরূপে পরিগণিত। এইরূপ অনেক দেবতার শক্তি ও মহত্বের কথা বেদে পাওয়া যায়।

নিরুক্তকার যাস্ক বেদের দেবতাসমূহকে স্থানভেদে তিনভাগে ভাগ করেছেন—১। পৃথ্বীস্থানীয় দেবতা, ২। অন্তরীক্ষস্থানীয় দেবতা, ৩। দ্যুঃস্থানীয় দেবতা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই সকল দেবতার স্থানকে 'আন্তসা' অর্থাৎ পৃথ্বীলোক সম্বন্ধীয়, 'নাভসা' অর্থাৎ অন্তরীক্ষ সম্বন্ধীয় এবং 'মাহসা' অর্থাৎ মহলোক সম্বন্ধীয় বলা হয়েছে। পৃথ্বীস্থানীয় দেবতারা হলেন—অগ্নি, অপ্, পৃথিবী ও সোম। অন্তরীক্ষস্থানীয় দেবতারা হলেন—ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ,

অপাং নপাৎ (বিদ্যুৎ), পর্জন্য (মেঘ) ইত্যাদি। দ্যুঃস্থানীয় দেবতারা হলেন—সূর্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, দ্যুঃ, পূষা, সবিতা, আদিত্য, অশ্বিনীযুগল, ঊষা, রাত্রি প্রভৃতি। এই তিন স্থানের দেবতাগণের মধ্যে একজন দেবতা প্রধান এবং সেই স্থানের অন্যান্য দেবতাগণ তার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি বা প্রকাশমাত্র। পৃথ্বীস্থানীয় দেবতাবৃন্দের মধ্যে অগ্নি মুখ্য বা প্রধান। অন্তরীক্ষস্থানের দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র বা বায়ু প্রধান এবং দ্যুঃস্থানের প্রধান দেবতা সূর্য। এই তিন মুখ্য বা প্রধান দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ নিয়ে সেই সেই গোষ্ঠীর অপরাপর দেবগণের নামকরণ হয়েছে। আবার ওই একই নিয়মে সূর্য হতে আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পূষা, ভগ, ঊষা, অশ্বিনীযুগল, সবিতা প্রভৃতি দেবতা নামকরণ হয়েছে। নিরুক্তকার যাস্কের মতে এই তিনজন দেবতাই মুখ্য বা মূল। যাস্কের এই মতের সমর্থনে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, ১৫৮ নং সূক্তে, একটি মন্ত্র দৃষ্ট হয়। যথা—

"সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ।
অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।।"

অর্থাৎ সূর্য আমাদের দ্যুলোক বা স্বর্গের উপদ্রব হতে রক্ষা করুন। বায়ু আমাদের আকাশ অথবা অন্তরিক্ষলোকের উপদ্রব হতে রক্ষা করুন এবং অগ্নি আমাদের পার্থিব উপদ্রব হতে রক্ষা করুন। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে তিন স্থানের বা তিনলোকের সকল দেবতার উল্লেখ না করে শুধুমাত্র এই তিনজন দেবতার উল্লেখ করায় তাঁদের প্রধানত্ব বা মুখ্যত্ব প্রতিপন্ন করে।

ভারতীয় বৈদিক গ্রন্থে এই তিন স্থানের দেবতার সংখ্যা সাধারণত তেত্রিশ বলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে একাদশ দেবতা ভূলোক বা পৃথ্বীর, একাদশ অন্তরিক্ষলোকের এবং বাকি একাদশ দেবতা দ্যুলোকবাসী। 'শতপথ ব্রাহ্মণে'ও তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদে তেত্রিশ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋক্ সংহিতার দুটি মন্ত্রে দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ জন বলা হয়েছে। যথা—

"ত্রীনি শতা ত্রী সহস্রান্যগ্নিং ত্রিংশচ দেবা নব চা স পর্যন।
ঔক্ষণ্ ঘৃতৈর স্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্বোতারং ন্যসাদয়ন্ত।।
[ঋগ্বেদ, তৃতীয় মণ্ডল, ৯ সূক্ত, ৯মন্ত্র]

অনুরূপ প্রায় একই বিষয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের, ৫২ নং সূক্তের, ৬ষ্ঠ মন্ত্রে পুনরায় উক্ত হয়েছে। উভয় মণ্ডলের উভয়সূক্তের মন্ত্রের অনুবাদ—তিন সহস্র তিনশত ত্রিংশত ও নবসংখ্যক (৯) দেবগণ অগ্নিকে পূজা করেছেন, ঘৃত দ্বারা সিক্ত করেছেন এবং তাঁর জন্য কুশ বিস্তৃত করেছেন। তদন্তর তাঁকে হোতারূপে কুশ আসনের উপরে উপবেশন করিয়েছেন। ৩৩৩৯ জন দেবতা সম্বন্ধে বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য তাঁর বেদভাষ্যে লিখেছেন—দেবতা কেবল ৩৩ জন, ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁদের মহিমা মাত্র। আবার কোনও কোনও বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মতে এই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুটি শূন্য বসিয়ে পরে যোগ করে ওই সংখ্যা পাওয়া গেছে। যথা—

দেবতার সংখ্যা—	৩৩
মধ্যে একটা শূন্য অর্থাৎ—	৩০৩
মধ্যে দুটি শূন্য অর্থাৎ—	৩০০৩
	৩৩৩৯

পৌরাণিক যুগে এই সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হয়। [বলা বাহুল্য 'কোটি' শব্দের এক অর্থ শ্রেণী বা স্তর যথা তিনি উচ্চকোটির সাধক]।

অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই মুখ্য তিন দেবতাদের মধ্যে অগ্নি আমাদের সবচেয়ে কাছের বা নিকটের দেবতা এবং সূর্য সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী দেবতা এবং অন্যান্য সকল দেবতা এই দুই দেবতার অন্তর্ভুক্ত।

বেদ মনীষীদের মতে উপরে উল্লিখিত তিন মুখ্য বা প্রধান দেবতা প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান এক পরমাত্মার তিনপ্রকার অভিব্যক্তিমাত্র। বেদ-মনীষীদের মতে সকল দেবতার মূলে রয়েছেন এক পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম। সেই এক সর্বব্যাপী পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সকল দেবতা। বৈদিক সংহিতা গ্রন্থেও দেবতাদের স্বরূপ সম্বন্ধে এই তত্ত্ব স্পষ্ট ভাষায় বারবার উক্ত হয়েছে। যথা—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ' (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)। সেই এক শাশ্বত সত্তাকে বিপ্রগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহুনামে অভিহিত করে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১৪নং সূক্তের অন্তর্গত পঞ্চম মন্ত্রে বলা হয়েছে—'একং সন্তং বহুধা

কল্পয়ন্তি'—অর্থাৎ সেই এককে অথবা এক সৎকে ঋষিগণ বহুরূপে ভাবনা করেন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্নতম সূক্তের প্রতি মন্ত্রের বা ঋকের অন্তিম পাদে— 'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্' এই বাক্যটি দৃষ্ট হয়। এর অর্থ—'তুমিই সকল দেবতার প্রাণদাতা মহান সত্তা।'

ঋগ্বেদের অপর একমন্ত্রে বলা হয়েছে—'একং বৈ ইদং বি বভূব সর্বম'—অর্থাৎ এই একই পরমাত্মা সকল রূপ ধারণ করেছেন। বেদ ও বেদ-মনীষীগণের মতে নিত্য নিত্য এক পরমাত্মা হতে সকল দেবগণের উৎপত্তি। এই বিষয় সম্পর্কে শুক্ল-যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। 'এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ'—অর্থাৎ এই এক পরমাত্মাই সকল পদার্থ সৃষ্টি করেছেন, ইনিই সকল দেবতার রূপ ধারণ করেছেন।

বেদবিদ্ পণ্ডিতদের মতে বেদে বর্ণিত প্রতিটি দেবতা এক-একটি পার্থিব বস্তুর অথবা পার্থিব প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতীক। এক-একটি পার্থিব পদার্থের চৈতন্যসত্তা বা অধিষ্ঠাতা এক-একজন দেবতা। যেমন দৃশ্য পার্থিব অগ্নির চৈতন্যময় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন অগ্নি। সূর্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন সবিতা বা আদিত্যদেব। রুদ্র দেবতা হলেন বজ্র। এই জন্য তিনি ভীষণ ও সংহারক। ঋগ্বেদে রুদ্রের এই ভীষণরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। রুদ্রের শুভ বা কল্যাণমূর্তি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। শুক্ল-যজুর্বেদে রুদ্রের যুগপৎ ভীষণ ও কল্যাণরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। রুদ্রের দুটি বিপরীতরূপের সমন্বয় করা হয়েছে শুক্ল যজুর্বেদে। অপাং নপাৎ দেবতার বাহ্য প্রতীক বিদ্যুৎ। পর্জন্যদেবের প্রতীক হল মেঘ। মিত্র, বরুণ, সবিতা, ভগ, পূষা, আদিত্য, ঊষা, অশ্বিন প্রভৃতি দেবগণ পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তন গতিপথে সূর্যের গগনে অবস্থানের স্থানভেদের এক-একটি নাম মাত্র।

দিনের বেলায় আদিত্যের নাম সূর্য, রাত্রিতেও আদিত্য বিরাজ করেন। আমরা দেখতে পাই না, তখন তাঁর নাম 'বরুণ'। রাত্রিশেষে আকাশের অন্ধকার প্রথম তিরোহিত হয় কিন্তু পৃথিবীতে অন্ধকার থেকে যায়, তখন আদিত্যের নাম 'সবিতা'। যখন পৃথিবীর অন্ধকারও তিরোহিত হয় তখন তাঁর নাম 'অশ্বিন'।

সূর্যোদয়ের পূর্বে দিক্‌মণ্ডল যখন রক্তিমাভ হয়ে ওঠে তখন আদিত্যের নাম 'ঊষা'। উদিতমাত্র সূর্যবিম্বের নাম 'ভগ'। তারপরের অবস্থার নাম 'সূর্য'। মধ্যাহ্নে আদিত্য যখন গগনমণ্ডলের মধ্যখানে বিরাজ করেন তখন তাঁর নাম হয় বিষ্ণু। দৈবগণের বিশেষ বিশেষ নাম ও রূপের দৃষ্টিতে তাঁরা পরস্পর ভিন্ন এবং তাঁদের সকলের মধ্যে অনুস্যূত মহাসত্তার পরিপ্রেক্ষিতে বা দৃষ্টিতে তাঁরা অভিন্ন। যেমন স্বর্ণ হতে নির্মিত কুণ্ডল, বলয়, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্বর্ণালংকার হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বর্ণত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তারা অভিন্ন। দেবতাগণের মধ্যে বিদ্যমান এই মহাসত্তাই পরমাত্মা এবং মূলত দেবগণ পরমাত্মা স্বরূপ—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, দেবতাগণ সাকার না নিরাকার? শরীরী অথবা অশরীরী? এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগেই এ-সম্বন্ধে দ্বিমত ছিল। নিরুক্তকার যাস্ক তাঁর বৈদিক নিরুক্ত গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে সে-সকল মতের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। তিনি পরস্পর বিরোধী মত আলোচনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি সাকার-নিরাকার অথবা শরীরী-অশরীরীর অর্থে 'পুরুষবিধ' এবং 'অপুরুষবিধ' শব্দদুটি প্রয়োগ করেছেন। 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ শরীরধারী এবং 'অপুরুষবিধ' এর বিপরীত। মহর্ষি জৈমিনী 'পূর্ব'-মীমাংসা' দর্শনে দেবতাদের আকার ও চেতনপুরুষের ন্যায় ব্যবহার স্বীকার করেননি। এই দর্শনের মতে মন্ত্রের অতিরিক্ত দেবতার কোনও পৃথক রূপ নেই। 'মন্ত্রময়ী দেবতা', যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যখন কোনও বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হয় তখন সেই মন্ত্ররূপে দেবতার আবির্ভাব হয়। এই দর্শনের মতে মন্ত্র ব্যতীত দেবতার কোনও পৃথকসত্তা, বিগ্রহ বা রূপ নেই। কিন্তু উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনে মহর্ষি বেদব্যাস 'পূর্ব-মীমাংসা' দর্শনের এই মত স্বীকার করেননি। তিনি তাঁর 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে জৈমিনীর মত খণ্ডন করে দেবগণের পুরুষবৎ শরীরধারণ ও ব্যবহার সম্ভব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। শ্রীমদ্ শংকরাচার্য ও তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বেদব্যাসের মত সমর্থন করেছেন এবং শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র হতে প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যথা—ইন্দ্র মেঘ-এর রূপ ধারণ করে কান্বায়ন মেধাতিথিকে হরণ করেছিলেন। আবার

ইন্দ্র অশ্বারোহণ করে দীর্ঘপথ গমন করেছিলেন, ইত্যাদি শ্রুতিবচন এবং আদিত্য পুরুষের রূপ ধারণ করে কুন্তির নিকট গমন করেছিলেন। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন প্রভৃতি দেবগণ যুগপৎ রাজা নলের রূপ ধারণ করেছিলেন। ভাগবতে আছে 'পৃথিবী গাভীর রূপ ধারণ করে ভগবান নারায়ণের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।' ইত্যাদি স্মৃতি পুরাণাদি গ্রন্থের বচন দেবগণের শরীর ধারণের প্রমাণ।

নিরুক্তকার যাস্কাচার্য এই পরস্পর বিরুদ্ধ মতদ্বৈততার সমন্বয় করে নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। দেবতারা সাকার ও নিরাকার—তাঁর ভাষায় পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ উভয়ই, স্বরূপত পুরুষবিধ শরীরধারী কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মে তাঁরা শরীর নিয়ে উপস্থিত হন না। তাঁদের স্ব-স্বরূপ 'পুরুষবিধ' কিন্তু কর্মরূপ অপুরুষবিধ। যথা যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞপুরুষ স্বরূপে পুরুষরূপী কিন্তু সেইরূপ যজমানের প্রত্যক্ষ যোগ্য নয়। যজ্ঞকর্মকালে যজ্ঞকর্মের সঙ্গে যজ্ঞপুরুষ একাত্ম হয়ে থাকেন এবং সেই কর্মময় অপুরুষবিধরূপ যজমান দেখতে পায়। এই তত্ত্ব অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণাদি প্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বরূপ বিচারে তাঁরা বিগ্রহ যুক্ত, রূপবান কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মকালে সসীম শক্তি মানবগণের নিকট তাঁরা অশরীরী থাকেন, তখন সেই সেই শ্রৌতকর্মই তাঁদের রূপ। অতএব দেবতাগণ নিত্য উভয় প্রকার।

আজানদেব এবং কর্মদেব নামে দেবতাদের আরও দুটি বিভাগ করা হয়েছে। যেসব দেবদেবীগণের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ, দেবত্ব লাভ করার জন্য তাঁদের কোনও পুণ্যকর্ম বা তপস্যাদি করতে হয় না তাঁদের আজান দেবতা বলা হয়—অর্থাৎ জন্মরহিত স্বতঃসিদ্ধ দেবতা বলা হয়। যাঁরা পূর্বে মানুষ ছিলেন, পুণ্যকর্ম বা তপস্যার বলে দেবত্ব লাভ করেছেন তাঁদের কর্মদেব বা কর্মদেবতা বলা হয়। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, সোম, বিষ্ণু, রুদ্র, মরুৎ, ঊষা, বাক্ প্রভৃতি দেবদেবীগণ 'আজান দেবতা'—কারণ এদের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ। 'ঋভু' নামক দেবগণ এবং অশ্বিনী দেবতাযুগল কর্মদেবতা কারণ তাঁরা প্রথমে দেবতা ছিলেন না। পুণ্যকর্ম ও তপস্যার বলে তাঁরা দেবত্ব অর্জন করেছেন। বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায় যে, বেদে ইন্দ্র, বায়ু, ও অগ্নি—এই তিনটি দেবতার

বিশেষ প্রাধান্য আছে। আমার পরমারাধ্য আচার্যদেব বিশ্ববন্দিত শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলতেন—"ইন্দ্র বিশ্বমনের (Universal mind) প্রতীক। এই বিশ্বমনের ভাবনাই বিশ্বরূপে, সৃষ্টিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। বায়ু বিশ্বপ্রাণের (Universal life force) প্রতীক। এই বিশ্বপ্রাণ হইতেই ব্যষ্টি প্রাণ বা ব্যষ্টি জীবের আবির্ভাব। অগ্নি বিশ্বশক্তির (Universal energy) প্রতীক। এই অগ্নিই বিশ্বভুবন গড়িয়া তুলিতেছে। অরূপ শক্তিকে রূপে পরিণত করিতেছে।" বেদের দেবতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা আশা করি সুধী সহৃদয় পাঠক পেয়েছেন। এবার আসুন বেদের কতিপয় দেবদেবীর তত্ত্ব নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই শুরু করা যাক অগ্নিদেবকে নিয়ে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের শুরুও এই অগ্নিদেবকে নিয়ে।

অগ্নি

আমার আচার্যদেব তাঁর ঈশোপনিষদের আঠারো সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে বলেছেন— "আমাদের এই ভৌমচেতনার আধারই অগ্নি। এইজন্য অগ্নিকে বলা হয় পৃথিবীস্থান দেবতা। ইনিই পৃথিবীকে রূপায়িত করিয়া পৃথিবীর সর্বজীবের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। অজ্ ধাতু হইতে এই অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। অজ্ ধাতুর অর্থ অগ্রসর হওয়া। আমাদের এই মৃন্ময় দেহাধারে অন্তর্নিহিত আছে আত্মস্বরূপ অনুভবের আকুতি, আত্মসাক্ষাৎকারের অভীপ্সা—ইহাই আমাদের অন্তরস্থিত অগ্নির স্বরূপ। এই অগ্নিই আমাদের মৃন্ময় আধারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দ্যুলোকের পানে লেলিহান শিখা বিস্তার করেন। এই অগ্নিরূপী ভৌমচেতনা হইতেই আমাদের দেহ, প্রাণ ও মনের সৃষ্টি, সুতরাং এ অগ্নিই পুরোধা—দেহপুরকে, দেহনিকেতনকে তিনিই ধারণ করিয়া আছেন। ইনিই পুরোহিত অর্থাৎ দেহপুরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবতা। পৃথিবীর সর্বমানবের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া জীবন্মুক্ত পুরুষ এই অগ্নিকেই আবাহন করিতেছে"—ঈশোপনিষদের ভাষায় সেই আবাহনের মন্ত্র হল—

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্—
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

ইন্দ্র অশ্বারোহণ করে দীর্ঘপথ গমন করেছিলেন, ইত্যাদি শ্রুতিবচন এবং আদিত্য পুরুষের রূপ ধারণ করে কুন্তির নিকট গমন করেছিলেন। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন প্রভৃতি দেবগণ যুগপৎ রাজা নলের রূপ ধারণ করেছিলেন। ভাগবতে আছে 'পৃথিবী গাভীর রূপ ধারণ করে ভগবান নারায়ণের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।' ইত্যাদি স্মৃতি পুরাণাদি গ্রন্থের বচন দেবগণের শরীর ধারণের প্রমাণ।

নিরুক্তকার যাস্কাচার্য এই পরস্পর বিরুদ্ধ মতদ্বৈততার সমন্বয় করে নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। দেবতারা সাকার ও নিরাকার—তাঁর ভাষায় পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ উভয়ই, স্বরূপত পুরুষবিধ শরীরধারী কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মে তাঁরা শরীর নিয়ে উপস্থিত হন না। তাঁদের স্ব-স্বরূপ 'পুরুষবিধ' কিন্তু কর্মরূপ অপুরুষবিধ। যথা যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞপুরুষ স্বরূপে পুরুষরূপী কিন্তু সেইরূপ যজমানের প্রত্যক্ষ যোগ্য নয়। যজ্ঞকর্মকালে যজ্ঞকর্মের সঙ্গে যজ্ঞপুরুষ একাত্ম হয়ে থাকেন এবং সেই কর্মময় অপুরুষবিধরূপ যজমান দেখতে পায়। এই তত্ত্ব অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণাদি প্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বরূপ বিচারে তাঁরা বিগ্রহ যুক্ত, রূপবান কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মকালে সসীম শক্তি মানবগণের নিকট তাঁরা অশরীরী থাকেন, তখন সেই সেই শ্রৌতকর্মই তাঁদের রূপ। অতএব দেবতাগণ নিত্য উভয় প্রকার।

আজানদেব এবং কর্মদেব নামে দেবতাদের আরও দুটি বিভাগ করা হয়েছে। যেসব দেবদেবীগণের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ, দেবত্ব লাভ করার জন্য তাঁদের কোনও পুণ্যকর্ম বা তপস্যাদি করতে হয় না তাঁদের আজান দেবতা বলা হয়—অর্থাৎ জন্মরহিত স্বতঃসিদ্ধ দেবতা বলা হয়। যাঁরা পূর্বে মানুষ ছিলেন, পুণ্যকর্ম বা তপস্যার বলে দেবত্ব লাভ করেছেন তাঁদের কর্মদেব বা কর্মদেবতা বলা হয়। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, সোম, বিষ্ণু, রুদ্র, মরুৎ, ঊষা, বাক্ প্রভৃতি দেবদেবীগণ 'আজান দেবতা'—কারণ এদের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ। 'ঋভু' নামক দেবগণ এবং অশ্বিনী দেবতাযুগল কর্মদেবতা কারণ তাঁরা প্রথমে দেবতা ছিলেন না। পুণ্যকর্ম ও তপস্যার বলে তাঁরা দেবত্ব অর্জন করেছেন। বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায় যে, বেদে ইন্দ্র, বায়ু, ও অগ্নি—এই তিনটি দেবতার

বিশেষ প্রাধান্য আছে। আমার পরমারাধ্য আচার্যদেব বিশ্ববন্দিত শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলতেন—''ইন্দ্র বিশ্বমনের (Universal mind) প্রতীক। এই বিশ্বমনের ভাবনাই বিশ্বরূপে, সৃষ্টিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। বায়ু বিশ্বপ্রাণের (Universal life force) প্রতীক। এই বিশ্বপ্রাণ হইতেই ব্যষ্টি প্রাণ বা ব্যষ্টি জীবের আবির্ভাব। অগ্নি বিশ্বশক্তির (Universal energy) প্রতীক। এই অগ্নিই বিশ্বভুবন গড়িয়া তুলিতেছে। অরূপ শক্তিকে রূপে পরিণত করিতেছে।'' বেদের দেবতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা আশা করি সুধী সহৃদয় পাঠক পেয়েছেন। এবার আসুন বেদের কতিপয় দেবদেবীর তত্ত্ব নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই শুরু করা যাক অগ্নিদেবকে নিয়ে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের শুরুও এই অগ্নিদেবকে নিয়ে।

অগ্নি

আমার আচার্যদেব তাঁর ঈশোপনিষদের আঠারো সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে বলেছেন— ''আমাদের এই ভৌমচেতনার আধারই অগ্নি। এইজন্য অগ্নিকে বলা হয় পৃথিবীস্থান দেবতা। ইনিই পৃথিবীকে রূপায়িত করিয়া পৃথিবীর সর্বজীবের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। অজ্ ধাতু হইতে এই অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। অজ্ ধাতুর অর্থ অগ্রসর হওয়া। আমাদের এই মৃন্ময় দেহাধারে অন্তর্নিহিত আছে আত্মস্বরূপ অনুভবের আকুতি, আত্মসাক্ষাৎকারের অভীপ্সা—ইহাই আমাদের অন্তরস্থিত অগ্নির স্বরূপ। এই অগ্নিই আমাদের মৃন্ময় আধারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দ্যুলোকের পানে লেলিহান শিখা বিস্তার করেন। এই অগ্নিরূপী ভৌমচেতনা হইতেই আমাদের দেহ, প্রাণ ও মনের সৃষ্টি, সুতরাং এ অগ্নিই পুরোধা—দেহপুরকে, দেহনিকেতনকে তিনিই ধারণ করিয়া আছেন। ইনিই পুরোহিত অর্থাৎ দেহপুরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবতা। পৃথিবীর সর্বমানবের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া জীবন্মুক্ত পুরুষ এই অগ্নিকেই আবাহন করিতেছে''—ঈশোপনিষদের ভাষায় সেই আবাহনের মন্ত্র হল—

''অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্—
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরানমেনো।
ভূয়িষ্ঠাং তে নম—উক্তিং বিধেম।। ১৮।। [ঈশোপনিষদ্]

অর্থাৎ হে অগ্নি, তুমি আমাদের সুপথে, আলোর পথে নিয়ে চলো। তুমি আমাদের চলার পথের সব বিবরণ জানো। আমাদের মাঝে কুণ্ডলী হয়ে সঞ্চিত আছে যে পাপ তা তুমি দূর করো। তোমাকে জানাই আমাদের আত্মসমর্পণের শত শত প্রণতি।

আচার্যদেবের ভাষায়—"অধ্যাত্মচেতনার অগ্নিই মনের তেজ, মনের বীর্য, সাধক অন্তরের ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার শিখা। অগ্নি অশুদ্ধ অপবিত্র বস্তুকেও দগ্ধ করিয়া আত্মস্বরূপে পরিণত করে। অন্তরে যখন সাধনার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন দেহ-মনেরও সমস্ত অশুভচিন্তা দূর হইয়া যায়। এইরূপ সাধকের কাছ হইতে ষড়রিপু সভয়ে পলায়ন করে। এইরূপ অগ্নিতুল্য তেজস্বী সাধকের দেহকেই বলে 'ভস্মান্তং শরীরম্' অর্থাৎ অগ্নিস্বাক্ত বা অগ্নিময় দেহ। যোগশাস্ত্রে এইরূপ দেহকে বলে 'যোগাগ্নিময়ং শরীরম্'।"

ভারতীয় সনাতন ধর্মের মূলস্তম্ভ চতুর্বেদে অগ্নি অন্যতম প্রধান দেবতারূপে চিত্রিত। বেদে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে স্তুতিমন্ত্রের সংখ্যা দু-হাজার চারশত তিরাশি (২৪৮৩)। ইনি বিভিন্নরূপে জগদ্ব্যাপী ব্যাপ্ত। ঊর্জা বা শক্তির স্রোত। এককথায় বিশ্বব্যাপী ঊর্জাই অগ্নি। ইনি জগৎসংসারের সমস্ত পদার্থসমূহকে গতি এবং শক্তি প্রদান করেন। বিভিন্ন স্থানে ইনি বিভিন্ন নামে অভিহিত। অথর্ব বেদ মতে অগ্নি চার প্রকারের, যথা—ভৌতিক অগ্নি, জলীয় অগ্নি, সূর্য এবং বিদ্যুৎ। অথর্ব বেদে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"দিবং পৃথিবীমন্তরিক্ষং যে বিদ্যুতমনু সংচরন্তি।
সে দিক্ষ্বন্তর্যে বাতে অন্তঃ।। [অথর্ব বেদ, ৩।২১।৭]

অর্থাৎ অগ্নি দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, বিদ্যুৎ, বায়ু এবং চতুর্দিকে ব্যাপ্ত বা বিরাজমান। অথর্ব বেদ মতে জলে ইনি বিদ্যুৎ, মেঘে বিজলী, মনুষ্যে ঊর্জা শক্তি, প্রস্তরে স্ফুলিঙ্গ বা অগ্নিকণা, বৃক্ষ বনস্পতিতে ঊষ্মা, পশুপক্ষীতে স্ফূর্তি। বিশ্বের যেখানে যা কিছু গতি, জ্যোতি, প্রকাশ-বিকাশ অথবা প্রগতি তা সবই অগ্নির শক্তি বা প্রভাব। এইজন্য বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে অগ্নিকে

সর্বদেবময় বলা হয়েছে। অগ্নির সঙ্গে সকল দেবতার সম্বন্ধ। এইজন্য 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে 'সর্বদেবত্যোঅগ্নিঃ'। 'অগ্নি র্বৈ সর্বেষাং দেবানামাত্মা।' অর্থাৎ অগ্নি সকল দেবতার, সকল দেবতা অগ্নিরই বিভিন্ন রূপমাত্র। অগ্নিতত্ত্বের কারণেই বায়ুতে গতিশীলতা বিদ্যমান।

সর্বব্যাপক হওয়ার কারণে ঈশ্বরীয় সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হয়। অগ্নি সংসারের সর্বত্র ব্যাপ্ত, এই কারণে অগ্নিকে ব্রহ্ম বলা হয়। সারা জগৎ-সংসার গতিশীল। গতিশীলতার মূল আধার অগ্নিতত্ত্ব অথবা ঊর্জা। এই অগ্নিতত্ত্ব প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে ঘুরতে বা সক্রিয় হতে বাধ্য করে। এইজন্য বৈদিক শতপথ, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থদ্বয়ে অগ্নিকে ব্রহ্ম এবং সোমকে ক্ষত্র বা শক্তি বলা হয়েছে। অগ্নি ও সোম মিলেমিশে যেন একটি যুগ্ম বা যুগল। এইরূপে ব্রহ্ম ও শক্তি যুগ্ম বা যুগল। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—

'ত্রিবৃদ্ অগ্নিঃ'। অর্থাৎ অগ্নি ত্রিবৃত্। এর অর্থ অগ্নি তিনরূপে তিনলোকে বিতত (ব্যাপ্ত)। ইনি দ্যুলোকে সূর্য, অন্তরিক্ষে বায়ু এবং বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে ইনিই অগ্নি। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নির এই তিনরূপের কথা সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে এটাও বলা হয়েছে যে,—'যো বৈ রুদ্রঃ সো অগ্নিঃ।' অর্থাৎ যিনি রুদ্র তিনিই অগ্নি। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থানুযায়ী রুদ্র এবং অগ্নি একই তত্ত্বের দুই নাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে—'অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ।' অর্থাৎ অগ্নি নিম্নশ্রেণীর বা নিম্ন কোটির দেবতা এবং বিষ্ণু উচ্চস্থানীয় বা উচ্চ কোটির দেবতা। পাশ্চাত্য এই অভিমত সম্পূর্ণ ভুল। কারণ শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে দেবতাদের মধ্যে কোনও উচ্চ-নীচ-এর বিচার নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মন্ত্রটির প্রকৃত অর্থ হল, বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য, সূর্যের স্থান ঊর্ধ্বের অর্ধলোক—তিনি এই ঊর্ধ্ব বা পরার্ধলোকের স্বামী। অপরদিকে অগ্নির স্থান নিম্নের ভূগোলে বা নিচে—তিনি নিচের অর্ধভাগের বা অপরার্ধের স্বামী।

শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নির উদ্দেশে বলা হয়েছে—'শির এবাগ্নিঃ'। অর্থাৎ মানুষের শিরোভাগ বা শিরোদেশে আগ্নেয় বা অগ্নিতত্ত্ব বিদ্যমান। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের মস্তিষ্ক সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। এখানে সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের

প্রেরণাসূত্র (Switch) সংলগ্ন আছে। এই কেন্দ্রীয় তত্ত্বই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে। এই কেন্দ্রের কোনও প্রকার ক্ষতি বা হানি সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষতি বা হানিরূপে পরিগণিত হয়। এইজন্য মানুষের মস্তিষ্ককে দ্যুলোক, দেবভূমি, দেবমন্দির, দেবালয় ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই কেন্দ্র প্রকাশের পুঞ্জ। এখান থেকেই ঊর্জা নির্গত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা এই স্থান থেকেই প্রস্ফুটিত হয়। এই কারণে মানুষের মস্তিষ্ককে অগ্নিতত্ত্বের কেন্দ্র বলা হয়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' এও বলা হয়েছে যে—'মন এবাগ্নিঃ'। 'প্রাণো বা অগ্নিঃ। বাগেবাগ্নিঃ'। অর্থাৎ মন-প্রাণ-বাকই অগ্নি। বাকতত্ত্ব-শব্দতত্ত্ব—আকাশের গুণ। এই গুণকে পঞ্চ মহাভূতের প্রতিনিধি মেনে প্রতীকরূপে বাক্ বলা হয়। মন-প্রাণ-বাক্-এর সমষ্টিই হচ্ছে মানবশরীর। মন—বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তি জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার। প্রাণ—শারীরিক ঊর্জা এবং বাক্ হচ্ছে ভাবপ্রকাশ, ভাষণ এবং কথন আদির মাধ্যম। অগ্নিতত্ত্বের উপস্থিতিতেই এগুলি সক্রিয় বা ক্রিয়াশীল হয়। অগ্নিতত্ত্বের অনুপস্থিতিতে এগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। মন-প্রাণ-বাক্ তত্ত্বের বিশ্লেষণ তিন বেদের মধ্যেও পাওয়া যায়। যজুর্বেদে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে—'ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনোযজুঃ প্রপদ্যে, সাম প্রাণং প্রপদ্যে।' অর্থাৎ ঋগ্বেদ হচ্ছে বাক্ তত্ত্ব। এর মধ্যে বিচার, চিন্তন, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ভাবের বিশদ বিবরণ আছে। যজুর্বেদ হচ্ছে মনস্তত্ত্ব। এতে আছে বুদ্ধি, সংকল্প, বিকল্প এবং সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের বিশদ বিবরণ। ঋগ্বেদ জ্ঞানপ্রধান। যজুর্বেদ কর্মপ্রধান। সাম বেদ হচ্ছে প্রাণতত্ত্ব। এই বেদে প্রাণ তত্ত্বরূপে সংগীতকে বর্ণনীয় বিষয় করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের, প্রথম সূক্তের এগারোটি মন্ত্রে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে— সমস্ত দেব-দেবী অগ্নিরই বিভিন্ন রূপ। ঊর্জা বা শক্তির বিভিন্নতার কারণেই অগ্নির বিভিন্ন নাম ও রূপের বর্ণনা করা হয়েছে ঋগ্বেদের ওই সকল মন্ত্রে [অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তের এগারোটি মন্ত্র অধ্যয়ন করুন] বর্ণিত হয়েছে যে, অগ্নিই ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ত্বষ্টা, রুদ্র, মরুৎ, পূষা, সবিতা, এবং ভগ-আদি দেবগণ। অগ্নিই অদিতি, ভারতী, ইড়া, এবং সরস্বতী নামক দেবীগণ। মন্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে অগ্নিই পিতা, ভ্রাতা,

মিত্র এবং পুত্র। মন্ত্রসমূহের অভিপ্রায় হল—ওই একই আত্মারূপী অগ্নি অনেকরূপে প্রকাশিত হয়ে কখনও পিতা, কখনও ভ্রাতা, কখনও পুত্র, কখনও মিত্র ইত্যাদি নানারূপে প্রকট বা ব্যক্ত হচ্ছেন।

সংসারের প্রত্যেক বস্তু অগ্নি বা ঊর্জার রূপ। অগ্নিই মনুষ্য, জীবজন্তু, ঋষি-মুনি, দেব-দেবতা, সূর্য-চন্দ্র, নক্ষত্র-তারা-আদিরূপে দৃশ্যমান। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে বলা হয়েছে—'অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।' অর্থাৎ, অগ্নিদেবকে কবিক্রতু বলা হয়েছে। বেদে কবি শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বেদ মন্ত্রের মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য আছে তা যাঁরা দর্শন করেন তাঁরাই কবি। বৈদিক নিরুক্তি মতে 'কবি' অর্থ ক্রান্তদর্শী বা সূক্ষ্ম দর্শী। 'ক্রতু' শব্দের সাধারণ অর্থ যজ্ঞ বা শুভকর্ম। মন্ত্রের অভিপ্রায়— অগ্নি হচ্ছে সূক্ষ্মদর্শী, জ্ঞানবান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি ক্রান্ত বা সূক্ষ্মদর্শী হয়ে বিচারপূর্বক সকল কর্ম সম্পন্ন করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে—'ক্রতু' শব্দের সাধারণ অর্থ যজ্ঞ। বৈদিক যজ্ঞের মূল তত্ত্বই সাযুজ্যের (অভেদ বা একাত্মতা) ভাবনা। অগ্নিতে আহুত দ্রব্য যেমন অগ্নিময় হয়ে অগ্নিস্বারূপ্য লাভ করে, তেমনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করে ভগবত চিন্তায় তন্ময় হয়ে সাধকও ভগবৎস্বরূপ লাভ করে। আমাদের আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের ভাষায়—"বেদে অশ্বমেধ, গো-মেধ ও পুরুষমেধ যজ্ঞের বিবরণ আছে। অশ্ব অর্থ শক্তি। শক্তির সাধনা, বীর্যলাভের সাধনাই অশ্বমেধ। গো অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভের সাধনার নামই গো-মেধ। ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভের সাধনাই পুরুষমেধ যজ্ঞ।" সহজ কথায় ভগবান বা ব্রহ্মে সমর্পণ বা আত্মাহুতিই পুরুষমেধ যজ্ঞ। সাধক এই যজ্ঞ সম্পন্ন করে তপঃ অগ্নি, জ্ঞান বা চিৎ-অগ্নি ও ভৌম-অগ্নির সহায়তায়। মদীয় আচার্যদেবের মতে 'ক্রতু' অর্থাৎ চিৎশক্তির দিব্যপ্রতিভা। অগ্নি 'কবিক্রতু' অর্থাৎ অরূপকে রূপায়িত করার দিব্যপ্রতিভা তাঁর মাঝে আছে। ক্রান্ত বা সূক্ষ্মদর্শী কবির মতো তাঁর (অগ্নির) সংকল্প, কর্ম, তাই তিনি সিদ্ধকর্মা। অগ্নিকে বলা হয়েছে সত্যপরায়ণ বা সত্য। অস্তিত্বরূপে যার স্থিতি চিরন্তন তিনি সত্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্রে ঋষি সত্য শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে বলছেন—

"তানি হ বা এতানি ত্রীনি অক্ষরানি সতীয়ম্-ইতি,
তদ্ যৎ সৎ অমৃতম্, অত যৎ তি তৎ মর্ত্যম্,
অথ যদ্ যং তেন উভে যচ্ছতি;
যৎ অনেন উভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যম্। ....।।

অর্থাৎ এই যে 'সত্যম' পদ, 'য' ফলা যুক্ত হয়ে যার উচ্চারণ 'সতীয়ম'—এর মধ্যে আছে তিনটি অক্ষর—স + তী + য়ম্ > স + তি + য়ম্। 'স' অর্থাৎ 'সৎ' = অমৃত। 'তি' অর্থাৎ 'মর্ত্য' = মরণশীল। এই যে 'স' আর 'তি' অর্থাৎ অমৃত আর মর্ত্য এই দুটিকে নিয়মিত করে রেখেছে 'য়ম'। যেহেতু এর সাহায্যে দুটি অক্ষরের মধ্যে যাওয়া যায়, তাই এর নাম 'য়ম'। মর্ত্য ও অমৃতলোকের সত্যকে যা নিয়মবদ্ধ করে ধরে রেখেছে, তাহাই 'য়' বা 'য়ম' (S)। অগ্নি এই সত্যের মূর্তি। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে, ষষ্ঠ অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্রে (সত্য) শব্দের অর্থে বলা হয়েছে—

"তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ নিরুক্তং চ অনিরুক্তঞ্চ। নিলয়ং চ অনিলয়ঞ্চ। বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যং চ অনৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিতি আচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি।"

অর্থাৎ, সৃষ্টির ভিতরে অনুপ্রবেশ করে তিনি সৎ এবং তৎ অর্থাৎ মূর্ত, অমূর্ত বা ব্যক্ত, অব্যক্ত—এই দুইয়ের মধ্যেই থেকে গেলেন। শুধু তাই নয় নিরুক্ত অর্থাৎ সবিশেষ, অনিরুক্ত অর্থাৎ নির্বিশেষে, নিলয় অর্থাৎ আশ্রয়, অনিলয় অর্থাৎ নিরাশ্রয়, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান অর্থাৎ চেতন-অচেতন, সত্য-অনৃত (মিথ্যা), অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য এবং মিথ্যা—এই সব যা কিছু আছে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সবার ভেতর থেকে নিজেই সব হয়েছেন। ব্রহ্মই এইসব হয়েছেন বলে ব্রহ্মবিদ ঋষিরা ব্রহ্মকেই সত্য বলেন। অগ্নি এই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার তপঃশক্তি। যে তপঃশক্তি আমাদের সত্য সংকল্পের পরিচালক বা ঋত্বিক। তাই তিনি সত্যপরায়ণ ও সত্য এবং আমাদের সকল কর্মের অগ্রণী বা পুরোহিত।

অগ্নির আর একটি বিশেষণ 'চিত্রশ্রবঃ'। 'শ্রব' শব্দের অর্থ গুণরাশি এবং চিত্র অর্থ বিচিত্র। তিনি বিচিত্র গুণরাশির আধার। বেদের ঋষিরা এই বিচিত্র

গুণরাশির আধার অগ্নিরূপ ব্রহ্মের বা ব্রহ্মরূপ অগ্নির উপাসনা করেন। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে এই অগ্নিই বিশ্বভুবন নির্মাণ করে চলেছে। অরূপকে রূপ দান করে সমগ্র সৃষ্টিকে সুন্দর বা শোভাময় করে তুলেছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৩নং সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নির উদ্দেশে বলা হয়েছে—

মধুমন্তং তনূনপাদ্যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে।
অদ্যা কৃনুহি বীতয়ে।।

অর্থাৎ 'হে মেধাবী তনূনপাত্ (অগ্নির নাম) নামক অগ্নি! আমাদের রসবৎ যজ্ঞ অদ্য ভক্ষণার্থে দেবগণের নিকট নিয়ে যাও'। উপরে উল্লিখিত ঋগ্বেদের মন্ত্রটিতে অগ্নিকে তনূনপাত বলা হয়েছে—তনু অর্থাৎ নিজ শরীর। নপাত্ অর্থ বেদ-মনীষীদের মতে 'পুত্র'। অর্থাৎ অগ্নি নিজ শরীর হতে নিজেই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়।

অগ্নি তাই স্ব-জন্মা। অগ্নি দুইটি অরণির (অরণি নামক কাষ্ঠ) সংঘর্ষ বা ঘর্ষণ হতে উৎপন্ন হয়। এর অভিপ্রায় অগ্নির জন্ম অগ্নি থেকেই হয়। তাঁর জন্মের জন্য অন্য কারও প্রয়োজন হয় না। সমগ্র প্রকৃতির মূলে এই অগ্নি বা Energy। অগ্নি অপ্রকট থেকে প্রকট, অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত এবং সংঘর্ষ বা ঘর্ষণ থেকে নিজেই উৎপন্ন হয়। এই জন্যই তাঁকে স্বজন্মা বা তনূনপাত্ বলা হয়। অগ্নিরূপ পরমাত্মা শরীরের মধ্যে বিরাজ করেন। প্রাণায়াম—ধ্যান ঘর্ষণের দ্বারা প্রকট হন।

চার বেদের অনেক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, অগ্নি রোগ-শোক, পাপ-কুভাব, দুর্বিচার, শাপ তথা পরাজয় ইত্যাদি হতে আমাদের রক্ষা করে। এর অভিপ্রায় হচ্ছে যার হৃদয়ে যত্ন এবং বিবেকরূপী অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তার হৃদয়ে কুভাব, কুবিচার, রোগ-শোক-আদির কখনও আগমন হয় না এবং সে কখনও পরাজিত হয় না। ঋগ্বেদে উষা ও অশ্বিনীকে অগ্নির মিত্র বলা হয়েছে। যথা—'সজূরেশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ।' অর্থাৎ, হে অগ্নি তুমি অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিনীকুমার দ্বয় ও উষার সহিত শোভনীয় বীর্যযুক্ত ও প্রভূতধন আমাদিগকে দান করো। এর অভিপ্রায় মানব-শরীরে আত্মারূপী অগ্নি আপন উর্জা বা শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে বা প্রসারিত করে বিরাজ করছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় মানব-শরীরে

শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী প্রাণ ও অপান বায়ু। এই দুই বায়ু নিজ ঘর্ষণের দ্বারা নিরন্তর মানব-শরীরকে উর্জা প্রদান করে। প্রাণ ও অপানরূপী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মাধ্যমেই মানবজীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। ঊষাদেবীর অভিপ্রায় ঊষাকালেই প্রাণায়াম, ধারণা এবং ধ্যানের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এইজন্যই ঊষাকে অগ্নির সহযোগী বা মিত্র মনে করা হয়। ধ্যান-ধারণার ফলেই মানুষের মধ্যে জ্ঞানাগ্নির সঞ্চার হয়। এর ফলেই মানুষ যশ ও ধনের অধিকারী হয়। ঋগ্বেদে বায়ুকেও অগ্নির মিত্র বলা হয়। এর অভিপ্রায়—অগ্নি যখন প্রজ্বলিত হন, তখন বায়ুর সহযোগে আরও অধিক তেজে জ্বলে ওঠেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রে এও বলা হয়েছে যে, অগ্নিই দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের ধারক। অগ্নির উর্জাই আপন আকর্ষণ-শক্তির দ্বারা এই ত্রিলোককে ধারণ করে রেখেছে। বেদ মতে অগ্নির এক বিশেষ গুণ হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া বা প্রসারিত হওয়া। অগ্নির এক অর্থ তাপ বা Heat। যেখানে তাপ আছে সেখানেই প্রসার বা বিস্তার আছে। অগ্নি-তাপের কারণেই লোহা আদি ধাতু বস্তুসমূহ প্রসারিত বা বিস্তারিত হয়। ওই সকল ধাতুসমূহের নমনীয়তা আসে। অগ্নিতাপের ফলেই প্রত্যেক পরমাণু প্রসারতা লাভ করে। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোক, এই তিন লোকের বিস্তারের কারণ—অগ্নিতাপ। বেদ-মনীষীদের মতে মানব-শরীরের অভ্যন্তরে এই অগ্নি বিদ্যমান আছেন। একটি জীবাত্মা, অন্যটি পরমাত্মা। পরমাত্মা প্রাপ্তির উপায় তপস্যা বা সাধনা। সাধনার দ্বারাই জীবাত্মা জ্বলন্ত অগ্নিস্থিত লৌহপিণ্ডের ন্যায় পরমাত্মারূপ অগ্নির মধ্যে স্থিত হয়ে পরমাত্মাই হয়ে যায়। বেদান্তের ভাষায়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে খুঁজতে গিয়ে সাধক ব্রহ্মই হয়ে যান—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।।' ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১২৭নং সূক্তের ৮ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে অগ্নি—''অতিথিং মানুষাণাম...'' অর্থাৎ অগ্নিরূপ আত্মা মনুষ্য শরীরে অতিথিতুল্য বিরাজ করেন এবং সত্যনিষ্ঠকে রক্ষা করেন। এর অর্থ হচ্ছে আত্মা সত্যনিষ্ঠ-সত্যানুশীলনকারীকে রক্ষা করেন। মনুষ্য শরীরে আত্মা অতিথিতুল্য বিরাজ করেন—আবার যখন ইচ্ছা হয় তখন ওই অতিথিরূপ অগ্নি শরীর থেকে প্রস্থান করেন। আমাদের এই মানব শরীর এক অতিথিশালা। এতে আত্মারূপী অগ্নি নিবাস করেন। কর্মশেষ হলে শরীর ত্যাগ করে চলে যান। ঋগ্বেদ মতে শরীর নশ্বর, শরীরের মধ্যে অজর, অমর আত্মারূপী অগ্নি অবিনাশী। যজুর্বেদ মতে মরণশীল মানুষের মধ্যে অবিনশ্বর আত্মারূপী অগ্নি পরমাত্মাই রেখেছেন। আত্মারূপী এই অগ্নিই মনুষ্যকে পবিত্র করে। আত্ম-অগ্নির উপস্থিতিতেই মানুষ চৈতন্য লাভ করে। আত্ম-অগ্নির সু-উপযোগে মানুষ পবিত্র হয়ে— ভগবৎতুল্য হয়। ঋগ্বেদের মন্ত্রে বলা হয়েছে—

> ''জন্মন্ জন্মন্ নিহিতো জাতবেদা
> বিশ্বামিত্রেভিরিধ্যতে অজস্রঃ।'' [ঋগ্বেদ, ৩।১।২১]

অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের মধ্যে এই জাতবেদস্ (স্বাভাবিক জ্ঞান সম্পন্ন) অগ্নি বিদ্যমান আছেন। যিনি জনতারূপ-জনার্দনসেবী এবং বিশ্বামিত্র (বিশ্বের মিত্র) তিনি এই অগ্নিরূপী আত্মাকে প্রদীপ্ত করে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। ইনি মনুষ্যের পূর্ব এবং পরবর্তী জন্মের কর্মসমূহকে জানেন। ইনি মিত্রতুল্য সকলের হিত করেন। ঋগ্বেদে অগ্নির তিন শরীরের কথা বলা হয়েছে। যথা—''তিস্র উ তে তন্বো দেববাতা...'' [ঋগ্বেদ. ৩।১০।২]। অগ্নির এই তিন শরীর হল—স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর এবং কারণশরীর। আমাদের অন্নময়-প্রাণময়-কোষযুক্ত শরীর স্থূলশরীর। মনোময়-বিজ্ঞানময়-কোষযুক্ত শরীর সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময় কোষযুক্ত শরীর কারণশরীর। ঋগ্বেদে উক্ত হয়েছে—

> ত্রিসপ্ত যদ্ গুহযানি ত্বে ইত্
> পদা অবিদন্ নিহিতা যজ্ঞিয়াসঃ।
> তেভী রক্ষন্তে অমৃতং সজোষাঃ। (ঋগ্বেদ, ১।৭২।৬)

অর্থাৎ আত্মারূপ অগ্নির মধ্যে ২১ প্রকার রহস্যাত্মক তত্ত্ব বিদ্যমান। এই তত্ত্ব সকল শরীরস্থিত অমৃতকে রক্ষা করে। বেদবিদ্ মাত্রেই এই রহস্য জানেন। প্রধানত শরীরে রহস্যাত্মক তত্ত্ব সাত (৭)। এগুলি হল পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক), মন ও বুদ্ধি। এদেরকেই অনেক বেদবিদ্ সপ্তর্ষি নামে অভিহিত করেন। এই সাত তত্ত্বই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে সাত গুণিতক (৭ × ৩) = ২১ প্রকার রহস্যাত্মক তত্ত্ব। ঋগ্বেদের মন্ত্রে বলা হয়েছে—''গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি'' [ঋগ্বেদ, ১।১৪১।৩]। অর্থাৎ

এই আত্মারূপী অগ্নি হৃদয়রূপী কন্দরে লুকিয়ে থাকেন। একে মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু, প্রাণায়াম রূপ মন্থনের দ্বারা প্রকট করে। যেমন অরণি কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি বিদ্যমান থাকে, ঘর্ষণে প্রকট হয়। তদ্রূপ নিরন্তর প্রাণায়ামরূপী বায়ুর ঘর্ষণে ওই আত্মারূপী গুপ্ত অগ্নি প্রকট হন। বেদে বৈশ্বানর অগ্নির কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে বৈশ্বানর অগ্নির বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা—

১। "বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাম্"...[ঋগ্বেদ, ১।৫৯।১]

২। মূর্ধা দিবো নাভিরসি পৃথিব্যাঃ...। [ঐ, ১।৫৯।২]

অর্থাৎ উপরোক্ত মন্ত্র দুটিতে বেদে বৈশ্বানর অগ্নিকে সৃষ্টির কেন্দ্রীয় তত্ত্ব (নাভি বা Nueleus) বলা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অগ্নিতত্ত্বের সমষ্টিকেই বৈশ্বানর অগ্নি বলা হয়। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থে ওই অগ্নি কেন্দ্রীয় উর্জারূপে ক্রিয়া করে। এই অগ্নি দ্যুলোক, ভূগোল, অন্তরিক্ষলোক, সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই অগ্নির তাপ বা Heat-এর দ্বারাই প্রত্যেক পদার্থের বিকাশ, প্রগতি উপচিতি বিপাক (Anabolic), অপচিতিবিপাক (catabolic) বা Metabolism ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বৈশ্বানর অগ্নির ব্যাপকতা বোঝাতে গিয়ে ঋগ্বেদের ঋষি বলছেন—

"আ সূর্যে ন রশ্ময়ো ধ্রুবাসো, বৈশ্বানরে
দধিরে অগ্না বসূনি।" ঋগ্বেদ (১।৫৯।৩)।

অর্থাৎ সূর্যের মধ্যে যেমন কিরণ সতত বিদ্যমান, অনুরূপ বৈশ্বানর অগ্নিতে শাশ্বত উর্জা বিদ্যমান। এই অগ্নির Heat বা তাপ থেকেই মণি, রত্নাদি নানা মূল্যবান বস্তু ভূগর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়। ঋগ্বেদে এও বলা হয়েছে যে, "যো হোতাসীত্ প্রথমো দেবজুষ্টঃ।" ঋগ্বেদ, (১০।৮৮।৪)। অর্থাৎ বৈশ্বানর অগ্নিই বিশ্বের প্রথম সক্রিয় তত্ত্ব—যার দ্বারা দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, ও ভূলোকের বিস্তার হয়েছে। বেদ ও বেদ-মনীষীদের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভরূপে যে আগ্নেয় বা অগ্নিপিণ্ড ছিল, তার মধ্যে বৈশ্বানর অগ্নির মহাবিস্ফোরণ হয় এবং ওই বিস্ফোরণের ফলে দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোকের উৎপত্তি হয়। অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোকে এর তেজোময় প্রকাশকরূপ বিদ্যমান। ভূলোক

বা পৃথিবীতে বৈশ্বানর অগ্নি সর্বভক্ষী (সবকিছু যে ভক্ষণ করে অর্থাৎ অগ্নি) রূপে বিরাজ করেন। মানব-শরীরে এই অগ্নি ক্ষুধারূপে জঠরদেশে থেকে আপন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই অগ্নিই মানব-শরীরে ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে রস-রক্ত-আদিরূপে পরিণত করেন। এই অগ্নির উপস্থিতিতেই মনুষ্য নিরন্তর কর্ম করতে সক্ষম হয়। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিত।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।।

অর্থাৎ "আমি জঠরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয়পূর্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।"

ঋগ্বেদে বৈশ্বানর অগ্নির দুটি রূপের উল্লেখ আছে। যথা ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের, দ্বিতীয় সূক্তের, তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে—"দ্বিতা হোতারম্...।" অর্থাৎ, বৈশ্বানর অগ্নির দুই রূপ। একটি ভৌতিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। অগ্নির ভৌতিক রূপ আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। এইরূপে অগ্নি জ্বলে, দগ্ধ করে, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তৈরি করে, তাপ দেয়। এই অগ্নির আধ্যাত্মিক রূপ—আত্মা। মানবশরীরে এই অগ্নি প্রাণাগ্নিরূপে জীবনের সঞ্চার করে এবং মানবকে জীবিত রাখে। বৈশ্বানর অগ্নি বিশ্বব্যাপী অগ্নির (Energy) পারিভাষিক নাম। সৃষ্টির মূলে যে অব্যক্ত অসাধারণ শক্তিতত্ত্ব বিদ্যমান—তারই নাম অগ্নি। এই অগ্নিতত্ত্বই ব্যক্ত অবস্থায় তিনটি রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই তিনরূপ তিনলোকে কথিত হয়। বেদবিদ্‌দের মতে দ্যুলোকে এই অগ্নির নাম সূর্য। অন্তরিক্ষলোকে এই অগ্নির নাম বায়ু। পৃথিবীতে ইনিই অগ্নি নামে অভিহিত। 'বৈশ্বানর' শব্দটি বিশ্ব ও নর শব্দ দ্বারা গঠিত। বিশ্ব-অর্থ সমস্ত বা সব, নর-অর্থ মনুষ্য, নেতা, জীবনদাতা বা জীবনীশক্তি। এইরূপে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ হয় (বিদ্বৎজনদের দৃষ্টিতে) সমস্ত জীবনদায়ক শক্তির সমন্বিত রূপ। শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে—

"যঃ স বৈশ্বানরঃ, ইমে তেলোকাঃ।
ইয়ম্বে পৃথিবী বিশ্বম্ অগ্নির্নরো,

অন্তরিক্ষমেব বিশ্বং বায়ুর্নরো,
দ্যৌরেব বিশ্বমাদিত্যো নরঃ।।”

অর্থাৎ তিনলোকে ব্যাপ্ত অগ্নিকেই বৈশ্বানর অগ্নি বলা হয়। ভূলোক বা পৃথিবীতে ইনি অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য। তত্ত্বের দৃষ্টিতে সূর্য মনস্ বা মনতত্ত্ব, বায়ু প্রাণতত্ত্ব এবং অগ্নি বাক্‌তত্ত্ব বা ভূততত্ত্ব। প্রাণের দৃষ্টিতে এই অগ্নিকে ব্যান্, অপান ও প্রাণ বলা হয়। ছন্দের দৃষ্টিতে এই অগ্নির নাম জগতী, ত্রিষ্টুপ ও গায়ত্রী। এই তিন ছন্দকে অথর্ব বেদে “ত্রয় সুপর্ণাঃ” [সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী (গরুড়), কিরণ, বিষ্ণু, এখানে ছন্দের প্রতীক] বলা হয়েছে। এই সুপর্ণ স্বর্গ থেকে সোম (অমৃত) আনে। একা মন এবং প্রাণতত্ত্ব স্বর্গ থেকে অমৃত আনতে পারে না। এই অমৃতকে ধরিত্রীর বুকে আনার জন্য গায়ত্রী বা বাক-তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া আবশ্যক হয়।

বেদবিদ্‌রা ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে গায়ত্রীছন্দরূপে মান্যতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থেকে তপস্বী বা সাধক জীব তপস্যার দ্বারা দ্যুলোক অর্থাৎ শিরোদেশে সহস্রদল পদ্মস্থিত অমৃত বা সোমকে মেরুদণ্ডের সুষুম্না পথে মূলাধারে অর্থাৎ ধরিত্রীর বুকে নিয়ে আসেন। গৃহস্থ আশ্রম ত্রিষ্টুপ ছন্দ এবং বানপ্রস্থ—সন্যাস আশ্রম জগতী ছন্দরূপে বিবেচিত হয়। গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ অবস্থায় উর্জা ক্ষীণ হয়ে যায়। ব্রহ্মচর্য অবস্থার ন্যায় অত পরিশ্রম করা তখন সম্ভব হয় না, এই জন্যই ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দ স্বর্গ থেকে সোম বা অমৃত আনতে সমর্থ হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানবশরীরে প্রাণরূপী অগ্নিকে বা প্রাণাগ্নির প্রধানত দুটি ভেদ বা পার্থক্য আছে—প্রাণ-অপান। এতদুভয়ের মধ্যে বেদের “অগ্নীষোমীয়ং জগত্”—অর্থাৎ এই জগৎ অগ্নিসোমাত্মক এই দৃষ্টিতে প্রাণ অগ্নিতত্ত্ব এবং ধনাত্মক বা Positive। অপরদিকে অপান হচ্ছে ঋণাত্মক বা Negative। এই দুইয়ের নিরন্তর সংঘর্ষে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপই সকলের জীবন। দুই প্রাণাগ্নির সংঘর্ষে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়—তা-ই বৈশ্বানর অগ্নি। ক্রিয়া বা কার্যদৃষ্টিতে এই প্রাণাগ্নি পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। প্রাণ হৃদয়কে সঞ্চালন করে। অপান মল-মূত্র-ঘর্মাদি দেহ থেকে বের করে দেয়। ব্যান-বায়ু সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া

সম্পন্ন করে বা সামলায়। সমান-বায়ু নাভিতে থেকে সারা শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চার করে এবং কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে কার্য করে। উদান-বায়ু মস্তিষ্ক প্রদেশের সমস্ত ক্রিয়া সঞ্চালন করে। এইভাবে শরীরের মধ্যে পাঁচ প্রাণাগ্নির কাজ বিভাজিত হয়ে আছে, যেরূপ বিরাট বিশ্বের সঞ্চালন সূর্য করে। ওইরূপ মানবশরীররূপী বিশ্বের সঞ্চালন প্রাণাগ্নি, বৈশ্বানর অগ্নিরূপে সঞ্চালন করে।

এই দিব্য প্রাণাগ্নি অজ্ঞেয়, অনির্বচনীয় এবং গুপ্ত কারণে নচিকেতা বা ‘নাচিকেতস্ অগ্নি’ নামে কথিত হয়। এটিই আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যা। এরই উপদেশ যমাচার্য (যম) কঠোপনিষদে বাজশ্রবস্ ঋষিনন্দন নচিকেতাকে দিয়েছেন। এই প্রাণাগ্নির তিনটি রূপ—মন, প্রাণ ও বাক্। এই তিন রূপের কারণে একে ‘ত্রিনাচিকেত অগ্নি’ নামে অভিহিত করা হয়। এই অগ্নিই আত্ম-অগ্নি বা আত্মতত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্বরূপ অগ্নিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞান লাভ হয়।

অগ্নির উপরোক্ত বা পূর্বকথিত রূপগুলি ছাড়াও আরও একটি রূপের কথা ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে বলা হয়েছে। বেদদ্বয় কথিত অগ্নির এই রূপটির নাম অঙ্গিরস্ অগ্নি। এই অগ্নিকে অতিথি, শোচিষ্, জাতবেদস্, বৃহচ্ছোচস্ এবং যবিষ্ঠয়—ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। অজ্ঞাতপূর্ব গৃহাগত ব্যক্তি বা আগন্তুককে ‘অতিথি’ বলা হয়। ইনি স্থায়ীভাবে গৃহে বাস করেন না। মানবশরীরে জীবাত্মারূপ অগ্নিই অঙ্গিরস অগ্নি এবং অস্থায়ী বাসিন্দা বা অতিথি। যতদিন ইচ্ছা হয় ততদিন এই ‘অতিথি’ শরীরে থাকেন এবং যখন ইচ্ছা হয় তখন এই শরীর থেকে চলে যান। এরই নাম মৃত্যু। ‘শোচিষ’—এর অর্থ তেজময়, তেজস্বী। জীবাত্মার মধ্যে চেতনা বিদ্যমান। এই চেতনা শরীরে জ্যোতি বা অগ্নিকে প্রদীপ্ত রাখে। এর উপস্থিতিতেই শরীর সক্রিয় থাকে। এর মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতি জ্বলতে থাকে। ‘জাতবেদস্’-এর অর্থ জন্ম থেকেই যা স্বাভাবিক রূপে জ্ঞান সম্পন্ন। জীবাত্মায় জ্ঞান স্বাভাবিকরূপে বিদ্যমান থাকে, এবং এই জ্ঞান জীবাত্মার জন্মজাত জ্ঞান। ‘বৃহচ্ছোচস্’-এর অর্থ বৃহৎ অর্থাৎ জ্বালা, তেজ বা প্রভা দ্বারা যুক্ত। জীবাত্মারূপ অঙ্গিরস অগ্নিতে অসাধারণ বা বৃহৎ তেজ বিদ্যমান। এই তেজস্বীতার ফলেই ঋষি, মহর্ষি, সিদ্ধ, জ্ঞানী, বিজ্ঞানবেত্তা এবং তত্ত্বজ্ঞ মহাতেজস্বী হন। ‘যবিষ্ঠয়’-এর অর্থ নবযুবক বা

নিত্যযুবক—যে কখনও বৃদ্ধ হয় না এবং মৃত্যুর দ্বারা কবলিত হয় না। শরীরে জীবাত্মারূপী অঙ্গিরস অগ্নি অজর, অমর এবং নিত্য যুক্ত। এর শক্তির কখনও হ্রাস বা ক্ষয় হয় না। বৈদিক 'গোপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"তং বা এতম্ অঙ্গরসং সন্তম্ অঙ্গিরা ইত্যাচক্ষতে।"— অর্থাৎ অঙ্গ + রস থেকেই অঙ্গিরস শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অঙ্গিরস অগ্নি সেই অগ্নিকেই বলা হয় যা রসরূপে শরীরের সমস্ত অঙ্গে বিদ্যমান থাকে। একেই জীবাত্মা বা প্রাণাগ্নি বলা হয়। এই অগ্নিই সারা শরীরকে রস বা চেতনা প্রদান করে। এই রসের উপস্থিতিতেই সারা শরীরে লাবণ্য, জ্যোতি, চেতনা, উৎসাহ-আদি বিদ্যমান থাকে। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' এই কারণেই উক্ত হয়েছে—'প্রাণো বা অঙ্গিরা'। অর্থাৎ শতপথ ব্রাহ্মণ মতে প্রাণই অঙ্গিরা এবং একেই অঙ্গিরস ঋষি (রূপকার্থে) বলা হয়। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে অঙ্গিরস বা অঙ্গিরা অগ্নি হচ্ছে সৃষ্টি এবং মানবের মধ্যে বিদ্যমান প্রাণতত্ত্ব। এই প্রাণতত্ত্ব দু-ভাগে বিভক্ত। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। ধনাত্মক প্রাণতত্ত্বকে প্রাণ বলা হয় এবং ঋণাত্মক প্রাণতত্ত্বকে অপান বলা হয়। দু-ভাগে বিভক্ত এই প্রাণতত্ত্বকেই বেদের ভাষায় অগ্নি এবং সোম বলা হয়। অগ্নি আগ্নেয় তত্ত্ব এবং ধনাত্মক-সোম সোমীয় তত্ত্ব এবং ঋণাত্মক। সৃষ্টিতে এই দুই শক্তির সংঘর্ষের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এর ফলেই জীবের মধ্যে উপচিতি বিপাক এবং অপচিতি বিপাক বা চয়াপচয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চয়াত্মক ক্রিয়া বর্ধিষ্ণু অবস্থাকে বলা হয়। ব্রহ্মচর্য কাল বর্ধিষ্ণু অবস্থা—এই সময়ে শরীর ও মনের শক্তি-উৎসাহ-আদি বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় প্রাণায়ামাদি যোগানুশীলনের দ্বারা শরীরে অঙ্গিরস অগ্নিকে উদ্বুদ্ধ বা উদ্দীপিত করা হয়। এর ফলে জীব বা সাধকের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। যজ্ঞে অঙ্গিরাগ্নিকে যে আহুতি দেওয়া হয় তার অভিপ্রায় হচ্ছে আমরা যেন আমাদের প্রাণশক্তিকে উদ্দীপিত করি এবং সদা উন্নতির পথে অগ্রসর হই।

শরীরে হ্রাস বা ক্ষয়শীল অবস্থাকে অপচয়াত্মক অবস্থা বলা হয়। বৈদিক রূপকের ভাষায় শরীরের এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার নাম চ্যবন-অবস্থা। এই অবস্থায় শরীরে শক্তির নিরন্তর হ্রাস বা ক্ষয় হতে থাকে। জীবনের অন্তিমপর্বে অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় এই ক্ষয়িষ্ণু ক্রিয়া বলবৎ হয়। এই ক্ষয়ের প্রতিরোধে যোগের

প্রাণায়াম-অনুশীলন বা প্রাণায়ামরূপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয়। শারীরিক ক্ষয় প্রতিরোধে প্রাণায়াম যজ্ঞই একমাত্র সহায়ক। প্রাণায়ামের মাধ্যমে যত শক্তি বা উর্জা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে তত শরীরের উর্জা বৃদ্ধি পাবে। প্রাণায়াম হচ্ছে বাহ্য জগতে বিদ্যমান প্রাণতত্ত্বকে শ্বাসের দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে পৌঁছে দেওয়া এবং শরীরের অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত কার্বনকে বাইরে বের করে দেওয়া। শরীর থেকে যত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাইরে বেরিয়ে যাবে, শরীর তত শুদ্ধ ও নীরোগ হবে। বেদের দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই বিদ্যার দ্বারাই চ্যবন ঋষির (অকাল বার্ধক্যদশা প্রাপ্ত শরীর) শরীর থেকে বার্ধক্য দূর করেছিলেন। প্রাণ ও অপানের সংযম, প্রাণশক্তির বৃদ্ধিকরণ এবং অপানশক্তির হ্রাসকরণই অঙ্গিরস অগ্নিবিদ্যার মৌলিক তত্ত্ব বা কল্পনা—এইরূপ বেদবিদ্‌গণ মনে করেন।

এই অঙ্গিরস অগ্নিবিদ্যাকে আবার অন্যরূপে সাবিত্রী বিদ্যাও বলা হয়েছে। সবিতা অর্থাৎ সূর্য। সূর্যের শক্তিকেই বৈদিক দৃষ্টিতে সাবিত্রী বলা হয়। সূর্য আপন শক্তি অর্থাৎ সাবিত্রীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। সূর্য থেকে পৃথিবী বা ভূলোকের, সমস্ত জীবজন্তু, মনুষ্য এবং বৃক্ষ তরুলতা-আদি শক্তি প্রাপ্ত হয়। সূর্য থেকে যে শক্তি পৃথিবীর বুকে নেমে এসে পৃথিবীকে প্রাণবন্ত, সবুজ ও সতেজ রাখে সেই শক্তিরই নাম সাবিত্রী। পৃথিবীকে প্রাণরসে পূর্ণ করে দিয়ে ওই শক্তি তথা পৃথিবীর শক্তি যখন সূর্যের দিকে ফিরে যায় তখন বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সেই শক্তির নাম হয় গায়ত্রী। সূর্য থেকে ওই শক্তি পুনরায় সাবিত্রী হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। এইরূপে সূর্যের শক্তি পৃথিবীর বুকে নেমে আসে এবং পৃথিবী থেকে পুনরায় সূর্যে ফিরে যায়। সূর্যের এই সাবিত্রী শক্তিকেই গায়ত্রী মন্ত্রে 'ভর্গোদেবস্য ধীমহি'—অর্থাৎ সূর্যস্থিত ওই ভর্গ বা তেজ শক্তিকেই ধ্যান করতে বলা হয়েছে। এই শক্তিকেই আপন অন্দরে ধারণ করার প্রার্থনাই বেদের ঋষি করেছেন। এইজন্য বেদে বলা হয়েছে—

"সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।" (ঋগ্বেদ, ১।১১৫।১)

অর্থাৎ, সূর্যই জগতের আত্মা এবং প্রাণ।

উপরে অগ্নিতত্ত্বের যে স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হল, তাতে সুধী পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে বেদবর্ণিত অগ্নি সাধারণ অগ্নি বা Fire নয়। এই

অগ্নিই বিদ্যুৎ, সৌদামিনী, তড়িৎ-আদি নামে অভিহিত হয়। ভারতের বিজ্ঞান-মনস্বী সন্ত শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁর 'বেদ ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলেছেন—"অধিভৌতিক দৃষ্টিতে অগ্নি হচ্ছে সেই বিভু পদার্থ যার অভিব্যক্তি জগতে বিভিন্নরূপে হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান তাকে Electricity নামে অভিহিত করেছে।" যজুর্বেদে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে—"ত্রীনি-অপ্সু, ত্রীনি-অন্তঃসমুদ্রে"। অর্থাৎ, অগ্নি দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও পৃথিবী লোক—এই তিনলোকে তিন-তিনটি করে অর্থাৎ প্রতিলোকে তিনটি করে কার্য সম্পন্ন করে। যথা— (১) দ্যুলোকে প্রকাশ দেওয়া, (২) উর্জা বা ভরণ পোষণ দেওয়া, (৩) গ্রহ-উপগ্রহ সমূহকে আকর্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা। অন্তরিক্ষলোকে অগ্নির তিন কার্য— (১) মেঘ নির্মাণ, (২) বিদ্যুৎশক্তি সৃজন, (৩) গর্জন ও বারি বর্ষণ। পৃথিবীতেও অগ্নির তিনটি কার্য—(১) জীব-জগৎ, বৃক্ষ-বনস্পতি আদিকে সৌর উর্জার দ্বারা অনুপ্রাণিত করা, (২) সমুদ্র থেকে জলকে বাষ্পরূপে অন্তরিক্ষে প্রেরণ করা, (৩) ভূলোকে বা পৃথিবীলোককে জীবনীশক্তি প্রদান করা।

যজুর্বেদের একাদশ অধ্যায়ে বাইশটি মন্ত্রে (১১-৩২) পুরীষ্য অগ্নির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ভূগর্ভীয় অগ্নিকেই (Plutonic fire) পুরীষ্য অগ্নি বলা হয়। এই পুরীষ্য অগ্নির বিদ্যমানতার কারণেই পেট্রোল, গ্যাস-আদি প্রজ্বলনশীল পদার্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। যজুর্বেদ মতে এই পুরীষ্য অগ্নি মূলত সৌর উর্জাই। যজুর্বেদে পুরীষ্য অগ্নিকে— "পুরীষ্যোসি বিশ্বভরাঃ" অর্থাৎ, পুরীষ্য অগ্নিকে 'বিশ্বভরা' বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, এই অগ্নি বিশ্বভর, জগৎ সংসারের পালন পোষণকারী। এই অগ্নিজাত শক্তির দ্বারা অনেক কার্য সম্পন্ন হয়। এই অগ্নিই জল-স্থল, সমুদ্র এবং গগনচারী সমস্ত যানবাহনসমূহের একমাত্র উর্জার স্রোত। যজুর্বেদ মতে এই পুরীষ্য অগ্নির প্রথম আবিষ্কারক হচ্ছেন অথর্বা ঋষি। তিনি সুদূর অতীতে আপন জীবন বিপন্ন করে এই অগ্নিকে পৃথিবীর গর্ভ থেকে আবিষ্কার করেছিলেন। বেদজ্ঞ-মনীষীদের মতে অথর্বা বা অথর্বন ঋষি বিশ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক— (অনুসন্ধিৎসু পাঠক, যজুর্বেদের একাদশ অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক মন্ত্র দেখুন)।

যজুর্বেদে অথর্বা ঋষির তিনটি আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে যথা— (১) এই ঋষি অরণি নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন করেন। (২) জলকে মন্থন করে অগ্নি অর্থাৎ Hydro-electric energy আবিষ্কার করেন। (৩) ভূগর্ভীয় অর্থাৎ পুরীষ্য অগ্নি (Oil & Natural gas) আবিষ্কার করেন। যজুর্বেদে উল্লেখ আছে যে অথর্বা ঋষি যে অগ্নি আবিষ্কার করেন তা যজ্ঞে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন অথর্বা ঋষির পুত্র দধীচি বা দধ্যঙ্ ঋষি (যজুর্বেদ একাদশ অধ্যায়, ৩৩ সংখ্যক মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। যজুর্বেদের সাতাশ অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, অগ্নির চার প্রকারের শক্তি আছে—যার ফলে জগৎ সংসার সুরক্ষিত থাকে। অগ্নির এই প্রকার শক্তি কী, তার কথা ওই বেদে বলা হয়নি। বেদ ভাষ্যকার আচার্য উব্বট এবং মহীধরের মতে ওই চার শক্তি হল— (১) ঋক্‌শক্তি—অর্থাৎ প্রার্থনার শক্তি। (২) যজুঃশক্তি—অর্থাৎ কর্মঠতা, (৩) সামশক্তি—অর্থাৎ সংগীতের শক্তি। (৪) অথর্ব শক্তি অর্থাৎ বিজ্ঞানের শক্তি। এ যুগের অন্যতম বেদ-মনীষী ডাঃ কপিলদেব দ্বিবেদী তাঁর 'বেদামৃতম্' গ্রন্থে বলেছেন—"আমার বিচারে ওই চার শক্তির অভিপ্রায় হচ্ছে— (১) আধিভৌতিক শক্তি—অগ্নির ভৌতিক শক্তি হচ্ছে দহন, জ্বলন, পাচন, প্রকাশকরণ এবং সর্বজীবকে উর্জা প্রদান করা। (২) আধিদৈবিক শক্তি—বিদ্যুৎ বা তড়িৎরূপে উর্জার প্রসারণ, পরমাণুকে জোড়া ও পৃথক করা, মেঘ রচনা, বৃষ্টি বা বর্ষণ করা, বিদ্যুৎ দ্বারা ধ্বনিকে দূরে পৌঁছে দেওয়া, শ্রবণ করা, শ্রবণ করানো, ধ্বনি তরঙ্গের প্রসারণ ইত্যাদি। (৩) আধ্যাত্মিক শক্তি—আত্মিক শক্তির বৃদ্ধিকরণ, ধ্যান-মনন-চিন্তন-আদির শক্তিকে বর্ধন করা, আত্মিক উন্নতি এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার করানো। (৪) মৌলিক শক্তি—পরমাণুসমূহের মধ্যে আপন মৌলিক শক্তি Potential Energy প্রোটন, ইলেকট্রন-আদিকে আপন মৌলিক ক্ষমতা, রূপান্তর অথবা বিবর্তনের ক্ষমতাদি। ঋক্ বেদে অগ্নিকে—"বিদ্যুদ্রথঃ সহসস্পুত্রো অগ্নিঃ"—অর্থাৎ অগ্নিকে শক্তির পুত্র বলা হয়েছে এবং অগ্নির রথে বিদ্যুৎ সংযুক্ত আছেন এরূপ বলা হয়েছে। অগ্নিকে শক্তিপুত্র বলার কারণ অগ্নি বল অথবা ঘর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যখন কোনও দুটি পদার্থের মধ্যে ঘর্ষণ বা ধাক্কা-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখনই অগ্নি উৎপন্ন হয়। অগ্নিকে

'বিদ্যুদ্রথঃ' বলার অভিপ্রায় হচ্ছে—যেখানেই অগ্নি সেখানেই বিদ্যুৎ বিজলী অথবা Electricity-র উপস্থিতি অনিবার্য।

বস্তুত অগ্নিরই একরূপ বিজলী (Electricity অথবা lighting)। এই বিজলী আকাশে মেঘের ঘর্ষণে প্রকট হয়, পৃথিবীতে জল-আদির ঘর্ষণে বিদ্যুৎ অর্থাৎ Electricity এবং অন্য গ্যাস-আদিরূপে প্রকাশিত হয়। জঙ্গলে এই অগ্নি দাবাগ্নি (Forest conflagretion) রূপে প্রকাশ হয়। ভূগর্ভে এই অগ্নি পুরীষ্য অগ্নি বা Plutonic fire রূপে বিদ্যমান থাকে এবং আগ্নেয়গিরি বা জ্বালামুখীর অগ্নি volcanic fire নামে প্রকট হয়।

যজুর্বেদের একাধিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে এই সংসারে অগ্নি এবং জলের চক্র নিরন্তর চলছে। অর্থাৎ অগ্নি থেকে জলের উৎপত্তি এবং জল থেকে অগ্নির উৎপত্তি নিরন্তর চলছে। বেদে বলা হয়েছে অগ্নি সৃষ্টির মূলে এবং জলের গর্ভ অর্থাৎ অগ্নি জল থেকে উৎপন্ন হয়। পুনরায় ওই জলকে বাষ্পরূপে অন্তরিক্ষে নিয়ে যায় এবং বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর উপর বর্ষণ করে। আবার ওই জল অগ্নি দ্বারা বাষ্পরূপে আকাশে এবং এবং বর্ষারূপে পৃথিবীতে নেমে আসে। ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রে অগ্নিকে 'রত্নধাতমম্' বলা হয়েছে। 'রত্নধাতমম্'—অর্থাৎ প্রভূত রত্নধারী। ভূগর্ভে রত্নোৎপত্তির আধার ভূগর্ভীয় অগ্নি (Plutonic fire)। এই অগ্নির তীব্র তাপে প্রস্তর-শিলাদি তরলরূপ ধারণ করে। এই অগ্নির তীব্র তাপ থেকেই কয়লা থেকে হীরা এবং অন্যান্য রত্ন-আদি উৎপন্ন হয়। এইজন্য অগ্নিকে রত্নধারণকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। ঋক্ বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের নবমসূক্তের ৪।৫ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে অগ্নির দুইরকম ধন বা ঐশ্বর্য আছে—একটি দিব্য অপরটি পার্থিব। অগ্নির এই দুই রকমের ধন বা ঐশ্বর্য কখনও সমাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অক্ষয়। অগ্নির দিব্যধন হচ্ছে সৌর ঊর্জা (Solar energy) এবং পার্থিব ধন হচ্ছে ভূগর্ভস্থিত রত্ন—পেট্রোল-গ্যাস ইত্যাদি। এই কারণেই অগ্নিকে বেদে ধনপতি বা রায়পতি বলা হয়েছে। যজুর্বেদ মতে (যজুর্বেদ, ১২।২৩), অগ্নির সাহায্যে কঠিন থেকে কঠিনতর পাথর ভাঙ্গা বা চূর্ণ করা যায়। এটা হল অগ্নির আর একরূপ, ডিনামাইট বা ডাইনামাইট (Dynamite)।

ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের, একাত্তর সংখ্যক সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, "অঙ্গিরা ঋষি শব্দশক্তির দ্বারা পর্বতকে টুকরো টুকরো করেছিলেন।" এর অর্থ তীব্রধ্বনি বা বিস্ফোরণের দ্বারাই পাথর-শিলাদি অথবা পাহাড়-পর্বত আদিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়। বেদে, পুরাণে বলা হয়েছে অদিতি দেবগণের মাতা। বেদ-মনীষীদের মতে অদিতি হচ্ছে জগতের মূলে এবং জগতে ওতপ্রোতরূপে যে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব বর্তমান তা-ই অদিতি। অন্যান্য বেদগণের ন্যায় অগ্নিরও জন্ম এই অদিতি থেকে। অতএব অগ্নিও ওই অখণ্ড বস্তুরই আর এক নাম—বেদ-মনীষী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁর 'বেদ ও বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করেছেন। স্বামীজি ওই গ্রন্থে ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের ৫৬ সংখ্যক সূক্তের ১ম সংখ্যক মন্ত্রের উল্লেখ করে বলেছেন—"তোমার মধ্যে তিন অংশ আছে। স্থূল অগ্নি তোমার এক অংশ, বায়ু তোমার দ্বিতীয় অংশ এবং জ্যোতির্ময় আত্মা তোমার তৃতীয় অংশ'—এই তিন অংশ দ্বারা (অগ্নি, বায়ু, সূর্য (আত্মা)) তুমি প্রবেশ করতে সমর্থ হোচ্ছ।" স্বামীজির মতে অগ্নির একটা বিশিষ্টরূপ দিয়ে অগ্নিকে সীমার মধ্যে ধরে রাখার ব্যবস্থায় আর্যঋষিগণ সম্মত ছিলেন না। এইজন্যই স্বামীজির ভাষায় বলতে সাহস হয় অণুর ভেতর বিপ্লব এবং তেজোবিকিরণ যা নিত্যচলমান তা সত্য-সত্যই অগ্নিকাণ্ড। বেদে বলা হয়েছে, অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত। যজ্ঞে ঘৃতের সঙ্গে অগ্নির ঘনিষ্ঠ যোগ। ঘৃত অগ্নিতে আসা মাত্র অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়। ঘৃত অর্থ—আলোক। ঋষি অরবিন্দের ভাষায়—"Classified mental consciousness" অর্থাৎ পরিশুদ্ধ মানসচেতনা। এইজন্য অগ্নির একটি বিশেষণ ঘৃত প্রতীক। বেদের মরমী ভাষ্যকার ঋষি অনির্বাণ বলেন—"ঘৃত পঞ্চামৃতের তৃতীয় অমৃত (পঞ্চামৃত—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি)। পয়ঃ (বা দুগ্ধ) শুভ্র বর্ণ। পার্থিব সত্তা হইতে শুভ্র জ্যোতির এই পয়োধারা। তমঃ এবং রজঃ হইতেই সত্ত্বের আবির্ভাব। দুগ্ধ ঘনীভূত হইলে দধি। প্রজ্বলিত হইলে ঘৃত। আনন্দের সৌম্য চেতনায় রূপান্তরিত হইলে হয় মধু।" (বেদ-মীমাংসা, দ্বিতীয় খণ্ড, অনির্বাণ)।

অগ্নির আর একটি রূপ সোম। সাধনার শুরুতে অগ্নি, অন্তে সোম। শুরু ও অন্ত—জীবন ও জগতের দুই প্রান্ত। এই দুই প্রান্তেই জাগ্রত থাকে অগ্নি, তাই তিনি নিত্য জাগ্রত।

অগ্নির আর একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা "গোপাঃ"—অর্থাৎ রক্ষক। প্রতিদিন যখন আকাশের বুকে ওঠে ঊষার আলো, তারপর সূর্যের উদয়ে নবজীবনের সূচনা—তখন অগ্নি হন আমাদের গোপা বা আলোর রাখাল। 'গোঃ'—অর্থাৎ অন্তর্জ্যোতি। ঋষি অনির্বাণের ভাষায়— "ঊষার আলো প্রাতিভসংবিতের (অলৌকিকভাবে অন্তরে স্ফূরিত বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান), সূর্যের আলো বিজ্ঞানের। অভীপ্সারূপী অগ্নি দুয়ের মধ্যে সেতু। ...কবিক্রতু অগ্নি অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখা, বায়ু শুদ্ধ প্রাণ, ইন্দ্র শুদ্ধ মন, মিত্র বা সূর্য সর্বতো ভাস্বর আদিত্যচেতনার দ্যুতি। তাঁর অজস্র জ্যোতিতেই পবমান সোমের অমৃতলোক যা আমাদের পরমকাম্য।" বিশ্বে যা কিছু আছে, যা কিছু হবে, যা কিছু হচ্ছে তা অগ্নি। বিচিত্ররূপে অগ্নি সকলের গোপা পরমদেবতা, যাঁর রশ্মি বা কিরণ আমাদের মধ্যে আবিষ্ট। অগ্নির সর্বপ্রধান কর্ম হল তাঁর 'দূত্য' বা 'দৌত্য'। মানুষ ও দেবতার মধ্যে তিনি 'দূত'। অগ্নি পৃথ্বীস্থানীয় দেবতা। তাই মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। তিনি আমাদের গৃহপতি বা ঘরের দেবতা। আবার কখনও দূর হতে এলেও তিনি আমাদের অতিথি। আমাদের অতি দূরের প্রত্যক্ষ দেবতা 'বিবস্বান' সূর্য। তাই তাঁকে পেতে অগ্নিকে পাঠাই দূতরূপে। "অগ্নিচৈতন্য আর বিশ্বচৈতন্যের মাঝে অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখাই হয় অতন্দ্র আর নিঃশব্দ বার্তাবহ।" অগ্নি মানুষের প্রার্থনা পৌঁছে দেন দূতরূপে দেবতার কাছে। আবার দেবতার আশিস্ বা করুণা মানুষের কাছে নিয়ে আসেন। মানুষের সাধনা, দেবতার করুণা দুটিকে এক করে দেন অগ্নি। দূতরূপে অগ্নির দুটি কার্য—আবাহন ও আবহন। যখন আবাহন করেন তখন তিনি হোতা বা পুরোহিত। যখন আবহন করেন তখন তিনি বহ্নি বা দেবতার আশীর্বাদ বহনকারী।

বর্তমানে আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতার মূলেও অগ্নির গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষ লক্ষ কলকারখানা অগ্নি বা বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়। বিদ্যুৎ অগ্নিরই একরূপ। অগ্নি ও বিদ্যুৎ যদি একই কালে নির্বাপিত বা নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে জগৎ-জীবন, মানবসভ্যতা সব স্তব্ধ হয়ে যাবে। মানবশিশু যখন মাতৃজঠরে থাকে তখন আলো ও তাপ পাওয়ার জন্য সে ছট্‌ফট্ করে। তাকে বাঁচানোর

জন্য তাপ লাগে। আবার মানুষ যখন দেহত্যাগ করে, তখন দেহটির সংকারের জন্য অগ্নি বা আগুনের প্রয়োজন হয়। আঁতুরঘর হতে রন্ধনশালা, পূজামণ্ডপ বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সকল শুভ কর্মে অগ্নির প্রয়োজন। এইজন্য 'অগ্নিসূক্ত' দ্বারা ঋক্ বেদের শুরু। যথা—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।" অর্থাৎ অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক। বেদে ঋত ও সত্যের কথা বলা হয়েছে। এই সত্য ও ঋতের জন্ম কোথা হতে? ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলে দ্রষ্টা ঋষি উত্তর দিলেন—

"ঋতং চ সত্যং চ অভীদ্ধার্ত্তপসোঽধ্য জায়ত"—অর্থাৎ প্রজ্বলিত তপস্যা হতে ঋত এবং সত্য জন্মগ্রহণ করল। এই তপস্যাই তাপ ও আলো—যা অগ্নির পরিচয় বহন করে। "প্রজ্বলিত অগ্নিই পরম ব্রহ্মের তপস্যা।" পরিশেষে বলি বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ বা সাধককেও বলা হয়েছে বৈশ্বানর বা অগ্নিস্বরূপ।

ইন্দ্র

বেদে অন্তরিক্ষ-স্থানীয় দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র হচ্ছেন সর্বপ্রধান। চার বেদে অগ্নির পরে ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রের সংখ্যা সর্বাধিক। চার বেদে ২০,৩৮৯ সংখ্যক মন্ত্র আছে—এর মধ্যে ইন্দ্রবিষয়ক মন্ত্রসংখ্যা ৪৪১৮। বেদের সকল দেবদেবীই একই পরমতত্ত্বের বিভিন্ন রূপ ও নাম।

বিভিন্ন বেদভাষ্যকার ইন্দ্র শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। ইন্দ্র শব্দের যৌগিক অর্থ (যোগজাত/প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থানুসারে অর্থবোধক শব্দ), ঐশ্বর্যশালী বা শক্তিশালী। এই যৌগিক অর্থকে গ্রহণ করে 'ইন্দ্র' শব্দের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ—পরমাত্মা, জীবাত্মা, অন্তঃকরণ, প্রাণ। আধিদৈবিক দৃষ্টিতে 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ—ইন্দ্র, বায়ু, বিদ্যুৎ, সূর্য। 'ইন্দ্র' শব্দের আধিভৌতিক অর্থ—রাজা, সেনাপতি, বেদে ইন্দ্রবায়ু, ইন্দ্রাগ্নী, ইন্দ্রবরুণৌ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইন্দ্রের সাথে বিভিন্ন দেবতাদের সম্বন্ধ আছে।

বেদে বর্ণিত ইন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দেব-দেবীগণ হলেন—অগ্নি, বরুণ, বায়ু, বিষ্ণু, সোম, মরুত্, বৃহস্পতি, অদিতি, ঊষা এবং পূষা। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে (যথা, কৌষীতকী, শতপথ, গোপথ ব্রাহ্মণ) 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ—আত্মা, ব্রহ্ম, মন, প্রাণ, বাক্, বীর্য এবং জ্যোতি। 'ইন্দ্র' শব্দের যৌগিক অর্থ—পরমৈশ্বর্যযুক্ত বা মহাবলশালী। বেদ-মনীষীদের দৃষ্টিতে ইন্দ্র বস্তুত ঊর্জা। ঊর্জার বিশাল বা সমষ্টিরূপ পরমব্রহ্ম। সমষ্টিরূপকেই পরমাত্মা, ঈশ্বর, শিব, রুদ্র, বিষ্ণু ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়। আত্মার সমষ্টিরূপ পরমাত্মা এবং ব্যষ্টিরূপ জীবাত্মা। একই তত্ত্বের দুই ভিন্নরূপ ও নাম। ইন্দ্র ঊর্জার স্রোত। মানবের আত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক শক্তির স্রোত বা উৎস মন-প্রাণ ও বাক্। এইজন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে কখনও মনকে, কখনও প্রাণকে, কখনও বা বাক্‌কে ইন্দ্র বলা হয়েছে। যথা—

শতপথ ব্রাহ্মণে—'মন এবেন্দ্রঃ।'
গোপথ ব্রাহ্মণে—'যন্মনঃ স ইন্দ্রঃ।'
শতপথ ব্রাহ্মণে—'প্রাণ এবেন্দ্রঃ।'
শতপথ ব্রাহ্মণে—'বাগ্ ইন্দ্রঃ।'

শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'বীর্য'কে ইন্দ্র বলা হয়েছে। মানবীয় শক্তির স্রোত হচ্ছে বীর্য। বীর্যই শরীরে ঊর্জা, উৎসাহ, তেজ ও স্ফূর্তি প্রদান করে। এই বীর্যই আত্মস্বরূপ। অতএব—'বীর্যমিন্দ্রঃ' (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ)। 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র মতে—'রেতঃ ইন্দ্রঃ।' কৌষীতকী ব্রাহ্মণের মতে—'ইন্দ্রো জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্র ইতি'—অর্থাৎ, ইন্দ্র জ্যোতিঃস্বরূপ। বিদ্যুৎ-আদিতে যে জ্যোতি বা প্রকাশ তা ইন্দ্রই। ইন্দ্রকে জ্যোতিস্বরূপ বলার তাৎপর্য মানবের মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রকাশের জ্যোতি বিদ্যমান, যা মানসিক শক্তির স্ফূরণ বা বিকাশ তা ইন্দ্র। ইন্দ্রই জ্যোতির স্রোত।

যজুর্বেদে, ৮।৩৭ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে—"ইন্দ্রশ্চ সম্রাট্ বরুণাশ্চ রাজা"—অর্থাৎ ইন্দ্র সম্রাট এবং বরুণ রাজা। ইন্দ্রের আদেশাধীনেই দ্যাবা-পৃথিবী, বরুণ এবং সূর্য ক্রিয়াশীল হন। অথর্ব বেদে ইন্দ্রের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

"সবরুণঃ সায়ম্ অগ্নির্ভবতি, সমিত্রোভবতি প্রাতরুদ্যন্।
স সবিতা ভূত্বাঅন্তরিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা।।"
(অথর্ব বেদ, ১৩।৩।১৩)।

অর্থাৎ ইন্দ্র একই—বিবিধ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা অনেক নাম ও অনেক রূপে কথিত হয়। প্রাতঃকালে উদিত হওয়ার সময় তিনি মিত্র বা সূর্য। সন্ধ্যাকালে বরুণ ও অগ্নি নামরূপ ধারণ করেন। আবার আকাশে বিচরণ করার সময়ে তিনি সবিতারূপে পরিগণিত হন এবং মধ্যাহ্নে তিনিই হন তপ্তসূর্য। যজুর্বেদের সপ্তদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃপুর এতুসোমঃ।
দেবসেনানামভি ভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম।।"

এই মন্ত্রটিতে ইন্দ্রের এক সেনাবাহিনী এবং ইন্দ্রকে মহানযোদ্ধারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বিপক্ষের বা শত্রুদের অসংখ্য সৈন্যদের একাই পরাস্ত করতে পারেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য বৃহস্পতি-আদি দেবগণ সঙ্গে আছেন। বৃহস্পতি তাঁর দক্ষিণদিকে চলেন, সোম সাথে সাথে চলেন, মরুত্ তাঁর সেনাবাহিনীর আগে আগে চলেন। এর রহস্য নির্ণয়ে বেদ-মনীষীগণ বলেন—ইন্দ্ররূপী আত্মার সাথে বৃহস্পতিরূপী বুদ্ধি, এবং শক্তিস্বরূপ সোম ও প্রাণরূপী মরুত্ সর্বদা সাথে চলেন। বুদ্ধি, শক্তি এবং প্রাণতত্ত্বের সহযোগে ইন্দ্ররূপী আত্মা পাপ, দুর্ভাবনা এবং দুরাচারাদি শত্রুদের (বৃত্রদের) বিনাশ করেন।

যজুর্বেদের একবিংশ অধ্যায়ের ৪৮-৫৬ সংখ্যক মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, অশ্বিনীদেবদ্বয় এবং দেবী সরস্বতী ইন্দ্রকে তেজ, প্রাণ, বল, বীর্য, মতি, ওজ ইত্যাদি গুণসমূহ প্রদান করেছেন। এর অর্থ নিরূপণে বেদ-মনীষীদের অভিমত—ইন্দ্র অর্থাৎ জীবাত্মা। এই জীবাত্মাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অর্থাৎ প্রাণ-অপান এবং সরস্বতী অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ী ক্ষরিত সোমরস বা দিব্যচেতনা বা দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের ঊর্জা এই দুই দিব্যশক্তি অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও দেবী সরস্বতী প্রদান করেন। সর্বপ্রকার শারীরিক শক্তি প্রাণ-অপাণরূপী অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রদান করেন এবং আত্মিক শক্তি তথা দিব্যশক্তি বা চেতনা সরস্বতীরূপা সুষুম্নাক্ষরিত সোমরস প্রদান করেন।

ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১ সংখ্যক সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বলা হয়েছে—ইন্দ্র 'পুর' সকলের বিনাশ করেন। এর অর্থ ইন্দ্র মনুষ্যের তিন পুর অর্থাৎ তিন শরীর, যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই শরীর ত্রয়কে বিনষ্ট করেন। মনুষ্য চেতনা এই তিন শরীরে আত্মাবোধকে নষ্ট করেই ব্রহ্মের দর্শন পায়। এখানে ইন্দ্র 'জীবাত্মা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যজুর্বেদের ৩৪তম অধ্যায়ের ৭ম মন্ত্রে বলা হয়েছে ইন্দ্র ত্রিত বা ত্রিতের রূপ ধারণ করে বৃত্রকে সব সময়ই ধ্বংস করেন। ইন্দ্রের এই ত্রিত বা তিনটি রূপ হচ্ছে ত্রিকোণাত্মক। এই ত্রিকোণের তিনটি কোণ— (১) দ্যুলোক, (২) অন্তরিক্ষলোক, (৩) ভূলোক। এই ত্রিকোণ সারা বিশ্ব-বিধৃত। এই ত্রিকোণই বিষ্ণুরূপী ইন্দ্রের তিনপদ। শরীরে এই তিনপদ হচ্ছে—মন, বুদ্ধি ও হৃদয়। যদি মন-বুদ্ধি এবং হৃদয়ের ত্রিকোণ পবিত্র বা শুদ্ধ হয়, তাহলে মানবের শরীর ও মনে কখনও বৃত্র অর্থাৎ পাপবৃত্তি বা অবিদ্যা প্রবেশ করতে সমর্থ হয় না। বেদে ইন্দ্রকে বাসব, মরুত্বান্ এবং ইন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'বাসব' ইন্দ্র অর্থাৎ বসুনামক দেবগণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। দ্যুলোকের আদিত্যের রশ্মিকে বসু বলা হয়। 'বসু' শব্দের আধুনিক অর্থ ধন, রত্ন ও সুবর্ণ ইত্যাদি। বেদে দেবতাদের এক বিশেষ বর্গ বা শ্রেণীকে 'বসু' বলা হয় যাদের সংখ্যা আট। এই আটজন হলেন—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। বসুগণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ইনি (ইন্দ্র) পঞ্চতত্ত্বের সংগ্রাহক এবং বাকতত্ত্বের প্রতিনিধিত্বকারী। 'মরুত্বান্' ইন্দ্র—মরুত বা বায়ুর সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। হৃদয়ের সঞ্চালক ও প্রাণতত্ত্ব। 'মঘবা' ইন্দ্র, ইনি দ্যুলোক অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোক তথা মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। মস্তিষ্ক বা দ্যুলোকের সঞ্চালক মনস্তত্ত্ব। মনেরই পবিত্রশক্তিকে 'মঘ' বা 'মখ' বলা হয়। ইন্দ্রই শরীররূপী তিনলোকের গতিকেন্দ্র। উপরোক্ত সব নামেই বেদে ইন্দ্রকে অভিহিত করা হয়েছে।

অথর্ব বেদ মতে ইন্দ্র শরীররূপী রথের নিয়ন্তা (দ্রষ্টব্য-অথর্ব বেদ, ৪/১১/২)। শরীররূপী রথে যুক্ত আছে দুই অশ্ব, এদেরকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলা হয়। এই দুই অশ্ব হচ্ছে প্রাণ ও অপান। প্রাণরূপী এই দুই অশ্বই শরীরকে গতি ও উর্জা প্রদান করে। প্রত্যেক জীবে এই প্রাণ অপানের (শ্বাস-প্রশ্বাসের)

ক্রিয়া নিরন্তর চলছে। বৈদিক কথানুযায়ী ইন্দ্র সোমপায়ী ও অমর। এই সোম বা সোমরস কী যা পান করে ইন্দ্র অমর হন! কৌষীতকী, শতপথ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থমতে—'রেতঃ সোমঃ' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বীর্য বা রেত হচ্ছে সোম। এই বীর্য বা রেতকে শরীরের মধ্যে সুচারুরূপে পরিপাক করে নেওয়া বা হজম করে নেওয়াই সোমপান। যিনি সংযম ও তপস্যার দ্বারা শরীরস্থিত বীর্যকে শরীরের মধ্যেই জীর্ণ বা হজম করে নেন তিনিই অমর বা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে যান। সোমাহরণ বা সোমপান বস্তুত কাম ভাবনাকে দমন করা ও বীর্য বা রেতকে সুরক্ষিত করা। বীর্য বা রেত যদি সুরক্ষিত থাকে তাহলে জীবাত্মারূপী ইন্দ্র হন শক্তিশালী ও অমর এবং তিনি পাপাদি বৃত্তিরূপ বৃত্রাসুরকে দমন করতে সমর্থ হন।

যজুর্বেদে অনেক মন্ত্রে যথা অষ্টম অধ্যায়ের ৩৩-৩৬, এবং ছাব্বিশ অধ্যায়ের, ১০ সংখ্যক মন্ত্রে ইন্দ্রকে ষোড়শিন্ বা ষোড়শী বলা হয়েছে, যথা—"ইন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে।" ষোড়শীর অর্থ ১৬ কলা দ্বারা যিনি যুক্ত। পরমাত্মাকেই ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ বলা হয়। ষোড়শকলার অভিপ্রায়—সব প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা যুক্ত সর্বশক্তিমান পরমাত্মা। সৃষ্টিতে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে সবই পরমাত্মারূপী ইন্দ্রের উর্জা। সৃষ্টির সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এই উর্জাকে ষোড়শী বা সর্বশক্তিমান বলা হয়েছে।

ডাঃ ভি.জি. রেলে তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'The Vedic Gods, as figures of Biology, page no, 95-104—এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শরীরে ইন্দ্রদেবতা হচ্ছে বৃহৎ-মস্তিষ্ক। যা মানবীয় সমস্ত চেতনার মূলকেন্দ্র। এই কেন্দ্রকে বিচার ভাবনা করার জন্য তথা শক্তি সরবরাহ করার জন্য এর অভ্যন্তরে চারটি গহ্বর বা গর্ত আছে (Ventricles)। এই গহ্বরগুলি সোমরস দ্বারা পরিপূর্ণ। এই সোমরসকেই শিরোমেরুদ্রব বা Cerebro-spinal fluid বলা হয়। এই সোমরসই শরীরস্থিত ইন্দ্রদেব বা বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum, cortical layer of the brain) নিরন্তর পান করে। মস্তিষ্কের সমগ্র অংশের নাড়ী-জালকে (Nervous system) নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শরীরের বিভিন্ন স্থানে দ্বাদশটি কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। এই দ্বাদশ

কেন্দ্রের সহায়তায় জীবজগতের বুকে নিজেকে প্রকাশ করে। এই কেন্দ্রগুলিই জীবরূপী দেহব্রহ্মাণ্ডের দ্বাদশ-আদিত্য বা সূর্য। এইগুলি সংবেদনশীল ও চেতনার কেন্দ্ররূপে অভিব্যক্ত হয়। এগুলি মস্তিষ্কের বহির্ভাগে অবস্থিত থেকে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরস্থিত এই দ্বাদশটি কেন্দ্র হল—১। দুই পা, ২। দুই হাত, ৩। মুখ, ৪। দুই ওষ্ঠ, ৫। গর্দান বা গ্রীবা, ৬। জিহ্বা, ৭। মস্তিষ্ক, ৮। দুই চোখ, ৯। বাক্ বা বাক্তন্ত্র, ১০। শ্রবণশক্তি, ১১। দর্শনশক্তি, ১২। স্পর্শ ও অনুভব শক্তি। বেদে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়, যুদ্ধে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন। বেদ-মনীষীদের দৃষ্টিতে বৃত্র হচ্ছে অবরোধক বা বাধা প্রদানকারী শক্তি বা তত্ত্ব। আকাশে জলকণাসমূহের মধ্যে পরস্পরের মিলনে বাধার সৃষ্টি করে—যার ফলে মেঘ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ হয় না। ইন্দ্র বৃত্রবিরোধী তত্ত্ব বা শক্তি। যে শক্তি আকাশস্থিত জলকণাসমূহকে যুক্ত করে, যার ফলে মেঘ বৃষ্টিপাত করতে সমর্থ হয়। এইরূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণসলিল বা কারণবারি, যা এধারে-ওধারে ছড়িয়েছিল, বৃত্ররূপী অবরোধের কারণে মিলতে পারছিল না, ইন্দ্রশক্তি অর্থাৎ বজ্র বা বিদ্যুৎশক্তি তা একত্র করে—ফলে সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir J.J. Thomson বলেছেন-"সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থায় ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা এদিক-ওদিক ছড়িয়েছিল, এগুলি আকাশীয় প্রভাবের কারণে (অর্থাৎ- ইন্দ্রশক্তির কারণে) সংহত হয় এবং সৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

কোনও কোনও বেদ-মনীষীর মতে বৃত্র হচ্ছে অজ্ঞান বা অবিদ্যার আবরণ। এই আবরণে আমাদের আত্মজ্ঞান বা আত্মস্বরূপ আবৃত থাকে। জীবাত্মারূপী ইন্দ্রের আত্মজ্ঞানাগ্নিরূপ বজ্রের প্রহারে ওই বৃত্ররূপী অসুর তথা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বিনাশ হয়। এর ফলে জীব বা সাধকের আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। জীবের মনোভূমিতে তখন চিদাকাশ থেকে আনন্দ বা অমৃত বর্ষিত হয়। 'বৃত্র' শব্দের আর এক অর্থ কুয়াশা বা অন্ধকার। বাইরে কুয়াশার অন্ধকার ঘনীভূত হলে সূর্যের আলো পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে না। সূর্যরূপী ইন্দ্রের আলোরূপী বজ্রপাতে এই কুয়াশার আবরণ বিনষ্ট হয়। ফলে সূর্যের

আলোয় জগৎ প্রকাশিত হয়। বৈদিক কেনোপনিষদে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, উমা ও ব্রহ্মকে নিয়ে একটি কাহিনী বিবৃত আছে। কাহিনীটির সংক্ষিপ্তরূপ—দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হলেন ব্রহ্মের কৃপায় বা শক্তিতে। কিন্তু এই জয়কে দেবতারা অহংকারবশত নিজেদের শক্তির জয় বলে মনে করলেন। ব্রহ্ম দেবগণের সেই আত্ম-অহংকার জানতে পেরে, তাঁদের অহংকার দূর করার জন্য, তাঁদের নিকটে যক্ষরূপে আবির্ভূত হলেন। দেবলোকে উপস্থিত এই রহস্যময় ব্যক্তিটি কে? দেবগণ তা জানতে পারলেন না। ইন্দ্রের আদেশে অগ্নি তখন যক্ষের কাছে আপন পরিচয় দিয়ে, তিনি (যক্ষ) কে তা জানতে চাইলেন। কিন্তু যক্ষ কে, তা জানতে না পেরে পুনরায় ইন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন। এরপর ইন্দ্রের আদেশে বায়ুদেব যান যক্ষের কাছে। তিনিও অগ্নিদেবের ন্যায় তাঁর (যক্ষের) পরিচয় জানতে না পেরে ফিরে আসেন। এরপর ইন্দ্র নিজে যান ওই যক্ষের পরিচয় জানতে। ইন্দ্রকে নিজের দিকে আগমন করতে দেখে যক্ষ অন্তর্হিত হলেন। এমন সময়ে হৈমবতী উমা অপরূপ সৌন্দর্যশালিনী নারীমূর্তিতে দেবলোকে বা আকাশে আবির্ভূতা হলেন। ইন্দ্র তখন হৈমবতী উমাকে দর্শন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই যক্ষটি কে?' হৈমবতী উমা তখন বললেন, 'তোমাকে দেখে যিনি অন্তর্ধান করেছেন—তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর ইচ্ছাতেই তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছ।' হৈমবতী উমার মুখে এই কথা শুনে ইন্দ্র ওই যক্ষকে ব্রহ্ম বলে জানতে পারলেন। উপরে কথিত কাহিনীটির মধ্যে যে পাঁচজন দেবতার নাম পাওয়া গেল, তাঁরা হলেন আমার আচার্যদেব শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের ভাষায়—"ইহারা আমাদের আত্মানুভূতিরই পাঁচটি স্তর এবং এর সৃষ্টিও পাঁচটি স্তর। 'অগ্নি' পার্থিব চেতনা বা ভৌমচেতনা। 'বায়ু' অন্তরীক্ষ চেতনা বা প্রাণশ্চেতনা। 'ইন্দ্র' দিব্যচেতনা, 'হৈমবতী উমা'—প্রজ্ঞানঘন চেতনা বা পরমা-প্রকৃতি, 'যক্ষ' অর্থাৎ ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমপুরুষ।

'যক্ষু' শব্দ হইতে যক্ষ শব্দ নিষ্পন্ন, 'যক্ষু' শব্দের অর্থ অনির্বচনীয় রহস্য। যিনি রহস্যময়, যাঁর তত্ত্ব অনির্বচনীয় তিনিই যক্ষ। জীবের বাস্তব সত্তা বা ইন্দ্রিয়সত্তার মূলে রহিয়াছে অতীন্দ্রিয়, অনির্বচনীয় রহস্যময় সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা। জীব আত্মাভিমানে থাকে বলিয়া এই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বা আবির্ভাব ধারণা

করিতে পারে না। ব্রহ্মসত্তাতেই জীব সত্তাবান, জীব যখন নিঃসংশয়ে এই তত্ত্বকে ধারণা করিতে পারে তখনই সে উত্তরায়ণ-পথের যাত্রী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে।...যক্ষ আবির্ভাব কাহিনী দ্বারা, জীবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ভৌমচেতনা (অগ্নি) ও প্রাণশ্চেতনা (বায়ু) ব্রহ্মচেতনায় অবগাহন করিতে পারে না। দিব্যচেতনা বা অতীন্দ্রিয় চেতনাই (ইন্দ্র), প্রজ্ঞানঘন চেতনা বা পরমা-প্রকৃতির সহায়তায় ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করিতে পারে। প্রজ্ঞানঘন চেতনা বা পরমা-প্রকৃতিই পরম পুরুষের হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দদ্যুতি। এই পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতিকেই এককথায় বলা যায়—'নিত্যচেতন, নিত্যশক্তিলীলা নিত্যধামে।'...যে শক্তি পরিণামিত হইয়া এই সৃষ্টিকে গড়িয়া তুলিয়াছে উহার নামই অগ্নি। ...এই অগ্নিই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্যষ্টিজ্ঞানরূপে আত্মজ্ঞান প্রকাশ করেন।...ব্যষ্টিজ্ঞান কখনও সমষ্টি জ্ঞান বা পরমাত্মজ্ঞানকে ধারণ করিতে পারে না। এই জন্যই অগ্নির পক্ষে যক্ষকে জানা সম্ভবপর হয়নি।...বায়ুর আর এক নাম মাতরিশ্বা। মাতার অনুগত থাকিয়া অর্থাৎ চিন্ময়ী মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী যিনি সৃষ্টিকে সঞ্জীবিত রাখেন তিনিই মাতরিশ্বা। অধ্যাত্মভাবে এই বায়ুই আমাদের অন্তরে জাগে সমষ্টি চেতনারূপে, শুদ্ধ প্রাণরূপে। এই শুদ্ধ প্রাণই আমাদের অন্তরে ফোটে ব্যাপ্তিবোধরূপে। শুদ্ধপ্রাণ বা সমষ্টিচেতনা মায়াধীশ পরমচেতনাকে জানিতে পারে না। এই জন্যই বায়ুর পক্ষে যক্ষকে জানা সম্ভবপর হয়নি।

ইন্দ্র, দ্যুলোক বা দিব্যলোকের অধিপতি; এই দ্যুলোকই ব্রহ্মলোকের সবচেয়ে কাছে। বেদে ইন্দ্রের আর এক নাম সূর্য। সূর্য শব্দের অর্থ যিনি সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোক দ্যুলোকেরই অন্তর্গত, দ্যুলোকেরই অধীন। সুতরাং দ্যুলোকের অধিপতি ইন্দ্র বা সূর্যই সমগ্র সৃষ্টির অধিপতি।

অধ্যাত্মভাবে এই ইন্দ্রই শুদ্ধমন বা দিব্যমন। এই শুদ্ধমনই সহজে নিস্তরঙ্গ হয়, শূন্য হয়। এই শুদ্ধ নিস্তরঙ্গ মনে, এই নিষ্কলুষ শূন্যমনে প্রজ্ঞা বা হৈমবতীর আবির্ভাব হয়। এই প্রজ্ঞা বা হৈমবতীর কৃপাতেই শুদ্ধমন ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ

করে, ইন্দ্রিয়ের রাজা ইন্দ্রের তখন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশের ক্ষমতালাভ হয়। ব্রহ্ম সন্দর্শন হয়। উমাং হৈমবতীং—হিমবৎ শুভ্রচেতনার যিনি অধিকারিণী অর্থাৎ যিনি চিন্ময়ী মহাশক্তি বা চিন্ময়ী প্রকৃতি তিনিই হৈমবতী উমা। এই চিন্ময়ী মহাশক্তির কৃপার যোগ্য হইতে পারিলে তবেই সাধক ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে পারে।"

(উপনিষদ রহস্য, কেন উপনিষদ, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ)

বিজ্ঞান-মনস্বী যতিপ্রবর শ্রীমৎস্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দের মতে—শুধুমাত্র গতিদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয় না। গতিতে ছন্দের উপস্থিতি চাই। গ্রহ-উপগ্রহ-আদি যদি ছন্দোবদ্ধরূপে না ঘোরে, ছন্দহীন হয়ে যদি ঘুরতে থাকে তাহলে পরস্পর-পরস্পরের ধাক্কা খেয়ে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ইন্দ্র সৃষ্টির গতিতে ছন্দ এবং শৃঙ্খলা এনে দেন। যে অনির্বচনীয় কারণে সব গতিশীল বস্তুসমূহের মধ্যে ছন্দ ও শৃঙ্খলা আসে বা আসতে থাকে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তাঁকে চৈতন্যরূপে উপলব্ধি করে তাঁর নামকরণ করেছেন ইন্দ্র।

(দ্রষ্টব্য ঃ 'বেদ ও বিজ্ঞান'—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী)।

বেদে দেখা যায় ইন্দ্র সর্বদা অসুর বধে ব্যস্ত। বৃত্র, অহি, নমুচি, শম্বর, পনি—এরা সকলেই অসুর। 'বৃত্র' আবরণকারী অন্ধকার বা অবরোধক শক্তি। 'অহি' জলধারার বিঘ্নপ্রদানকারী দুর্বৃত্ত বা অসুর। ইন্দ্র বৃত্রকে বজ্রদ্বারা বধ করে আলোর প্রসারতা এনে দেন। অহিকে বধ করে জলধারায় পৃথিবীকে স্নান করান। 'নমুচি' শব্দের বৈদিক অর্থ জলের উপর জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা বা ফেনা। অন্য অর্থে দুর্ভিক্ষকালীন মেঘ, যা কখনও পৃথিবীর সন্তানদের সুখের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে না। 'শম্বর' শব্দের বৈদিক অর্থ মেঘকে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ হতে যা বাধা দেয় অথবা অনাবৃষ্টি। 'শম্বর' শব্দের আর একটি বৈদিক অর্থ হচ্ছে মেঘ বা আবরণ যা আত্মারূপী সূর্যকে আবৃত করে রাখে। ইন্দ্র এই সকল অসুরদের বধ করে আত্মরূপী সূর্যকে মুক্ত করে পরমাত্মারূপী পরমসূর্য বা পরমজ্যোতির সাথে মিলন সম্পন্ন করেন। বৃত্রাসুরকে ইন্দ্র বধ করেন—তাই তাঁর আর এক নাম 'বৃত্রঘ্ন'। তিনি অসুর বা দানবদের দুর্গ বা পুরসমূহ বিনাশ করেন—এই জন্য তিনি পুরন্দর। পণিদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—তাই

এখানে এর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইন্দ্র দেবরাজ অর্থাৎ দেবতাদের রাজা। পৃথিবীর সকল জীবহৃদয়ে পরমাত্মা-দেব বিরাজ করেন। রাজা রজোগুণী ক্ষত্রিয়বৃত্তি সম্পন্ন। 'ক্ষত' বা আঘাত হতে যিনি ত্রাণ করেন তিনিই ক্ষত্রিয়। সমাজ-সংসারে, ব্যষ্টি জীবনে, রাষ্ট্রে যখন দুর্বৃত্তরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন ইন্দ্রের বজ্রশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও বীর্যবত্তা ওইসব দুর্বৃত্তদের দমন করে। দুর্বৃত্ত কারা? ব্যষ্টি জীবনে, সমাজ-সংসারে তথা রাষ্ট্রের যারা উন্নতি সমৃদ্ধির বাধক তারাই দুর্বৃত্ত। যারা সার্বিক জীবনে বা ক্ষেত্রে আলোর প্রসারণে অন্তরায়স্বরূপ তারাই দুর্বৃত্ত বা অসুর। আলোকিত জীবাত্মারূপী ইন্দ্র অথবা প্রবুদ্ধ আত্মারূপী ইন্দ্র বীরের মতো, রাজকীয় ভঙ্গীতে ওইসকল দুর্বৃত্তদের বিনাশ করেন। বেদমূর্তি ঋষি অনির্বাণের ভাষায় "ইন্দ্র সর্বভূতকে (চৈতন্য দিয়ে) প্রদীপ্ত করেন, অথবা মানুষ প্রাণ দিয়ে নিজের মধ্যে তাঁকে সমিদ্ধ করে, তাই তিনি ইন্দ্র।"

"ইন্দ্রের আর এক নাম শতক্রতু অর্থাৎ শতধা-ব্যাপ্ত সৃষ্টি প্রতিভা যাঁর ভিতর আছে।" ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের ৮৬ সংখ্যক 'বৃষাকপি সূক্তে' ইন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সূক্তে ইন্দ্রপত্নীর নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু পুরাণে তাঁর (ইন্দ্রপত্নীর) নাম হয়েছে শচী, এই নামকরণের উৎসটি কিন্তু ঋক্ সংহিতাতেই পাওয়া যায়। সেখানে ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা বা নাম হল 'শচীবঃ'-অর্থাৎ যাঁর শচী আছে। বৈদিক 'নিঘন্টু'তে 'শচী' শব্দের তিনটি অর্থ দৃষ্ট হয়—১। বাক্ বা মন্ত্র, ২। কর্ম বা যজ্ঞ, ৩। প্রজ্ঞা বা সাধনার ফল। শচ্ ধাতু হতে উৎপন্ন শচী শব্দের অর্থ ইন্দ্রাণী বা কর্ম। বৈদিক কোষ মতে (অভিধান) শচী শব্দের আর এক অর্থ স্তুতি বা স্তুতি করা। সহজ কথায় শচী হল ইন্দ্রের শক্তি। এই শক্তিতেই তিনি শক্তিমান। এককথায় শচী তাঁর স্বরূপশক্তি। আমাদের মধ্যে তিনি পরমপুরুষের জন্য আকুতি, যা দেবতারই আত্মশক্তি।

ঋষি অনির্বাণ তাঁর বেদ-মীমাংসাগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—"ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনার সময় তিনি পরম দেবতা একথা মনে রাখা প্রয়োজন। অদেববাদী মুনিপন্থীদের প্রভাবে পরমদেবতার তাত্ত্বিক

দিকটাই বেশি জোর ধরাতে ক্রমে তার অভিধা হয়েছে 'পুরুষ' বা 'ব্রহ্ম'। তার ফলে সেই বৈদিক যুগেই ব্রহ্মবাদীদের দৃষ্টিতে ইন্দ্র যেন খানিকটা নিচে নেমে এসেছেন। আমাদের কাছে এখন তো তিনি কেবল ভোগৈশ্বর্যের প্রতীক। এই দৃষ্টির সংশোধন হওয়া একান্ত আবশ্যক; নইলে সংহিতার ইন্দ্রমন্ত্রগুলির ব্যঞ্জনা আমাদের চেতনায় সম্যক্ পরিস্ফুট হবে না।"

বৈদিক সাহিত্যে অগ্নি জড়শক্তি, বায়ু প্রাণশক্তি ও ইন্দ্র সংজ্ঞাশক্তি। অন্তরের দিক দিয়ে এই ইন্দ্রই ইন্দ্রিয়ের রাজা বা মনঃশক্তি। বেদেও বলা হয়েছে—"যো জাত এব প্রথমো মনস্বান"। অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বের আদি আবির্ভূত মন। বেদে এ-ও বলা হয়েছে যে—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। অর্থাৎ ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপ সৃজন করলেন। অর্থাৎ যে সমষ্টি চেতনা ভেঙ্গে এই ব্যষ্টি চেতনার উদ্ভব, তাহাই ইন্দ্র। এইরূপে অগ্নি হল বিশ্বভূত, বায়ু বিশ্বপ্রাণ এবং ইন্দ্র বিশ্বচেতনা।

বেদে ইন্দ্রের আর এক নাম আদিত্য। ভিতরের দিক দিয়ে যে শক্তিটা গুটিয়ে আছে সেটাই ইন্দ্র আর যে শক্তিটা বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে সমষ্টি জগতের চোখে দেখার, যে Energy সেটাই আদিত্য।

বায়ু

বায়ু দেবতার বিষয়ে মহর্ষি যাস্ক বলেছেন—"অথাতো মধ্যস্থানো দেবতাঃ। তাসাং বায়ুঃ প্রথমাগামী ভবতি।" অর্থাৎ অনন্তর অন্তরিক্ষ বা মধ্যস্থানীয় দেবতার কথা বলা হচ্ছে। যার মধ্যে বায়ু প্রথম। বৈদিক 'নিঘন্টু'তে বায়ুর নাম প্রথমে বলা হলেও অন্তরিক্ষে যে ইন্দ্রেরই প্রাধান্য একথাও যাস্ক স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন। অন্তরিক্ষে ইন্দ্রের বিশেষ কাজ হল 'বৃত্রকে' বধ করে অবরোধ বা বন্ধন থেকে প্রাণকে মুক্ত করা এবং আধারকে রসানুষিক্ত করে তার বন্ধ্যাত্ব ঘোচানো। এর জন্য ঊর্জা বা শক্তির প্রয়োজন হয়। অন্তরিক্ষে যা কিছু শক্তি বা ঊর্জাকৃতি তা ইন্দ্রের কাজ বা কর্ম এবং একই সঙ্গে তা বায়ুরও কর্ম। অন্তরিক্ষ-স্থানীয় দেবতাদের এটাই সাধারণ কর্ম। এঁরা অর্থাৎ এইসব দেবতারা হলেন মহাপ্রাণের বিভূতি, মহাভাগ বা মহেশ্বর। এঁদের এক-একজনের অনেক

নাম। অনেক নাম ও রূপধারী এইসব দেব-দেবীগণ যে এক পরমাত্মা বা পরব্রহ্মেরই বিভূতি তা আমরা পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছি। পূর্বে আমরা এও জেনেছি যে 'দিব্' ধাতু হতে দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'দিব' ধাতুর অর্থ দ্যুতিশীল অর্থাৎ যা চৈতন্যময় বা চেতনাবান তা-ই দেবতা। এই অর্থে আমাদের প্রাণ-মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরাও দেবতা। কারণ এরাও দ্যুতিশীল বা চেতনাবান। বৈদিক দেবতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেদের সর্বপ্রাচীন ভাষ্যকার যাস্ক বলেছেন—"তিস্রঃ এব দেবতাঃ—অগ্নি পৃথিবীস্থানো, বায়ু অন্তরীক্ষ স্থানঃ, সূর্য দ্যুস্থানঃ তাসাং মহাভাগ্যা দেবৈ ব্যাপি বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম পৃথকত্বাৎ"—অর্থাৎ দেবতা মাত্র তিনটি, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য। এই তিনদেবতা 'মহাভাগ্যা' অর্থাৎ মহা ঐশ্বর্যযুক্ত। এঁদের বহু নাম অথবা এঁরা পৃথক পৃথক কর্ম করেন বলেই পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হন। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে—"বায়ুঃ প্রাণঃ"—বায়ু প্রাণশক্তিস্বরূপ। বেদমূর্তি ঋষি অনির্বাণ তাঁর বেদ-মীমাংসা গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন, দেবতা-মাত্রেরই স্বরূপ হল জ্যোতি। অন্তরিক্ষে আমরা নৈসর্গিক দুটি জ্যোতির সাক্ষাৎ পাই—একটি বিদ্যুৎ, আরেকটা চন্দ্রমা। একটি প্রাণের জ্যোতি, আরেকটি প্রজ্ঞার। এই দুটি জ্যোতি বুদ্ধিস্থ রেখে আমরা অন্তরিক্ষস্থান নৈসর্গিক দেবতাদের দুটি বর্গ পাই—একটিতে আছেন বায়ুপ্রমুখ বাত, বরুণ, রুদ্র, অপাং নপাত, ইন্দ্র মরুদ্‌গণ ও পর্জন্য, আরেকটিতে সোমপ্রমুখ ইন্দু, চন্দ্রমা, অনুমতি, রাকা, সিনীবালী, কুহূ এবং আরও কয়েকজন দ্যুস্থানদেবতা। বিশেষ কারণে যাঁদের অন্তরিক্ষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। নৈসর্গিক এই কাঠামোটি অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি"।

ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলে, ১৬৮ সূক্তে, চতুর্থ মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো যথাবশং চরতি দেব এষঃ।
ঘোষা ইদস্য শৃন্বিরে ন রূপং তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম।।"

অর্থাৎ "এই বায়ুদেব দেবগণের আত্মস্বরূপ, ত্রিভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথেচ্ছ বিচরণশীল। এই দেবতার শব্দই অনেক প্রকার শোনা যায়, এঁর রূপ কখনও প্রত্যক্ষ হয় না, এসো, হবি দিয়ে এই বায়ুদেবের পূজা করি।" সূক্তটির

(১৬৮), দেবতা বায়ু, দ্রষ্টা অনিল ঋষি। অনিল শব্দের অর্থ বায়ু। বায়ু দেবতার ধ্যান করতে করতে ঋষি যেন বায়ুময় বা বায়ু হয়ে গেছেন। বেদান্তের ভাষায় ব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে সাধক যেমন ব্রহ্ম হয়ে যায়। দ্রষ্টা ঋষি ইঙ্গিত করলেন পূজা বা ধ্যান করতে করতে ধ্যানীকে দেবতার স্বরূপে তন্ময় হয়ে দেবতাই হয়ে যেতে হবে—তবেই ধ্যানের দেবতার স্বরূপ বা মহিমা নিজের মধ্যে ফুটে উঠবে। ওই সূক্তের (১৬৮) তৃতীয়মন্ত্রে ঋষি বলেছেন—

"অন্তরিক্ষে পথিভিরীয়মানো ন নি বিশতে কতমচ্চনাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা ক্ব স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব।।"

অর্থাৎ "ইনি সর্বদাই আকাশপথে বিচরণশীল থাকেন, কখনও বা কোনওদিনই স্থির হয়ে বসে থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হন অর্থাৎ আগে বাতাস পরে বৃষ্টি। ইনি সত্য-স্বভাব। বলো দেখি ইনি কোথায় জন্মেছেন?" বায়ু জগতের সর্বত্র বিদ্যমান। বায়ু ছাড়া আমাদের জীবন এক মুহূর্তও চলে না। বায়ু ব্যতিরেকে জীবনধারণ অসম্ভব। পঞ্চভূতের অন্যতম ভূত বায়ুকে আমরা সর্বদাই নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে টেনে নিয়ে বেঁচে আছি। তাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বায়ু হল প্রাণ বা প্রাণশক্তি। আমরা যেন এক অসীম বায়ু বা প্রাণ সমুদ্রের মাঝে নিমজ্জমান অবস্থায় থেকে তাতেই বিচরণ করছি। বায়ু আমাদের ভেতরে, বায়ু আমাদের বাইরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যে প্রাণবায়ু সবার মধ্যে প্রবহমান, সেই প্রাণবায়ু আমারও মধ্যে সতত সঞ্চরণশীল প্রবাহাকারে। বায়ুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যতটা প্রত্যক্ষ এবং নিবিড়, ততটা নিবিড় সম্পর্ক পঞ্চভূতের মধ্যে একমাত্র আকাশ ছাড়া আর কোনও ভূতের সঙ্গে আমাদের নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বায়ুর সাথে আমাদের প্রত্যক্ষভূত নিবিড় সম্পর্ককে অনুভবে ফুটিয়ে তোলার অর্থ আত্মচৈতন্য বা ব্যষ্টিচৈতন্যকে বিশ্বচৈতন্যে উত্তীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ার এক অমোঘ সাধন। ঈশোপনিষদের ঋষি এই কারণেই কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—"বায়ুরনিলমৃতম্"। অর্থাৎ, এই বায়ু প্রাণময় অমৃত। আমাদের সবার প্রাণে এই অমৃতের প্রবাহ।

আমাদের দেশে অধ্যাত্মসাধনায় বা যোগসাধনায় প্রাণায়ামরূপে বায়ুর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রাণ-অপান বায়ুর সহজ বা স্বাভাবিক গতি বা সংঘর্ষের ফলে আত্মচৈতন্য প্রদীপ্ত হয়—সাধক ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভের যোগ্য হয়ে ওঠেন। তবে প্রাণায়ামের অনুশীলন কিভাবে করতে হবে এটা যোগতত্ত্বদর্শী গুরুর কৃপার ওপর নির্ভর করে। এখানে শুধু এইটুকু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক ভাবনায় পৃথিবীস্থানীয় দেবতা অগ্নি অর্থাৎ পার্থিব চৈতন্য বা ভৌমচৈতন্য। এই ভৌম বা পার্থিব চেতনাকে উত্তরণের পথে অন্তরিক্ষস্থানীয় দেবতা বায়ুচৈতন্যে বা প্রাণচৈতন্যে উন্নীত করতে হবে। সহজ কথায় অগ্নিচেতনাকে বায়ুচেতনার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অধ্যাত্ম উন্নতির ক্ষেত্রে এটাই ব্যাপ্তিচৈতন্যের প্রথম পাঠ। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম মন্ত্রে অগ্নিচৈতন্যকে বায়ুচৈতন্যে উন্নীত করার অনুকূলে সমর্থন পাওয়া যায়। যথা—"বায়ুর্বাব সংবর্গো। যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্যোহস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি। যদা চন্দ্রোহস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি।।" অর্থাৎ বায়ু সম্বর্গ। সম্বর্গ অর্থাৎ সর্বগ্রাসীবিদ্যা বা লয়স্থান। বায়ু সর্বব্যাপী ও সর্বগত। বায়ুদেবতা সকলকে গ্রাস করেন, সকলের লয়স্থান। যখন আগুন নেভে, সূর্য-চন্দ্র অস্ত যায়, তখন বায়ুই তাদের গ্রাস করেন—অর্থাৎ তাঁরা বায়ুতে লীন হন।" ঋষি অনির্বাণের ভাষায়—"অভীপ্সার অগ্নিশিখা লেলিহান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মিশে যায় বায়ুতে। সে যেমন দেহকে তপস্থান করে, তেমনি আশপাশের বায়ুমণ্ডলকেও প্রতপ্ত করে। এই ভাবনাসমৃদ্ধ চৈতন্যের তেজস্ক্রিয়া এবং সামর্থ্যের পরিচায়ক।" (বেদ-মীমাংসা, তৃতীয় খণ্ড, অনির্বাণ)।

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে বায়ু গতি-উৎপন্নকারী শক্তি। বেদে যেখানে বায়ুকে দেবতারূপে স্মরণ করা হয়েছে, সেখানে গতি-উৎপন্নকারী শক্তি অর্থেই করা হয়েছে। ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলে, দ্বিতীয় সূক্তে, চতুর্থমন্ত্রে বায়ুর গতি উৎপন্নকারী শক্তি বিষয়ে বলা হয়েছে। যথা—"ইন্দ্রবায়ু ইমে সূতা উপ প্রয়োভিরাগতম। ইন্দ বো বামুশন্তি হি।।" অর্থাৎ হে ইন্দ্র ও বায়ু এ সোমরস অভিষুত (শোধিত) হয়েছে, অন্ন নিয়ে এসো (অর্থাৎ নিজ নিজ উপাদান কারণ সহ) সোমরস তোমাদের কামনা করছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উক্ত মন্ত্রের অভিপ্রায় হচ্ছে যখন পরমাণুর ভেতরের শক্তি ইন্দ্র, পরমাণুর অসাম্যাবস্থা হওয়ার কারণে, অর্থাৎ পরমাণুর ভেতর ক্ষোভ উৎপন্ন হওয়ার কারণে প্রকট হল, তখন ওই প্রকার প্রকট অবস্থার তিনটিরূপ প্রকাশ পেল। যথা—১। রাজস্ বা তৈজস্, ২। সত্ত্ব বা সাত্ত্বিক, ৩। তম বা তামস্। পরমাণু অন্তর্গত ইন্দ্রকে এই কারণে ত্রিগুণাত্মক বলা হয়। একগুণ হচ্ছে রাজস বা তৈজস্, একে ঋণ-বিদ্যুৎ বলা হয়। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে সত্ত্ব বা সত্ত্বিক একে ধন-বিদ্যুৎ বলা হয়। তৃতীয় গুণ হচ্ছে তম বা তামস্ একে শূন্য বা '0' শক্তি বলা হয়। এগুলি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করতে থাকে। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রক্রিয়ার ফলে গতি উৎপন্ন হয়। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিই বায়ু নামে অভিহিত হয়। উল্লিখিত মন্ত্রে 'সূতা' শব্দের তাৎপর্য নির্মীয়মান পদার্থ বা বস্তু। গতিরূপে, প্রাণরূপে বায়ু সর্বত্র প্রবহমান, বায়ু যেন বিশ্বব্যাপী অন্তহীন এক মহাপ্রাণের সাগর। সাগরের বুক জুড়ে চলছে নিত্য প্রাণায়াম, অর্থাৎ প্রাণের আয়াম বা বিস্তার। বেদ-মনীষী অমলেশ ভট্টাচার্যের ভাষায়—"আমাদের সকলের অন্তরে ও বাহিরে এই প্রাণের সমুদ্র প্রবহমান।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, অমলেশ ভট্টাচার্য)।

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে প্রাণশক্তিসমূহের অধিপতি হচ্ছে বায়ু। ঋক্ বেদের চতুর্থ মণ্ডলে ৪৮ সূক্তে, প্রথম মন্ত্রে বেদের ঋষি বলছেন—

"বিহি হোত্রা অবীতা বিপো ন রায়ো অর্যঃ।
বায়বা চন্দ্রেন রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে।।"

অনুবাদ—"আনন্দের প্রকাশক এবং কর্মকর্তার মতোই আপনি ব্যক্ত করুন অব্যক্ত যজ্ঞীয় শক্তিসমূহ; হে বায়ু, আপনার সুখময় জ্যোতির রথে আরোহণ করে আবির্ভূত হোন, পান করুন সোম আসব" (ঋষি অরবিন্দ কৃত অনুবাদ, বেদরহস্য, উত্তরার্ধ)। সূক্তটির (৪৮) ঋষি—বামদেব, দেবতা—বায়ু। এই সূক্তিটির অন্তর্গত পাঁচটি মন্ত্রের ভাষ্যে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন—"এই সূক্তটিতে বামদেব আমাদের জীবন ও কর্মের যে ভূমি তার নিম্নে অবস্থিত অবচেতনার যে মহাসমুদ্র তার বর্ণনা করেছেন। সেই সমুদ্র থেকে আমাদের সংবেদনময় অস্তিত্বের মধুময় লহরী উঠে আমাদের অসিদ্ধ আনন্দের যে সব বোঝা হতে

আমরা এখনও মুক্ত হতে পারিনি তারাই 'ঘৃত' এবং 'সোম'-এ ভরপুর হয়ে অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোক হতে অবতরণশীল বিশুদ্ধ মানসিক চৈতন্য এবং জ্যোতির্ময় আনন্দে ভরপুর হয়ে অমরতার যে আকাশ তারই দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। মানসিক চেতনার "গুহ্যনাম" হল আনন্দের প্রতীকভূত সোম, যা অমৃতত্বের নাভি, দেবতাদের জগৎ আস্বাদনের জিহ্বা স্বরূপ। কেন না সৃষ্টির সবকিছুই অবচেতনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল দিব্যপুরুষ চতুঃশৃঙ্গ বৃষের দ্বারা, যার চারটি শৃঙ্গ হল অনন্ত অস্তিত্ব (সৎ), চেতনা (চিৎ), আনন্দ এবং সত্য (বিজ্ঞান)। ......তার তিনটি পায়ের পাতা বা তিনটি পা হল তিনটি মানবীয় তত্ত্ব, মানসিকতা, প্রাণের সক্রিয়তা এবং জড়ীয় উপাদান, দুইটি মুণ্ড হল পুরুষ এবং প্রকৃতিগত দ্বিবিধ চেতনা, তার সাতটি হাত হল প্রকৃতির সপ্ততত্ত্বের অনুরূপ সপ্তবিধ সক্রিয়তা। "ত্রিবিধ বন্ধনে বদ্ধ"—মনের দ্বারা বদ্ধ, প্রাণশক্তির দ্বারা বদ্ধ, বদ্ধ দেহের দ্বারা—"বৃষটি উচ্চনাদে নিনাদিত; মর্ত্য মাঝে প্রবিষ্ট হয়েছেন মহান দেবত্ব"। ....। অতঃপর আমরা দেখছি মনের ঈশ্বর ইন্দ্র, আর প্রাণের ঈশ্বর বায়ু পরস্পর সংযুক্ত.....। চিন্তাকে সক্রিয় করবার জন্য মানসিক শক্তির ঈশ্বর ইন্দ্র আর স্নায়বিক অথবা প্রাণিক শক্তির ঈশ্বর বায়ুর মিলিত হবার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁদের আহ্বান জানানো হয়েছে একই রথের আরোহী হিসেবে এসে যৌথভাবে আনন্দের সোমরস পানের জন্য, যা দিব্যায়নের শক্তিসমূহকে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসে। একথা বলা হয়ে থাকে যে বায়ুরই রয়েছে প্রথম চুমুকের অধিকার; কেন না, সহায়ক প্রাণশক্তিসমূহকেই প্রথমে দিব্য সক্রিয়তাজনিত আনন্দের ধারণ-সামর্থ্য পেতে হবে।....সক্রিয় শক্তির প্রতীক হল রথ আর সেই সক্রিয়তা হল ইতিমধ্যেই প্রদীপ্ত প্রাণশক্তির সক্রিয়তা আর তাকেই আবাহন করা হয়েছে বায়ুরূপে" (বেদরহস্য, উত্তরার্ধ, ঋষি অরবিন্দ)।

ঋক্ সংহিতায় বায়ুদেবের উদ্দেশে মাত্র দুটি পূর্ণ সূক্ত আছে, যথা ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডল ১৩৪ সূক্ত, ও চতুর্থ মণ্ডল, ৪৮-সূক্ত—এই দুটি সূক্তে দুই দেবতা (বায়ু ও সোম) এমনভাবে ওতপ্রোত আছেন যে, তাঁদের পৃথক করা কঠিন। এছাড়াও বায়ুর উদ্দেশে কিছু ছড়িয়ে থাকা মন্ত্রও দৃষ্ট হয়। এইসব সূক্তে বায়ুর সাধারণ দেবত্বগুণ ছাড়াও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যগুলি হল—বায়ু 'শ্বেত', বায়ু 'নিয়ুত্বান', বায়ু সোমের 'শুচিপা', এবং 'পূর্বপা'। ঋক্ বেদের সপ্তম মণ্ডলে, ৯০তম সূক্তে, তৃতীয় মন্ত্রে বশিষ্ঠ বায়ুকে বলছেন—'শ্বেতং বসুধিতিং নিরেকে'—"অর্থাৎ তিনি শুভ্র হয়ে জ্যোতি নিহিত করেন শূন্যতায়।" যোগশাস্ত্র বা আচার্য নির্দেশিত প্রাণায়ামের যথাযথ গতাগতি সাধকের চিত্ত বা হৃদয়কে মালিন্যশূন্য বা বাসনাশূন্য করে 'নিরেক' অর্থাৎ ভেতরটাকে একেবারে শূন্য করে দেয়। এই শূন্য হৃদয় বা চিত্তে আত্মবোধের শুভ্র জ্যোতি সমিদ্ধ হয়। এই জ্যোতির ভেতর দিয়ে প্রজ্ঞা বা দিব্যজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হয় বলেই তিনি শুভ্র। প্রাণায়ামরূপ প্রাণবায়ুর সাধনেই এই শুভ্রতার প্রকাশ ঘটে। অনাবিল প্রাণের স্বচ্ছতাতেই বায়ু এই জ্যোতিস্বরূপতা লাভ করে।

'নিয়ুত্বান' বা 'নিয়ুৎ'-এর অর্থ হচ্ছে বৈদিক 'নিঘন্টু' মতে বায়ু বা দেবতাদের বাহন। 'যু' ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে—যার একটি অর্থ যুক্ত করা এবং অন্য আরেকটি অর্থ হচ্ছে বেষ্টন করা। ঋষি অনির্বাণের ভাষায়—"উপসর্গের ব্যঞ্জনাসহ শব্দটির অর্থ তাহলে দাঁড়ায় 'ভিতরের খাত' যা বায়ুকে বেষ্টন করে আছে। এই খাতগুলি আমাদের সুপরিচিত নাড়ী (নালী), যার আসল অর্থ নল। হঠযোগে (এবং আয়ুর্বেদেও) বায়ুর বাহন হল 'নাড়ী'। বেদে অপ্, অগ্নি এবং বায়ু তিনটিই প্রাণের প্রতীক এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনটি যে নাড়ীর ভিতর দিয়ে চলাচল করে—এ অনুভবের সঙ্গে আমরা পরিচিত। নিয়ুত্বান্ মরুদগন এবং ইন্দ্র তারই সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম প্রকাশ।

(বেদ-মীমাংসা, তৃতীয় খণ্ড, অনির্বাণ)।

ঋক্ বেদের সপ্তম মণ্ডলে ৯০ তম সূক্তে, দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে.... "শুচিং সোমং সূচিপাস্তুভ্যং বায়ো।" অর্থাৎ হে বায়ু, হে সোমপায়ী, যে তোমার জন্য শুচি সোম প্রদান করে। বেদে ইন্দ্র যেমন সোমপায়ী বা সোমপানকারীদের মধ্যে অনুত্তম, বায়ুও তেমনি 'সূচিপা বা শুচিপা'। মন্ত্রটিতে আছে, 'শুচিং সোমং সূচিপা'। এই শুচিসোম হল 'পবমান' সোম—অর্থাৎ অগ্নিশোধিত পবিত্র সোমরস। এই সোমরস বিশেষ করে ইন্দ্রের ভাগ বা অংশ। তবু বায়ুই তাকে প্রথমে পান করেন, তাই তিনি 'পূর্বপা'—অর্থাৎ পূর্বে বা আগে সোমপান

করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, মানসিক চেতনার "গুহ্যনাম" হল আনন্দের প্রতীকভূত সোম, যা অমৃতত্বের নাভি,...। মানসিক শক্তির ঈশ্বর ইন্দ্র এবং স্নায়বিক অথবা প্রাণিক শক্তির ঈশ্বর বায়ু।.....তাই বায়ুরই আছে প্রথম সোমপানের অধিকার।" কেন না প্রাণশক্তি সক্রিয় না হলে মনশক্তি বা মানসিক শক্তি সক্রিয় হয় না। মনশক্তি শুদ্ধ হয় যোগের প্রাণায়াম্, সংযম ও তপস্যা দ্বারা। তপস্যার আগুনেই মানসচেতনা দিব্যচেতনা বা সোমচেতনায় রূপান্তরিত হয়। শরীর মনকে শুদ্ধ করা, অন্তরের পশুশক্তিকে দমিত করে দেবশক্তিকে জাগ্রত করা, প্রাণায়ামরূপী বা প্রাণ শক্তিরূপী বায়ুর কাজ। ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোকে যা কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে তা সমস্তই এই বায়ু বা মহাপ্রাণ শক্তির অধীন।

আমার আচার্যদেব শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের ভাষায়—"আকাশরূপী মহাপ্রাণ শক্তি হইতেই বায়ুর উৎপত্তি। সৃষ্টিতে যে প্রাণের খেলা, উহা বায়ুরই বিভূতি। 'বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টে রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'—এই সৃষ্টিতে বায়ুই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বৃষ্টিপ্রাণ ও ব্যষ্টিচেতনায় পরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্ম চেতনায় এই বায়ুই উদ্বুদ্ধ প্রাণের তীব্র সংবেগ। উদ্বুদ্ধ প্রাণই পরমাত্মার স্পর্শ লাভ করে, অমৃতের স্পর্শে অমৃতস্বরূপ হয়ে ওঠে। সুতরাং বায়ুই দিব্যজীবনের প্রতীক।" (ঈশোপনিষদ, মন্ত্রভাষ্য, শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ)।

ঈশোপনিষদ বায়ুদেবতার উদ্দেশে বলেছেন 'অনিলমমৃতম'—অন্ ধাতু হতে অনিল শব্দ নিষ্পন্ন। অন্ ধাতুর অর্থ শ্বাস প্রবাহিত হওয়া। সুতরাং 'অনিলমমৃতং অর্থ প্রবহমান অমৃত। বায়ুর এই অমৃতরূপ প্রত্যক্ষ করেই 'তৈত্তিরীয় উপনিষদের' ঋষি মধুক্ষরা কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো।
ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি।

অনুবাদ—ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু, তোমাকে নমস্কার। হে বায়ু তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই আমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলে ঘোষণা করব। কেননা এই

বিশ্বচরাচর জুড়ে তুমি অদৃশ্যভাবে থাকলেও, তুমি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ঋষির এই ঘোষণা কি আবেগমথিত? নাকি অনুভবী সত্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশ!

মরুত্ দেববৃন্দ

দেবতাতত্ত্ব নিরূপণে 'নিরুক্তে' যাস্কের উক্তি—'দেবতায়া এক আত্মা বহুধাস্তূয়তে' —অর্থাৎ দেবতাগণের এক আত্মা বহুরূপে বহুনামে কীর্তিত হয়েছে। ঋক্ বেদ ও যজুর্বেদে মরুত্গণের বহু গুণগান দৃষ্ট হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতেও মরুত্গণ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। এঁরা ইন্দ্রের সাথী বা সহায়ক। মরুতের সাধারণ অর্থ বায়ু বা বায়ুদেবতা। বেদ-মনীষীদের দৃষ্টিতে মরুত্ বৃষ্টির দেবতা। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে— " প্রাণা বৈ মারুতাঃ"। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে মরুত্ প্রাণশক্তি বা প্রাণবায়ু। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাণকেই মরুত্ ও সুসখা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর অভিপ্রায় সুখে-দুঃখে প্রাণ সর্বদাই আমাদের সাথে থাকে বা আমাদের সঙ্গ দেয়। এই প্রাণশক্তি বা মরুত্গণ সমূহরূপে আমাদের শরীরের মধ্যে থাকে। এরা সংখ্যায় দশ। এর মধ্যে মুখ্য প্রাণ হচ্ছে পাঁচ, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। 'প্রাণবায়ু' হৃদয়ের রক্তসঞ্চালনক্রিয়া সম্পন্ন করে। 'অপান' শরীরের ভেতর থেকে বর্জ্য পদার্থসমূহ বের করে দিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে। 'সমান' নাভিদেশে ব্যাপ্ত থেকে জঠরের ক্রিয়াদি সঞ্চালন করে। 'উদান' এর স্থান কণ্ঠে। এই বায়ু শিরোদেশের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'ব্যান' সারা শরীরে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পাঁচ মুখ্য প্রাণের সঙ্গে পাঁচ উপপ্রাণও আছে, যথা—নাগ, কূর্ম, কৃকল, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এরা শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়া, যথা হাইতোলা, হাঁচি ফেলা ইত্যাদির নিয়ামক। এইরূপে সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্তা প্রাণ। ঋক্ বেদে মরুত্গণের উদ্দেশে তেত্রিশটি সূক্ত দৃষ্ট হয়। মরুত্ বলতে একজন দেবতা নয়, একদল দেবতা বোঝায়। সেই জন্য এঁদের ক্ষেত্রে সর্বদা বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায়।

ঋক্ বেদের অষ্টম মণ্ডল, ২৮ সূক্ত, দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখা যায় এঁরা সংখ্যায় সাতজন। ঋক্ বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৫২ সূক্তে, সপ্তদশ মন্ত্রে দেখা যায়,

এঁরা সংখ্যায় উনপঞ্চাশ জন। আবার ঋক্ বেদের ৮/৯৬/৮ মন্ত্রে তেষট্টিজন মরুতের সংখ্যা পাওয়া যায়। ঋক্ বেদের যুগে এই সংখ্যা সাত ছিল বলেই বেদ-বিদ্‌গণ মনে করেন এবং পৌরাণিক যুগে এই সংখ্যা সাতগুণ সাত অর্থাৎ উনপঞ্চাশে দাঁড়ায়। আবার ঋক্ বেদের ১/১৩৩/৬ মন্ত্রে দেখা যায় এঁদের সংখ্যা একুশ। ঋষি অনির্বাণের মতে লোকভেদে বা স্থানভেদে অথবা ধামভেদে তাঁরা হয়েছেন একুশ বা উনপঞ্চাশ , কখনও বা সাত, কখনও বা তেষট্টি। ঋক্ বেদের অষ্টম মণ্ডলের, ৯৬ সূক্তের, অষ্টম মন্ত্রে দেখা যায়—"ত্রিঃ ষষ্টিস্তা মরুতো বাবৃধানা উস্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ।" অর্থাৎ হে ইন্দ্র ত্রিষষ্টি সংখ্যক মরুত্‌গণ একত্রীভূত গো-সমূহের ন্যায় তোমায় বর্ধিত করেছিলেন বলে যজ্ঞার্হ হয়েছেন, আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট গমন করব।"

ঋষি অনির্বাণ বলেছেন, "তিন ষাট" এখানে বোঝাচ্ছে—একশ আশি এবং তা লক্ষ্য করছে সূর্যের উত্তরায়ণের দিনগুলিকে। তখন আলোর উপচয় (বৃদ্ধি বা সংগ্রহ)। তাইতে মরুতেরা 'বাবৃধানা'।" তাঁর (ঋষি অনির্বাণ) মতে "লোকভেদে অথবা ধামভেদে তাঁরা হয়েছেন একুশ বা উনপঞ্চাশ।"

ঋক্ বেদ ও যজুর্বেদে (ঋক্ বেদ, ৫/৫২/১৭, যজুর্বেদ, ১৭/৮৩) অগ্নিতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন মরুত্‌গণের সংখ্যা উনপঞ্চাশ বলা হয়েছে। ঋক্ বেদ মতে মরুতের উৎপত্তি বিদ্যুৎ (Electricity) থেকে হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে—"সপ্ত সপ্ত হি মারুতা গণাঃ" অর্থাৎ মরুত্‌গণের সংখ্যা উনপঞ্চাশ। ঋক্ বেদে বলা হয়েছে এই দেবগণ অত্যন্ত শক্তিশালী। বেদে দেবতার 'গণ'কে অর্থাৎ দেবতার সমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ। মরুত্‌গণ রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ উভয়গণের সঙ্গে যুক্ত। 'সপ্তমরুত' অর্থাৎ সাতজন মরুতের একটি গণ। 'শতপথ ব্রাহ্মণের' মতে মরুত্‌গণ সপ্তভাগে বিভক্ত। মরুত্ সদা 'গণ' রূপে চলে বা চলতে থাকে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ (Electromagnetic-Radiation) সদাসমূহরূপে থাকে। এদের উর্জা বা শক্তির কিরণসমূহ চলতে থাকে। বৈদিক গ্রন্থ 'তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে' স্পষ্ট বলা হয়েছে—"মরুতোরশ্ময়"। অর্থাৎ মরুত হচ্ছে রশ্মি বা কিরণ। এই কিরণ 'গণ' বা সমূহরূপে চলে। পূর্বেই বলা

হয়েছে ঋক্ বেদ মতে মরুতের জন্ম বিদ্যুৎ (Electricity) হতে। এই তেজময় বিদ্যুৎ-আধার হল সূর্য—এর সাতটি কিরণই সপ্তমরুত্ বা মরুত্‌গণ। মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম মন্ত্রে এই সপ্তমরুত্‌কেই 'সপ্তপ্রাণ' বলা হয়েছে।

যজুর্বেদে বলা হয়েছে মরুত্ ইন্দ্রের সহায়ক এবং পোষক। বৃত্রের সাথে যুদ্ধে মরুত্‌গণ ইন্দ্রকে সহায়তা করেন এবং মরুত্‌গণ ইন্দ্রের সাথে থাকেন। এর অভিপ্রায় হচ্ছে শরীরের মনের মধ্যে নিরন্তর দেবভাব ও অসুরভাবের যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধ আজীবন চলে। এটাই বৃত্র ও ইন্দ্রের লড়াই। শরীরস্থ মনের মধ্যে দুর্বিচার, কুচিন্তা, কুভাবনা, পাপ এবং কুকর্মের ভাবনাই হচ্ছে বৃত্র। মনের সদ্-ভাবনা, সদ্‌বিচার ও সৎকর্মই হচ্ছে ইন্দ্র। মরুত্ দেবগণ হচ্ছে প্রাণবায়ু শরীর ও মনকে উর্জা ও সদ্‌ভাবনা প্রদান করে। প্রাণশক্তির তেজই শরীর ও মনের বৃত্ররূপী অসুরভাবকে নষ্ট করে। জীবাত্মারূপী ইন্দ্রকে এই প্রাণশক্তি সর্বদাই সঙ্গ দেয় বা সাহায্য করে। এই জন্যই মরুত্‌গণ ইন্দ্রের সহায়ক ও পোষক। এই প্রাণশক্তি যদি শরীরের মধ্যে বিকৃত বা কুপিত হয়—তাহলে শরীর রোগগ্রস্ত হয়। এঁদের শুদ্ধতাই শরীরকে নীরোগ রাখে। মরুত্‌গণ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধিরূপী দেবগণের সদা সেবা করে, তাই বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে (ঐতরেয়, কৌষীতকী) মরুত্‌কে সেবক বা প্রজা বলা হয়েছে। শরীর-ইন্দ্রিয়ের স্থান বিশেষে মরুত্‌গণের ক্রিয়া সপ্তভাগে বিভক্ত—তাই এরা সাতজন। ঋক্ বেদের ১/৬৪/১২, মন্ত্রে বলা হয়েছে "রুদ্রস্য সূনুম"—অর্থাৎ মরুত্ রুদ্রগণের পুত্র। রুদ্র অর্থাৎ ঈশ্বর বা পরমাত্মা। অতএব মরুত্—পরমাত্মারই শক্তি। মদীয় আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের মতে "চেতনার সহিত প্রাণের অবিনাভাব সম্বন্ধ। প্রাণ চেতনারই শক্তি বা বিভূতি, সমগ্র সৃষ্টিকে ঋষিরা ৭টি (সাতটি) চেতনার স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন—এই ৭টি চেতনাই সপ্তপ্রাণ। এই সপ্তপ্রাণকে আশ্রয় করিয়াই সপ্তলোকের উদ্ভব। বেদে এই সপ্তপ্রাণকে সপ্তসিন্ধু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ....প্রাণের অপর নাম মরুৎ....যে চেতনার ধারা নীচে নামিয়া আসিয়াছে, মর্ত্যজগতে অবরোহণ করে তাহাই মরুৎ। অগ্নি যাহা উর্ধ্বে গমন

করে। ক্রমাভিব্যক্তির পথে যে চেতনা ঊর্ধ্বে আরোহণ করে তাহাই অগ্নি, ঊর্ধ্ব হইতে যে চেতনাধারা সৃষ্টিতে অবতরণ করে তাহাই মরুত্। এই মরুত্ সপ্ত সপ্ত অর্থাৎ ৪৯। বেদের এই ৪৯ মরুত্কেই পুরাণে আবহ, নিবহ, পরিবহ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে এবং 'গুহাশয়া নিহিতাঃ'—প্রত্যেক জীবদেহেই এই প্রাণ বা চেতনার আধার।....জীব দেহস্থ সপ্তচেতনাকে যোগীরা সপ্তচক্র নামে অভিহিত করেন।... সাধকের ঊর্ধ্বায়নের মূলে রহিয়াছে এই অগ্নি ও মরুত্। সাধকের অন্মোন্নতির আকুতিই অগ্নি। এই আত্মোন্নতি প্রয়াসী সাধকের অন্তরে যে ভাগবৎ দিব্যজ্ঞান, দিব্যচেতনা নামিয়ে আসে তাহাই মরুত্। এই মরুত্ সপ্তচেতনারূপে সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত, এই মরুত্ বা সপ্তচেতনার মায়াই সৃষ্টিতে এবং সমষ্টিতে, পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান।" (উপনিষদ রহস্য মুণ্ডক, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী)।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মরুত্ হচ্ছে Cosmic-Rays (মহাজাগতিক রশ্মি)। ঋক্ বেদের ১/১৬৮/৪, মন্ত্রে বলা হয়েছে এই Cosmic-Rays-এ কোনও ধূলিকণা নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সূর্যের চারিদিকে ধূলিকণাসমূহ থাকে না। কেন না সূর্য আপন তাপশক্তি দ্বারা সব ঘন কণাসমূহকে বাষ্পে পরিণত করে। এই জন্যই ঋক্ বেদে, ৫/৫৩/৬ মন্ত্রে, মরুত্কে মেঘ ও বৃষ্টির দেবতা বলা হয়েছে—অর্থাৎ মরুত্ই মেঘ নির্মাণ করে এবং বৃষ্টি বর্ষণ করে। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' মরুত্কে বর্ষার স্বামী বলা হয়েছে।

প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী প্রফেসর V.G.Rele তাঁর রচিত "The Vedic Goods, as figures of Biology" গ্রন্থে বলেছেন—"মরুত্ হচ্ছে মস্তিষ্কস্থিত জ্ঞানতন্তু (Cerebral sensory nerves)। এই জ্ঞানতন্তু বাহ্য জগত থেকে প্রাপ্ত সংবেদনা বা অনুভূতিসমূহকে জ্ঞানতন্তুর প্রধানকেন্দ্র অগ্নির (Thalamus) কাছে পৌঁছে দেয়। Thalamus হচ্ছে অগ্নি এবং জ্ঞানতন্তুর প্রধানকেন্দ্র।

ঋক্ বেদের ১/৮৫/৭, মন্ত্রে মরুত্কে 'স্বতবস্' (স্বাবলম্বী), 'রঘুপত্বান্' (শীঘ্রগামী), এবং 'মনোজুবেঃ" (মনের গতিদ্বারা চলনশীল) বলা হয়েছে। ওই মন্ত্রে (১/৮৫/৭) এও বলা হয়েছে যে মরুত্ আপন শক্তিতে বৃদ্ধি পায় এবং স্বর্গে নিজস্থান নির্মাণ করে রাখে এবং বিষ্ণু এর রক্ষক। বেদ-মনীষীদের

মতে এর অর্থ হচ্ছে—মরুত্রূপী প্রাণশক্তির কোনও অন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এই প্রাণশক্তি স্বয়ংসেবী, স্বাবলম্বী এবং আপন শক্তিদ্বারা আপনার স্থান সর্বদা উচ্চে রাখে। প্রাণের স্থান দ্যুলোক অর্থাৎ শিরোদেশে বিদ্যমান। শিরোদেশ বা মস্তিষ্কস্থিত এই প্রাণের সংখ্যা সাত। যথা—দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক (ছিদ্রদ্বয়), ও মুখ (এক)। এই সকল অঙ্গসমূহ শিরোদেশেই বিদ্যমান—এই জন্য এদের শীর্ষণ্য বা শীর্ষস্থ প্রাণ বলা হয়। বিষ্ণু অর্থাৎ পরমাত্মা এদের রক্ষক।

বেদানুশীলনে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মরুত্ সংসারের এক মহাশক্তি। এই শক্তি সংসারে বা জগতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মরুত্ই আকাশের বুকে মেঘ নির্মাণ করে,বৃষ্টি বর্ষণ করে, প্রাণীসমূহকে জীবনীশক্তি প্রদান করে। মরুত্ই বুদ্ধিদাতা ও জ্ঞানের জ্যোতি প্রদানকারী।

সূর্য বা সবিতা

'সূ' ধাতু হতে সূর্য শব্দ নিষ্পন্ন। 'সূ' ধাতুর অর্থ প্রসব করা। যিনি সৃষ্টিকে প্রসব করেছেন, যা হতে এই সৃষ্টি উৎপন্ন, তাঁরই নাম সূর্য। 'সূ' ধাতুর আরেকটি অর্থ প্রেরণা দেওয়া বা উদ্বুদ্ধ করা। আত্মস্বরূপলাভের প্রেরণা আমরা এই সূর্যরূপী বিশ্বপিতার কাছ হতেই পাই বা প্রাপ্ত হই। এই বিশ্বপিতার প্রেরণাই আমাদের অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করে। সূর্য সম্পর্কে বেদ-মনীষী অনির্বাণ তাঁর বেদ-মীমাংসা গ্রন্থে বলেছেন—

"একটা সূর্য একটা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, যদি সেই কেন্দ্রের সঙ্গে এক হতে পারি, তাহলে আমিও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হতে পারি। বৈদিক রহস্যবিদ্যার এই হল মূলসূত্র—নিজেকে সৌরশক্তির বিদ্যুৎকূটে রূপান্তরিত করা। " বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে সূর্য বা সবিতাকে অনেক নামে অভিহিত করা হয়েছে। যথা—অগ্নি, প্রজাপতি, বরুণ, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, বায়ু, দিন, মন ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য—গোপথ ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, জৈমিনী উপনিষদ)।

বিশ্বের প্রেরক শক্তিকেই সবিতা বলা হয়। প্রাণশক্তিই হচ্ছে বিশ্বের প্রেরক। যেখানেই প্রাণ সেখানেই ক্রিয়া। প্রাণ তৈজস তত্ত্ব। যেখানেই তেজ সেখানেই

গতি। যেখানে গতি সেখানেই প্রকাশ। এই গতিতত্ত্ব বা প্রকাশতত্ত্বই দেবত্ব বা দেবতা তত্ত্ব নামে কথিত হয়। গতির অপর নাম প্রকাশ। এই জন্যই দেবতত্ত্বকে জ্যোতির্ময় বা জ্যোতিস্বরূপ বলা হয়। গতিই বিশ্বের অমৃতস্বরূপ, প্রেরক ও ধর্তা। যেখানে গতির অভাব সেখানেই মৃত্যু বা বিনাশ। বেদে সবিতার অর্থ সূর্য। সূর্যই জগৎ-সংসারে গতিপ্রেরণা দেয় এবং প্রকাশ করে। এই জন্যেই সূর্যকে সবিতা বলা হয়। ঋক্ যজুঃ ও অথর্ব বেদে বলা হয়েছে—,...“সূর্য আত্মা জগতস্ত স্থুষশ্চ।” অর্থাৎ সূর্যই জগতের আত্মা বা জীবন। প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে—“প্রাণঃ প্রজানা মুদয়ত্যেষ সূর্যঃ”—অর্থাৎ সূর্য সংসারের প্রাণ। সূর্যই জগৎ-সংসারে প্রাণশক্তি, চেতনা ও শক্তির দাতা। অথর্ব বেদ মতে—“ সবিতা প্রসবানাম্ অধিপতি” (অথর্ব বেদ, ৫/২৪/১) অর্থাৎ সবিতা প্রেরণার স্রোত। জগৎ-সংসারে যত শক্তির কার্য আছে তার অধিপতি ও নিয়ন্তা সবিতা বা সূর্য। অথর্ব বেদ অনুযায়ী সূর্যই একমাত্র দেব, অন্য দেবসকল তাঁর প্রতিরূপ। যথা—“স এতি সবিতা, ধাতা, বিধাতা, অর্যমা, বরুণঃ, রুদ্রঃ, মহাদেবঃ, অগ্নিঃ” (অথর্ব বেদ, ১৩/৪/১-১৩)। “অর্থাৎ সূর্যই সবিতা, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, অর্যমা, বরুণ, রুদ্র, মহাদেব ও অগ্নি।”

ঋক্ বেদ ও যজুর্বেদের (ঋক্ বেদ, ১/৫০/১১, অথর্ব বেদ, ৯/৮/১-২২) মন্ত্রে সূর্যকিরণ দ্বারা বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিবরণও দৃষ্ট হয়। যজুর্বেদের মন্ত্রে বলা হয়েছে—“উৎপুনামি পবিত্রেণ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। তেজোঽসি, শুক্রমসি, অমৃতমসি।।” (যজুর্বেদ, ১/৩১)। অর্থাৎ সূর্যের কিরণে পবিত্রতা বিদ্যমান। অপবিত্রকে নাশ করে পবিত্রতা দান করে। সূর্যে অমৃত, তেজ ও শক্তি আছে—এই অমৃত, তেজ ও শক্তির জন্য সূর্যের উপাসনা করা প্রয়োজন।

সাবিত্রী উপনিষদে সবিতা ও সূর্যের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। উপনিষদের (সাবিত্রী উপনিষদ) বক্তব্য অনুযায়ী সবিতা ও সাবিত্রী সংবদ্ধ বা যুগল-শব্দ। যেমন শব্দ এবং অর্থ। যেখানেই শব্দ সেখানেই অর্থ। কিংবা অর্থ যেখানে, শব্দও সেখানে। এইরূপ কিছু যুগল শব্দের উল্লেখ সাবিত্রী উপনিষদে পাওয়া যায়। যথা—

১। “কঃ সবিতা, কা সাবিত্রী, অগ্নিরেব সবিতা,
পৃথিবী সাবিত্রী, তদেকং মিথুনম্।”
২। বায়ুরেব সবিতা, আকাশঃ সাবিত্রী,
যত্র বায়ুস্তদাকাশঃ। যত্র বা আকাশঃ,
তদ্ বায়ু, দ্বে যোনিস্তদেকং মিথুনম্।
৩। আদিত্য এব সবিতা, দ্যৌঃ সাবিত্রী,...।

(সাবিত্রী উপনিষদ, ১,৩,৬)।

উপরে উল্লিখিত উপনিষদ মন্ত্রে কিছু যুগল শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—অগ্নি এবং পৃথিবী, বায়ু ও আকাশ, সূর্য ও দ্যুলোক, মন ও বাক্ ইত্যাদি। যুগল শব্দসমূহের প্রত্যেকটি একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যেমন অগ্নি ও সবিতা এবং পৃথিবী-সাবিত্রী। বায়ু-সবিতা তো আকাশ-সাবিত্রী। যেরূপ অগ্নি ও পৃথিবী, সূর্য ও দ্যুলোক সম্বন্ধযুক্ত সেরূপ শক্তি এবং শক্তির আধারের যুগলবন্দি হয়। এইভাবে সূর্য হয় সবিতা এবং তাঁর শক্তিকে বলে সাবিত্রী, সাবিত্রী বা গায়ত্রী ধ্যানের অভিপ্রায় হচ্ছে—সূর্যের শক্তির ধ্যান করা অথবা ওই শক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা। সৌর উর্জার সাথে একীভূত হওয়াই সাবিত্রীর ধ্যান বা উপাসনা।

বেদ-মনীষীরা বীজ-শক্তিকেই সবিতা নামে অভিহিত করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই বীজশক্তি উদ্বুদ্ধ বা অঙ্কুরিত হচ্ছে—ততক্ষণ পর্যন্ত তা বীজই এবং শক্তির ভাণ্ডারও সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। যখন বীজের কেন্দ্র থেকে শক্তি উদ্বুদ্ধ বা অঙ্কুরিত হয়ে প্রবাহিত বা বিকশিত হয়, তখনই ওই সবিতার শক্তি সাবিত্রী হয়ে যায়। অতএব সাবিত্রী সবিতা বা সূর্যের শক্তির নাম। এই শক্তি গতিশীল হয়ে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে যায়।

বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে গতি কেন্দ্র থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাইরের দিকে যায় এবং পুনরায় আপন কেন্দ্রে ফিরে আসে। বহির্মুখি এবং অন্তর্মুখি এই উভয় ক্রিয়াদ্বারা গতিচক্র পূর্ণ হয়। বিদ্যুৎ ধনকেন্দ্র (Positive) থেকে ঋণকেন্দ্রের (Negative) দিকে চলে এবং পুনরায় ধনকেন্দ্রে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়াকে যজুর্বেদের ভাষায়, শরীরের মধ্যে ‘প্রাণত্-অপ্রাণত্’ বলা হয়। অর্থাৎ শরীরের

মধ্যে ঘটমান প্রাণ ও অপানের (বায়ুদ্বয়) ক্রিয়া। অতএব বেদমতে সূর্যের শক্তি শরীরের মধ্যে প্রাণ-অপানরূপে বিচরণ করে।

সূর্যের শক্তি যা কিরণরূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, তা-ই সাবিত্রী, সাবিত্রী পৃথিবীতে পৌঁছে গায়ত্রী হয়ে যায় এবং পৃথিবী থেকে ওই শক্তি যখন সূর্যে পুনরায় ফিরে যায়—তখন ওই সৌরশক্তিই গায়ত্রীশক্তি নামে অভিহিত হয়। সূর্যে পৌঁছানোর পর ওই শক্তি পুনরায় সাবিত্রীশক্তিতে পরিণত হয়। এইরূপে সাবিত্রী এবং গায়ত্রী পরস্পর সংবদ্ধযুক্ত। এককথায় সবিতা এবং সাবিত্রী একই তত্ত্বের দুই রূপ—অমূর্ত ও মূর্ত। অব্যক্ত ও ব্যক্ত, অনুদ্বুদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ। সবিতা এবং সাবিত্রীর যুগল তত্ত্বকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করাই সাবিত্রীবিদ্যা। সবিতা হচ্ছে প্রাণ—এই প্রাণ ক্রিয়াশীল হয়ে সাবিত্রীরূপে প্রকট বা ব্যক্ত হয়। যজুর্বেদে (১২/৫), মন্ত্রে, সূর্যকে 'গরুত্মান্' (পাখাওয়ালা) সুপর্ণ (পক্ষী, গরুড়) বলা হয়েছে এবং তাঁর বিরাট রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্যকে 'গরুত্মান', 'সুপর্ণ' বলার অভিপ্রায় হচ্ছে সূর্যের দুইপক্ষ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। সূর্যের এই দুই পক্ষ দ্বারাই বর্ষচক্র বা সংবৎসরচক্র সঞ্চালিত হয়। ঋক্ বেদের, ৯/১১৪/৩, মন্ত্রে বলা হয়েছে—"সপ্তদিশো নানা সূর্যাঃ,...দেবা আদিত্যা যে সপ্ত"...অর্থাৎ সূর্য একটি নয়, অনেক। এই মন্ত্রে আমরা জানতে পারি যে সাতটি সৌরমণ্ডল আছে। অথর্ব বেদ মতে (দ্রষ্টব্য অথর্ব বেদ, ১৩/৩/১০) কেন্দ্রীয় সূর্য হচ্ছে কশ্যপ। বাকি সাত সূর্য তাঁর অঙ্গ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১/৭/১), এই সাত সূর্যের নাম দেওয়া আছে। যথা—আরোগ, ভ্রাজ, পটর, পতঙ্গ, স্বর্ণর, জ্যোতিষ্মান ও বিভাস। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে—"সোমেন-আদিত্য বলিনঃ" (অথর্ব বেদ, ১৪/১/২)।

অর্থাৎ সূর্যশক্তির আধার সোমতত্ত্ব। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় হাইড্রোজেন। অন্যদিকে যজুর্বেদের বক্তব্য হচ্ছে—"অপাং রসম্ উদ্‌বয় সং, সূর্যে সন্তং সমাহিতম্।" অর্থাৎ সূর্যে স্থাপিত অন্নের প্রকাশক জলের 'সারভূত' বায়ু আমি গ্রহণ করছি। যজুর্বেদের এই মন্ত্রানুযায়ী সূর্যের মধ্যে দুটি তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথমত—'অপাং রসম্' অর্থাৎ জলের সারভাগ যা উর্জারূপে বিদ্যমান। 'উদ্‌বয়স্' শব্দের অর্থ শক্তির উৎকৃষ্ট রূপ—এই উৎকৃষ্ট রূপটি হচ্ছে গ্যাস

(Gas)। জলের সারভাগ হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস। বেদে হাইড্রোজেন গ্যাসের পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে 'অপাংরসম্'। ওপরে যজুর্বেদের যে মন্ত্রটিতে 'অপাং রসম্'...ইত্যাদি বলা হয়েছে, তা যজুর্বেদের নবম অধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রের প্রথম চরণ, ওই অধ্যায়ের ওই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে বলা হয়েছে— "অপাং রসস্য যো রসস্তং...।।" যজুর্বেদ কথিত সূর্যের মধ্যে স্থিত দুটি তত্ত্বের অন্য তত্ত্বটি মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় তত্ত্বটি হল—'অপাং রসস্য যো রসঃ'—এর অর্থ জলের সারভাগের সারভাগ। জলের সারভাগের গ্যাসীয় রূপ হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের সূক্ষ্মরূপ বা সারভাগ হচ্ছে 'হিলিয়ম' (Helium)। যজুর্বেদের মন্ত্রে হিলিয়ামের জন্য পারিভাষিক শব্দ—'অপাং রসস্য যো রসঃ'-র প্রয়োগ বা ব্যবহার করা হয়েছে। মন্ত্রটিতে—'সূর্য সন্তং সমাহিতম্'-এর দ্বারা স্পষ্ট নির্দেশ করা হয়েছে যে এই দুই তত্ত্বই সূর্যে বিদ্যমান।

ঐতরেয় এবং গোপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে সূর্য না কখনও উদিত হয়, না কখনও অস্ত যায়। অর্থাৎ সূর্যের উদয়-অস্ত বলে কিছু নেই। সূর্য সদাই আপন স্থানে বিরাজমান। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমা করতে থাকে—এর ফলেই দিনের শেষকে সূর্যাস্ত এবং রাত্রির শেষকে সূর্যোদয় বলা হয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এরূপ বলা হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে নয়।

যজুর্বেদের ১৮/৪০, মন্ত্রে বলা হয়েছে, সূর্যের সুষুম্ন নামক কিরণ চন্দ্রকে প্রকাশ দান করে। চন্দ্রের নিজস্ব কিরণ নেই, সূর্যের কিরণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। বৈদিক নিরুক্তকার যাস্কাচার্যও বলেছেন—"সূর্যের কিরণ চন্দ্রকে প্রকাশিত করে।" ঋক্ বেদের (৫/৮৫/৫) একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, বরুণ (Electron) সূর্য হতে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের এক ইলেকট্রনিক অংশ। যজুর্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম মন্ত্রে বলা হয়েছে যে—"অন্তশ্চরতি রোচনাহস্য প্রাণাদপানতী।" অর্থাৎ সূর্যের মধ্যে প্রাণ ও অপান দুই শক্তিই বিদ্যমান আছে। সূর্যের তাপশক্তির রহস্য হচ্ছে—প্রাণ ও অপানের নিরন্তর পরিবর্তন। অর্থাৎ প্রাণ থেকে অপান, অপান থেকে প্রাণ—এই ক্রম সূর্যের মধ্যে নিরন্তর চলতে থাকে। সূর্য একদিকে বিশ্ব-সংসারকে প্রাণশক্তি অর্থাৎ

oxygen দেয় অপরদিকে অপানশক্তি Hydrogen-কে নিজের ইন্ধন করে।

প্রশ্নোপনিষদে ঋষি পিপ্পলাদ শিষ্যদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ষষ্ঠ শ্লোকে বলছেন—

"অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি,
তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে।
যদ্ দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধো, যদূর্ধ্বং, যদন্তরা।
দিশো, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণন্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে।।"

অর্থাৎ সূর্য তাঁর কিরণ জালে সর্বদিক আলোকময় করে তুলেছেন। এই বিশ্বের যখন পূর্বদিকে তিনি, তখন সেই দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। ঠিক তেমনিভাবেই দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিম্ন, উর্ধ্ব ছাড়াও যত দিক আছে, যত বস্তু আছে, তাঁর রশ্মির স্পর্শে সব শুধু প্রত্যক্ষই হয়ে উঠছে না, তাঁর প্রাণশক্তির পরশে সব প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। ওই উপনিষদের (প্রশ্নোপনিষদ) নবম, দশম ও একাদশ মন্ত্রে ঋষি বলেছেন—সূর্যের গতিপথ দুটি। একটি উত্তরাপথ বা উত্তরায়ণ। অপরটি দক্ষিণাপথ বা দক্ষিণায়ন।

গীতার ভাষায়— "শুক্ল কৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যয়া বর্ততে পুনঃ।।
(শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৮ম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক)।

অর্থাৎ, দেবযান ও পিতৃযান, জগতের এই মার্গদ্বয় সনাতন বলে কথিত হয়। দেবযানে গতি হলে মুক্তি লাভ হয় এবং পিতৃযানে গমন করলে পুনরায় দেহধারণ করতে হয়। পিতৃযান মার্গ অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ বা ভোগের পথ। দেবযান মার্গ অর্থাৎ নিবৃত্তি বা ত্যাগের পথ। সহজ কথায় একটি অজ্ঞানের পথ, অন্যটি জ্ঞানের পথ। দেবযানে অর্থাৎ উত্তরায়ণে গমনে জীব মুক্তি পায়, পিতৃযানে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে গমনে জীবের সংসারে প্রত্যাবর্তন হয়। উপরে পূর্বে উল্লিখিত প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ষষ্ঠ শ্লোকটির মূল বক্তব্য—সূর্যই প্রাণশক্তির আধার। সূর্যরশ্মিকে অবলম্বন করেই প্রাণশক্তি দশদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নের পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে—প্রায় অমূর্ত আদিত্য তাঁর প্রকাশ। সুতরাং আদিত্যই সৌরজগতের

প্রাণ—আদিত্যই প্রাণশক্তির মূর্ত প্রতীক। সূর্য সমস্ত কিছুরই আত্মাস্বরূপ। সমস্ত দেবশক্তির সমষ্টি ইনি, ইনিই জীবন্ত প্রাণের উৎসব, কঠোপনিষদে আচার্য যম বলেছেন—

"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্য।।"
(কঠোপনিষদ, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী, ১১ শ্লোক)।

অর্থাৎ, "যেমন সূর্য সমস্ত লোকের চোখ। চক্ষু ইন্দ্রিয়জনিত দোষ সূর্যকে স্পর্শ করে না (ভাবার্থ—চোখের মন্দ বা মলিন দৃষ্টি, সূর্যকে বা সূর্যের কিরণকে মন্দ বা মলিন করতে পারে না)। ঠিক তেমনই সর্বভূতের অন্তরে বাইরে যিনি আছেন সেই এক আত্মা, দুঃখের দ্বারা লিপ্ত হন না, কেননা তিনি বাইরে আছেন অসঙ্গ সম্পৃক্ত হয়ে। অর্থাৎ তিনি বাইরের সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন নির্লিপ্ত হয়ে।"

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সূর্য জড়পিণ্ড নয়—চেতনার সমষ্টি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবী সূর্যেরই ক্ষুদ্রতম অংশ। পৃথিবীতে যে রঙের বৈচিত্র্য তা সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হওয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। ঋষির দৃষ্টিতে চেতনা প্রাণ ও দেহ সমস্ত কিছুই সূর্য থেকে উৎপন্ন। খাদ্যের মধ্যে যে সৌরশক্তি রয়েছে তা গ্রহণ করেই আমাদের প্রাণ শক্তি বাড়ছে। ঘি-দুধের মাঝে সৌরশক্তি বা তেজশক্তির আধিক্য থাকে, এই জন্যই ঘি-দুধ সেবনে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। একথা বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। কেবল দৃক বা চেতনাকে দেখবার উপায় নেই তাই তাকে মেনে নিতে হয়। আমাদের চেতনাকে যখন আমরা স্বীকার করছি তখন সূর্যকে চেতনার সমষ্টি বলে স্বীকার করব না কেন? এই সূর্যই সর্বলোকশ্চ চক্ষুঃ বা বিশ্বতশ্চক্ষু। সূর্যের আলোই দর্শন-শক্তি। সূর্যকে দিনে সকলেই দেখছে তাই তিনি সর্বলোকের চক্ষু।

বেদের অগ্নি এবং সূর্য সৃষ্টির দুই pole বা মেরুস্বরূপ। এক প্রান্ত অগ্নি আর এক প্রান্ত সূর্য। অগ্নি তত্ত্ব থেকে সাধন আরম্ভ করে আমরা সূর্য তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছাব। বৈদিক ঋষির ভাষায়—সৃষ্টিতে যা কিছু রয়েছে, যা কিছু move করছে বা চলছে তার আত্মা সূর্য। সূর্যের মাঝেই সমস্ত কিছু বিধৃত

রয়েছে। এই সূর্যকে অথবা সূর্যাত্মাকে অনুভব করে আমরাও সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠব। বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বলেছেন—"ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি"—সবিতার এই বরেণ্য ভর্গ বা বরেণ্য জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। ঋষির এই সূর্যোপাসনা প্রতীক উপাসনা। বর্তমানে আমরা যেমন মৃন্ময় মূর্তিতে চিন্ময় দেবতার উপাসনা বা আরাধনা করি, বৈদিক যুগে এই আদিত্যকে প্রতীক করে ব্রহ্মোপাসনার বিধি প্রচলিত ছিল। আদিত্যের উদয়ে ব্রহ্মজ্যোতিতে যেন প্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বেদ-পুরাণ মতে অদিতির পুত্র আদিত্য বা সূর্য। বেদ-মনীষীদের মতে অদিতি হল অখণ্ড চেতনা বা অখণ্ড জ্ঞান। এই অদিতি বা অখণ্ড জ্ঞান যাঁদের মাঝে ফুটে ওঠে তাঁরাই দ্যুতিশীল সূর্যদেবতা বা আদিত্য। সুতরাং বেদে সূর্যোপাসনা শুধুমাত্র প্রাকৃত জড় সূর্যের উপাসনা নয়—তদন্তর্গত পুরুষেরই বা পরম ব্রহ্মের উপাসনা। পরমপুরুষের প্রতীকরূপেই বৈদিক ঋষিগণ সূর্যের উপাসনা করেছেন। বেদে সূর্য ও সবিতা। কোনও কোনও বেদ-মনীষীর মতে—সূর্য বাইরের আকাশ এবং সবিতা অন্তরের আকাশ আলোকিত করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর 'যোগদর্শনের' 'বিভূতিপাদে', ২৬ সংখ্যক সূত্রে বলেছেন,—"ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ"—অর্থাৎ সূর্যে মন একাগ্র বা সংযম করলে ভুবনজ্ঞান হয়। সহজ কথায় সূর্যে মনসংযম করলে বিশ্বভুবনের জ্ঞান আমাদের অন্তরলোকে সহজেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একই পরমতত্ত্ব সূর্যরূপে সৌরজগতের অধীশ্বর হয়ে বহির্জগতকে আলোকিত করেন, আবার সবিতারূপে আমাদের সবার অন্তরে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বক্ষণকে সবিতা আখ্যায় অভিহিত করেছেন। সকল প্রাণীকে জ্ঞানের প্রেরণা যোগান এই সবিতাদেব।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"আদিত্যো বা অস্তং গচ্ছন্ অগ্নৌ অনুপ্রতিশতি"— অর্থাৎ আদিত্য অস্তগমনকালে অগ্নিতে তাঁর তেজ নিহিত বা স্থাপিত করে যান। অতএব অগ্নিও আদিত্যেরই রূপ বিশেষ।

ঋক্ বেদে ১৩টি সূক্ত সূর্যদেবতার উদ্দেশে পাওয়া যায়। এছাড়াও ওই বেদের অন্য সূক্তে যথা পঞ্চম মণ্ডলের চল্লিশ সংখ্যক সূক্তে ইন্দ্র ও সূর্যের

একযোগে স্তুতি করা হয়েছে এরূপ দৃষ্ট হয়। সূর্যের বহু মুখ স্তুতি ঋক্ বেদে দেখা যায়। সূর্যের শীতল এবং প্রখর তাপ উভয়ই মানুষ ও পৃথিবীর পক্ষে হিতকর। চন্দ্রের যে জ্যোৎস্না রাত্রিতে পৃথিবীকে শীতল করে—তা সূর্যেরই আলো। সূর্যের প্রখর তাপ শস্যাদি উৎপাদনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ঋক্ বেদের, ৮/১০১/১১-১২, মন্ত্রে ভৃগুগোত্রীয় ঋষি জমদগ্নি বলেছেন—"হে সূর্য তুমি সত্যই মহান। হে আদিত্য! তুমি মহান একথা সত্য। তুমি মহান, তোমার মহিমা স্তুত হচ্ছে,....হে সূর্য! তুমি শ্রবণে মহান একথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহিমায় মহান, একথা সত্য।....তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনীয়।"

সোম

বেদে সোমের অনেক প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়। ঋক্ বেদের সমগ্র নবম মণ্ডল, যার সূক্ত সংখ্যা ১১৪ এবং মন্ত্রসংখ্যা ১১০৮, সূক্তের মন্ত্রগুলি পবমান (পরিশুদ্ধ) সোমের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এই মণ্ডলে (নবম) সোমের দিব্য স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সোম সামান্য সোমরস বা আধুনিক ভাষায় মদ বা মদিরা নয়। বিশ্বব্যাপী যে জীবনীশক্তি বা প্রাণতত্ত্ব সদা ক্রিয়াশীল, তা-ই সোম। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে সোমরূপী জীবনীশক্তি বা প্রাণতত্ত্ব বিদ্যমান। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে—

"দ্বয়ং বা ইদং ন তৃতীয় মাস্তে। আর্দ্রং চৈব শুষ্কং চ।
যৎ শুষ্কং তৎ আগ্নেয়ম্, যদ্ আর্দ্রং তত্ সৌম্যম্"।।

অর্থাৎ, সংসারে দু-প্রকারের পদার্থ বিদ্যমান। তৃতীয় প্রকারের কোনও পদার্থই এই সংসারে নেই। এই দু-প্রকারের পদার্থ হল—শুষ্ক ও আর্দ্র। যা শুষ্ক তা আগ্নেয় বা অগ্নিতত্ত্বযুক্ত। যা সিক্ত বা আর্দ্র, তা সৌম্য বা সোমতত্ত্ব।

বৃহৎ জাবাল উপনিষদে বলা হয়েছে—"অগ্নীষোমাত্মকং বিশ্বম্"—অর্থাৎ এই সারা জগৎ বা সংসার অগ্নি এবং সোমতত্ত্বের সংযোগে নির্মিত হয়েছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' আরও বলা হয়েছে যে, সূর্য আগ্নেয়তত্ত্ব এবং চন্দ্র সোমতত্ত্ব। দিন আগ্নেয় এবং রাত্রি সৌমীয় বা সোমতত্ত্ব। এই দুই তত্ত্বই সৃষ্টির মূল।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎপত্তি পরমাণু থেকে। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে তিনটি তত্ত্ব বিদ্যমান—ধনাত্মক (positive), ঋণাত্মক (Negative), ও উদাসীন বা Neutral। এগুলির মধ্যে ধনাত্মক তত্ত্ব অগ্নি, ঋণাত্মক তত্ত্ব সোম, যার আর এক নাম রসতত্ত্ব বা জলীয় তত্ত্ব, এবং উদাসীন বা Neutral তত্ত্ব হচ্ছে শূন্য। এগুলিকেই বিজ্ঞানের ভাষায় যথাক্রমে—Proton, Electron ও Neutron নামে অভিহিত করা হয়। এগুলির দ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 'শতপথ ও তাণ্ড্য' ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে—"প্রাণঃ সোমঃ।" "প্রাণোহি সোমঃ।" অর্থাৎ প্রাণই হচ্ছে সোম। প্রাণ জীবনের শক্তি। প্রাণের সত্তাই মানবকে জীবিত রাখে। শরীর থেকে প্রাণ নির্গত হলে শরীরের মৃত্যু হয়। শরীরে সোমরস বা প্রাণই জীবনীশক্তি দান করে—এইজন্য সোমকে প্রাণ বলা হয়।

'তাণ্ড্য, কৌষীতকী ও তৈত্তিরীয়' ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে—"শুক্র সোমঃ"। "রেতঃ সোমঃ"। "সোমো বৈ বাজপেয়।" অর্থাৎ বীর্য বা রেতকেই সোম বলা হয়। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে বীর্যকে রক্ষা করাই সোম পান। বীর্য বা রেতকে নষ্ট বা ক্ষয় হতে রক্ষা করাকেই 'বাজপেয়' বলা হয়। 'বাজ' অর্থাৎ বীর্য বা রেত, 'পেয়' অর্থাৎ পান করা। বীর্য বা রেতকে রক্ষা বা ধারণ করে প্রাণায়ামের দ্বারা উপর মস্তিষ্কে নিয়ে যাওয়াই সাধকের সোমপান। এইভাবে যিনি বীর্যপান করেন তাঁকে 'বাজপেয়ী' বলা হয়।

ঋক্ বেদে বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, ঋক্ বেদ, ৯/৬৩/২৭), "পবমানো দিবস্পরি অন্তরিক্ষাদসৃক্ষত। পৃথিব্যা অধি সানবি।।" অর্থাৎ এই সোম স্বর্গ থেকে অন্তরিক্ষে, অন্তরিক্ষ থেকে পৃথিবীতে এসেছে। এর অভিপ্রায় বা তাৎপর্য হচ্ছে এই সোমরস যা মস্তিষ্করূপী স্বর্গ বা দ্যুলোকে সঞ্চিত থাকে, তা শরীরের অন্তরিক্ষ অর্থাৎ মধ্যভাগকে পবিত্র করে। মেরুদণ্ডরূপী (spinal column) পৃথিবীকে পবিত্র করে।

শরীরের শিরোভাগ (Cerebrum) দ্যুলোক বা স্বর্গ। Medulla oblongata অর্থাৎ গর্দানের উপরিভাগ অন্তরিক্ষ এবং মেরুদণ্ড বা কেন্দ্রীয় নাড়ীজাল হচ্ছে পৃথিবী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সোম কী তা পূর্বে ইন্দ্রদেবতা বিষয়ক অধ্যায়ে

বলা হয়েছে। এখন অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম কী তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

সূক্ত সংখ্যার বিচারে ঋক্ বেদে ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবতার পরেই সোমদেবতার স্থান। এর অর্থ বৈদিক দেবতাদের মধ্যে সোম অন্যতম প্রধান দেবতা। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সবকিছুই দেবতার রূপ। বেদ-উপনিষদে সর্বত্র শান্তির জন্য প্রার্থনা দেখা যায়।

এই প্রার্থনার ভাষা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে বৈদিক সমাজ ছিল শান্তিপ্রিয় সমাজ। দেবতার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করাই ছিল ঋষির সাধনা। নশ্বর জীবনের সীমিত পরিধির বিষয়ে ঋষি ছিলেন সজাগ, তাই অমরত্বের জন্য তাঁর প্রার্থনা ছিল স্বাভাবিক। জ্যোতিস্বরূপ পরমদেবতাকে বা অমরত্বকে পাওয়ার সাধন করেছেন ঋষি।

অমৃতের সন্ধানে ঋষি-হৃদয় ডুব দিয়েছে ধ্যানের গভীরে। ধ্যানের তন্ময়তায় সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞায় তিনি খুঁজে পেয়েছেন সেই আনন্দস্বরূপকে—যা ছিল তাঁরই হৃদয়ের গভীরে, প্রকাশের অপেক্ষায়। নিজের ভেতরে দেবতাকে আনন্দরূপে পেয়ে তিনি উল্লাসে মত্ত হয়েছেন। বেদের ভাষায় আনন্দই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই রস, "রস বৈ সঃ"। আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই ঋষির সাধনার সিদ্ধি সোমদেব। ওই আনন্দ ব্রহ্ম থেকে জ্যোতিধারার ন্যায় যে রস সর্বদা নির্গত হচ্ছে—তা-ই সোমরস। ঋষি ওই সোমরস পান করেন। আনন্দময় ব্রহ্মই বৈদিক ঋষির ভাবনায় সোমদেব—এবং আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে যে রস বা সুধা ক্ষরিত হয়—তা-ই সোমরস। ঋষি ওই সোমরস পান করেন। আনন্দময় ব্রহ্মই বৈদিক ঋষির ভাবনায় সোমদেব—এবং আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে যে রস বা সুধা ক্ষরিত হয়—তাই সোমরস। দেহ-প্রাণ রূপ দুই প্রস্তরের পেষণে, কিংবা বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়রূপ দুই প্রস্তরের পেষণে, সংযম তপস্যার ছাঁকনিতে যে বাসনা পরিশুদ্ধ হয়ে উপাসনায় রূপান্তরিত হয়ে হৃদয়পাত্রে দিব্যরসরূপে সঞ্চিত হয়েছে সেই রসরূপী সোম বা অমৃত পান করে ঋষি আনন্দে মাতোয়ারা। বৈদিক যুগে সোমযাগকে বলা হতো শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ—এই যজ্ঞানুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল অমৃত লাভ। অমৃত যেমন অমরত্ব প্রদান করে, তেমনি আনন্দও অমরত্ব

প্রদানকারী। পার্থিব দৃষ্টিতে সোম একটি লতা। বিশেষ এক পদ্ধতির সাহায্যে ওই লতা থেকে সোমরস নিষ্কাশন করা হতো এবং যজ্ঞে দেবতাকে আহুতি দেওয়া হতো। এই সোমরস পান করে ঋষিরা আনন্দ লাভ করতেন। এখন দেখা যাক ওই সোম নামক লতাটি কী? বেদে বলা হয়েছে ওই লতাটি পাওয়া ছিল দুর্লভ। আমাদের দেহে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত নাড়ীকে বলা হয় সুষুম্না নাড়ী। যোগশাস্ত্রে এবং বেদে এই নাড়ীকে ব্রহ্মনাড়ীও বলা হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে সোমযাগে সোমরস আহুতি দেওয়া হতো। সুষুম্না নাড়ী হচ্ছে 'সোমলতা'। প্রাণায়ামের সাহায্যে ওই নাড়ীপথে প্রাণবায়ু বা প্রাণের রসকে (সোম) সহস্রারে অর্থাৎ মস্তিষ্কে নিয়ে যাওয়া হয়— সহস্রারের মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র আছে, যাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলা হয়। সুষুম্না নাড়ীপথে প্রাণবায়ু বা প্রাণের রস ব্রহ্মরন্ধ্রে এসে পবমান অর্থাৎ পরিশুদ্ধ হয়। এই পরিশুদ্ধ প্রাণের রসই সুষুম্নারূপী সোমলতার রস। সহস্রার পরমাত্মার নিবাসস্থল। জ্যোতিরূপে তিনি এখানে বিরাজ করেন। তাঁর জ্যোতির্ময় অঙ্গ থেকে সব সময়ই সুধা বা অমৃত ক্ষরণ হচ্ছে—প্রাণের রস সুষুম্নানাড়ীপথে এসে এই রসের সাথে মিলিত হয় এবং দিব্যরসে পরিণত হয়। যোগী বা সাধক খেচরীমুদ্রা যোগে ওই রস পান করে আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠেন। যৌগিক দৃষ্টিতে এই হল সোমরস ও সোমলতা এবং সোমদেবের পরিচয়।

জীবনে আমরা সকলেই আনন্দ চাই। আমরা কেউই দুঃখ কষ্টে থাকতে চাই না। এর কারণ কী? আমাদের অন্তরে বা হৃদয়ে একটি আনন্দরসের প্রবাহ আছে। আনন্দরসের এই প্রবাহই সোম। আনন্দরসের এই প্রবাহ অনেকটা নদীর মতো। এখানেও জোয়ার ভাটা আছে—অর্থাৎ উত্থান ও পতন আছে। যখন এই আনন্দরসের স্রোত ভাটার টানে নিচে নেমে যায় তখন মানুষ পার্থিব অনিত্য ইন্দ্রিয়ভোগে মত্ত হয়ে উঠে—এটাই আনন্দরসকে কারণরস বা মদিরারসে পরিণত করে পান করার অবস্থা। আবার এই আনন্দরসের ধারা যখন ঊর্ধ্বগামী হয় তখন তা আমাদের মন বুদ্ধি হৃদয়কে উল্লাসিত করে দিব্য চেতনার ভূমিতে বা অমৃত চেতনার ভূমিতে নিয়ে যায়। যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রের দৃষ্টিতে নিম্নগামী প্রবাহের স্থান মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত মূলাধার চক্রে এবং

ঊর্ধ্বগামী চেতনা প্রবাহের স্থান মস্তিষ্কস্থিত সহস্রার চক্রে। ঊর্ধ্বগামী চেতনা যখন পরমচেতনার ভূমিতে আরোহণ করে আনন্দময় ব্রহ্মের সাথে একাত্মতা অনুভব করে, তখন এই অনুভবজনিত আনন্দরসের আস্বাদনই হয় সোমপান। জীবাত্মারূপী ইন্দ্র এই সোমপানে সদাই মত্ত থাকেন। জীবাত্মারূপী ইন্দ্রের কাছে তখন সোমই হয় প্রিয় পেয়। বেদে ইন্দ্রকে তাই বলা হয়েছে সোমপায়ী। আমাদের জীবনে যে দেহগত সুখ তা সোমের প্রাকৃতরূপ। এই প্রাকৃত বা স্থূল দেহ-ইন্দ্রিয়জ সুখকে সাধনা ও নিষ্ঠারূপী দুই পাথরে পেষণ করে শ্রদ্ধারূপ ছাঁকনিতে ছেঁকে জীবনরূপ পাত্রে রেখে পান করতে হবে। প্রাকৃত বা স্থূল সুখভোগকে দিব্য আত্মিক আনন্দযোগে রূপান্তরিত করতে হবে—বৈদিক ঋষির সোমযাগ অন্তে এটাই হল সোমপান।

আমার আচার্যদেব শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ তাঁর কেনোপনিষদের ভাষ্যে বলেছেন—"শ্রৌত কর্মের মাঝে শ্রেষ্ঠ সোমযাগ। সেখানে অগ্নি ও সোমকে মিলিয়ে দিতে হবে। অগ্নি আমাদের আধারে, সোম সূর্যের ওপারে। বিশ্বচেতনার ওপারে যে আনন্দ চেতনা তা-ই সোম। সূর্য যদি বিজ্ঞান তাহলে তার ঊর্ধ্বে যে আনন্দ তা-ই সোম।...দেহের চেতনাকে এই সোমচেতনাতে অনুপ্রবিষ্ট করা সোমযাগের লক্ষ্য—এটাই শ্রৌতকর্ম।" আবার মুণ্ডক উপনিষদের ভাষ্যে তিনি (আচার্যদেব) বলেছেন—"যজ্ঞার্থে দেবতাকে উৎসর্গীকৃত সোমলতার রস যিনি পান করিয়াছেন তিনিই সৌম্য। সোম শব্দের অন্য অর্থ অমৃত, চন্দ্র প্রভৃতি। মন যখন শুদ্ধসত্ত্ব হয়, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়; যোগীদের ভাষায় মন যখন বিশুদ্ধ চক্রে, আজ্ঞাচক্রে আরোহণ করে তখন দেহের মাঝে সর্বদাই এক অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক হইতে এই আনন্দ ক্ষরিত হইয়া সর্বশরীরকে যেন প্লাবিত করে। ধ্যানী, ধ্যানের গভীরতায় সর্বদাই নিজের ভিতরে এই আনন্দ অনুভব করেন। ...ভাগবৎ সত্তার দিব্য আনন্দ বা অমৃতরসই সোম। তাঁহার এই আনন্দ বা অমৃতধারা আমাদের জীবনেও নামাইয়া আনিতে হইবে। 'অপাম্ সোমম্ অমৃতা অভূম'—এই অমৃত পান করিয়া আমরাও অমর হইব। আমাদের মর্ত্যজীবনকেও দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করিয়া আমরা সেই ভূমার মাঝে বৃহতের মাঝে প্রতিষ্ঠিত

হইব। আমাদের অন্তর সত্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে। ...অমূর্ত পুরুষের স্বীয় শক্তি বা প্রকৃতিতে আত্মাহুতিই এই সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টিতেও মূলের এই আত্মাহুতি বা যজ্ঞের আদর্শ বিদ্যমান। সূর্যের আত্মবিচ্ছুরণ বা আত্মাহুতিই এই জগৎসূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন যেন তাঁহার সংবাৎসরিক যজ্ঞ। অব্যক্ত পৃথিবী সূর্যের এই যজ্ঞের ফলেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই যে যজ্ঞকর্তা যজমান তাহার উৎপত্তির মূলেও যজ্ঞ। পিতার আত্মাহুতিই সন্তানের উৎপত্তির কারণ, এই যে সপ্তলোক তাহাও এই আত্মবিচ্ছুরণ বা যজ্ঞের ফলেই উৎপত্তি। 'সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ।' এই সুপবিত্র সোম বা দিব্যচেতনা, এই সুপবিত্র সূর্য বা দিব্যশক্তিই সৃষ্টির মূলে। এই চেতনা ও শক্তির, এই পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন বা আত্মাহুতিই এই জীবজগৎ।"

বরুণ

বৈদিক দেবমণ্ডলীর মধ্যে বরুণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। একে জল ও সমুদ্রের দেবতাও বলা হয়। ঋক্ বেদে দ্বাদশটি সূক্তে বরুণের আহ্বান করা হয়েছে। ঋক্ বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের, ৯টি মন্ত্রের দেবতা বরুণ এবং ওই মণ্ডলের ৪২ সূক্তের তিনটি মন্ত্রও বরুণ দেবতার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। বেদে বরুণ বৃহতের দেবতা। 'বৃ' ধাতু থেকে বরুণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'বৃ' ধাতুর অর্থ বেষ্টন করা। তিনি (বরুণ) আছেন সবকিছু বেষ্টন করে। সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক তার উর্ধ্বে মহাকাশ—এই সব কিছু ব্যাপ্ত করে তিনি বিরাজমান। বেদমন্ত্রে বরুণকে—"অসীৎ ভুবনানি সম্রাট" অর্থাৎ সমস্ত ভুবনের সম্রাট বলা হয়েছে। তিনি শুধু সম্রাটই নন, তিনি "অমৃতস্য গোপাম" অর্থাৎ অমৃতের রক্ষকও। বেদে ইনি মিত্র নামক দেবতার সহচর। এই জন্য 'মিত্রাবরুণৌ' দ্বন্দ্ব সমাসাত্মক পদে উভয় দেবতার উল্লেখ বেদে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সূর্যের দুটিরূপ—একটি মিত্র অপরটি বরুণ। দিবালোকের সূর্যের নাম মিত্র এবং রাত্রিবেলার সূর্যের নাম বরুণ। নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন—"আবৃনোতি সতঃ পদার্থান ইতিবরুণঃ"—অর্থাৎ যিনি সমস্ত পদার্থকে আবৃত করে ব্যাপ্ত থাকেন তিনিই

বরুণ। সূর্যের উদয় অস্ত নেই—রাত্রি ও দিন উভয়কালেই সূর্য বিরাজ করে, এই সত্য বৈদিক ঋষিরা জানতেন। বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে যথা,—ঐতরেয়, 'কৌষীতকী' ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বেদে বরুণ নিয়ম-শৃঙ্খলার অধিপতি রূপে বর্ণিত। তাঁরই নিয়ন্ত্রণে বা শাসনে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি স্বীয় কক্ষপথে আবর্তন করছে। বিশ্বের ঋত বা নিয়ম-শৃঙ্খলার তিনি অধিপতি। তাই তাঁকে 'ধৃতব্রত', 'ধর্মপতি' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। অথর্ব বেদের পঞ্চম কাণ্ডের, ১১ সংখ্যক সূক্তে, বরুণ ও অথর্বা ঋষির একটি সংবাদ দৃষ্ট হয়। সংবাদের বিবরণে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বরুণ অথর্বা ঋষিকে একটি রং-বেরঙের বা বিচিত্রবর্ণের গাভী দক্ষিণারূপে দান করেন। পরে বরুণদেব অথর্বা ঋষিকে ওই গাভী ফেরৎ দিতে বলেন। ঋষি অথর্বা বরুণকে বলেন, "দক্ষিণার বস্তু ফেরৎ হয় না।" বরুণ বলেন—ওই গাভী যোগ্য ব্যক্তি বা যোগ্য অধিকারী রক্ষা করতে সমর্থ। উত্তরে অথর্বা বলেন—"এই গাভী রক্ষা করার যোগ্য ও অধিকারী ব্যক্তি আমি—অতএব ফেরৎ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।"

বেদের এই পৃশ্নিবর্ণের বা বিচিত্রবর্ণের গাভীটি কী? যা বরুণদেব অথর্বা ঋষিকে দান করেছিলেন। প্রকৃতিই এই গাভী। গাভীটি পৃশ্নিবর্ণের বা বিচিত্র বর্ণের—অর্থাৎ প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক বা বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, প্রকৃতি সত্ত্বগুণের কারণে শ্বেতবর্ণা, রজোগুণের কারণে রক্ত বা লালবর্ণা এবং তমোগুণের কারণে কৃষ্ণ বা কালোবর্ণা বিশিষ্ট। শ্বেত বা সাদা, রক্ত বা লাল এবং কৃষ্ণ বা কালো রঙের কারণেই প্রকৃতিরূপা গাভী পৃশ্নিবর্ণা বা বিচিত্রবর্ণা।

প্রকৃতিরূপা এই ত্রিবর্ণা বিশিষ্ট গাভী দানরূপে পাওয়ার সে-ই যোগ্য অধিকারী যিনি বরুণদেবের তিনটি শর্ত পালনে সমর্থ। বরুণদেবের তিনটি শর্ত বেদানুযায়ী —প্রথমত, তাঁকে 'জাতবেদস্' হতে হবে—অর্থাৎ স্বাভাবিক বোধজ্ঞান সম্পন্ন। যিনি জ্ঞানী, কর্তব্য-অকর্তব্যের বোধ যাঁর আছে, এরূপ বিবেকী পুরুষ বা সাধকই ওই গাভী রাখার যোগ্য অধিকারী। দ্বিতীয়ত, তাঁকে কবি বা ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ দূরদর্শী হতে হবে।

তৃতীয়ত, তাঁকে ঋতমার্গ বা সত্যমার্গের অবলম্বনকারী হতে হবে। তাঁর হৃদয়ে দান, দয়া ও পরোপকারের ভাবনা সদাই সক্রিয় হয়ে বিদ্যমান থাকবে। এরূপ ব্যক্তি বা সাধকই প্রকৃতিরূপা বিচিত্রবর্ণা ওই গাভী রাখার যোগ্য অধিকারী। বরুণের গাভী অর্থাৎ প্রকৃতির সুখ সে-ই লাভ করতে সমর্থ হয় যে নিষ্কপটভাবে প্রকৃতিরূপা গাভী মাতার সেবা করে। যিনি সত্যপথে চলেন, অনাসক্তভাবে প্রকৃতির সম্পদ উপভোগ করেন। জ্ঞানী, তপস্বী, পরহিতব্রতী ব্যক্তিই বরুণের প্রদত্ত গাভীর সুখ উপভোগ করতে সমর্থ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বরুণ মিত্রদেবতার সহচর। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে এই দুই দেবশক্তি একই তত্ত্বের পরস্পর বিরোধীগুণ যুক্ত রূপ। (দ্রষ্টব্য—তৈত্তিরীয়, শতপথ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ)। অর্থাৎ একজন ধনাত্মক শক্তি ও অন্যজন ঋণাত্মক শক্তি। দুইয়ের মিলনে এক সমন্বিতরূপ নির্মিত হয়। যতক্ষণ না এই দুই দেবতার মিলন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টিতে ঊর্জা বা শক্তি সঞ্চারিত হয় না। একজনের কার্য হচ্ছে প্রেরণা বা শক্তির যোগান দেওয়া—অন্যজনের কার্য হচ্ছে মল, বিক্ষেপ তথা অপশিষ্ট তত্ত্ব অথবা বর্জ্য পদার্থ সমূহকে নিষ্কাশন করে দেওয়া। মিত্র ও বরুণের সংঘর্ষেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং তা জগৎ জীবের কাজে লাগে।

'শতপথ' ও তৈত্তিরীয়' ব্রাহ্মণ গ্রন্থ মতে—"প্রাণো বৈ মিত্র অপানো বরুণঃ।।" (শতপথ ব্রাহ্মণ,৮/৪/২/৬)। "প্রাণাপানৌ মিত্রবরুণৌ"। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩/৩/৬৯)। অর্থাৎ মিত্র ও বরুণ হচ্ছে প্রাণ ও অপান। শরীরে প্রাণ মিত্ররূপে শক্তি সঞ্চার করে। অপান বরুণরূপে শরীরকে শোধন বা পবিত্র করে তথা শরীর হতে বর্জ্য পদার্থ সমূহ বের করে দেয়। কালের দৃষ্টিতে দিন মিত্র এবং রাত্রি বরুণ। আবার প্রতিমাসে শুক্লপক্ষ মিত্র এবং কৃষ্ণপক্ষ বরুণ। উত্তরায়ণ মিত্র এবং দক্ষিণায়ন বরুণ। বৈদিক ঋষিরা এইরূপে প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে বরুণ ও মিত্রের বিভাজন করেছেন। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' মতে মিত্র আগ্নের শক্তি, বিজ্ঞান দৃষ্টিতে এই আগ্নের তত্ত্বই ধনাত্মক শক্তি। বরুণ সোমতত্ত্ব, বিজ্ঞান দৃষ্টিতে ঋণাত্মক শক্তি। সূর্যের ধনাত্মক শক্তিকে বেদের ভাষায় 'মিত্রমহ' অর্থাৎ মিত্রশক্তি বা মিত্রশক্তির অধিকারী বলা হয়। সূর্য যখন সন্ধ্যায় অস্ত যায়

তখন তা ঋণাত্মক শক্তি বরুণে পরিণত হয়। এইরূপে একই তত্ত্ব সূর্যের বিভিন্ন রূপকে কখনও মিত্র, কখনও বা বরুণ বলা হয়। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' মতে মিত্র দিনের দেবতা, বরুণ রাত্রির দেবতা।

বরুণ সোম বা জলীয় তত্ত্ব। বরুণকে বেদে বলা হয়েছে সমস্ত ভুবনের সম্রাট। এর তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় হচ্ছে জগতের সত্তর ভাগ (৭০) জল এবং শরীরেও শতকরা ৭০ ভাগ (সত্তর) জল ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই জল বা রসই বরুণের সাম্রাজ্য। অর্থাৎ যেখানে যেখানে জলীয় বা রসতত্ত্ব বিদ্যমান—সেখানেই বরুণের সাম্রাজ্য। জগতে সর্বত্রই রস বা জলীয় তত্ত্ব অধিকমাত্রায় বিদ্যমান, এই জন্যেই বরুণ সমস্ত ভুবনের সম্রাট রূপে বেদে কথিত হয়েছে।

Dr. V. G. Rele তাঁর রচিত "The Vedic Gods, as figures of biology" গ্রন্থে মিত্র ও বরুণের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, মিত্র হচ্ছে জ্ঞানতন্তু (Sensory nerves, Afferent) এবং বরুণ হচ্ছে ক্রিয়াতন্তু (Motor Nerves, Efferent)। বরুণের বিষয়ে বেদে বলা হয়েছে, বরুণ দ্যুলোক এবং ভূলোক উভয়স্থানেই বিদ্যমান। এর তাৎপর্য নিরূপণে ডাঃ রেলে (V.G.Rele) বলেছেন যে, শিরো-মেরু-দ্রব (cerebro-spinal fluid) মস্তিষ্কের ভেতরের অংশেও বিদ্যমান এবং মেরুদণ্ডেও বিদ্যমান। ডঃ রেলের ভাষায় ওই শিরো-মেরু-দ্রবই বরুণ। এই বরুণদেবের উপস্থিতিতেই আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় আর্দ্র ও সক্রিয় থাকে। এই শিরো-দ্রব বা রসই শিরোদেশের সমস্ত জ্ঞানতন্তুকে সিঞ্চন করে। এর ফলেই মস্তিষ্কদেশে চিন্তা-খনন, স্মরণ ইত্যাদির ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই দ্রব বা রস মস্তিষ্ক থেকে প্রবাহিত হয়ে মেরুদণ্ডের নিচের ভাগ পর্যন্ত গমন করে। বেদে বলা হয়েছে বরুণ দ্যুলোক থেকে বর্ষণ করে এবং এই বর্ষণের দ্বারা ভূলোককে সিঞ্চন করে। এর তাৎপর্য্য হচ্ছে শিরো-মেরু-দ্রব বা রস মস্তিষ্কের উপরিভাগ অর্থাৎ দ্যুলোক থেকে মেরুদণ্ড অর্থাৎ ভূলোকে সিঞ্চন করে। মস্তিষ্কের উপরিভাগে যে শিরো-দ্রব বা রসরূপী বরুণ বিদ্যমান, ওই বরুণই আভ্যন্তরিক চাপের কারণে ক্রিয়াতন্তু সমূহকে (Motor nerves, Efferent) প্রভাবিত করে। এর ফলেই মাংসপেশী এবং শরীরের Tissues আদি প্রভাবিত হয়।

বেদে বলা হয়েছে যে বরুণ ও মিত্র এরা নিজেদের দুত দ্বারা সব কার্য সম্পন্ন করে। বরুণ ও মিত্রের দুতগণের সাধারণ নাম আদিত্য বলা হয়েছে। এরা সংখ্যায় দ্বাদশ। এই দ্বাদশ বা বারো সংখ্যা বস্তুত জ্ঞান ও ক্রিয়া তন্তুর দ্বাদশকেন্দ্র। জ্ঞানতন্তু এবং ক্রিয়াতন্তু সারা শরীরে ব্যাপ্ত বা ছড়িয়ে আছে। এই দূতগণের দ্বারা সব খবর প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত হন। বেদে বলা হয়েছে, বরুণ তাঁর দুত মারফৎ সব খবর প্রাপ্ত হন—এটাই তাঁর রহস্য।

ঋক্ বেদের ৮/৬৯/১২, মন্ত্রে বলা হয়েছে যে বরুণের সাত সিন্ধু (নদী) আছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সাতসিন্ধু বা নদী হল—দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কান ও জিহ্বা। শিরো-মেরু-দ্রব থেকে এরা রসপ্রাপ্ত হয়। এই রসের অভাবে চোখ-কান-নাক আদি রোগগ্রস্ত হয়। এই সাত জ্ঞানেন্দ্রিয়-র প্রবাহকেই বেদের ভাষায় সপ্তসিন্ধু বা সপ্তনদী বলা হয়। মিত্র জ্ঞানতন্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে, বরুণ স্নায়ুতন্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলে, ১৬১ সূক্তে, চতুর্দশ মন্ত্রে বলা হয়েছে বরুণ চলেন সমুদ্রে-সমুদ্রে। বেদ-ঋষি অনির্বাণের ভাষায়—"সমুদ্র একটি নয়। পৃথিবীতে যেমন জলের সমুদ্র, অন্তরিক্ষে তেমনি প্রাণের সমুদ্র, দ্যুলোকে আলোর সমুদ্র। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তারা যেন ভূতমাত্রা প্রাণমাত্রা আর প্রজ্ঞামাত্রার অক্ষীয়মান শতধার উৎস। তিনটি সমুদ্রই বরুণের, অথবা তারা বরুণই।" (বেদ-মীমাংসা, দ্বিতীয় খণ্ড, অনির্বাণ)। আমার আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ তাঁর কঠোপনিষদ ভাষ্যে বলেছেন—"ঋক্ বেদে দুটি Mystic বরুণ এবং অদিতি...। বরুণ বোঝাচ্ছে—অব্যক্তের রহস্য, রাত্রির রহস্য। বরুণ-অদিতি দুই Transcendent.....। অদিতি-অবন্ধনা, অখণ্ডিতা কোনও কোনও সময় সে আকাশ। অসীম আকাশকে বোঝায়। তার ভিতরে সাতটি আদিত্য—চেতনার রূপ জেগে উঠেছে। বরুণ ও অদিতি দুই ব্রহ্ম। বরুণ ব্রহ্ম পুরুষরূপে, অদিতি ব্রহ্ম শক্তিরূপে।"

অশ্বিনী বা অশ্বিনীকুমারদ্বয়

বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, সূর্য ও বরুণের পরেই গুরুত্বে ও মহিমায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় বা অশ্বিদেবতার স্থান। এই দেবতদ্বয় সর্বদা যুগলরূপে বিরাজ

করেন। এরা প্রথমে দু-জন মানুষ বা পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। পরে পুণ্যবলে দেবত্ব অর্জন করেন। এইজন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় বা অশ্বিযুগলকে কর্মদেব বলা হয়। 'অশ্বিনৌ' অশ্বিন শব্দের দ্বিবচনের রূপ। অশ্বিন শব্দের এক অর্থ—অশ্বের প্রভু বা মালিক। বেদে 'অশ্ব' শব্দের অর্থ ঊর্জা বা শক্তি। অতএব অশ্বিনের অর্থ হল ঊর্জা বা শক্তিযুক্ত তত্ত্ব। ঊর্জা বা শক্তিযুক্ত দুই তত্ত্বের নামই অশ্বিনৌ বা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। নিরুক্তকার যাস্কের মতে অশ্ ধাতু হতে অশ্বিন শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে—এর অর্থ যা সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাকেই অশ্বিন বলা হয়। যজুর্বেদের ২০/৬১, মন্ত্রে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে "উষাসানক্তমশ্বিনৌ"—অর্থাৎ উষা ও রাত্রির সমন্বিতরূপকেই 'অশ্বিনৌ' বলা হয়। এর অর্থ দিন ও রাত্রির সমষ্টি অশ্বিনৌ বলা হয়। বস্তুত 'অশ্বিনৌ' দুই বিভিন্ন কর্মধারক তত্ত্বের সমন্বিত রূপ। এর মধ্যে একটি হল তাঁর প্রকাশরূপ, অন্যটি হল তাঁর অন্ধকার রূপ। এখন প্রশ্ন এরা দু-জনে কেন? নিরুক্তকার যাস্ক বলেন—একজন অন্ধকার বা তমো ভাগের অশ্বিন— অন্যজন আলোক বা প্রকাশ ভাগের অশ্বিন্। বৈষ্ণব সন্ত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থের ভাষায়— "একজন অন্ধকারের মধ্যেই আলো লইয়া যাত্রা করেন। মনে করুন রাত্রি ১২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত। তারপর অন্ধকার একটু পাতলা হইলে আকাশকে ক্রমে ক্রমে আলোকিত করিতে করিতে আসেন আর একজন, রাত্রি ৩টা হইতে উষাকাল পর্যন্ত। অশ্বিদ্বয় আলো লইয়া পৌছান উষার পদমূল পর্যন্ত।....এক জনের কাজ তমোহরণ, আর একজনের কাজ আলোর সম্ভাষণ। এই দুইটি কাজ তাঁহারা নিত্যকালই করিতেছেন।" বিজ্ঞানদৃষ্টিতে প্রকাশরূপ ধনাত্মক বা Positive, অন্ধকাররূপ ঋণাত্মক বা Negetive। একটি আগ্নেয়তত্ত্ব অপরটি সোমীয় বা সোমতত্ত্ব। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে এই দুই তত্ত্ব সংসারের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। জগতে প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে একটি ধনাত্মক। (Positive, Proton) এবং একটি ঋণাত্মক (Negative, Electron) তত্ত্ব বিদ্যমান। এদের সংযোগেই সমগ্র সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়। এই কার্য সৃষ্টির বুকে নিত্যকাল ধরে চলতে থাকে। এই জন্যই বেদের ভাষায় এদের 'নাসত্যৌ' অর্থাৎ শাশ্বত সত্য বলা হয়। এই দুই দেবতাকেই স্থানভেদে অথবা বস্তুভেদে

দুই ভিন্নরূপে অভিহিত করা হয়। যেমন কালচক্রে বা কালভেদে এই দুই দেবতাই দিনরাত, শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন।

ব্রহ্মাণ্ডীয় দৃষ্টিতে দ্যুলোক-পৃথিবী, দিন-রাত্রির মধ্যে শক্তির স্রোতরূপে এরাই সূর্য-চন্দ্র। মানব-শরীরের মধ্যে এই দুই দেবতাই প্রাণ ও অপানরূপে বিদ্যমান। মানবশরীরের দৃষ্টিতে দুই নাসারন্ধ্রই হচ্ছে 'অশ্বিনৌ'। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে প্রাণশক্তির নিবাস এবং বাম নাসারন্ধ্রে অপান শক্তি বা অপান বায়ুর নিবাস। এই প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু দ্বারা যোগশাস্ত্র কথিত প্রাণায়ামের সাধন সম্পন্ন হয়। প্রাণায়াম সাধনের ফলে শরীর রোগমুক্ত হয়, মন একাগ্র হয়। এই জন্যই বেদে অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে দেববৈদ্য বা দেবচিকিৎসক বলা হয়।

যজুর্বেদের ২০/৫৫, মন্ত্রে বলা হয়েছে—"সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা"—অর্থাৎ অশ্বিনীদ্বয় অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। এর তাৎপর্য—শরীরস্থিত প্রাণ ও অপান বায়ুশক্তিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এদের মধ্যে একটি শক্তি ধনাত্মক, অন্যটি ঋণাত্মক। দুইয়ের ঘর্ষণেই উর্জারূপী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই উর্জাই অগ্নি। যজুর্বেদের ২০/৫৭, ২০/৫৮, মন্ত্রে বলা হয়েছে যে অশ্বিনীদ্বয় বা অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রকে মধু প্রদান করেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে প্রাণ ও অপানরূপী অশ্বিনীকুমারদ্বয় জীবাত্মারূপী ইন্দ্রকে মধু বা অমৃতরূপী সোমরস পান করান। অশ্বিনীদ্বয় জীবাত্মাকে শক্তি, তেজ ও স্ফূর্তি প্রদান করে। আত্মিক বল বা শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা প্রাণ ও অপানরূপী অশ্বিনীদ্বয় জীবাত্মাকে সর্বদা প্রদান করেন।

ঋক্ বেদের, ১/১১৭/২১, মন্ত্রে বলা হয়েছে যে অশ্বিনীদ্বয় আর্যদের জ্যোতি প্রদান করেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে—যিনি প্রাণ-অপাণ বায়ু বা শক্তিকে সংযমিত করে বা নিয়ন্ত্রিত করে প্রাণায়াম অনুশীলন করেন, তিনি শারীরিক বল ও জ্ঞানের জ্যোতি প্রাপ্ত হন।

বেদে বলা হয়েছে যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন ঋষিকে বার্ধক্যমুক্ত করে তারুণ্য প্রদান করেছিলেন—এর অভিপ্রায় হচ্ছে প্রাণ-অপানের শক্তি বৃদ্ধি, সহজ কথায় প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চ্যবন ঋষিকে বার্ধক্য থেকে মুক্তিদান

করত তারুণ্য প্রদান করেছিলেন। এই প্রাণায়ামের ফলে 'চ্যবন' অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু বা জরাগ্রস্ত শরীর প্রাণায়ামরূপী অমৃত বা সোমপান করে তারুণ্য লাভ করে। বেদ মতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এর ফলে সোমপানের অধিকারী হন। অর্থাৎ প্রাণায়ামের অনুশীলনের ফলে 'প্রাণ-অপানে'র গতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়—এটাই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপানের অধিকার লাভ।

পুরাণে চ্যবন ও শর্যাতি রাজার মেয়ে সুকন্যার বিবাহ বিষয়ক আখ্যান পাওয়া যায়। বেদে বা বেদমন্ত্রে সুকন্যা শর্যাতি রাজা আদির কাহিনী পাওয়া যায় না। বেদে আছে অশ্বিনী কুমারদ্বয় চ্যবন ঋষির বার্ধক্য দূর করে তাঁকে তারুণ্য প্রদান করেছিলেন। 'চ্যুঙ্ গতৌ' ধাতু থেকে চ্যবন শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যা উদিত হয়ে গমনশীল হয় এবং অস্ত যায়।

সূর্য উদিত হয়ে অস্ত যায়। অস্ত যাওয়ার আগে সূর্যের জ্যোতি বা আলো জীর্ণ বা ক্ষীণ হয়ে আসে। এই জীর্ণ বা ক্ষীণ দশা প্রাপ্ত সূর্যই চ্যবন। অশ্বিনী কুমারদ্বয় অর্থাৎ দিন ও রাত্রি। উদয়াচল থেকে সূর্য অস্ত গেলে দিনরাত্রি রূপী অশ্বিনী কুমারদ্বয় পুনঃ সূর্যকে যুবা বা তারুণ্য প্রদান করে অর্থাৎ প্রাতঃকালীন সূর্যরূপে পূর্বদিগন্তে উদিত করে। দ্বিপ্রহরে সূর্য তীক্ষ্ণ কিরণ দ্বারা যুক্ত হয় অর্থাৎ এই সময় সূর্যের তেজ বা জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। এটাই যুবক চ্যবন ঋষির অনেক কন্যার সাথে অর্থাৎ সূর্যের কিরণরূপী কন্যা বা কন্যাগণের সাথে বিচরণ বা ভ্রমণ। বেদের উপদেশ ভোগবিলাসের জন্য নয়, বরং সংযত জীবনযাপনের জন্যই বেদে উপদেশ বিদ্যমান। পুরাণে সুকন্যা শর্যাতি কাহিনী দ্বারা এক পতিব্রতা ভারতীয় নারীর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বেদ-মনীষী পণ্ডিত শিবশংকর শর্মা তাঁর "বৈদিক ইতিহাসার্থ নির্ণয়" গ্রন্থে বলেছেন, দুষ্কর্মে পতিত বা সংযমহীন ব্যক্তির শরীরই অকাল বার্ধক্যদশা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দশাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই চ্যবন। স্বীয় দুষ্কর্ম ও অসংযম পরিত্যাগপূর্বক সংযমী হয়ে বা সদাচারসম্পন্ন হয়ে জীবন যাপিত করাই চ্যবন ঋষির যুবা বা তরুণ অবস্থালাভ। যখন ব্যক্তি সদাচারী ও সংযমী হয় তখন বিদ্যা, ধন, কীর্তি আদি অনেক গুণের অধিকারী বা স্বামী হয়—এই সকল গুণরাজির স্বামী

হওয়াই অনেক কন্যার সাথে বিচরণ ও মিলন। ভারতের বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'অগ্নীষোমীয়ং জগত্' অর্থাৎ সারা জগৎ-সংসার অগ্নিতত্ত্ব (Oxygen) এবং সোমতত্ত্ব (Hydrogen) দ্বারা নির্মিত। এই দুই তত্ত্বের সমীকরণ হচ্ছে জীবনতত্ত্ব। এই অগ্নি ও সোমকেই বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বেদে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের জন্য দুটি মুখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে—দস্র ও নাসত্য। এই দুটি বিশেষণই অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের কার্যাবলীর উপর বিশেষ আলোকপাত করে। 'দস্র' শব্দের অর্থ আশ্চর্যজনক বা বিস্ময়কর কার্য। 'নাসত্য' শব্দের অর্থ শাশ্বত সত্য বা যার কখনও অভাব হয় না। যা সর্বত্র সদা বর্তমান। এই দৃষ্টিতে সোম-অগ্নি এবং প্রাণ-অপান, অর্থে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কার্যবিবরণ সুসংগত রূপে প্রতীত হয়।

বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্যের যমজ পুত্ররূপে বর্ণিত—অর্থাৎ সূর্যের উদয়-অস্তের ফলেই দিন ও রাত্রিরূপী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম তথা প্রাণ-অপানদি বায়ুশক্তিরও জন্ম। বেদের ভাষায় এরা দেববৈদ্য বা দিব্যচিকিৎসক। এঁদের একজন দেন জ্ঞান, অপর জন যোগান কর্মশক্তি। আকাশ ও পৃথিবীর বুক থেকে একজন আঁধারকে দেন ঠেলে সরিয়ে, অপরজন আলোকে আনেন টেনে। সংযত প্রাণ-অপানের গতিতে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রাণায়ামবিধিতে জীবের অন্ধকার বা অবিদ্যা তথা রাত্রি দূর হয়—জ্ঞানের আলোর উদয় হয়। এই জন্যই এঁরা দেববৈদ্য। প্রাণ-অপানের সংযত গতিতেই দিব্যচেতনার স্ফুরণ হয়। জীব দেহচেতনা, মনোচেতনার ভূমি থেকে আত্মচেতনায় উন্নীত হয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রাণ-অপানরূপে এই কার্য সম্পন্ন করেন এবং জীবকে দিব্য জ্ঞানামৃত পান করিয়ে চিরতারুণ্য প্রদান করেন। বেদ-মনীষী অমলেশ ভট্টাচার্যের ভাষায়—"আধ্যাত্মিক চেতনার আত্মজাগরণের উষালগ্ন নিয়ে আসেন তাঁরা।" ঋষি অরবিন্দের ভাষায়-"Lords of the human Journey"—"জীবন যাত্রার পুরোধা দেবতা।" বেদে এই দুই পুরোধার (পুরোহিত) উদ্দেশে পঞ্চাশটি সূক্ত বা স্তব পাওয়া যায়।

বিষ্ণু

ঋক্ বেদে বিষ্ণুসূক্তের সংখ্যা মাত্র তিনটি। এছাড়া অন্যান্য দেবতার সূক্তের মধ্যে কয়েকটি স্থানে বিষ্ণুদেবতার বিবরণ পাওয়া যায়। ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তের দেবতা বিষ্ণু, এখানে মন্ত্রের সংখ্যা ছয়। ওই মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তে মন্ত্র সংখ্যা পাঁচ, দেবতা বিষ্ণু। প্রথম মণ্ডলের (ঋক্ বেদের) ১৫৬ সূক্তের দেবতাও বিষ্ণু। এছাড়া ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের, ১৭ হতে ২১ সংখ্যক মন্ত্র পর্যন্ত বিষ্ণুর মহিমার কথা বলা হয়েছে। বেদ-মনীষীগণ বিষ্ণু শব্দের ব্যাখা করেছেন—'বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণু'—অর্থাৎ যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত তিনিই বিষ্ণু। এই দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী উর্জাই (universal Energy) বিষ্ণু নামে অভিহিত হন। জগৎ সংসারে প্রতিটি কণায় কণায় ব্যাপ্ত উর্জাই হচ্ছেন বিষ্ণু। বেদে বিষ্ণুর তিনটি পদের কথার উল্লেখ আছে। যথা ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলে, ২২ সূক্তে, ১৭ মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।
*সমূঢ়মস্য পাংসুরে।।" (*সমূলহমস্য, কোনও কোনও ঋক্‌মন্ত্রে দৃষ্ট হয়)।

অর্থাৎ বিষ্ণু তিনপদ দ্বারা জগৎ আবৃত বা ব্যপ্তি করেছিলেন, বিষ্ণুর এই তিনপদ কী? বেদে বিষ্ণু শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যরূপী বিষ্ণুর তিন পদ হল—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল। সূর্যরূপী বিষ্ণুর প্রথম চরণ প্রাতঃকাল, প্রাতে সূর্য উদিত হয়। মধ্যহ্ন, সূর্যরূপী বিষ্ণুর দ্বিতীয় চরণ। এই সময় সূর্যের তেজ বৃদ্ধি পায়। সায়ংকাল সূর্যের বা বিষ্ণুর তৃতীয় চরণ—এই সময় সূর্যরূপী বিষ্ণু অস্ত যান। যজুর্বেদে ৫/১৫, মন্ত্রেও ওই একই মন্ত্রের পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুর তিনপদ সৃষ্টির প্রত্যেকস্থানে দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর এই তিনপদ হল সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। মানবজীবনে শৈশব, যৌবন ও অন্তকাল (মৃত্যু)। বিষ্ণুর তিনপদে পরিভ্রমণ বা পরিক্রমা হচ্ছে এই তিন বিন্দুতে পৌছানো বা আরোহিত হওয়া। বিষ্ণুর তিনপদ বস্তুত বিশ্বের বাস্তবিকতার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। বিষ্ণুর বিষয়ে বলা হয়ে থাকে যে তিনি তাঁর তিনপদ দিয়ে বা তিনপদে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক ধারণ করে আছেন বা ওই ত্রিলোক তাঁর পদে বিধৃত আছে।

বেদ-মনীষীদের দৃষ্টিতে বিষ্ণু এক বিশাল ত্রিভুজস্বরূপ। এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু হল যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক। এই ত্রিভুজের মধ্যে তিনলোক তথা সারা জগৎ বিদ্যমান। এই তিনটি ভুজ বা বাহুই বিষ্ণুর তিনপদ বা চরণ। যজুর্বেদে, ৫/১৯ মন্ত্রে ত্রিবিক্রম (বিষ্ণুর এক নাম) শব্দ দ্বারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, ও দ্যুলোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ঋষি অরবিন্দ তাঁর 'বেদরহস্য' (উত্তরার্ধ) গ্রন্থে বলেছেন—"বিষ্ণুর গতি অতি প্রসারিত। তিনিই পর্যটন করেন। ঈশোপনিষদের ভাষায় 'সপর্যগাৎ' (সর্বত্রগমনশীল)—নিজেকে তিনভাবে প্রসারিত করে, যেমন দ্রষ্টা হিসাবে, চিন্তক হিসাবে এবং রূপকার হিসাবে, অতিচেতন আনন্দে, মনোময় স্বর্গে আর জড়ীয় চেতনার মর্ত্যে, "ত্রেধা বিচক্রমানঃ।"

বেদাদি শাস্ত্রমতে পূজা উপাসনার পূর্বে আচমন করা বিধি বা নিয়ম। এই আচমনের একটি বিখ্যাত মন্ত্র ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলে, ২২ সূক্তে ২০ সংখ্যক মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। মন্ত্রটি হল—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ

দিবীব চক্ষুরাততম্।।"—অর্থাৎ বিষ্ণুর সেই পরমপদ জ্ঞানীজন বা সুধীজন সর্বদা দর্শন করেন। বিষ্ণুর এই পরমপদ হচ্ছে মোক্ষ বা মোক্ষজনিত আনন্দ। বিষ্ণুর এইপদ জ্ঞানী যোগী, ও সিদ্ধ-সাধকগণই প্রাপ্ত হন। সিদ্ধ সাধকের অনুভবে এই পদে সর্বত্রই আনন্দ-শান্তি ও মধুধারা প্রবহমান। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ।" অর্থাৎ বিষ্ণু দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"বিষ্ণুঃ সর্বাঃ দেবতাঃ"—অর্থাৎ বিষ্ণু সর্বদেবময়। বিষ্ণুকে সর্বদেবময় বলার তাৎপর্য্য—সমস্ত দেবতাই উর্জার বিভিন্নরূপ। যথা, শক্তিশালী ইন্দ্র ব্যাপক হওয়ার জন্য বিষ্ণু, প্রাণ-অপানরূপ শক্তির কারণে 'অশ্বিনৌ', উর্জার স্রোত হওয়ার কারণে অগ্নি।

যজুর্বেদের ১৩/৩৩ সংখ্যক মন্ত্রে বিষ্ণুকে বলা হয়েছে—"ইন্দ্রস্য সখা।" ঋক্ বেদে এই কথাকেই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যথা-"ইন্দ্রো বিষ্ণুঃ সুকৃত সুকৃত্তর" (ঋগ্বেদ, ১/১৫৬/৫)। অর্থাৎ বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা বা মিত্র। ইন্দ্র (জীবাত্মা) সৎকর্ম করেন এবং বিষ্ণু (পরমাত্মা) 'সুকৃত্তর' অর্থাৎ ইন্দ্রের চেয়েও

অধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম করেন। পরমাত্মারূপী বিষ্ণু ইন্দ্ররূপী জীবাত্মাকে সহায়তা করার জন্য সদাই তৎপর থাকেন। উভয়ে উভয়ের মিত্র। ঋগ্বেদের ১/১৬৪/৩৬ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে সাতটি তত্ত্ব বিষ্ণুর আদেশানুসারে আপন আপন কার্য নির্বাহ করেন। জীব দৃষ্টিতে এই সাততত্ত্ব হচ্ছে—মন-বুদ্ধি ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। বৈশ্বিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির আধার বুদ্ধি, মন ও পঞ্চ-মহাভূত। এই সকল তত্ত্বদ্বারাই সমস্ত সৃষ্টি নির্মিত হয়েছে। এই সাততত্ত্ব পরমাত্মারূপী বিষ্ণুর অধীন।

'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বিষ্ণুর দুইটি রূপের কথা বলা হয়েছে—একটি বামন বা সূক্ষ্মরূপ (Microcosm)। অন্যটি বিরাট বা স্থূলরূপ (Macrocosm)। বিষ্ণুর বামনরূপ—পরমাণু। তাঁর বিরাটরূপ বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড। বিষ্ণুকে জানার জন্য তাঁর উভয়রূপের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে প্রত্যেক বস্তু প্রারম্ভ অবস্থায় বামন বা বীজ রূপে থাকে। কালক্রমে এই বামনরূপী বীজ বিশাল রূপ ধারণ করে। রজ এবং বীর্যকণা বামন বা বীজরূপে থাকে। এই রজ এবং বীর্যকণা মিলিত হয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণ হয়, তা থেকে শিশু, শিশু থেকে বৃহদ্রূপ মহান মানব হয়। বীজ বিশাল বৃক্ষ হয়। জলবিন্দু বিশাল হয়ে নদী ও সাগরের রূপ ধারণ করে। যদি আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিষ্ণুর বামনরূপ এবং বিরাটরূপ দেখতে চাই তাহলে আমাদের দিব্যদৃষ্টি অর্জন করতে হবে। সামান্য দৃষ্টিতে বিষ্ণুর এই উভয়রূপ দর্শন অসম্ভব। বিষ্ণুর বামনরূপ পরমাণু। পরমাণুর মধ্যে এক ধন-বিদ্যুৎ-এর বিন্দু বিদ্যমান। যাকে বিজ্ঞানীরা কেন্দ্র বা proton নামে অভিহিত করেন। এই proton-ই পরমাণুর হৃদয়ভাগ বা হৃদয়কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের চারদিকে ঋণ-বিদ্যুৎ-প্রধান বিদ্যুৎকণা ঘুরতে থাকে। একে ইলেকট্রন্ (Etectron) বলা হয়। ঋণ-বিদ্যুৎ প্রধান হওয়ার কারণে একে Etectron বলা হয়। এই বিদ্যুৎকণাসমূহ কেন্দ্র থেকে উর্জা প্রাপ্ত হয়, বিকশিত হয় এবং সৃষ্টি রচনা করে।

বিষ্ণুর বিরাটরূপ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড। আমরা সবাই এক সৌরজগৎ বা সৌরমণ্ডলের মধ্যে বিরাজমান। এই সৌরমণ্ডল নীহারিকা বা এক আকাশগঙ্গার (Galaxy) কোটিতম ভাগ বা অংশ। এক নীহারিকায় সূর্যের ন্যায় কোটি কোটি নক্ষত্র বিদ্যমান। আবার নীহারিকার সংখ্যাও কোটি কোটি। এই সব

নীহারিকায় এমন সব বৃহদাকার সূর্য বিদ্যমান আছে, যার সামনে আমাদের দৃশ্য আকাশের সূর্য ক্ষুদ্র সর্ষের সমান। এ থেকেই বিষ্ণুর বিরাটরূপের ধারণা করা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় দুরবীণ এখনও পর্যন্ত ২০ লাখ নীহারিকার দেখা পেয়েছে। এই হল বিষ্ণুর বামন ও বিরাটরূপ। পূর্বেই ঋক্ বেদের একটি মন্ত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

“ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুরে।।” (ঋগ্বেদ, ১/২২/১৭, মন্ত্রটি যজুর্বেদ ৫/১৫, অথর্ব বেদ ৭/১৬/৪, তথা সাম বেদেও দৃষ্ট হয়)। মন্ত্রের অর্থ—“বিষ্ণু পরাক্রম করলেন, তিন পদ রাখলেন। তাঁর ধূলিযুক্ত পদে সারা সংসার ব্যাপ্ত আছে।” মন্ত্রটিতে ‘পাংসুরে’ শব্দটি বিশেষভাবে বিচার্য। ‘পাংসু’ অর্থাৎ ধূলি বা রজ। এর অর্থ অণুর স্বরূপ ধূলিকণা বা ধূলিকণা সদৃশ। বিষ্ণুর ধূলিযুক্ত পদ—অর্থাৎ তেজময় কণা বা কণাসমূহ—যা তিন তত্ত্বের সম্মিলিতরূপ। এই তিনতত্ত্ব হল—proton (ধনাত্মক বিদ্যুৎ) Electron (ঋণাত্মক বিদ্যুৎ), ও neutron (উদাসীন)। এর মধ্যে প্রোটন প্রেরকতত্ত্ব—এই তত্ত্বের কাজ হল গতি ও প্রেরণা দান করা। ইলেকট্রন অর্থাৎ প্রেরণা দ্বারা প্রেরিত হয় যে তত্ত্ব। প্রেরিত হওয়ার ফলে এর মধ্যে প্রেরণ ও গতির সঞ্চার হয় এবং বস্তুর বিকাশ হয়। তিন তত্ত্বের মধ্যে নিউট্রন হচ্ছে উদাসীন তত্ত্ব। এই তত্ত্ব হচ্ছে আশ্রয়, আধার বা স্থিতিস্থাপক। এর সত্ত্বাতেই Proton, Electron-এর স্থিতি। গণিতের দৃষ্টিতে এই তিনতত্ত্বকে যথাক্রমে ধন (অর্থাৎ plus, +), ঋণ (অর্থাৎ minus,-), এবং শূন্য (zero,o) বলা হয়।

ঋগ্বেদের ১/২২/১৬ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর সাতটি ধাম আছে যেখান থেকে বিষ্ণুর পরাক্রম শুরু হয়। এই সাত ধাম কী? পৃথিবীর সাতটি স্তর বা Layers। পৃথিবীর নিচে সাতটি স্তর বিদ্যমান। পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা স্তর প্রথম স্তর। এর নিচে পাথর বা শিলাস্তর। তার নিচে জল, অগ্নি, গ্যাস-আদির স্তর বিদ্যমান। পৃথিবীর শেষ বা সপ্তম স্তরের নাম নাভিকীয় উর্জা বা nuclear energy। এই Nuclear Energy পৃথিবীকে নিরন্তর আপন কক্ষপথে আবর্তন করাচ্ছে বা ঘোরাচ্ছে। Nuclear energy সহ পৃথিবীর সাতটি স্তরই বিষ্ণুর স্থান।

এই জন্যই বলা হয় বিষ্ণু সর্বত্র ব্যাপ্ত। বিষ্ণুর পরাক্রম সাত ধাম অথবা মুখ্যরূপে Nuclear energy থেকেই শুরু হয়। এর ফলেই পৃথিবীর রক্ষণ, সংরক্ষণ, পালন-পোষণ সম্পন্ন হয়। পৃথিবীর সমস্ত উর্জার আধারই বিষ্ণু। যদি Nuclear Energy-র সংরক্ষণ পৃথিবী প্রাপ্ত না হতো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীই মরুভূমিতে পরিণত হতো।

শারীরিক পরিকাঠামোর দৃষ্টিতে বিষ্ণু মেরুদণ্ড বা spinal cord। শরীরের এই অঙ্গ Nuntral। এর মধ্যে প্রবাহমান সোমরস বা দ্রব (cerebro-spinal fluid) থাকে। একেই বরুণ বলা হয়। মেরুদণ্ডের দু-দিকে বিদ্যমান Afferent এবং Efferent nerves-ই (অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী) অশ্বিনীকুমাররূপী যুগল ভ্রাতৃদ্বয়। ঋক্ বেদের, ১/১৫৬/৪, মন্ত্রে বলা হয়েছে,বিষ্ণুর কার্যকে বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহায়তা প্রদান করে সম্পূর্ণ করেন। পূর্বে শারীরিক পরিকাঠামোর দৃষ্টিতে উল্লিখিত বক্তব্যে, ঋক্ বেদের মন্ত্রের এই অর্থ স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। ঋক্ বেদের ১/১৫৬/৪, মন্ত্রের কথানুযায়ী বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহযোগে বিষ্ণু অজ্ঞানরূপী অন্ধকার দূর করে মস্তিষ্ককে জ্ঞানরূপ প্রকাশ প্রদান করেন।

বিষ্ণু দ্যুলোকের দেবতা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি মূর্ধণ্য চেতনা (মস্তিষ্কজাত)। ‘বেদ-মন্ত্র মঞ্জরী’ গ্রন্থের প্রণেতা অমলেশ ভট্টাচার্যের ভাষায়—“পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে অনন্তনাগের উপর যোগনিদ্রায় শয়ান—এই ভাবটি সম্পূর্ণ প্রতীকী। শাশ্বত সত্যের অসীম অব্যক্ত অনন্ত প্রসারের মধ্যে পরমদিব্য স্বরূপ বিষ্ণু, তিনি সৃষ্টির অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে সমাহিত আত্মস্থ হয়ে আছেন। লক্ষণীয়, অনন্তনাগ নামটি, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন ‘Coils of Infinity’ আর সমুদ্রও সাধারণ সমুদ্র নয়, ক্ষীরসমুদ্র, রসের আনন্দের সুখসাগরের ঘনীভূত অসীম বিস্তার, পুরাণে তাকে বলেছে ‘কারণ সলিল’।” বেদমন্ত্রে পুনঃপুন যাকে ‘একো দেবঃ’ বলা হয়েছে তিনি বিষ্ণুই। ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তের ছয়টি মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি দীর্ঘতমা। ওই সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে ঋষি বলছেন—“...বিষ্ণো পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।।” অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস। এই একটি মন্ত্রে বিষ্ণুর স্থান যে সবার উপরে

তা প্রকারান্তরে প্রকাশ করা হল। বেদের ঋষিদের কাছে এই মধু হচ্ছে পরমব্রহ্মের আনন্দ অমৃতধারা, যা ঋষিদের সাধনার একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত ধন। বিষ্ণুর পরমপদে যখন মধুর উৎস, তখন শ্রীবিষ্ণুই সর্বোত্তম লক্ষ্য। এই মধুই আনন্দ। আনন্দই রস। বেদে তাই সকল দেবতার মূল বিষ্ণু। বিষ্ণুর মহিমায় তাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মুখরিত ও পরিব্যাপ্ত।

রুদ্র বা শিব

বিশ্বব্যাপী শাশ্বত নিয়মকে 'ঋত' বলা হয়। এই ঋততত্ত্বই জগৎসংসারকে সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণ করে। সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীর্থ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই ঋততত্ত্বের নিয়ন্ত্রণে। ঋততত্ত্বের দুটি রূপ—একটি পালক, অপরটি সংহারক। প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূলে চললে 'ঋততত্ত্ব' হয় পোষক ও রক্ষক। এর বিপরীতক্রমে চললে 'ঋততত্ত্ব' হয় সংহারক ও নাশক। এই সূত্র বা আধারকে মান্যতা দিয়েই বৈদিক ঋষিগণ পালক বা রক্ষক তত্ত্বকে, বিষ্ণু, শিব বা শংকর নামে অভিহিত করেছেন।

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সংহারক তত্ত্বই হচ্ছে রুদ্র। একই শক্তির দুই ভিন্ন রূপ। বেদে রুদ্রের নানা নাম দৃষ্ট হয়। যথা—রুদ্র, শিব, ভব, শর্ব, শংকর, পশুপতি, প্রথম ভিষক্ ইত্যাদি। বিভিন্ন গুণের লক্ষণে রুদ্রের এই বিভিন্ন নাম। রুদ্র—'রু' অর্থাৎ দুঃখম্, 'দ্র' অর্থাৎ 'দ্রাবয়তি' ইতি রুদ্রঃ। রুত্ = জ্ঞানম্, রাতি = দদাতি ইতি রুদ্রঃ। "রোদয়তি পাপিনঃ ইতি বা রুদ্রঃ।" বেদ ভাষ্যকার আচার্য মহীধর তাঁর যজুর্বেদের ভাষ্যে বলেছেন—"যিনি সত্যনিষ্ঠকে জ্ঞানদান করেন, কিন্তু পাপীগণকে দুঃখভোগের মাধ্যমে ক্রন্দন করান তিনিই রুদ্র।" বেদ-মনীষীরা এইভাবে রুদ্র শব্দের ব্যাখ্যা করেন।

বেদ-মনীষীদের অর্থানুযায়ী রুদ্র হলেন দুঃখনাশক, পাপনাশক এবং জ্ঞানদাতা। শুক্ল-যজুর্বেদ সংহিতার অন্তর্গত রুদ্রাষ্টক অধ্যায়ে, ভগবান রুদ্রের বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তিনি সংহার করেন, জীবকে মৃত্যু প্রদান করেন—ফলে জীবের আত্মীয়স্বজন ক্রন্দন করে—অর্থাৎ মৃত্যুরূপে তিনি জীবকে ক্রন্দন বা রোদন করান তাই তিনি রুদ্র। তিনি জগৎ সংসারের স্রষ্টা ও কর্তা তাই তাঁর

আর এক নাম 'ভব'। তিনি জীবকে পাপের দণ্ড দেন, কর্মফলজনিত দুঃখ ভোগ করান—এইজন্য তাঁর নাম 'শর্ব'। তিনি সমগ্র জীবজগৎ তথা পশুজগতের পালনকর্তা। তাই তিনি পশুপতি। বেদ মতে তিনি সৃষ্টির প্রথম চিকিৎসক বা বৈদ্য—এইজন্য তাঁকে প্রথম ভিষক্ বলা হয়।

রুদ্র 'ঋততত্ত্ব'। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে রুদ্র হচ্ছে Universal Eternal Laws বা বিশ্বব্যাপী নিয়ম বা নিয়মন শক্তি। সংসারের সমস্ত গতিবিধি এই নিয়মন শক্তির নিয়ন্ত্রণে। কেউই এই নিয়মকে লঙ্ঘন করতে সমর্থ হন না। এইজন্যই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, তাঁর (রুদ্রের) ভয়ে সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী-আদি নিয়ম মেনে আপন আপন কক্ষপথে চলতে থাকে। বায়ু প্রবাহিত হয়। মৃত্যু তাঁর সেবকতুল্য। কেউই এই নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না।

ঋক্ বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদের অনেক সূক্তে রুদ্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশেষ করে যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়, যা রুদ্রাধ্যায় নামে অভিহিত। এই অধ্যায়ে রুদ্রের বিরাট রূপের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—রুদ্রের সংখ্যা একাদশ। দশ ইন্দ্রিয় ও মনই হচ্ছে একাদশ রুদ্র। এই দশ ইন্দ্রিয় ও মন যখন শরীর ছেড়ে চলে যায়, তখন মৃতের আত্মীয়স্বজন রোদন করতে থাকে। এইজন্যই এদের রুদ্র বলা হয়।

শতপথ ও জৈমিনী ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে প্রাণই রুদ্র। এদের সংখ্যাও একাদশ। যথা—পাঁচ প্রাণ এবং পাঁচ উপপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়) ও আত্মা।

মহাকবি কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এর প্রথম শ্লোকে রুদ্র বা শিবের আটরূপ স্বীকার করেছেন। মহাকবির মতে শিবের এই আটটি রূপ হল—পঞ্চমহাভূত, (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) সূর্য, চন্দ্র ও হোতা (পুরোহিত)। মহাকবির দৃষ্টিতে 'রুদ্র' যে বিশ্বরূপ তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রের শতাধিক নাম পাওয়া যায়। এই বেদে রুদ্রের কার্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁকে অনন্ত ও অসংখ্য বলা হয়েছে। তিনি দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ এবং পৃথিবীতে অসংখ্যরূপে ব্যাপ্ত আছেন। এর তাৎপর্য রুদ্র ঋততত্ত্ব এবং এই ঋততত্ত্ব বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তিনি দ্যুলোকে বর্ষারূপে

থাকেন—তাই বৃষ্টি বা জলের প্রতিকণায় রুদ্র, অন্তরিক্ষে তিনি বায়ুরূপে বিদ্যমান এবং পৃথিবীতে তিনিই অন্নরূপে বিরাজ করেন। যজুর্বেদে রুদ্রকে ত্রম্বক নামে অভিহিত করা হয়েছে—কারণ তাঁর মধ্যে তিন শক্তি বিদ্যমান। এই তিন শক্তি হল—কর্তৃত্ব (জগৎ কর্তা), ভর্তৃত্ব (জগতের পালক), এবং হর্তৃত্ব (জগতের নাশক, হর)। এই তিন শক্তির সমন্বয়ের কারণে শিবকে ত্র্যম্বক বলা হয়।

বেদের অনেক মন্ত্রে রুদ্রকে মরুত্গণের পিতা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য—রুদ্র হচ্ছে আত্মতত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্ব বা চেতনতত্ত্বই উর্জা বা শক্তির স্রোত। মরুত্ হচ্ছে প্রাণতত্ত্ব। প্রাণের উৎপত্তি অথবা এর শক্তির উৎস বা স্রোত হচ্ছে আত্মা। এইজন্য আত্মারূপী রুদ্রই মরুত্গণের পিতা নামে বেদে অভিহিত হয়েছেন।

'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"ওষধিয়ো বৈ পশুপতিঃ।" অর্থাৎ বৃক্ষ-বনস্পতিসমূহকে পশুপতি বা রুদ্র বলা হয়েছে। বৃক্ষ বা বনস্পতিসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা মানবকে প্রাণবায়ু (Oxygen) প্রদান এবং বিষস্বরূপ কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) কে নিজেরা পান করে বা গ্রহণ করে। মানবের জন্য প্রাণবায়ুর স্রোত বৃক্ষ বা বনস্পতিসমূহ। যদি বৃক্ষ বা বনস্পতি না থাকতো, তাহলে মানবের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হতো। রুদ্রের বা শিবের বিশেষ মহৎগুণ তিনি নিজে বিষপান করেন এবং অমৃত অপরকে বা জগত-সংসারকে প্রদান করেন। বস্তুত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বৃক্ষ-বনস্পতিই শিবের মূর্তরূপ। বৃক্ষ-বনস্পতির সংরক্ষণই শিবের পূজা।

সন্তদৃষ্টিতে 'শিব' শব্দ অনন্ত কল্যাণকারী। শিবতত্ত্ব পরমানন্দদাতা। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই রূপান্তর। বেদ-মনীষীদের মতে 'শিব' শব্দের অর্থ—অনন্ত সত্তা, অনন্ত উর্জা এবং অনন্ত আনন্দ। বেদাদি শাস্ত্র-পুরাণে বলা হয়েছে যে ভগবান শিবের তিন নেত্র—সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি। সূর্য দক্ষিণ নেত্র, চন্দ্র তাঁর বামনেত্র এবং তৃতীয় নেত্রের নাম অগ্নি। সূর্য থেকে আমরা তাপ ও প্রকাশের অনুভূতি পাই। চন্দ্র থেকে পাই শীতলতা এবং অগ্নি থেকে পাই দাহকতার অনুভূতি। বস্তুত এই তিনই মূলত একই তত্ত্ব। সৃষ্টির জন্য সূর্য।

সৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য চন্দ্র এবং প্রলয় বা ধ্বংসের জন্যই অগ্নি। সূর্য-চন্দ্র ও অগ্নিকে শিবের ত্রিনয়ন বলার ফলে শিবের বিরাট তথা সর্বরূপতার দর্শন হয়। সহজ কথায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই হচ্ছে শিবের শরীর, আর এই শরীরে তিনটি প্রকাশ কেন্দ্র—অর্থাৎ সূর্য-চন্দ্র-অগ্নিই তাঁর তিন নেত্র।

বর্তমানে গৌরীপট্ট বা সর্পবেষ্টিত 'শিবলিঙ্গম্' বা শিবলিঙ্গ বেশির ভাগ স্থানেই পূজিত হতে দেখা যায়। শৈবদর্শন 'শৈবাগমে' বলা হয়েছে যে শিবের নিরাকার স্বরূপের প্রতীক শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গ কেবল শিব নয়, শিব ও শক্তি উভয়ের সংযুক্ত প্রতীক। শক্তি সদাই শিবের সাথে অভিন্ন। শক্তি শিবের স্বরূপভূতা, এইজন্য শিব ও শক্তির একাত্মকরূপ শিবলিঙ্গ। পুরাণ মতে 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ আকাশ বা অনন্ত। সংহারের সময় সমগ্র জগৎ এই লিঙ্গরূপী আকাশ বা অনন্তে বিলীন হয়ে যায়। এইজন্য আকাশ বা অনন্তের দ্যোতক নিরাকার শিবকে লিঙ্গ হিসাবে পূজা করা হয়।

এই পৃথিবীতে লিঙ্গ যোনিতে একতনু হলে প্রাণীগণের উৎপত্তি ঘটে। যা ব্যষ্টিতে তাই সমষ্টিতে। মহাপ্রলয়ে যখন সব লয় প্রাপ্ত হয় তখন সংহারকর্তা লয়প্রাপ্ত হন না। "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু"—রুদ্র বা সংহারক শিব তখনও বর্তমান থাকেন। প্রলয় অন্তে সৃষ্টি পুনরায় তাঁর থেকেই হবে। তিনি প্রকৃতি বা স্বীয়শক্তিতে গর্ভাধান করেন। তার ফলে প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব বা সৃষ্টি করে। প্রকৃতি বা শক্তিই তাঁর যোনি। এই যোনিই পার্বতী বা গৌরীরূপ পট্ট অর্থাৎ চাকচিক্যময় আবরণ। এর ফলে শিব আর কেবল সংহারকর্তাই রইলেন না, তিনি গীতার ভাষায় "অহং বীজপ্রদঃ পিতা" বা সৃষ্টিকর্তাও হলেন।

আমাদের বেদাদি শাস্ত্রে যে ওঁকার-এর কথা বলা হয়েছে—সেই ওঁকার হল ব্রহ্মের প্রতীক। ওঁকারে যে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) তা ব্রহ্ম বা নিরাকার শিব। নিচের অংশ (ও) শক্তি ভূজগাকার। ব্রহ্ম অণু হতে অণু, প্রকৃতির পরে স্থিত। চন্দ্রবিন্দুর বিন্দুই (.) অণুব্রহ্ম এবং নিম্নেস্থিত ভূজগাকারা (ও) ওঁকার শক্তি। মধ্যে অর্ধ্বচন্দ্রাকৃতিরূপ (⌣) কুল বা সীমা বিদ্যমান। এই কুলের নিচে কুণ্ডলাকার-এর জন্য শক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে অভিহিত। এই ভূজগাকারা ওঁকার আকৃতি শক্তি-বেষ্টনই শিবের সর্পরূপ ভূষণ বলে কথিত হয়েছে।

যৌগিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রবৃত্তিমূলক। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন আপন আপন বৃত্তি অনুসারে কার্যেরত হয় তখন তা প্রবৃত্তি নামে কথিত হয়। সংহারকর্তার সংহার চিন্তন নিবৃত্তিমূলক। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার হতে নিবৃত্তি। যখনই ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিবৃত্ত হয়, তখনই হয় জগতের প্রলয়। যেমন গাঢ় নিদ্রায়, যোগে, ধ্যানে ও সমাধিতে। যোগদর্শনের মতে— "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থই ইন্দ্রিয় ব্যাপার ত্যাগ বা ইন্দ্রিয় ব্যাপার হতে নিবৃত্ত হওয়া। যখনই এই ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি নিরোধ হয়, তখনই হয় লয় বা সংহার। তখন বিদ্যমান থাকেন যিনি, তিনিই শিব।

ঋক বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে, চতুর্থমন্ত্রে বলা হয়েছে—"কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতো বন্ধু অসতি।" অর্থাৎ যেই সিসৃক্ষা বা সৃষ্টি হল অমনি অসৎ-এর দ্বারা সতের বন্ধন হল। এই অসৎ যে সৎকে বন্ধন করল, এটাই নাগপাশ সদৃশ। সৎ-ই শিব। এখানে অসৎ (মায়া বা প্রকৃতি) যেন সৎকে নাগপাশে বন্ধন করলেন। তাই সর্পবেষ্টিত শিব। বেদের দেবতাতত্ত্ব মূলত একই তত্ত্বের বহুবিধ বিশ্লেষণ।

এবার বেদের কয়েকজন দেবীর কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

পৃথিবী

ঋক সংহিতায় পৃথিবীর উদ্দেশে তিনটি ঋকের মাত্র একটি ছোট্ট সূক্ত দৃষ্ট হয়। ঋষি অত্রির পুত্র ভৌম বা ভৌম অত্রি। এছাড়াও অথর্ব বেদের দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ৬৩টি মন্ত্র 'ভূমিসূক্ত' বা পৃথিবীসূক্ত। বৈদিক যুগের ঋষিগণ এই সকল বেদমন্ত্রের মাধ্যমে নিজ মাতৃভূমির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবীর প্রধান পরিচয় তিনি আমাদের সকলের মা ও জননী। পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করেই আমরা এই মাকে দর্শন করি এবং এর আলো-বাতাস-অন্ন জল গ্রহণ করি। আবার মৃত্যুর পর আমাদের সকলের দেহ এই মাটির বুকেই আশ্রয় নেয়। বেদের অনেক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর এই উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মূলতঃ পৃথিবীর সাধারণ সংজ্ঞা হল 'ভূ' বা 'ভূমি'। 'ভূ' ধাতুর অর্থ 'হওয়া'। পৃথিবীর আর একটি নাম ক্ষিতি, অর্থাৎ যেখানে সবাই বাস করে। নিরুক্তকার

যাস্কাচার্য তাঁর নিঘণ্টুতে পৃথিবীর একুশটি প্রতিশব্দ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার মধ্যে পৃথিবী, অবনি, ক্ষমা প্রভৃতি অর্থ নিরূপণে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। বিস্তারার্থক 'প্রথ' ধাতু হতে পৃথিবী শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, এর অর্থ বিস্তার। বীজ ভূমিতে পতিত হয়ে বৃক্ষরূপে বিস্তার করে নিজেকে। পৃথিবীতে মাতৃগর্ভের ক্ষুদ্র আধারে মানবশিশু জন্ম নেয়। ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে পরিণত যুবকরূপে তথা বৃদ্ধ পুরুষরূপে। পৃথিবীতে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদের সকলেরই জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি আছে। এই কারণেই এদের বিস্তার বা বর্ধনও আছে।

পৃথিবীমাতা তাঁর বক্ষজাত অন্নরস সেবন করিয়ে আমাদের রক্ষা ও পালন করেন—তাই তাঁর আরেক নাম অবনি (বা অবনী)। সকল প্রাণীই এই পৃথিবীর বাসিন্দা। এইজন্য তাঁর আর এক নাম ক্ষমা—অথবা তিনি তাঁর বক্ষস্থিত সকল সন্তানের উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করেন, তাই তাঁর নাম ক্ষমা। তিনি সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। এই পৃথিবীতে যজমানগণ দেবতার স্তুতি করেন, এইজন্য পৃথিবীর একটি নাম ইলা। পৃথিবী সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন এই কারণে পৃথিবীকে পৃথা নামেও অভিহিত করা হয়।

বেদে পৃথিবীর সাথে অন্য কোনও দেব-দেবীর স্তুতি দেখা যায় না। কেবলমাত্র ঋক্ বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে একটি সূক্তে (৬।৭০।৪) আকাশ ও পৃথিবীকে যৌথভাবে স্তুতি করা হয়েছে। আকাশ অর্থাৎ দ্যৌ বা দ্যুলোক। দ্যুলোক আর পৃথিবী মিলে একটি মিথুন। এদের একত্রে দ্যাবাপৃথিবী বলা হয়। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের আদি জনক ও জননী। দ্যুলোক হতে অমৃত-জ্যোতির ধারা পৃথিবীর উপর ঝরে পড়ে। এর ফলে পৃথিবী সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে। বেদে তাই এদের বলা হয়েছে—'বৃষভশ্চ ধেনুঃ' অর্থাৎ দ্যুলোক বৃষভ এবং পৃথিবী ধেনু। দ্যুলোকের সঙ্গে ভূলোকের নিত্য সাহচর্যের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের মর্ত্য জীবনের আদি ও অন্ত। আমাদের জন্ম-কর্ম, ধর্ম-সাধনা ও অন্ত বা মৃত্যু যেন এই আদি মিথুন বা দম্পতির বুকে তরঙ্গের ওঠানামার মতো। বৈদিক 'নিঘণ্টু' মতে পৃথিবীর প্রধান নামটি হল 'গৌঃ'। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' পৃথিবী 'ধেনু' নামে অভিহিতা। ঋষি অনির্বাণ রচিত—'পৃথিবী

অগ্নি ও জ্যোতির্লোক' গ্রন্থের ভাষায়—"এই পৃথিবী যেন ধেনুর মতো, মানুষ সব কাম্যবস্তু দোহন করে তাঁর থেকে—ধেনু মাতা। মাতার মত পৃথিবীর মানুষকে ভরণ করেছেন। পৃথিবীর গৌ-রূপের এটি সহজ তাৎপর্য। কিন্তু 'গৌ'র একটি রাহস্যিক অর্থ হল 'কিরণ'—বিশেষত, যে আলো কোনও অবরোধের আড়ালে লুকানো। রাত্রে গোযুথ গোষ্ঠে বন্দী থাকে। ভোরবেলা ছাড়া পেয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। তখন উষার আলোর বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত মেঘের টুকরোয় দ্যুলোককেও মনে হয় একটি গোচারণভূমি। বেদে গোযুথের এই অবরোধ মোচন প্রপঞ্চিত হয়েছে পণির কাহিনীতে। এই থেকে গো আধারে অবরুদ্ধ অথচ মুমুক্ষু জ্যোতির প্রতীক। পৃথিবীও তাই গৌরূপা।"

আমাদের চেতনা আবদ্ধ থাকে ক্ষুদ্র আধারে অথবা সীমার গণ্ডীতে। এই আধার বা সীমার গণ্ডীর থেকে চেতনার মুক্তি হয় বিস্তারে। এটাই ছিল বৈদিক ঋষির সাধনা ও মুক্তি। পৃথিবীর বিস্তার বা ব্যাপ্তরূপের মাঝেই তাঁরা পেয়েছিলেন অবরুদ্ধ চেতনাকে মুক্ত করার ইঙ্গিত। তাই পৃথিবী ঋষির দৃষ্টিতে দেবীরূপে পূজিতা-বন্দিতা-আরাধিতা। ঋক্ বেদের পঞ্চম মণ্ডলে, ৮৪ সূক্তে মাত্র তিনটি ঋকে (মন্ত্রে) পৃথিবীর স্তুতি করেছেন—ঋষি ভৌম অত্রি। ঋষির দৃষ্টিতে একই পৃথিবী তিনলোকে বিদ্যমান। প্রথম ঋকে পৃথিবীর দিব্যরূপটি ধরা পড়েছে ঋষির চোখে। এ যেন যবনিকার অন্তরাল হতে এক মহিমামণ্ডিতা অপরূপার আবির্ভাব ঋষির চোখের সম্মুখে। জ্যোতির্ময়ী দিব্যধরণীর আবির্ভাবে ঋষির হৃদয় হল শ্রদ্ধায় সিক্ত, তিনি গেয়ে উঠলেন—

"বলিত্থা পর্বতানাং খিদ্রং (ছিদ্রং) বিভর্ষি পৃথিবি।
প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি।।"

(ঋক্ বেদ, ৫।৮৪।১)।

অনুবাদঃ "হে পৃথিবী! হে প্রকৃষ্ট গুণবতী ও মহিমাময়ী পৃথিবীদেবী। তুমি ভূমিচর প্রাণীসমূহকে আপন সামর্থের দ্বারা পুষ্ট করো এবং সেই সঙ্গে অত্যন্ত বিস্তৃত পর্বতসমূহকেও ধারণ করো।"

ঋক্ বেদ কথিত এই মন্ত্রটির ভাষ্যে ঋষি অনির্বাণ বলেছেন—"পর্বতের তরঙ্গায়নে বিপুলা পৃথ্বীর অভ্রভেদী যে-উত্তুঙ্গতা, তা তাঁর দিব্য মহিমাকে

ফুটিয়ে তুলেছে আমাদের চোখের সামনে। আদিত্য যখন উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে, দ্যুলোকে যখন জ্যোতির মহাপ্লাবন, পৃথিবীর শিখরে শিখরে তখন মেঘমালার শৈল সমারোহ। প্রথম বর্ষণের ধারাসারে দ্যুলোকের আলোই যেন চিন্ময় প্রাণের ঢল নামিয়ে দিয়েছে পার্বতীর অঙ্গে-অঙ্গে অগণিত নির্ঝরের মুক্তধারায়। তার ছোঁয়ায় এইখানে এই মৃন্ময়ী ভূমির অণুতে অণুতে জাগলো শ্যামল প্রাণের রোমাঞ্চ। দ্যুলোকের জ্যোতির্মহিমা নিবিক্ত হল ভূলোকের উচ্ছ্রিত (উন্নত, বর্ধনশীল) আকুতিতে। দ্যাবাপৃথিবী তখন একাকার, দিব্য আবেশে পৃথিবী চিন্ময়ী কমলা। দ্বিতীয় ঋকে এই চিন্ময়ীকেই দেখি অন্তরিক্ষচারিণী প্রাণময়ী রূপে। ...। তারপর দ্যুলোকে যিনি চিন্ময়ী, অন্তরিক্ষে প্রাণোচ্ছলা, তাঁকেই এখানে দেখি সর্বংসহা মৃন্ময়ীরূপে, তখন তাঁর শক্তির বিকাশ ক্ষান্তিতে, দ্যুলোক আর অন্তরিক্ষের ঋষির কেন্দ্রানুগ সঙ্কর্ষণে। অত্রির ভাষায়, তুমি যে অনড় থেকে বনস্পতিদের ধরে থাকো ক্ষমা আর ওজঃ দিয়ে—যখন তোমার অভ্রের বিদ্যুতের আর দ্যুলোকের বৃষ্টিরা ঝরে পড়ে। জীবধাত্রী এই ভূমি, যাঁর 'কোলে নাচি শস্যে বাঁচি তৃষ্ণা জুড়াই যাঁর জলে'—তিনিই তো আমাদের মা।" (বেদ-মীমাংসা, তৃতীয় খণ্ড, অনির্বাণ)।

ঋষির দৃষ্টিতে একই পৃথিবী তিনলোকে তিনরূপে বিদ্যমান। এখানে তিনি মৃন্ময়ী, অন্তরিক্ষে তিনি প্রাণময়ী, দ্যুলোকে তিনিই চিন্ময়ী। দেহ-প্রাণ-মন মিলেমিশে যেমন আমাদের অস্তিত্ব। তিনটি লোকে পৃথিবীও তাই। তিনলোকেই তিনি দেবীরূপে বিদ্যমান। তিনিই বেদের অদিতি, অখণ্ডিতা, অনন্তা চৈতন্যরূপিণী। এই ভাবনা হৃদয়ে রেখে ঋষি ভৌম অত্রি মায়ের তিনটি পরিচয়েরই প্রশস্তি করেছেন, ঋক্ বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৮৪ সূক্তের তিনটি ঋকে। ঋক্ বেদের ভৌম অত্রির সূক্তটি পৃথিবী ভাবনার বীজ। এই বীজ মহীরুহ আকার ধারণ করেছে শৌনক সংহিতা বা অথর্ব সংহিতার দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ৬৩টি মন্ত্রে—যা 'ভূমি সূক্ত' নামে অভিহিত ওই সংহিতায়। কাব্যিক ব্যঞ্জনায় স্বর ও ছন্দের মূর্চ্ছনায় অনুপম পৃথিবী বন্দনা। সুধী পাঠক আসুন, ওই সূক্তের কয়েকটি মন্ত্র দিয়ে আমরা আনতমস্তকে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মা পৃথিবীকে করি বন্দনা—

"সত্যং বৃহদ্ ঋতম্ উগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃনোতু।।"

অর্থাৎ "বৃহৎ বা অটল সত্যনিষ্ঠা, ওজস্বী ঋত বা যথার্থ জ্ঞান, দীক্ষা ও যজ্ঞ, তপস্যা এবং বৃহতের ভাবনা—এরাই পৃথিবীকে ধরে রয়েছে। আমাদের যা হয়েছে এবং যা হবে তিনি তার ঈশ্বরী। তিনি আমাদের জন্য বিশাল লোক রচনা করুন।"

মানুষের পার্থিব জীবনের সার্থকতা—দিব্যজীবনের উন্মেষে। এই দিব্য জীবনের উন্মেষের পথে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা এবং যজ্ঞ দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া অপরিহার্য। এই সাধনার পূর্ণতা ঋত ও সত্যের উপলব্ধিতে। 'সত্য' হচ্ছে ব্রহ্ম 'ঋত' তাঁর শক্তি। এই শক্তির মধ্যে আছে উগ্রতা বা তেজ যা অনৃত বা মিথ্যাকে পরাভূত করার বজ্রবীর্য।

আমরা যা হয়েছি এবং ভবিষ্যতে যা হব, এই ব্যাপারে দেবী পৃথিবীই আমাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শিকা, এই মাকে ধরেই আমরা উত্তীর্ণ হব অনন্তের ব্যাপ্তিতে আনন্দের অমৃতঘনলোকে।

ভূমি সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে ঋষি বলেছেন—"যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভূবুঃ। যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎ সা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু।।" অর্থাৎ সমুদ্রবসনে আবৃতা পৃথিবী অথবা বুকে তাঁর সিন্ধুর হার। অন্নের জন্য মানুষ এই পৃথিবীকেই কর্ষণ করে বা করছে। দ্যুলোক হতে পৃথিবীতে প্রাণ ঝরছে ধারাসারে। তাতে নবজীবনের উচ্ছ্বাস ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। এতে আছে প্রাণের উদ্বেলন। এই প্রাণকে জয় করে প্রথম অমৃতপানের অধিকার পৃথিবীই আমাদের দেবেন। দ্যুলোক হতে ঝরে পড়েছে চিন্ময় প্রাণের ধারা, যারা সিন্ধু বা সমুদ্রকে পূর্ণ করেছে। পৃথিবীর জড়ত্ব কর্ষণের ফলে রূপান্তরিত হচ্ছে 'অন্নে' যা প্রাণ ও চেতনার পোষক। অধ্যাত্ম-দৃষ্টি কর্ষক তাই প্রবর্ত সাধক। কর্ষণের ফলে জড় রূপান্তরিত হয় প্রাণে। কিন্তু সে প্রাণ চঞ্চল, তাকে জয় না করলে অমৃত আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না। এই ভাবনারই প্রতিফলন পরের মন্ত্রে যেখানে ঋষি বলছেন—"...ভূমিগোষ্ব্ অপ্যু অন্নে দধাতু", অর্থাৎ দিকে দিকে পৃথিবীরূপা

অন্নপূর্ণার প্রাণের উল্লাস, যা অন্নময় সত্তার গভীরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করছে চিন্ময় সত্তায়।

অথর্ব বেদের ভূমিসূক্তের পরের মন্ত্রে (১২।১।৫), ঋষি বলছেন—"যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রাণের তপস্যা চলছে এই পৃথিবীর বুকে, তার ফলে অসুর শক্তির উপর দেবশক্তি হচ্ছে বিজয়ী। এই পৃথিবীতেই মানুষ আঁধারের গহনে আলোর সন্ধান পায়, তপস্যার বলে এই আলোকে অধিগত করে মানুষ মুক্ত বিহঙ্গের মতো অনন্ত সুনীল আকাশে স্বচ্ছন্দে বিপুল বিস্তারে ডানা মেলে। বেদ-মনীষীর ভাষায় তার এই সিদ্ধির মূলে "চিন্ময়ী পৃথিবীরই আবেশ ও শক্তিপাত। বেদ-উপনিষদের দৃষ্টিতে আমাদের শরীরই পৃথিবী। বক্ষঃস্থল বেদী, হৃদয় অগ্নি। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিয়মে সিংহের শাবক সিংহ হয়, হাঁসের শাবক হাঁস; মানুষের বাচ্চা মানুষ হয়। তেমনি আমরাও যারা পৃথিবীর সন্তান, তারাও সকলে এক-একটি পৃথিবী। বাইরের পৃথিবী যেন যজ্ঞবেদী। দ্যুলোক থেকে নেমে আসা আলো এই যজ্ঞবেদীর অগ্নি। ওই অগ্নিতে আমাদের দেহ-মন-প্রাণে যে জড়ত্ব তাকে আহুতি দিয়ে দিব্য চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় এটাই হল—"তোমাদের সকলের চেতনায় চৈতন্য হোক।" আমাদের ভৌম্যচেতনা ভূমাচেতনায় রূপান্তরিত হোক—পৃথিবীদেবীকে মার্গদর্শিকা করে। এই সূক্তের (১২।১।৫, অথর্ব বেদ), ছাব্বিশ সংখ্যক মন্ত্রে ঋষি বলেছেন—

"শিলা ভূমিরশ্মা পাংসুঃ সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা।
তস্মৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরংনমঃ।।"

অর্থাৎ "পৃথিবী মা আমার পাথর হয়েছেন, নুড়ি হয়েছেন, হয়েছেন ধূলি বা রেণু। এই মাতৃরূপা পৃথিবীকে কেউ বিশেষভাবে ধরে আছেন। মায়ের বুকখানি সোনার। দ্যুলোকের আলো তথা মায়ের গর্ভস্থিত অসংখ্য রত্নমণি—এইসব তিনি ধারণ করেন, তাই তিনি 'হিরণ্য রক্ষা'। ঋষি বলছেন—এই পৃথিবী মাকে প্রণাম জানালাম আমি।"

বেদ-মনীষীর দৃষ্টিতে—যিনি পাথর হয়েছেন, নুড়ি হয়েছেন, পরমব্যোমে তিনিই আবার হিরণ্যবক্ষা। তাঁকে বিশেষভাবে ধরে আছে সত্য আর ঋত।

বিজ্ঞান দৃষ্টিতে পৃথিবী জড়কণার সমষ্টি—অণু-পরমাণুর সমষ্টি। এই জড়কণার সমষ্টির মধ্যেই তথা অণু-পরমাণুর সমষ্টির মধ্যেই ঋষিরা পেয়েছিলেন অগ্নিতত্ত্ব ও সোমতত্ত্বের (Positive, Negative, ঋণাত্মক ও ধনাত্মক শক্তি) সন্ধান। ঋক্ বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৮৪ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে যে শত শাখাযুক্ত বনস্পতির কথা, তাতে ঊর্ধ্বশিখা অগ্নির ধ্যান আছে, বৃষ্টিতে সোমের ধ্যান। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঊর্ধ্বভূমিতে ওঠার প্রবল অভীপ্সার অগ্নি। বৃষ্টিতে বা বর্ষণে সোমরূপী প্রসাদের ধারা। একদিকে সোমের ধারায় অভিষিক্ত, আবার অন্যদিকে সৌরতেজে সমুজ্জ্বল। অভীপ্সার অগ্নি ঊর্ধ্বমুখী, প্রসাদ নিম্নমুখী। অগ্নি ও সোমের এই নিত্য মিলন খেলা পৃথিবীতে সতত চলমান।

'ভূমিসূক্তের' শেষ মন্ত্রটিতে ঋষি বলছেন—

"ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্।।" (অথর্ব, ১২।১।৬৩)।

অর্থাৎ "দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্তা, হে মাত পৃথিবী, তুমি আমার প্রতি সর্বতোভদ্র অর্থাৎ সদা কল্যাণ বা মঙ্গলবর্ষী হও। আমায় করো সুপ্রতিষ্ঠিত। ভূমি, মাগো, ওগো কবি, 'শ্রী'তে আমায় নিহিত করো, নিহিত করো 'ভূতি'তে।" 'শ্রী' অর্থাৎ শ্রেয়, 'ভূতি' অর্থাৎ প্রেয়। শ্রেয় ও প্রেয় দুইই পৃথিবী মায়ের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

হে পৃথিবী জননী, ত্রিলোকে তোমার আসন বিদ্যমান। তুমি ত্রিলোকেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মানুষ ও দেবতার মধ্যে তুমি দূত। তুমি দেবতাকে আনো মানুষের কাছে, মানুষকে তুলে নিয়ে যাও চেতনার চিন্ময় আকাশে। মা, তোমার প্রসাদে আমার আত্মচৈতন্য কবে তোমার বৃহৎ চৈতন্যে মিশে একাকার হবে? মা, তুমি আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্না হও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অথর্ব বেদের ঋষি অথর্বা যে চোখে, উল্লেখিত সূক্তের ঋষি অত্রি যে চোখে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, হাজার হাজার বছর পরে এমনই একটি, পৃথিবীর সুন্দররূপ ফুটে উঠেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চোখে—

তাঁর 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী), আর 'পৃথিবী'তে (পত্রপুট)। দুটি কবিতার মাঝে বিয়াল্লিশ বছরের ব্যবধান। কিন্তু দুটি কবিতাই বৈদিক ভাবনার সৌরভে আমোদিত। বাংলা সাহিত্যে এক আনন্দচকিত বিস্ময়।

উষা

বৈদিক উষাদেবীর কথা লিখতে গিয়ে বার বার মনে পড়ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা। মনে পড়ছে বিশ্বকবির 'প্রভাত সংগীত' কাব্যের সেই বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর কথা। বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে যার আবৃত্তি হতো উদাত্ত কণ্ঠে। এখনও মনের গহনে সেই কবিতার ছন্দ অনুরণিত হয়—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

* * * * * * *

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া।
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,

হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।”

বৈদিক ঋষির ভাবনায় যে ঊষা বন্দনার রূপটি ফুটে উঠেছিল, কবিগুরুর রচিত উপরোক্ত কবিতাটি তার যুগোপযোগী নবীন ভাষ্য। ঋষির সাধনা কবির কাব্য-বীণায় সুরের মূর্চ্ছনায় সিদ্ধির সুধাস্রাবী ব্যঞ্জনায়, বৈদিক চিরন্তনী দেবী ঊষার জ্যোতির্ময় তনুতে নতুন অলংকার। এ যুগের ঋষিকবির অমর ছোঁয়া পেয়ে ঊষার আলো-তনুতে যে আলো পুঞ্জীভূত হয়ে বৃত্রের আবরণে আবৃত ছিল, সেই আবরণ ভেঙে নৃত্যচঞ্চলা নির্ঝরের মতো তা ছড়িয়ে পড়ল অনন্তের বুকে অজস্র ধারায়, তমোনাশের শপথ নিয়ে। অজ্ঞানরূপী বৃত্রের মায়ায় যে ছিল স্বপ্নবিভোর, তার স্বপ্ন গেল সহসা ভেঙে। তার স্বপ্ন যেন আলো হয়ে অনন্তধারায় ছড়িয়ে পড়ল ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং দ্যুলোকের বুকে। ঋষির ভাবনা, এ যুগের কবির ভাবনায় পেল নবরূপ-নবশ্রী। বেদের দিব্যদুহিতা ছিল শুধুই বৈদিক ঋষির সাধনার দেবী। এ যুগের সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবি তাঁকে (ঊষাকে) সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে সর্বসাধারণের দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা করলেন। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’—অর্থাৎ ঝর্ণার স্বপ্নভঙ্গ। এ ঝর্ণা জলের চঞ্চল প্রবাহ নয়—এ ঝর্ণা আলোর ঝর্ণা। যে আলো বন্দি ছিল দেহ-মন-প্রাণের জড়ীয় চেতনার আধারে। দেহ-মন-প্রাণের মধ্যেই ছিল যাঁর স্বপ্নবিলাস। আজ জ্ঞানরূপ রবির উদয়ে দেহ-মন-প্রাণের কারাগার ভেঙে রুদ্ধ জড়ীয় চেতনা মুক্ত হয়ে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে দিব্যচেতনার অনন্ত সমুদ্রে অভিসারের উদ্দেশ্যে। অভিসার অন্তে মিলনের মধুর ক্ষণে সে হবে শান্ত। তাই মিলনের প্রাক্ মুহূর্তটি পর্যন্ত সে চঞ্চলা, অস্থিরা পাগলিনী প্রায়। সে ছুটে চলে, কোনও বাধা আজ সে মানবে না। সব বাধা অতিক্রম করে সে যাবে ওই অনন্তচেতনা বা আলোর সাগরে। তাই সে এ যুগের ঋষিকবির ভাষায় গেয়ে ওঠে—

কি জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

ওরে চারিদিকে মোর
একি কারাগার ঘোর—
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর।।

দেহ-মন-প্রাণের জড়ীয় অস্তিত্ব যখন ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার আগুনের ছোঁয়া পায়—তখনই ঘটে ‘‘দিব্য-দুহিতা’’ ঊষার আবির্ভাব। ঋষি অরবিন্দের ভাষায়—‘‘ঋষিগণের দিব্য ঊষা হলেন দিব্য জ্যোতির পুরোধা যিনি মানবীয় কর্মে আবরণের পর আবরণ ঘুচিয়ে ভাস্বর দেবত্ব প্রকাশ করেন। মানব জাতির সকল কর্মের সাধন, সর্বযজ্ঞের সমর্পণ এবং সব কাম্য ফলের প্রাপ্তিকেই এই আলোকে দেখা হয়েছে। ...। এই ঊষা সর্বদাই এক দিব্য সক্রিয়তার বিধান অনুযায়ী প্রাগ্রসর হন, এই প্রগতির পথে তিনি আনয়ন করেন বহুতর চিন্তার সম্পদ, তথাপি তাঁর পদক্ষেপ নিশ্চিত, সকল অভিলষিত বস্তু, সর্বোত্তম বরদান, আনন্দের রব, দিব্য উপস্থিতির আশীর্বাদ রয়েছে তাঁরই হাতে। তিনি পুরাতনী, শাশ্বতী, জ্যোতির প্রভাত হয়ে রয়েছেন সেই আদিকাল হতেই, তিনি ‘‘পুরাণী’’, তবু গ্রহীষ্ণু অন্তরাত্মার কাছে আবির্ভাবের সময়ে তিনি নিত্য নবীনা এবং অভিনবা।’’ (বেদরহস্য, উত্তরার্ধ, শ্রীঅরবিন্দ)

ঋগ্বেদ-সংহিতায় ঊষার বন্দনা প্রায় কুড়িটি সূক্তে দেখা যায়। এই সকল সূক্তে, ঊষাদেবীর অনিন্দ্যসুন্দর সৌন্দর্য্যের বর্ণনার ভঙ্গিটি এক কথায় অনুপম। ঋক্ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে, ৯২ সূক্তে; ১-৫ সংখ্যক মন্ত্রে বা ঋকে ঊষার বন্দনার অপূর্ব চিত্রটি যেন ‘চিত্ররূপময়’ হয়ে উঠেছে। সুধী পাঠক আসুন, তার থেকে কিছুটা রস আমরাও আস্বাদন করি। ওই সূক্তের ১-৫ সংখ্যক ঋকে ঋষি বলছেন—

‘‘এতা উত্যা ঊষসঃ ক্রেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।
নিংষ্কৃন্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোহরুষীর্যন্তি মাতরঃ।। ১
উদপপ্তন্নরুলা ভানবো বৃথা স্বাযুজো অরুষার্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানু মরুষীরশিশ্রয়ুঃ।। ২

অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন ভোজনেনা পরাবতঃ।
ইষং বহন্তী সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে।। ৩
অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরিবাপোর্নুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।
জ্যোতির্বিশ্ব স্মৈ ভুবনায় কৃনতী গাবো ন ব্রজং ব্যূর্যা আবর্তমঃ।। ৪
প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বম্।
স্বরুং ন পেশো বিদথেষ্বঞ্জঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ।। ৫

অনুবাদ ঃ ১। নিত্য প্রতি উষা আলোক আনয়ন করেন। আকাশের পূর্বদিগন্তে আলো বা জ্যোতি প্রকাশিত করেন। বীর যোদ্ধাগণ যেরূপ অস্ত্রে শান দেয় বা অস্ত্রসকলের সংস্কার করে, ঠিক সেইরূপ নিজের প্রকাশ জগতকে প্রকাশিত করে গমনশীল, দীপ্তিমান উষা প্রতিদিন গমন করেন।

২। অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হওয়ার পর উষাদেবী শুভ্রবর্ণ গাভী সকলকে (সূর্যের কিরণসমূহ) রথে সংযুক্ত করলেন এবং পূর্বের ন্যায় প্রথমে সকল প্রাণীর মধ্যে জ্ঞান বা চেতনার সঞ্চার করলেন। অনন্তর প্রকাশদাতা সূর্যের সেবা বা সহায়তায় সংলগ্ন হন।

৩। যজ্ঞাদি শ্রেষ্ঠ কর্মকারী, সোমরস পরিশুদ্ধকারী দাতা যজমানকে আপন কিরণ দ্বারা বা কিরণপ্রভাবে প্রচুর পরিমাণে অন্ন প্রদান করত দেবী উষা স্বীয় তেজে সমগ্র আকাশকে দীপ্তিমান করে তোলে।

৪। দেবী উষা নর্তকীর ন্যায় বিবিধ রূপ প্রকাশ করে অবতরিতা হন। গাভী যেমন দুগ্ধ দোহনের সময় নিজ আপীন (স্তন বা বাঁট) প্রকাশ করে, সেরূপ উষাও গাভীর ন্যায় (দুগ্ধ প্রদান করার মতো), পোষক প্রবাহ প্রদান জন্য নিজের বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন। দেবী উষা বিশ্বভুবন আলোয় প্রকাশিত করে অন্ধকার মুক্ত করছেন।

৫। দেবী উষার উজ্জ্বল আলো পূর্বদিক হতে ক্রমে ক্রমে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর আগমনে বিপুল অন্ধকার অপসারিত হয়। পুরোহিত যেরূপ যজ্ঞের যুপকাষ্ঠকে ঘৃতদ্বারা মার্জন করে উজ্জ্বল করেন সেরূপ উষা স্বীয় প্রকাশরূপ ঘৃত দ্বারা মার্জন করে দিক সকলকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করেন। স্বর্গদুহিতা বা আকাশ-কন্যা উষা জ্যোতির্ময় সূর্যের সেবা করছেন।

উপরে উল্লিখিত বেদমন্ত্রে ঋষির বর্ণনায় আমরা দেখলাম—উষা সুন্দরী। জ্যোতির্ময়ী, জ্যোতির প্রকাশিকা দেবী। সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত পূর্বদিগন্তের বুকে যে একটি অপরূপ মনোহর স্বর্ণ-রক্তিম বর্ণের আভা ফুটে ওঠে—সেই ওঠার ক্ষণটিকেই বলা হয় উষাকাল। উষাকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তিনি বেদ-বন্দিতা, ঋষি আরাধিতা। বেদে 'উষা' বানানে 'উ' কার দৃষ্ট হয়। অভিধান মতে, উষা-ঊষা উভয়ই শুদ্ধ। সূর্যের দীপ্তিতেই উষা দীপ্তিমতী। উষার অনেক নাম—নিরুক্তকার যাস্কাচার্য তাঁর 'নিঘণ্টুতে' উষার ষোলটি নামের উল্লেখ করেছেন। যথা—বিভাবরী, সুনরী, ভাস্বতী, ওদীতী, চিত্রমঘা, অর্জুনী, বাজিনী, বাজিনীবতী, সুম্রাবরী, অহনা, দ্যোতনা, শ্বেত্যা, অরুষী, সুনৃতা, সুনৃতবতী, সুনৃতাবরী। বেদে অশ্ববতী, গোমতী ইত্যাদি বিবিধ নামেও উষার বন্দনা করা হয়েছে। বেদমন্ত্রের ভাষায় উষা 'দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ।' অর্থাৎ উষা দ্যুলোকদুহিতা। সূর্য তাঁর আশ্রয়। বেদ-মনীষীদের দৃষ্টিতে উষা জাগরণের প্রতীক। এ জাগরণ দৈনিক ঘুম থেকে জেগে ওঠা বা জাগরণ নয়। শারীরিক-মানসিক-দৈহিক চেতনার যে জড়ীয় স্তরে আত্মার দিব্যচেতনশক্তি বদ্ধ দশায় বন্দী হয়ে আছে, উষা হল সেই দিব্য জাগরণ-এর শক্তি বা দেবী যার সহায়ে আত্মার দিব্যচেতনশক্তি মুক্তি পেয়ে আপন আলয় বা নিত্য আনন্দধামে ফিরে যায়। সাধকের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মজ্যোতি দর্শনের পূর্ব মুহূর্ত বা ক্ষণটিই হচ্ছে উষা। এইরূপে আত্মদর্শনের পূর্বমুহূর্তে সাধকের চিদাকাশে বা অন্তরাকাশে যে দিব্যদ্যুতিময় প্রকাশের আবির্ভাব ঘটে—সেই প্রকাশই উষা।

ঋগ্বেদে ১০।৭০।৬১, ১০।৩৬।১১, এবং অথর্ব বেদের পঞ্চমকাণ্ডের, তৃতীয় অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তের, ষষ্ঠ মন্ত্রে উষা ও রাত্রিকে যুগলভাবে স্তুতি করা হয়েছে। উক্ত মন্ত্রসমূহে দুই দেবীকে বার বার আহ্বান করা হয়েছে। উষা আর রাত্রি যেন দুই সহোদরা বোন। এরা দ্যুলোকের দুই তেজস্বিনী সুন্দরী কন্যা। ঋগ্বেদের ১০।৩৬।১১ মন্ত্রে, উষা এবং রাত্রিকে মহতী এবং সুরূপা বলা হয়েছে। অথর্ব বেদের ৫।১২।৬ মন্ত্রে, উভয় দেবীকে স্বর্ণালংকার ভূষিতা উজ্জ্বল শোভার মালা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উষা এবং রাত্রির উৎপত্তি সম্পর্কে ঋগ্বেদের ১।১১৩।১১ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, রাত্রি সূর্যের সন্তান বা

রাত্রি সূর্য দ্বারা প্রসূত হয়েছে এবং রাত্রি উষার জন্ম দিয়েছে। অতএব উষা রাত্রির সন্তান। এইরূপে দ্যুলোকের এই দুই কন্যা কখনও দুই বোন, কখনও বা মা-পুত্রীরূপে বর্ণিত হয়েছে, সূর্যই দুই দেবীকে ভরণ-পোষণ ও সংরক্ষণ করেন। এই দুই বোনের মধ্যে বৈরীভাবও পরিলক্ষিত হয়, কেননা এরা দুইজনে একে অপরের রূপকে বিনাশ করেন। এর রহস্য সমাধানে বেদ-মনীষীরা বলেন—প্রাতঃকালে যখন সূর্যোদয় হয়, তখন সূর্যোদয়ের পূর্বে উষার আগমন হয় এবং উষার দ্বারা রাত্রি বোনের রূপের বিনাশ। আবার সন্ধ্যাবেলায় সূর্যাস্তের সময় যখন কৃষ্ণবর্ণা রাত্রির আগমন হয় তখন উষা নিজের প্রকাশকে গুটিয়ে নেয় অর্থাৎ রাত্রি দ্বারা উষার প্রকাশ রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঋগ্বেদের আর একটি মন্ত্রে (১।১১৩।৩১) বলা হয়েছে যে এরা একে অপরের জন্য কখনও বাধা উৎপন্ন করে না। দুই বোনই সূর্য দ্বারা নির্দেশিত মার্গে ক্রমানুযায়ী সঞ্চারণ করেন। বেদ-মনীষী পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর তাঁর ঋগ্বেদ সংহিতার ভাষ্যে বলেছেন—"সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ রূপধর্মী হওয়া সত্ত্বেও উষা ও রাত্রি এই দুই দেবী প্রাণীসমূহকে প্রকাশ ও বিশ্রাম প্রদান করত আপন আপন কর্মমার্গে সর্বদা পরিভ্রমণ করেন। এই দুই দেবীর মধ্যে উষার বর্ণ গৌর, এবং রাত্রির বর্ণ কৃষ্ণ বা কালো। এই দুই দেবীর উপস্থিতিতে প্রাণীসমূহ সমুদয় কার্য সম্পাদন করেন। উষা বা দিনের কার্য প্রকাশ দেওয়া এবং রাত্রির কার্য বিশ্রাম দেওয়া। এদের মধ্যে একে অপরের বাচ্চাকে পালনপোষণ করেন। রাত্রি উষার বাচ্চাকে এবং উষা রাত্রির বাচ্চাকে স্তন্য পান করান। দিন বা উষার বাচ্চা অগ্নি, এবং রাত্রির বাচ্চা সূর্য। রাত্রির গর্ভ থেকে সূর্য উৎপন্ন হয়, একে পোষণ করেন উষা। এইরূপে উষার গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয় অগ্নি, রাত্রি তাঁকে পোষণ করেন। উষার পুত্র অগ্নি অত্যন্ত তেজস্বী ও বীর্যবান। রাত্রির পুত্র সূর্য সহস্র কিরণ দাতা—হরি যে রসকে হরণ করে।

উষা ও রাত্রি দুই দেবী দিন-রাত্রির প্রতীকরূপে বেদে চিত্রিত হয়েছে। এরা দু-জনেই সূর্য বা অগ্নির সাথে সম্বন্ধযুক্ত—তাই এদের আগ্নেয়তত্ত্বও বলা হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শরীরে যতক্ষণ তাপ বা অগ্নিতত্ত্ব বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ দেহস্থ জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অগ্নিতত্ত্বের অভাবে দেহ মৃত বলে ঘোষিত

হয়। উষা ও রাত্রি যুগলে পৃথিবী তথা ব্রহ্মাণ্ডদেহে অগ্নিতত্ত্বরূপে বা তাপপ্রবাহরূপে বিদ্যমান থেকে পৃথিবী তথা ব্রহ্মাণ্ড দেহে জীবন বা জীবনের লক্ষণকে ধরে রাখেন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই দুই দেবী সূচীশিল্পে বা বয়নশিল্পে অত্যন্ত নিপুণা। দুই দেবী প্রাতঃকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে প্রাতঃকাল অবধি দু-খানি বস্ত্র বুনতে থাকেন। এই দুই বস্ত্রের একটি আলো দিয়ে তৈরি, অন্যটি কালো দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ অহরাত্রিরূপ দু-খানি বসন বা বস্ত্র। এদের উভয়েরই বস্ত্র বোনার সূতো হচ্ছে ক্ষণ, মুহূর্ত, ঘণ্টা, প্রহর ইত্যাদি। আবার ওই সুতো দিয়ে এরা মানুষের জীবন বা আয়ুরূপী বস্ত্র ও বয়ন বা নির্মাণ করেন।

উষা এবং রাত্রিকে যজ্ঞে বারবার অর্থাৎ সর্বাধিক আহ্বান জানানো হয়। (দ্রষ্টব্য— অথর্ব বেদের পঞ্চমকাণ্ডে, তৃতীয় অনুবাকে, দ্বিতীয় সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র এবং ঋগ্বেদের ১।১৩।৭১ মন্ত্র)। এর তাৎপর্য হচ্ছে জীবন এক যজ্ঞ, এই যজ্ঞের যজমান কর্তা জীবনধারী জীব। জীবের জীবনে প্রকাশ ও বিশ্রাম উভয়েরই প্রয়োজন আছে। উষার প্রকাশে আমরা থাকি কর্মমুখর। রাত্রির অন্ধকারে আমরা থাকি বিশ্রামে। পরের দিন কর্ম করার শক্তি বা প্রেরণা— রাত্রিতে বিশ্রামের ফলেই প্রাপ্ত হই। দিনে শক্তির ক্ষয় ও ক্লান্তি রাত্রির আঁধার আঁচল বিশ্রাম অপনোদন করে—তাই মানুষের জীবনযজ্ঞে তাদের বার বার আহ্বান করা হয়।

বেদের মরমী ভাষ্যকার ঋষি অনির্বাণের ভাষায়—"উষা দ্যুলোকের মেয়ে, ভগের বোন, সূর্যের পত্নী, অগ্নির মাতা—'জননী তনয়া জায়া সহোদরারূপে নারীত্বের সকল বিভবই ঋষি তাঁর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।... তাঁদের মধ্যে যে রূপের বৈষম্য, তা স্বীকার করে নিয়েও বেদে বারবার তাঁদের নিগূঢ় সাম্যের উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে।" (বেদ মীমাংসা, দ্বিতীয় খণ্ড, অনির্বাণ)। উষা এবং রাত্রি, একটি আলো একটি আঁধার বা কালো। আলো-আঁধার নিয়েই সত্তার পূর্ণতা। উষা মিত্রের দীপ্তি। রাত্রি বরুণের দীপ্তি। ঋষি অনির্বাণকৃত বেদ মীমাংসার ভাষায় আবার বলি—"নারীত্বের সমস্ত মাধুরীতে মণ্ডিত করে আর কোনও দেবতাকেই ঋষিরা হৃদয়ের এত কাছে টেনে আনেননি। অথচ উষার

পটভূমিকায় নিসর্গের শোভাকেও এক মুহূর্তের জন্যে তাঁরা ভোলেননি। তাইতো প্রকৃতি নারী আর দেবী-মহাশক্তির এই তিনটি বিভাবের এক আশ্চর্য সঙ্গম ঘটেছে বৈদিক উষার রূপায়ণে।

সরস্বতী

সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থানুযায়ী (শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ), বাক্‌তত্ত্ব বা বাক্‌শক্তিই সরস্বতী। বেদে সরস্বতীর বন্দনা বা স্তুতি দেখা যায়। ঋগ্বেদের পাঁচটি সূক্তের মধ্যে তিনটি সূক্ত যথা—ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্ত, সপ্তম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তে সরস্বতীর স্তুতির উল্লেখ আছে। এছাড়াও যজুর্বেদের একুশ অধ্যায়ে ১৩, ৩৬, ৩৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ ইত্যাদি মন্ত্রে এবং ১৯ অধ্যায়ের ৯৩ সংখ্যক মন্ত্রে সরস্বতীর স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। বেদে সরস্বতীর নদী ও বাক্ এই দুটি রূপই দৃষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন এই সরস্বতী কে? নদী না বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী? নিরুক্তকার যাস্কাচার্য ও বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য দুই-ই অর্থাৎ সরস্বতীর দুই রূপই স্বীকার করেছেন। সরস্বতী একইসঙ্গে নদী এবং দেবী উভয়ই। বেদমূর্তি অনির্বাণের ভাষায়—“অধিভূত দৃষ্টিতে যা জলের ধারা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা-ই প্রাণের ধারা এবং অধিদৈব দৃষ্টিতে বিশ্বজনীন চিৎপ্রবাহ। ঋক্ সংহিতায় সরস্বতীর বর্ণনায় তিনটি ভাবই মিশে গেছে—আমাদের গঙ্গা যেমন একাধারে নদী, নারী এবং মা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই অধিভূত রূপের পিছনে আর একটি রূপেরও ব্যঞ্জনা রয়েছে—কখনও বা তা স্পষ্ট অভিব্যক্ত।

ঋষি এক জায়গায় বিগলিত হয়ে সম্বোধন করছেন, ‘তোমার মতো মা নাই, তোমার মতো নদী নাই, তোমার মতো দেবী নাই ওগো সরস্বতী।’ আরেক জায়গায় সরস্বতীর মাতৃমূর্তির অপূর্ব বর্ণনা ফুটে উঠেছে তাঁর স্তনের প্রশস্তিতে, “তোমার যে-স্তন উচ্ছল, যা আনন্দময়, যা দিয়ে পুষ্টকর বরেণ্য যা-কিছু, যা নিহিত করে রত্ন খুঁজে পায় আলো, যা স্বচ্ছন্দে ঢেলে দেয়, ওগো সরস্বতী, তাকে এইখানে বাড়িয়ে দাও পানের জন্য। এখানে মায়ের ছবিতে নদী ঢাকা পড়ে গেছে।” (বেদ মীমাংসা, দ্বিতীয়খণ্ড, অনির্বাণ)। ঋগ্বেদের

দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তটিকে বলা হয় নদীসূক্ত। এই সূক্তেও সরস্বতী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সরস্বতী বলতে নদী ও বাক্ উভয়কেই বোঝায়। নদী যেমন গতিময়ী বা গতিশীলা। বিদ্যার দেবী বাক্‌ও সেইরূপ গতিশীলা। গদ্য-পদ্যময়ী বাক্‌রূপিণী এই দেবীর গতিতে রয়েছে এক চিত্তাকর্ষক সুললিত ছন্দ। মানুষ তার জ্ঞানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হয় দেবী সরস্বতীর কৃপা প্রসাদে। নদী যেমন শতসহস্র ধারায় প্রবাহিত হয় সেইরূপ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীও ভাষার শতসহস্র ধারায় সর্বত্র প্রবাহিতা। বাক্ বা ভাষা যেন নদীসদৃশা। এই বাক্ ভাষারূপিণী দেবীর সর্বত্রই অবাধগতি। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ এই সরস্বতী বা বাক্ দেবীর অনুগ্রহ লাভের জন্য সদা সচেষ্ট। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪১ সূক্তে ১৬ মন্ত্রে ঋষি গৃৎসমদ দেবীকে বন্দনা করছেন—

অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি।।

“অম্বিতমে” অর্থাৎ মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মা—যার তুল্য মা আর হবে না। ‘নদীতমে’ অর্থাৎ নদী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা—এই নদীর মতো নদী আর নেই। “দেবীতমে সরস্বতী”—হে সরস্বতী, তোমার মতো দেবীও নেই, তুমি দেবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অর্থ—আমরা মূর্খ বালকের ন্যায় রয়েছি, আমাদের উত্তম জ্ঞান প্রদান করে সুসমৃদ্ধ করো। মন্ত্রোক্ত সম্বোধন হতেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে সরস্বতীকে বেদের ঋষিগণ তথা আর্যগণ কত উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানবশরীরে এক প্রকার রসের ধারা সদা প্রবহমান। একে শিরো-মেরু-দ্রব বলা হয় (Cerebro-spinal fluid)। একেই বেদের ভাষায় সরস্বতী নদী বলা হয়। এই নদীর রসই বেদের ভাষায় সোম। এই সোমই জীবাত্মারূপী ইন্দ্র পান করে শক্তি-বল-বীর্য প্রাপ্ত হন। এককথায় শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই রস দ্বারাই পুষ্ট ও শক্তিশালী হয়।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে, তৃতীয় সূক্তে, ১১-১২ মন্ত্রে বলা হয়েছে—

“চোদয়িত্রী সূনতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী।। ১

মহো অর্নঃ সরস্বতী, প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি।। ২”

অনুবাদঃ ১। সত্য বাক্য ভাষণের প্রেরণাদাত্রী। মেধাবীগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎসাহ দানকারী, দেবী সরস্বতী আমাদের এই যজ্ঞকে স্বীকার করত আমাদের অভীষ্ট বৈভব প্রদান করো।

২। হে দেবী সরস্বতী, তুমি নদীরূপে প্রভূত জল প্রবাহিত বা সৃজন করো, এবং সকল জ্ঞান প্রেরণ করো বা প্রজ্বলিত করো।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্র দুটির সহজ ভাবার্থ হচ্ছে—দেবী সরস্বতী আমাদের প্রেরণা দেন, চেতনা দেন এবং চিন্তা করার শক্তি প্রদান করেন। বুদ্ধির সমগ্রক্ষেত্রে দেবী সরস্বতী একমাত্র অধীশ্বরী। আমাদের শরীরে ও মনে চিন্তা-ভাবনার যে যজ্ঞ চলতে থাকে তা নিয়ন্ত্রণ করেন দেবী সরস্বতী। ঋগ্বেদের ৬।৬১।২ মন্ত্রে, দেবী সরস্বতীকে বিবিধ কারণে বলবতী বলা হয়েছে। এর অভিপ্রায় সরস্বতী বা বাক্‌রূপা জ্ঞানই বল বা শক্তি। এইজন্যই বলা হয় Knowledge is Power.

যজুর্বেদে উনিশ অধ্যায়ে, ৮১-৯৫ মন্ত্রে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে যে সরস্বতী ও অশ্বিনীদ্বয় মিলিত হয়ে সমস্ত শরীর নির্মাণ করেন। এরা মিলিত হয়ে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে নির্মাণ করেন—তার বিবরণ যজুর্বেদের ওই মন্ত্রগুলিতে পাওয়া যায়। অশ্বিনীদ্বয় নেত্রকে জ্যোতি প্রদান করেন। সরস্বতী প্রাণশক্তি ও বীর্যপ্রদান করেন। যজুর্বেদের কুড়ি ও একুশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সরস্বতী ও অশ্বিনীদ্বয় মিলে জীবাত্মারূপী ইন্দ্রকে নেত্রজ্যোতি, প্রাণ, বীর্য, বাক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি, সুমতি, ওজ, উৎসাহ-আদি প্রদান করেন। যজুর্বেদে ৩৪।১১ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে—“পঞ্চমদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশোঅভবত্ সরিত্।।”—অর্থাৎ পাঁচটি নদী আপন প্রবাহসহ সরস্বতী নদীতে এসে মিশেছে। তারা পাঁচটি দেশে নিজেদের নাম পরিহার করে সরস্বতী নামে খ্যাত হয়েছে অথবা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দেহবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সরস্বতী হচ্ছে শিরো-মেরুদ্রব বা Cero spinal fluid। এর সঙ্গে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধযুক্ত (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,

জিহ্বা ও ত্বক)। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানতন্তুসমূহ (Sensory nerves) এই সরস্বতী-রূপা শিরো-মেরুদ্রবে এসে মিলিত হয়। জ্ঞানতন্তু দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান বুদ্ধির নিকট পৌঁছায়। বুদ্ধি ওই বিষয়ে নির্ণয় গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী কার্য করার জন্য ক্রিয়াতন্তুকে (Motor Nerves) নির্দেশ দেয়। ওই নির্দেশ অনুসারে ক্রিয়াতন্তু অর্থাৎ পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থকে নির্দিষ্ট কার্য করার জন্য প্রেরিত করে। এটাই হচ্ছে পাঁচ নদীর সরস্বতীতে এসে মিলে যাওয়া এবং পাঁচ রূপে বিভক্ত হয়ে কার্য সম্পন্ন করা।

যোগবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্রহ্মনাড়ীস্থিত ব্রহ্মচেতনাই সরস্বতী। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রিণী ও চিত্রিণী—এই পাঁচটি নাড়ী হতে যখন চেতনার স্রোত ব্রহ্মনাড়ীতে বা সরস্বতীতে এসে মিলিত হয়—তখন ওইসব নাড়ী ভৌতিক বা প্রাণিক চেতনা দিব্যচেতনা বা ব্রহ্মচেতনায় রূপান্তরিত হয়, অনন্তর ওই ব্রহ্মচেতনার দিব্যদ্যুতি বাক্‌রূপা সরস্বতীর মাধ্যমে পঞ্চভূতাত্মক শরীরে ও জগতে ছড়িয়ে পড়ে। অথর্ব বেদে সপ্তমকাণ্ডের ৫৭ সূক্তটি সরস্বতী সূক্ত নামে অভিহিত। এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে—

“সপ্তক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে, পিত্রে পুত্রাসো অপ্যবীবৃতন্নৃতানি।
উভে ইদস্যোভে অস্য রাজত উভে যততে উভে অস্য পুষ্যতঃ।।”

অর্থাৎ মরুৎগণ শিশুর জন্য সাত দিব্যরস প্রদান করেন। যেরূপ পুত্র আপন পিতাকে সৎ কর্ম দ্বারা সেবা করেন, সেরূপ এরা শিশুকে সেবা করেন। এই সাত দিব্যরসের মধ্যে দুই রস মুখ্য, যা শিশুটির বর্ধনে ও পোষণে সাহায্য করে। বেদ-মনীষীদের দৃষ্টিতে মন্ত্রটির অনেক অর্থ হয়। উল্লিখিত মন্ত্রটিতে ‘শিশবে’ অর্থাৎ শিশু বা জীবাত্মা—তার জন্য সপ্ত বা সাত দিব্যরস প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ সূর্যের সপ্তরশ্মি। এই সপ্তরশ্মিই শিশুরূপী জীবাত্মার প্রাণ। সূর্যের এই আলো, বাতাস বা মরুত্‌গণের মাধ্যমে শিশুরূপী জীবাত্মা প্রাপ্ত হয়। সূর্যের রশ্মির আলোই সরস্বতী বা প্রাণশক্তি। আবার শিশুরূপী জীবাত্মার দেহে যে সপ্তধাতু অর্থাৎ রক্ত, পিত্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র বা রজ বিদ্যমান আছে তাতে প্রাণ-অপান-ব্যান আদি মরুত্‌গণ রস সঞ্চার করে

শিশুরূপী জীবাত্মার শরীরকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখেন। ঋগ্বেদে ৬।৬১।১০, মন্ত্রে অথর্ব বেদের ওই মন্ত্রকেই একটু অন্যরকমভাবে বলা হয়েছে—

"উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।
সরস্বতী স্তোম্যা ভূত।।"

অনুবাদ ঃ প্রিয়জনদের মধ্যে অতি প্রিয়, সাত বোনসহ দেবী সরস্বতী আমাদের জন্য নিত্য স্তুত্য। অথর্ব বেদ-উক্ত মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে—"সপ্তক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে।"—মন্ত্রের এই অংশটুকুর অর্থ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর উপাধ্যায় ও শ্রী অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বৈদিক কোশের" (তৃতীয় খণ্ড) মতে সাত শিরোস্থিত প্রাণের দ্বারা যুক্ত এই শরীরের মধ্যে বিদ্যমান 'শিশু'রূপী আত্মা। অথর্ব বেদের মতে সরস্বতীতে সাত নদী এসে মিলেছে, আবার ঋগ্বেদের মতে সরস্বতীর সঙ্গে থাকে সাত বোন। এদের মধ্যে দু-জন মুখ্য বা প্রধান, এরা সব সময়ই সরস্বতীর সঙ্গে থেকে সরস্বতীর শোভা ও পুষ্টি বর্ধন করে। এই সাতবোন কারা? এরা সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সাতটি নদী। এই সাতনদীর পরিচয় কী? জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে—মানুষের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিই—এই সাত নদী। এদের মধ্যে মুখ্য বোন কোন দু-জনা? এরা হল মানবশরীরের সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুতন্তু বা জ্ঞানতন্তু (Sensory nerves, Afferent), এবং আজ্ঞাবাহী স্নায়ুতন্তু বা ক্রিয়াতন্তু (Motor nerves, Efferent)। এই দুই ধরনের স্নায়ুতন্তু সরস্বতীর (অর্থাৎ শিরো-মেরুদ্রব বা cerebro-spinal fluid) কার্যকে নিরন্তর চালু বা সক্রিয় রাখে। সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুতন্তু বা জ্ঞানতন্তু বাইরে থেকে বিষয়-সংবাদ সংগ্রহ করে এবং বুদ্ধির কাছে নির্ণয়ের জন্য প্রেরণ করে, বুদ্ধির নির্ণয়কে আজ্ঞাবাহী স্নায়ুতন্তু বা ক্রিয়াতন্তু কার্যান্বিত করে। এইভাবে মানুষের সমগ্র জীবনে আদান-প্রদানের ক্রিয়া চলতে থাকে।

ঋগ্বেদের ৬।৬১।১১, ৬।৬১।১২ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক, এবং দ্যুলোকে ব্যাপ্ত থেকে তিনলোককে পুষ্ট করেন। এইজন্য এনাকে ঋগ্বেদের মন্ত্রে 'ত্রিষধস্থা' অর্থাৎ তিন স্থানেই বিরাজিতা বলা হয়েছে। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সরস্বতীর এই তিনটি স্থান হল—দ্যুলোক অর্থাৎ মানবশরীরের শিরোভাগ, শিরো-মেরু (cerebro-spinal fluid) বা সরস্বতীর

মুখ্যস্থান। এখানে অর্থাৎ মস্তিষ্কের দুই অর্ধভাগে (ডান মস্তিষ্ক ও বাম মস্তিষ্ক) এক এক করে দুটি অমৃত কলস আছে। মানুষের শরীরে অন্তরিক্ষলোক হচ্ছে মস্তিষ্কের নিচে স্থিত গলদেশ। এখানে পিনিয়াল ও পিটুইটারি (Pineal, Pituitary) গ্রন্থির মধ্যে থেলমস্-এ (Thalamas) তৃতীয় অমৃত কলস আছে। শরীরের মস্তিষ্ক তথা গলার নিচের অংশকে ভূলোক বা পৃথিবীলোক বলা হয়। মেডুলায় (Medulla) চতুর্থ অমৃত কলস আছে। মেডুলা মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্যে মধ্যস্থতার কার্য সম্পন্ন করে। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এইভাবে দেবী সরস্বতী তিনলোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং তিনলোককে অমৃতক্ষরণের দ্বারা পুষ্ট করেন।

অনেক বেদ-মনীষীর মতে বেদে 'সপ্ত' সংখ্যাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। ঋষি অরবিন্দের মতে, এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হল, তিনটি ঐহিক তত্ত্বের সহিত তিনটি দিব্য তত্ত্ব যোগ দিয়ে আর তার মধ্যে একটি সপ্তম তত্ত্ব অর্থাৎ যোগসূত্ররূপ অন্য তত্ত্ব যোগ দেওয়া হয়। এই সপ্তম তত্ত্বটিই সত্য-চেতনা, "ঋতম্ বৃহৎ" যার নাম পরে হল বিজ্ঞান বা মহঃ। এই শেষ পদটির অর্থ মহৎ, সুতরাং ইহা 'বৃহৎ'-এর সমার্থক। ঋষি অরবিন্দের মতে তিনটি ঐহিক ও তিনটি দিব্যতত্ত্ব হল—মন, প্রাণ ও শরীর (ঐহিক) এবং সৎ, চিৎ, আনন্দ (দিব্য)। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে, তৃতীয় সূক্তে, দ্বাদশ মন্ত্রে ঋষি মধুছন্দা বলেছেন—"মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতরতি কেতুনা।" অর্থাৎ সরস্বতী আমাদের হৃদয় বা চিত্তরূপী সমুদ্র কেতু দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপ্ত করেন। বেদ-মনীষীদের দৃষ্টিতে সরস্বতী বিশুদ্ধ সত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দিব্যাতিদিব্য পরম জ্ঞান। তিনি অনন্ত আনন্দময় পরমব্রহ্মের চিদ্-ঐশ্বর্য বা জ্ঞানময় সত্তা। নদীরূপে সরস্বতী ঋষি অরবিন্দের ভাষায়—"The river inspiration flowing from the truth consciouseness।" আবার দেবীর বাক্‌রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছেন—"Saraswati is the goddess of word. The goddes of divine Inspiration." (Secrets of the Veda, Sri Aurobindo). সরস্বতী শব্দের মৌলিক অর্থ 'স্রোতস্বতী' বা জলের ধারা—নদীরূপে, বাক্‌রূপে উভয়রূপেই তাঁর এই নাম সার্থক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"বাগ্ বৈ

ব্রহ্ম"। বাণী বস্তুত পরমাত্মার প্রত্যক্ষরূপ। বাণী দ্বারাই পরমাত্মার মহিমা জ্ঞাত হওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, "বাণী বৈ বিরাট।" বাণীরূপা সরস্বতী ব্রহ্মের বিরাট রূপ। বাণীরূপে সরস্বতী আমাদের বিচার ভাবনাকে প্রকট করে। মনের ভাবকে প্রকাশ করার একমাত্র সাধন বাণী। আমাদের মন যেন এক ভাবনা-চিন্তার পাহাড়। এই পাহাড়ের বুকে বাণীরূপা সরস্বতী যেন এক নদীপথ। বাণীরূপা নদীপথেই মনের বিচার এবং ভাবনা সংকল্পরূপী জল প্রবাহিত হয়। সরস্বতীর নদী-নাম সার্থক হয়। বেদাদি শাস্ত্রমতে ব্রহ্ম সর্বব্যাপক অনন্ত সত্তাবিশেষ। ভূলোক-দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক সর্বত্র ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ব্রহ্মের ন্যায় সরস্বতীও বাণীরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। এইজন্যই ঋগ্বেদের ১০।১১৪।৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে—"যাবদ্ ব্রহ্ম বিশিষ্টিতং তাবতী বাক।" অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যাপ্ত ততদূর পর্যন্ত দেবী সরস্বতীও বাক্‌রূপে ব্যক্ত। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তথা মানবদেহই দেবী সরস্বতীর বীণা। ব্রহ্মাণ্ড চলে কতকগুলি নিয়মছন্দের ঋতপথে, এই নিয়মছন্দই ওই বীণার তার। নিয়মছন্দের ঋতপথ অর্থাৎ ওই বীণা থেকে নির্গত হওয়া সপ্তসুরের সংগীতপ্রবাহ বা নাদলহরী। মানবদেহের ক্ষেত্রে—দেহবীণা, দেহস্থ গ্রন্থিগুলি ওই বীণার তার। গ্রন্থির নিঃসৃত রসই সংগীত প্রবাহ। দেহস্থ গ্রন্থির সুষম রস ক্ষরণে মানুষ হয় সুস্বাস্থ্যের তথা দিব্যজ্ঞান ও প্রতিভার অধিকারী। ফলে সরস্বতীর দিব্যরূপ, জ্ঞানময়রূপ, সংগীতময়রূপ মানবজীবন আধারে হয় প্রস্ফুটিত। এইরূপ দিব্য মানব-মানবীই দেবীর বীণার সংগীতরূপ।

অদিতি

ঋগ্বেদ, ১।৮৯।১০, যজুর্বেদ, ২৫।২৩, অথর্ব বেদে, ৭।৬।১, মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষম, অদিতির্মাতা স পিতা সপুত্রঃ।
বিশ্বেদেবাঅদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।।"

মন্ত্রটির অর্থঃ দেবমাতা অদিতিই দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক, তিনিই জগতের মাতা, তিনিই জগতের পিতা এবং তিনিই পুত্র। তিনিই সকল দেব ও দেবশক্তি

বা দিব্যশক্তি। তিনিই যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, দেব ও অসুর মিলে পঞ্চজন। সংসারে যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে বা হবে—সবাই অদিতি। মন্ত্রটিতে বিশ্বাত্মারূপে অদিতির কথা বলা হয়েছে। ঋষির অনুভবে অদিতি এক অখণ্ড সত্তারূপে প্রতিভাত। বৈদিক দৃষ্টিতে বা ভাবনায় অদিতি অখণ্ডতার প্রতীক। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বজগৎ এক অখণ্ড সত্তা। সকল ভাবনা দর্শন যে অখণ্ড সত্তায় উপনীত হয়ে পরমতা বা পরমগতি প্রাপ্ত হয় তিনিই অদিতি। সমগ্র সৃষ্টির মূলে যে অদ্বয় অখণ্ড সত্তা তত্ত্বরূপে বিদ্যমান তিনিই অদিতি। বিজ্ঞানবেত্তা বেদ-মনীষী স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁর প্রণীত 'বেদ ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলেছেন—সৃষ্টির আদিতে এক অব্যক্ত অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এই অব্যক্ত অবস্থার নাম অখণ্ড বা বিভু অবস্থা। এটাই কারণসমুদ্র বা অদিতি। ঋগ্বেদের ১০।১৯০ সূক্তে যে "তত সমুদ্রো অর্ণবঃ"-র কথা বলা হয়েছে—অদিতিই সেই কারণসমুদ্র বা কারণবারি। অদিতি দেবমাতা। বেদে এই দেবমাতার মূর্তি এমন এক কুয়াশার আবরণ দিয়ে ঘেরা যা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা এমনকি কল্পনা ও ওই কুয়াশার আবরণ ভেদ করতে সমর্থ হয় না। সৃষ্টির আদিতে যে অনন্ত অপরিচ্ছন্ন অস্তিত্ব নিহিত তাই অদিতি। এই অদিতির কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৮ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে আভাসে বা ইঙ্গিতে বলেছেন—"অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।" গীতার ভাষায়—যা আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত, অন্তে পুনরায় অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা-ই অদিতি। বেদের দৃষ্টিতে যার ভেতরে সমস্ত পদার্থ অথবা বস্তু ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাকেই অদিতি বলা হয়। অদিতি মাতৃত্বের চরম ও পরম অনন্ত সত্তা বিশেষ। ইনিই নিরতিশয় (পরম) অখণ্ড বিভু পদার্থ যা সমগ্র দ্রব্য তথা ক্রিয়ার আশ্রয়। এখন প্রশ্ন আশ্রয়ের ওই অখণ্ড বিভু পদার্থটি কী? এর উত্তর চিৎ বা চৈতন্য। এক অখণ্ড চৈতন্যের আশ্রয়েই নিখিল জগৎ চলছে। চৈতন্য পৃথক, জড় পৃথক, দেশ পৃথক, কাল পৃথক, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম পৃথক—এই পৃথকীকরণ বা ভেদবোধ সত্য নয়। এইরূপ ভেদবোধ ব্যবহারিক সত্য—ব্যবহারিক জগতে কাজ চালাবার জন্য। স্বরূপত চৈতন্যের বাইরে বা চৈতন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবী বা কোনও

বস্তুর অস্তিত্বের বিদ্যমানতার বা থাকার প্রমাণ নেই। চৈতন্যই আকাশরূপে জড়জগৎকে স্থান দিয়েছে। চৈতন্যই কালরূপে জগৎকে প্রবাহরূপে প্রবাহিত করছে। এই চৈতন্যকে এক পরিচ্ছিন্ন সাড়ে তিন হাত দেহের মাপে কর্তন করে বা কেটে আমরা ভাবি যে চৈতন্য এলাকার বাইরে এক প্রকাণ্ড অনাত্মীয় জগৎ পড়ে রয়েছে। এইরূপে দশ-বিশ-পঞ্চাশ অথবা অসংখ্যলোক আমার থেকে বাইরে পৃথকরূপে বিদ্যমান। মাটি-জল-আলো-বাতাস-আকাশ সব আমার থেকে পৃথক বা আলাদা। কিন্তু সত্য সত্যই এইসব বস্তু বা ব্যক্তি যে আমার থেকে আলাদা বা পৃথক হয়ে বিরাজ করছে, একথা কে বলল? সবকিছু আমার থেকে আলাদা হয়ে বাইরে আছে, এরূপ আমরা কেন ভাবি? এর উত্তর দেওয়ার সামর্থ্যও আমাদের নেই। মাটির তৈরি ঘট, কলস, সরা, হাঁড়ি, কটোরা, বাটি বা বিভিন্ন মৃৎপাত্র কি মাটি থেকে আলাদা? ওইসব পাত্রের মৃন্ময় সত্তার অস্তিত্ব কি মাটির মধ্যে নেই? সুবর্ণের তৈরি বিভিন্ন অলংকার— যথা, কুণ্ডল, বলয়, হার, বালা, আংটি ইত্যাদির মধ্যে কি স্বর্ণের অস্তিত্ব নেই কিংবা স্বর্ণের মধ্যে ওই সকল অলংকারের কি অস্তিত্ব নেই? মাটি বা সুবর্ণের মতো চিৎ বা চৈতন্য দিয়ে নির্মিত আমার আপনার সকলের তথা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি বস্তু বা পদার্থ। এই চৈতন্যকেই শ্রুতি বলেছেন ব্রহ্ম-আত্মা-চিদাকাশ। এই চৈতন্যকেই শ্রীশ্রী চণ্ডীতে পঞ্চম অধ্যায়ে উত্তর চরিত্রে, দেবীদূত সংবাদে বলা হয়েছে—

"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।। (১৭, ১৮, ১৯, শ্রীশ্রী চণ্ডী)।
ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমো নমঃ।। (৭৭, ঐ)
চিতিরূপেন যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। (৭৮, ৭৯, ৮০ ঐ)

অনুবাদ ঃ যে দেবী সর্বভূতে চেতনারূপে প্রসিদ্ধা তাঁকে নমস্কার। তাঁকে নমস্কার। নমস্কার নমস্কার।

যিনি সকল প্রাণীতে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা

এবং যিনি পৃথিবী-আদি স্থূল ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের প্রেরয়িত্রী, সেই বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবীকে পুনঃপুন প্রণাম।

যিনি চিৎশক্তি রূপে এই সমগ্র জগৎব্যাপী অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার পুনঃপুন প্রণাম।

চতুর্দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই দশ ইন্দ্রিয়ের (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও প্রজাপতি। মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—এই চারটি অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে চন্দ্র, ব্রহ্মা, শংকর ও অচ্যুত। অর্থাৎ এরা সকলেই (দেবতাগণ) এক অখণ্ড চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির কার্যক্ষেত্রানুসারে বিভিন্ন নাম ও রূপের প্রকাশ।

আমার আচার্য্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ তাঁর কঠোপনিষদের ভাষ্যে বলেছেন—"আত্মাকে পুরুষরূপে, শক্তি বা সম্ভূতিরূপে, আবার জীবরূপে জানতে হবে। যিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, যার থেকে তাপ, তাপ থেকে কারণশরীর আর তা থেকে ভূত শরীর। তাদের ভিতর যিনি ফুটেছিলেন দৃক্শক্তিরূপে, তিনিই বাহিরের দিক দেখছেন। ভূত বাহির দেখে না, তিনিই দেখছেন—এটাই দৃক্শক্তির অনুপ্রবেশ। এটাই পুরুষতত্ত্ব।" সেই তত্ত্বকে অর্থাৎ ওই পুরুষতত্ত্বকে শক্তিরূপে যখন দর্শন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় অদিতি। বেদে "অদিতি ব্রহ্ম শক্তিরূপে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে, প্রথম অধ্যায়ের নবম কাণ্ডে, প্রথম মন্ত্রে ঋষিতনয় শলাবতের পুত্র শিলক, জীবল-পুত্র প্রবাহনকে জিজ্ঞাসা করেন—

"অস্য লোকস্য কা গতিরিতি? আকাশ ইতি হোবাচ। সর্বানি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হি এ বৈভ্যো জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্।।"—অর্থাৎ, ঋষিতনয় শিলক বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ প্রবাহন, এই লোকের অর্থাৎ এই পৃথিবীর গতি তাহলে কী? কার উপর এই পৃথিবী লোকের প্রতিষ্ঠা? প্রবাহন বললেন—আকাশ, এই নিখিলের যা কিছু, তা সবার উৎপত্তিস্থল আকাশ।

আবার এই আকাশেই হয় সবার লয়। সবার চেয়ে আকাশই শ্রেষ্ঠ। আকাশই সবার আশ্রয়, পরমগতি, এই আকাশই উপনিষদ বা শ্রুতি কথিত চিদাকাশ। বিজ্ঞান যাকে ইথার বলে, তা এই চিদাকাশের মূর্তিবিশেষ। চরম আধারভাবে বা রূপে দেখলে যা চৈতন্য, তাই-ই অপেক্ষাকৃত খাটো করে দেখলে হয় আকাশ। দেশ-কাল-ইথার-আকাশ। চরম বা পরম আধার যে অখণ্ড চৈতন্য, তারই অপেক্ষাকৃত ছোটরূপ দেশ, কাল-ইথার বা আকাশ। ওই অপেক্ষাকৃত ছোট বস্তুগুলির চরম আধার যে অবিচ্ছিন্ন বা অখণ্ড চৈতন্যাকাশ, তা-ই অদি । ইনিই বিশ্বভুবনের আশ্রয় এবং গতি। পুরাণে আছে ঋষি কশ্যপের দুই পত্নী অদিতি ও দিতি। দিতি 'দিত্' ধাতু থেকে উৎপন্ন যার অর্থ বিচ্ছিন্ন বা বিভাগ, খণ্ড বা টুকরো, দ্বৈত বা দুই। বেদ ভাষ্যকার সায়নাচার্য 'দিতি' শব্দের অর্থ করেছেন—অসুর জননী। অদিতি অর্থ অখণ্ড, অদ্বৈত, পূর্ণ। অথর্ব বেদ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় দিতি শব্দ এবং অদিতি শব্দ পাশাপাশি আছে। দৈত্যশব্দ বেদে দৃষ্ট হয় না কিন্তু গীতা-উপনিষদে আছে। বেদে অদিতির উদ্দেশে কোনও সূক্ত দেখা যায় না কিন্তু বেদের কতিপয় ঋকে বা মন্ত্রে অদিতি শব্দ বেশ কয়েক বার দেখা যায়। যে পর্দার আবরণে আবৃত হয়ে বৃহৎ বস্তু ছোট হয়, অখণ্ড খণ্ডিত হয় ওই পর্দার নাম অবিদ্যা। এটাই হচ্ছে অদিতি এবং দিতির রহস্য। অনুভবকে অনন্ত রূপে দেখলে যা পাওয়া যাবে তার নাম অদিতি। ভূলোক-দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষে তখন আর অদিতির পরিব্যাপ্ত রূপটি গোপন থাকে না। যদি ওই অনন্ত অখণ্ড চৈতন্যকে পর্দার আবরণ দিয়ে অনুভব করে খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন বা ভাগ করি তাহলে যা পাই তার নাম দিতি। অদিতি যে দেবমাতা তার রহস্য এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভেদ দৃষ্টি সমগ্র দৃষ্টিতে দেবতার আবির্ভাব বা জন্ম, অথবা দিব্যচেতনা বা ভাবনার জন্ম। এই দিব্য বা দেবভাবনার জন্মদাত্রী-রূপে অদিতি দেবমাতা। অপরদিকে ভেদ দৃষ্টি বা খণ্ডিত বুদ্ধিতে হয় দৈত্যের জন্ম বা আবির্ভাব। এই জন্য দিতি দৈত্য বা অসুরজননী, বেদের দৃষ্টি বহু বা অনেকের পিছনে একত্বের ভাবনা। দেবতা বহু বা অনেক একথা বেদের অভিপ্রেত বা অভিমত নয়। বেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য-আদি সবই সর্বব্যাপী এক অখণ্ড বস্তু। একথা বেদে বারবার দৃষ্ট হয়। এই কারণেই দেবগণ অদিতির সন্তান।

যজুর্বেদে ২১/৫ মন্ত্রে বলা হয়েছে....সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম। ..সুশর্মানম দিতিং সুপ্রণীতিম্।। এই বেদের ২৯/৬০ মন্ত্রে বলা হয়েছে—"অদিতে বিষ্ণুপত্নৈ।।" অর্থাৎ ঋতের পত্নী ঋত-শাশ্বত তত্ত্বকে ঋত বলা হয়। সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান শাশ্বত নিয়মের সংজ্ঞা ঋত। বেদে এই শাশ্বত তত্ত্বকে বিষ্ণু বলা হয়েছে। বিষ্ণুর অর্থ যা জগতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিষ্ণুকে জগতের পালকরূপে মান্য করা হয় এবং তাঁর এই পালিকা শক্তিকে অদিতি বলা হয়। এই জন্য অদিতিকে যজুর্বেদে ঋত অর্থাৎ বিষ্ণুর পত্নী বলা হয়েছে। সৃষ্টির ক্রিয়া শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই জন্য ঋত অথবা বিষ্ণুর ক্রিয়াত্মিকা শক্তিই অদিতি। অদিতি শক্তিপুঞ্জ। শক্তি বা উর্জার বিশ্বব্যাপীরূপ। তাঁর (অদিতির) স্ফুরণই সৃষ্টি। এই কারণেই অদিতি বিষ্ণুপত্নী। যজুর্বেদে ৯/৫ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, শক্তির স্রোত অদিতিকে নমস্কার করি। বিশ্বের বুকে যে গতি, প্রগতি অথবা বিকাশ দেখা যায়—তার আধার অদিতি বা বিশ্বব্যাপী উর্জা। উর্জা বা শক্তি যেখানে প্রকাশ সেখানে এই প্রকাশ বা দীপ্তি দেবশব্দ বাচ্য বা দেবতা বোধক এই দিব্য প্রকাশ বা দীপ্তি অদিতিরূপা উর্জা থেকে আসে, তাই তিনি দেবমাতা বা সবার মাতা। যজুর্বেদের ৪/২১ মন্ত্রে অদিতির অর্থাৎ উর্জা বা শক্তির বিভিন্ন রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে অদিতিই অষ্টবসু। অষ্টবসু অর্থাৎ দেবতাদের একটি গণ বা সমূহ। যথা—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর বা ধব, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস। কখনও কখনও 'আপ'-এর স্থানে 'অহ' কে গণনা করা হয়। ঋষি অনির্বাণের মতে—দেবতার একটি সাধারণ সংজ্ঞা 'বসু' অর্থ দীপক, জ্যোতির্ময়। সংহিতায় দেবতার প্রধান বিভূতি ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, রুদ্র, মরুৎগণ, উষা, সূর্য, পূষা আদিত্যগণ সবাই বসু।" [বেদ-মীমাংসা, ২য় খণ্ড, অনির্বাণ]। অদিতিই আদিত্য, রুদ্র অর্থাৎ সংসারের সংহার শক্তি। অদিতিই চন্দ্র অর্থাৎ সব প্রকারের আনন্দদাত্রী। এইভাবে বিভিন্ন রূপে প্রকট হয়ে অদিতি জগৎ-সংসারকে ভরণ-পোষণ করেন ও রক্ষা করেন।

ঋগ্বেদের ১০/৭২/৪ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, "অদিতের্দক্ষ অজায়ত দক্ষাদ্ উ-অদিতি পরি।" অর্থাৎ অদিতি হতে দক্ষ জন্মালেন, দক্ষ হতে আবার অদিতি জন্ম নিলেন। ওই মণ্ডলের ওই সূক্তের পরের মন্ত্রে (ঋগ্বেদের ১০/৭২/৫)

অদিতিকে দক্ষকন্যা বলা হয়েছে। যথা—'দক্ষ বা দুহিতাতব।" —অদিতি হতে দক্ষ জন্মালেন, আবার দক্ষ হতে অদিতি জন্মালেন। বেদ মন্ত্রের এই উক্তি পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়।

এই রহস্য ভেদ করতে হলে অদিতি কে? দক্ষ কে? তা জ্ঞাত হতে হবে। অদিতির অর্থ অখণ্ড, অবিভক্ত, অনির্বচনীয়, পূর্ণ। যে দ্রব্য বা পদার্থ কখনও নষ্ট হয় না, তাই অদিতি অর্থাৎ প্রকৃতি অথবা দ্রব্য অথবা Matter। এইরূপ 'দক্ষের' অর্থযোগ্য বা সামর্থ্য যুক্ত তত্ত্ব এবং ওই তত্ত্ব হচ্ছে ঊর্জা বা Energy। অতএব মন্ত্রের অর্থ হচ্ছে অদিতি অথবা Matter থেকে দক্ষ অর্থাৎ উর্জা বা Energy-র জন্ম হচ্ছে। এইভাবে উর্জা থেকেও Energy-র জন্ম হয়। এর অভিপ্রায় হচ্ছে দ্রব্যের স্থূলরূপ অদিতি। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি সক্রিয় বা গতি সম্পন্ন না হচ্ছে ততক্ষণ অবধি এটা অদিতি। যখনই অদিতির মধ্যে সক্রিয়তা বা গতি উৎপন্ন হয় তখনই সে উর্জা বা দক্ষরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে দ্রব্য এবং উর্জার পরস্পর রূপান্তরণ হয়ে চলেছে, হচ্ছে এবং থাকবে। এ এক শাশ্বত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকেই বেদ সন্ধ্যাভাষায় ব্যক্ত করে বলেছে যে, অদিতি থেকে দক্ষর উৎপত্তি এবং দক্ষ থেকে অদিতির উৎপত্তি হয়েছে। এই তথ্যকেই বর্তমান যুগের বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন (Einstein) সত্য সিদ্ধান্ত রূপে স্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে দ্রব্য এবং উর্জা উভয়ের মধ্যে কোনও দ্রব্যকেই নষ্ট করা যায় না এবং উৎপন্ন করাও যায় না। এই দুইয়ের কেবলমাত্র রূপান্তরণ হয়। দ্রব্য উর্জারূপে পরিবর্তিত হয় এবং উর্জা দ্রব্যরূপে রূপান্তরিত হয়। এই নিয়মকে দ্রব্য এবং উর্জার রূপান্তরণ বলা হয় (Conservation of Mass and Energy)।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই নিয়মের যে সূত্ররূপ দিয়েছেন তা হল—$E = MC^2$

এতে E – Energy বা উর্জা। M–Matter বা Mass বা দ্রব্য। C–speed of Light অর্থাৎ প্রকাশের গতি। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে, 'দক্ষ' নিপুণ কুশল সাধনশীল ব্যক্তিকে বলা হয়। অদিতি হচ্ছে মোক্ষদা বা মুক্তির দেবী। যিনি সাধনায় পারদর্শী, যাঁর কোনও মোহ নেই। বন্ধন নেই, তিনিই মুক্তিকে বা মোক্ষদারূপী

অদিতিকে লাভ করেন। এর অভিপ্রায় হচ্ছে খণ্ডচৈতন্যবিশিষ্ট জীব, যখন সাধন বা তপস্যাবলে অখণ্ড চেতনায় উপনীত হন, তখন তিনিই অদিতির গর্ভে স্থিত হন—এটাই জীবরূপী দক্ষের অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হওয়া। অদিতির গর্ভ থেকে অখণ্ড বা অদ্বৈত চেতনার দিব্যজ্ঞান নিয়ে তিনি যখন পুনরায় ব্যষ্টি চেতনায় ফিরে আসেন যোগশাস্ত্রের ভাষায় সাধকের যখন সমাধি থেকে ব্যুত্থান হয় (বিশেষরূপে উত্থান, সমাধি ভঙ্গের কালকে বুত্থান বলা হয়)। অথবা সাধক যখন অখণ্ড চেতনসমাধি থেকে পুনরায় লৌকিক জগতে ফিরে আসেন তখন দক্ষরূপী সেই সাধকই অখণ্ড চেতনারূপা অদিতি থেকে ফিরে আসেন বলেই, দক্ষরূপ সাধন অদিতি থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন এরূপ বলা হয়। লৌকিক জগতে ফিরে এসে দক্ষরূপী সেই সাধক যখন তাঁর সাধন বা সমাধিলব্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির কথা লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন—তখনই দক্ষ থেকে অদিতির কন্যারূপে জন্মগ্রহণ হয়। সাধনার ধনকে তিনি কন্যাসম বাৎসল্য স্নেহে আপন বুকে ধরে রাখেন এবং জীবন্মুক্তির স্বাদ অনুভব করেন। ঋগ্বেদের ১০/৭২/৮ মন্ত্রে উক্ত হয়েছে—

"অষ্টৌ পুত্রাসো জাতাস্তন্ব স্পরি।
দেবাঁ উপ প্রৈত্ সপ্তভিঃ পরামার্তণ্ড মাস্যত্।।"

অর্থাৎ অদিতি আট পুত্র প্রসব করেন। এদের মধ্যে সাতজনার জন্ম আগে হয়েছে, অষ্টম পুত্র মার্তণ্ড পরে জন্মগ্রহণ করেন। কোনও কোনও বেদ-মনীষীর দৃষ্টিতে এই আটজন হলেন—প্রকৃতি বা অদিতিজাত মহৎতত্ত্ব, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র (রূপ,রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ) এবং সূর্য। প্রথম সাত পুত্রের মধ্যে প্রকৃতিরূপা অদিতি সুক্ষ্ম অবস্থায় বিরাজ করেন। কিন্তু অষ্টম পুত্রের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে স্থূল সূর্যরূপে প্রকট করেন।

Dr.V. G . Rele তাঁর 'The Vedic Gods' গ্রন্থে অদিতির আট পুত্রের সম্পর্কে নিজ অভিমত জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে মস্তিষ্কের Rolandic Area তে (মস্তিষ্কের কার্যশালা), সংবেদনশীল ক্রিয়াতন্ত্রর সাতটি কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। এই সাতকেন্দ্র মাংসপেশীসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। এদের নির্দেশেই মাংসপেশীসমূহ বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। এই সাত

কেন্দ্র হল—১। শির (Head), ২। ধড় (Trunk), ৩। অঙ্গ বা শরীর অবয়ব (Limbs), ৪। নেত্র (Eyes), ৫। নাক (Nostrills), ৬। কান (Ears) ৭। জিহ্বা (Tongue)। বালকের জন্মের সাথে সাথেই এই সাতটি কেন্দ্র কার্য শুরু করে দেয়। এটাকেই বেদে রূপক আকারে বলা হয়েছে যে সাত পুত্র প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিল এবং জন্মের সাথে সাথে কাজও করা শুরু করেছিল। অষ্টম পুত্র মার্তণ্ড অর্থাৎ সূর্য। এটি বচনশক্তি বা বাক্‌শক্তির কেন্দ্র। নবজাত বালক জন্মের নয়-দশ মাস পর কথা বলতে সমর্থ হয়। এই জন্য মার্তণ্ড বা সূর্যরূপী বাকশক্তি কেন্দ্রের উদ্ভব বা জন্ম নবজাতকের জন্মের নয়-দশমাস পরে হয়—বেদে এটাই রূপক শৈলীতে বলা হয়েছে। Dr. V. G. Rele -এর মতে অদিতি মানব মস্তিষ্কের উপরিভাগে বিদ্যমান। এটি মস্তিষ্কের মধ্যস্থ সন্ধি বা সংযোগস্থল থেকে, মস্তিষ্কের দু-দিকে আধ-আধ ইঞ্চি চওড়ায় এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমাণে নিচের দিকে ছড়িয়ে আছে। মস্তিষ্কের এই ভাগকে Rolandic Area বলা হয়। এখানে সংবেদনশীল ক্রিয়াতন্তুর সব কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। এই Rolandic Area হল মস্তিষ্কের কার্যশালা বা কার্যক্ষেত্র। মানবশরীরে এই ক্ষেত্রের যিনি অধিপতি—তিনিই অদিতি। সমষ্টিরূপে অদিতি অখণ্ড বিশ্বব্যাপিনী উর্জা এবং ব্যষ্টিরূপে উর্জার আটটি ভাগ। এই আট ভাগের মধ্যে সাত ভাগ দেবরূপ অর্থাৎ দিব্যশক্তি বা অমূর্তরূপে আছেন এবং অষ্টম পুত্র মার্তণ্ড (সূর্য) মূর্ত বা ব্যক্তরূপে আছেন। এই জন্যই শতপথ ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে—"অষ্টৌ হ বৈ পুত্রাঃ অদিতেঃ। যাংস্তু এতদ্ দেবা আদিত্যা ইত্যাচক্ষরে। সপ্ত হ বৈতে অবিকৃতং হাষ্টমং জনয়াংচকার মার্তণ্ডম্।"—অর্থাৎ অদিতির আটপুত্রের মধ্যে সাত অবিকৃত বা অমূর্তরূপে আছেন। কেবল অষ্টম পুত্র সূর্য মূর্তরূপে বিদ্যমান। তিনি অখণ্ড শক্তিরূপা অদিতির পুত্র, তাই তাঁর আর এক নাম আদিত্য।

যজুর্বেদে ৪/১৯ মন্ত্রে অদিতিকে 'উভয়তঃ শীর্ষ্ণী' বলা হয়েছে। এর অভিপ্রায় হচ্ছে—অদিতির দু-দিকেই শির বা মস্তক বিদ্যমান, অর্থাৎ তিনি দু-দিকেই চলেন। তিনি কখনও পিতা, কখনও মাতা, কখনও বা পুত্র। তিনিই কারণ, তিনিই কার্য।

গন্ধর্ব ও অপ্সরা

যজুর্বেদে, ১৮ অধ্যায়ে, ৩৮ থেকে ৪৩-এই ছয়টি মন্ত্রে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের কথা বলা হয়েছে। যজুর্বেদের এই ছয়টি মন্ত্রে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের বিরাটরূপের বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই বিবরণ হতে জানা যায় যে, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এই সম্বন্ধ কার্যকারণ সম্বন্ধ, আধার-আধেয় সম্বন্ধ, উপকার-উপকারক (যার উপকার করতে হয়, উপকার যোগ্য, উপকারক অর্থাৎ উপকারী বা সাহায্যকারী) সম্বন্ধ, জ্ঞান-জ্ঞেয় সম্বন্ধ অথবা প্রকাশ-আদি কোনও সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান। যজুর্বেদে বর্ণিত গন্ধর্ব ও অপ্সরা হল এইরূপ, যথা—

"অগ্নি গন্ধর্বঃ, ঔষধয়ো অপ্সরসঃ।" [যজুর্বেদ, ১৮/৩৮]
"সূর্য্যো গন্ধর্বঃ মরীচয়ো অপ্সরসঃ।" [,, ১৮/৩৯]
"সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মি মরীচয়ো অপ্সরসঃ।" [,, ১৮/৪০]
"চন্দ্রমা গন্ধর্বঃ নক্ষত্রাণি অপ্সরসঃ।" [,, ১৮/৪০]
"বাতো গন্ধর্বঃ অপো অপ্সরসঃ।" [,, ১৮/৪১]
"যজ্ঞো গন্ধর্বঃ দক্ষিণা অপ্সরসঃ।" [,, ১৮/৪২]
"মনো গন্ধর্বঃ ঋক্‌সামানি অপ্সরসঃ।" [,, ১৮/৪৩]

উপরে বর্ণিত বিবরণ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অগ্নিতত্ত্বের কারণেই বৃক্ষ বনস্পতি-আদির বিকাশ হয়। অতএব অগ্নি গন্ধর্ব এবং ঔষধিয়া সমূহ তাঁর অপ্সরাগণ। সূর্য থেকে আলো বা কিরণ প্রবাহিত হয়। অতএব সূর্য গন্ধর্ব এবং চন্দ্র অপ্সরা। আবার চন্দ্রের মধ্যে সূর্যের কিরণ থাকায়, চন্দ্র গন্ধর্ব, তার কান্তি-বিকিরণকারী নক্ষত্র নামে অপ্সরা আছে। বায়ুর কারণে জল বা বর্ষা হয়। অতএব বায়ু গন্ধর্ব, জল বা বর্ষা তার অপ্সরা। যজ্ঞে জ্ঞানের উপদেশই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ—এই কারণে যজ্ঞ গন্ধর্ব এবং দক্ষিণা তার অপ্সরা। মনের কারণেই ঋক্ বেদ সাম বেদাদির জ্ঞান উপলব্ধ হয়। জ্ঞানকে আত্মসাৎ করে মন—এইজন্য মন গন্ধর্ব এবং বেদাদির জ্ঞান অপ্সরা। এইরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উপকার্য ও উপকারক কোনও না কোনও সম্বন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণের মধ্যে পারস্পরিকভাবে বিদ্যমান। এই গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ কোনও ব্যক্তি বা দেবদেবী আদি নন। এরা উর্জা বা শক্তির বিভিন্ন রূপ। সমগ্র সৃষ্টিতে

ব্যাপ্ত আগ্নেয় এবং সোমীয় তত্ত্বই গন্ধর্ব অপ্সরা। গন্ধর্ব প্রেরক শক্তি, শক্তিদাতা তথা উর্জার স্রোত। অপ্সরা এদের দ্বারা প্রেরিত হওয়া সোমীয় বা সোমতত্ত্ব। এইজন্যই যজুর্বেদের মন্ত্রে মন ও সূর্যকে গন্ধর্ব বলা হয়েছে। শরীরে মন প্রেরকতত্ত্ব—সে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে প্রেরিত করে। তার প্রেরণাতেই জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ করে। ভৌতিক জগতে সূর্যই গন্ধর্ব। সূর্যই সমস্ত চরাচর জগৎকে প্রেরণা দান করে। গন্ধর্ব শব্দের অর্থ হচ্ছে—'গাং ধারয়ন্তি ইতি গন্ধর্বাঃ'—গাং অর্থাৎ গো—অর্থ জ্যোতি, প্রকাশ, যা তেজকে ধারণ করে, তা-ই গন্ধর্ব। এর অভিপ্রায় হচ্ছে গন্ধর্ব শক্তি বা উর্জার স্রোত। এরা শক্তি প্রদান করে জীবনকে বিকশিত করে।

যজুর্বেদের পূর্বকথিত মন্ত্রে ২৭ জন গন্ধর্বের বিবরণ পাওয়া যায়। এই গন্ধর্বগণ নিরন্তর মানবসমূহকে শক্তি প্রদান করতে থাকে। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য ও মহীধর আচার্য ২৭ গন্ধর্ব বলতে, ২৭টি নক্ষত্রকে (গন্ধর্বরূপে) গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই অর্থ অনেক বেদ-মনীষী গ্রহণ করেননি। এ-যুগের বিখ্যাত বেদ-মনীষী ডাঃ কপিলদেব দ্বিবেদী তাঁর 'বেদামৃতম্' (ভাগ ৩৬-৩৭) গ্রন্থে বলেছেন যে, "আমার মতে এই ২৭ জন গন্ধর্ব হচ্ছে মানব-শরীরে বিদ্যমান প্রেরক শক্তি সমূহ। এরা হচ্ছে—দশ প্রাণ, পাঁচ মুখ্য, পাঁচ উপপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান [মুখ্যপ্রাণ], নাগ, কূর্ম, কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় [উপপ্রাণ]) দশ ইন্দ্রিয়, চার অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার), তিনলোকের তিন প্রতিনিধি, সূর্য, বায়ু ও অগ্নি।

যজুর্বেদে পঞ্চদশ অধ্যায়ে, ১৫-১৯ মন্ত্রে দশজন অপ্সরার বিবরণ পাওয়া যায়। পাঁচটি দিকের মধ্যে, প্রত্যেক দিকে বা দিশায় দু-জন করে অপ্সরা বিরাজ করেন।

পূর্বদিকে নিবাসী দুই অপ্সরা হচ্ছেন—পুঞ্জিকস্থলা ও ক্রতুস্থলা।
পশ্চিমদিকে নিবাসী দুই অপ্সরা হচ্ছেন—প্রম্লোচনী ও অনুম্লোচন্তী।
উত্তর নিবাসী দুই অপ্সরা হচ্ছেন—বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী।
দক্ষিণ নিবাসী দুই অপ্সরা হচ্ছেন—মেনকা ও সহজন্যা।
উর্ধ্ব নিবাসী দুই অপ্সরা হচ্ছেন—উর্বশী ও পূর্বচিত্তি।

অপ্সরা শব্দের অর্থ হচ্ছে—'অপ্সু সরতি ইতি অপ্সরাঃ' অর্থাৎ জল ও আকাশে বিচরণকারিণীরাই হচ্ছে অপ্সরা। এদেরকে পরীও বলা যেতে পারে।

প্রত্যেক দিকে দু-জন করে অপ্সরা নিবাস করে—এর তাৎপর্য্য হচ্ছে প্রত্যেক দিকে দু-প্রকারের বা দু-ধরনের বিদ্যুৎধারা আছে। এরাই সকল দিকে শক্তি সঞ্চার করে। এই দুই ধারা হল—ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎধারা। এদের সংঘর্ষ বা মিলনের ফলে ওই সকল দিকগুলিতে নিরন্তর জ্যোতি উৎপন্ন হতে থাকে এবং দিকসকল প্রকাশমান থাকে।

ঋগ্বেদের ১০।৯৫ সূক্তের মন্ত্রে এবং যজুর্বেদের ৫।২ মন্ত্রে পুরূরবা উর্বশীর উল্লেখ আছে। যজুর্বেদে বলা হয়েছে পুরূরবা ও উর্বশী অগ্নিকে জন্ম দেন, এই অগ্নি অত্যন্ত শক্তিশালী, এদের দু-জনার মিলনের ফলে আয়ু নামক পুত্রের জন্ম হয়। ঋগ্বেদের ১০।৯৫ সূক্তে পুরূরবা-উর্বশীর সংবাদ বা কথোপকথন আছে—এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে বৈদিক সংবাদ ও কথোপকথন অধ্যায়ে। তথাপি পাঠককে ওই বিষয়ে অবহিত করার জন্য পুরূরবা-উর্বশী আখ্যানের অভিপ্রায় আর একবার সংক্ষেপে বিবৃত করছি। বস্তুত, পুরূরবা হচ্ছে মেঘ, উর্বশী হচ্ছে বিদ্যুৎ।

এদের আয়ু নামক পুত্র জন্মায়। আয়ু অর্থাৎ জীবন, জীবনীশক্তি ও মানুষ। পুরূরবা হচ্ছে গর্জনকারী মেঘ। উর্বশী হচ্ছে অধিক জ্যোতির্ময়ী বিদ্যুৎ—দু-জনার সংঘর্ষে বা মিলনে বিদ্যুৎ অর্থাৎ আলোরূপ অগ্নির জন্ম হয়। আকাশের বুকে দু-জনার সংঘর্ষ বা মিলনের ফলে শুধু আলো বা বিজলীরূপ অগ্নিরই জন্ম হয় না, বর্ষাও হয়। বর্ষার ফলে জীবন ও অন্ন উৎপন্ন হয়। অন্ন থেকে মানুষের জন্ম হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে আয়ুর অর্থ জীবন, জীবনীশক্তি ও মানুষ। এইজন্য আয়ুকে পুরূরবা ও উর্বশীর সন্তান বলা হয়। বর্ষা-ঋতুতে মেঘ ও বিদ্যুতের সমাগম হয়। বর্ষার বিদ্যুৎ ও মেঘের সমাগমকেই পুরূরবা ও উর্বশীর বিবাহরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ষা ঋতুর পর বিদ্যুৎ লুপ্ত বা অদৃশ্য হয়ে যায়—এটাই পুরূরবা ও উর্বশীর বিয়োগ। এই বিষয়টাকেই বেদে কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের ১০।৯৫।২, ১০।৯৫।১০, ১০।৯৫।১৭ মন্ত্রসমূহে স্পষ্ট সংকেত করা হয়েছে যে, উর্বশীই হচ্ছে বিদ্যুৎ। সে জল থেকে উৎপন্ন হয়, জলীয় তত্ত্ব। সে অন্তরিক্ষে থাকে। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের জীবনের বিষয়ে পর্যাপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ওইসকল গ্রন্থ অধ্যয়নে এতৎ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পারবেন।

একাদশ অধ্যায়

রহস্যময় বেদমন্ত্র

কোনও তথ্য বা তত্ত্বকে গুপ্ত বা রহস্যময় করে প্রকাশ করা বেদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে যে, দেবতাগণ হচ্ছে পরোক্ষপ্রিয় যথা—("পরোক্ষ প্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি।"—গোপথ ব্রাহ্মণ)। এইজন্য বেদের রহস্যময় মন্ত্রও পরোক্ষ-প্রধান বা গুহ্যার্থক। রহস্যাত্মক শৈলীতে কোনও তথ্য বা তত্ত্ব পরিবেশনের ফলে অনেক সময় বেদমন্ত্রের সঠিক অর্থ অধরাই রয়ে যায়। ফলে ওইসকল বেদমন্ত্রের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সত্যদ্রষ্টা ঋষিকল্প বেদজ্ঞ পুরুষের সান্নিধ্য প্রয়োজন হয়। সত্যদর্শী ঋষিকাতুল্য বেদজ্ঞা নারীর সান্নিধ্যও এ ব্যাপারে অপরিহার্য। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি রহস্যাত্মক বেদমন্ত্রের যে গূঢ়ার্থ এই দীন লেখকের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, তা বেদানুরাগী সকল পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে তুলে ধরার ছোট্ট প্রয়াস করছি। ঋগ্বেদ দিয়েই শুরু করা যাক্। মন্ত্রটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। মন্ত্রটি অথর্ব বেদেও দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তে, ২০ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি।।" অর্থাৎ একটি বৃক্ষে দুটি পাখি বন্ধুভাবে একত্রে বাস করে। তাদের মধ্যে একটি পাখি বৃক্ষের স্বাদিষ্ট ফল ভক্ষণ করে, অন্যটি শুধু চেয়ে দেখে, সে কোনও ফল ভক্ষণ করে না। এই মন্ত্রে লৌকিক পাখির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে জীবাত্মা-পরমাত্মার স্তুতি করা হয়েছে। এখানে বৃক্ষ বলতে জগৎ অথবা মানুষের শরীর বোঝানো হয়েছে। এই মনুষ্যদেহ বা জগৎ যেন এক বৃক্ষ। এই বৃক্ষে বসে আছে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী দুই পাখি। জীবাত্মা ফল ভক্ষণ করেন অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়রূপ ফল ভোগ করেন অথবা কর্মফল অনুযায়ী

সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করেন। কিন্তু পরমাত্মারূপ পাখিটি নিত্যমুক্ত বলে সংসারের বিষয় ভোগ অথবা কর্মফলজনিত সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করেন না। তিনি নীরব দ্রষ্টা হয়ে শুধুমাত্র দর্শন করেন। আবার অন্যমতে আকাশ যেন একটি বৃক্ষ। সেই বৃক্ষে চন্দ্র-সূর্যরূপ দুটি পাখি বাস করে। এই দু-জনার মধ্যে চন্দ্র ক্ষয়-বৃদ্ধি রূপ ফল ভোগ করে। সূর্য প্রকাশস্বরূপ দ্রষ্টারূপে বিরাজ করে। অথবা যজ্ঞস্থল যেন একবৃক্ষ। এই বৃক্ষে ব্রহ্মা ও যজমান হল দুই পাখি। যজমান যজ্ঞের ফল ভোগ করেন। ব্রহ্মা যজ্ঞের ফল ভোগ করেন না।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তে, ৪৪ মন্ত্রে উক্ত হয়েছে—

"এযঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবত্সরে বপত এক এষাম্।
বিশ্বমেকো অভিচেষ্ট শচীভিভ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্।।"

অনুবাদ ঃ কেশ বিশিষ্ট তিনজন সম্বৎসরের মধ্যে যথা সময়ে ভূমি দর্শন করেন বা সময়ে সময়ে কৃপাদৃষ্টি করেন। এদের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কামিয়ে দেন অর্থাৎ নাপিতের কার্য করেন, বীজ বোনেন, ফসল কাটেন। একজন আপন কর্ম দ্বারা বিশ্বকে প্রকাশিত করেন তথা বিশ্ব পরিদর্শন করেন। যিনি তৃতীয়জন, তাঁর গতি দেখা যায় কিন্তু রূপ দেখা যায় না। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে এই তিনজন হলেন অগ্নি, আদিত্য ও বায়ু। অগ্নির কেশ হচ্ছে ধোঁয়া, অগ্নি সারা বৎসর বপন তথা রোপণ ও কর্তন বা ছেদন দ্বারা পৃথিবীর ঔষধি ও বনস্পতিরূপী কেশ কামিয়ে দেন বা মুণ্ডন করে দেন। সূর্যের কেশ হচ্ছে তাঁর কিরণ—সূর্য তাঁর কিরণরূপ কেশের দ্বারা জগৎ প্রকাশিত করেন। তৃতীয়জন বায়ুর কেশ হচ্ছে ধূলিকণা ও জলকণা সমূহ। বায়ুর গতি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় কিন্তু বায়ুর রূপ দেখা যায় না।

অথবা এই তিনজন হলেন—জীবাত্মা, পরমাণুসমূহ ও ব্রহ্ম। জীবাত্মা কর্ম করার ফলে শুভাশুভ সংস্কারের বীজ বপন করে এবং তদনুসারে ভালো অথবা মন্দ ফসল কর্তন করে। অর্থাৎ ভালো মন্দ কর্মের ফল ভোগ করে। দ্বিতীয়, পরমাণুসমূহ, যারা আপন গুণ ও কর্মের দ্বারা জগতের রূপ নির্মাণ করে জগৎকে প্রকাশ করে। তৃতীয়জন হলেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মা—যার কার্য জগৎব্যাপী দৃষ্ট হয় কিন্তু তিনি দৃষ্ট হন না। শরীর দৃষ্টিতে এই তিনজন হল

যথাক্রমে মন, আত্মা ও প্রাণ। মন নিরন্তর বিচার-ভাবনা দ্বারা সিদ্ধান্ত বা মত স্থাপন এবং খণ্ডন করে। মনের এই বিচার-ভাবনা দ্বারা মত স্থাপন এবং খণ্ডন—যেন ফসল বপন ও কর্তন। আত্মা সবাইকে প্রকাশ করেন। তৃতীয় প্রাণের গতি সবাই দেখতে পায়, কিন্তু প্রাণের রূপ কেউ দেখতে পায় না।

ঋগ্বেদের ১।১৬৪।৪৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে—"দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত। তস্মিন্তসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোহর্পিতাঃ যষ্টির্ন চলাচলাসঃ।।"

অনুবাদ : দ্বাদশ পরিধিযুক্ত একটি অদ্ভুত চক্র আছে, তাতে তিনটি নাভি আছে। তাতে ৩৬০টি পেরেক বা লোহার খিল সংযুক্ত আছে। একথা কে জানে? মন্ত্রটিতে সংবৎসর হচ্ছে চক্র। বৎসরের বারো মাসই দ্বাদশ পরিধি। বসন্ত-গ্রীষ্ম, বর্ষা-শরৎ, হেমন্ত-শীত এই তিন ঋতু-যুগলই তিন নাভি (বৈদিক যুগে, বসন্ত থেকে ঋতু গণনা হতো)। সংযুক্ত ৩৬০টি পেরেক বা লোহার খিল হচ্ছে—৩৬০ অহরাত্র বা দিনরাত্রি।

আধ্যাত্মিক অর্থে মানব-শরীরই ওই অদ্ভুত চক্র। দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হচ্ছে এই শরীররূপী চক্রের দ্বাদশ পরিধি। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মানব-শরীরের এই তিন অবস্থাই তিনটি নাভি। ৩৬০টি পেরেক বা লোহার খিল হল শরীরস্থ অস্থিসমূহ, মজ্জা অথবা অস্থিসন্ধি সকল। ঋগ্বেদ, ৩।৫৬।২ মন্ত্রে বলা হয়েছে—

ষড়্ভারাঁ একো অচরন্বিভর্ত্যৃতঃ বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ।
তিস্রো মহীরূপরাস্তস্থুরত্যা গুহা দ্বে নিহিতে দর্শ্যেকা।।

অনুবাদ : একটি বিশাল বলদ আছে, যে চলে না, কিন্তু ছ-জনার ভার বহন করে। তার নিকট অনেক গাভী আসে। তিনটি বিশাল ঘোটকী তার নিকটস্থিত আছে। যার মধ্যে দুটি গুহায় অর্থাৎ অদৃশ্য এবং একটিকে দেখা যায়।

বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে এই বলদ হচ্ছে সংবৎসর—যা স্বয়ং চলে না, স্থির থাকে। বসন্তাদি ছয় ঋতুর ভার বহন করে বা এই ছয় ঋতুকে সে ধারণ করে রাখে। এর নিকটে আগমনকারী গাভী হচ্ছে সূর্য-কিরণ। যা

সংবৎসরকে ব্যাপ্ত করে রাখে। এর নিকটস্থিত তিন ঘোটকী হচ্ছে—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক—এদের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীকে দেখা যায়। অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক গুহায় নিহিত—অর্থাৎ অদৃশ্য।

অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এই বলদ বা বৃষ হচ্ছে স্থির প্রাণ। ছয় ভার হচ্ছে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—যা এই স্থির প্রাণরূপী-বৃষ ধারণ করে রাখে। নিকটে আগমনকারী গাভী হচ্ছে অন্য ইন্দ্রিয় সমূহ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) নিকটস্থিত তিন ঘোটকী হচ্ছে তিন রকমের বাণী। যার মধ্যে মনস্থ, বুদ্ধিস্থ বাণীসমূহ গুহানিহিত অর্থাৎ অদৃশ্য এবং তৃতীয় স্থূল বাণী প্রত্যক্ষ ও শ্রুতিগোচর হয়।

ঋগ্বেদের ৪।৫৮।৩ এবং যজুর্বেদে, ১৭।১৯ মন্ত্রে উক্ত হয়েছে—

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাং আ বিবেশ।"

অনুবাদ : একটি বৃষ বা বৃষভ আছে। তার চারটি শিং, তিনটি পা ও দুটি মাথা এবং সাতটি হাত আছে। তিনটি স্থানে বদ্ধ থেকে এটি অত্যন্ত শব্দ করছে। এক মহান দেবতা আছেন যিনি মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন বা প্রবেশ করছেন। এই রহস্যময় মন্ত্রটির অনেক অর্থ করা হয়েছে। বৈদিক নিরুক্তি অনুসারে এই বৃষ হচ্ছে যজ্ঞ। চার বেদ এই যজ্ঞরূপী বৃষের চার শৃঙ্গ বা শিং। প্রাত, মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যাবেলার সবনই (যজ্ঞস্নান, যজ্ঞ, সোমরস পান) এর তিনটি পা। যজ্ঞের যজমান ও তার পত্নী হচ্ছে দুই শির। গায়ত্রী-আদি সাত ছন্দ এর সাতটি হাত। বৃষটি মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্প এই তিনস্থানে বদ্ধ আছে। বৃষটি অত্যন্ত শব্দ করছে অর্থাৎ যজ্ঞে মন্ত্র পাঠ হচ্ছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন—বৃষভ হচ্ছে শব্দ। শব্দের চারভেদ (পার্থক্য), যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাতই (ব্যাকরণে, চ, বা ইত্যাদি অব্যয় শব্দ) এই বৃষভের চার শৃঙ্গ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালই এর তিনটি পদ। সুপ্ এবং তিঙ্ (প্রত্যয়) এর দুই শির। সাত বিভক্তি, সাত হাত উরস্ (বক্ষ), কণ্ঠ এবং শির এই তিন স্থানে বদ্ধ থেকে বৃষটি অত্যন্ত শব্দ করে—অর্থাৎ এই তিন স্থানের সহায়তায় শব্দ বা বাক্য উচ্চারিত হয়। শরীরের দৃষ্টিতে এই বৃষভ হচ্ছে মুখ্য প্রাণ। অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার)-এর চার শৃঙ্গ। ব্যান-উদান-সমান এই তিন বায়ু

এর পা। প্রাণ ও অপান বায়ু-এর দুই শির। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি এর সাত হাত। মতান্তরে শরীরস্থিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান-আদি চক্রের সাত হাত। কারও কারও মতে শরীরস্থিত সপ্তধাতু (রক্ত, পিত্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র বা রজ)। এই মুখ্য প্রাণরূপী বৃষভ শরীরের উত্তমাঙ্গ, মধ্যাঙ্গ তথা নিম্নাঙ্গ এই তিন স্থানে বাঁধা বা বদ্ধ আছে। এ শ্বাস উচ্ছ্বাস দ্বারা অথবা বাণী দ্বারা শব্দ করতে থাকে।

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৭ ও অথর্ব বেদের ৯।১৪।১৭ মন্ত্র একই। যথা—

"অবপরেণ পর এনাবরেণ পদাবৎসং বিভ্রতী গৌরূদস্থাৎ।
স কদ্রাচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক্ব স্বিৎ সূতে নহি যুথে অন্ত।।"

অনুবাদ : একটি গর্ভবতী গাভী আছে। সে তার সামনের পা দুটি পিছনের দিকে মুড়ে এবং পিছনের পা দুটি সামনের দিকে মুড়ে (ভাঁজ করে) উদরস্থ বৎসকে ধারণ করে উড়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? গর্ভভারের ফলে গাভীটির গতি মন্থর—কিছুদূর গিয়ে সে গর্ভের বৎসটির জন্ম দিল। গো-যুথের মধ্যে বৎসটির জন্ম হল না বা গো-যুথের মধ্যে গাভীটি বৎস প্রসব করল না। বৈদিক সাহিত্য অবলম্বনে শ্লোকটির মর্মার্থ নিম্নরূপ—

প্রথমত—যজ্ঞভূমি হচ্ছে গাভী। অগ্নি হচ্ছে তার বৎস। যজ্ঞের সব আয়োজন প্রস্তুত, কেবল অগ্নি প্রজ্বলিত হয়নি। অগ্নি যজ্ঞরূপ গাভীর গর্ভেই বিদ্যমান। অনতিবিলম্বে যজ্ঞভূমি অগ্নিরূপ বৎস প্রসব করবে। কেন না যজ্ঞের সব আয়োজন প্রস্তুত। অগ্নি প্রজ্বলিত হল—অর্থাৎ যজ্ঞ ভূমিরূপ গাভী বৎস প্রসব করল। কিন্তু গো-যুথের মধ্যে প্রসব না করে, কোথায় প্রসব করল? যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে প্রসব করল।

দ্বিতীয়ত—আকাশস্থিত মেঘ হচ্ছে গাভী। এই মেঘরূপ গাভীর গর্ভে বিদ্যমান জলই হচ্ছে তার বৎস। এই মেঘরূপী গাভীটি আকাশে উড়ছে। শীঘ্রই গর্ভস্থ জলরূপী বৎস বৃষ্টিধারায় বর্ষিত হবে। এটাই গাভীর বৎস প্রসব করা।

তৃতীয়ত—অন্তরিক্ষলোক হচ্ছে গাভী। বায়ু তার বৎস। বায়ু অন্তরিক্ষলোকের গর্ভে বন্দী আছে। গতিশীল হচ্ছে না। সব জীব ব্যাকুল হয়ে বায়ুরূপ-বৎসের জন্মের প্রতীক্ষায় আছে। শীঘ্রই শীতল মন্দবায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করল।

জীবকুলের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হল। অন্তরিক্ষলোকরূপী গাভী বায়ুরূপ বৎসের জন্ম দিল।

চতুর্থত—দ্যুলোক হচ্ছে গাভী, আদিত্য বা সূর্য হচ্ছে তার বৎস। রাত্রির বা সন্ধ্যার অন্ধকারে সূর্য বিলীন হয়ে গেল—অর্থাৎ সূর্য দ্যুলোকের গর্ভে রয়ে গেল। কিন্তু দ্যুলোকের গর্ভে সূর্য কতক্ষণ নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবে? রাত্রির অবসানে সূর্যোদয় হল, অর্থাৎ দ্যুলোক সূর্যরূপী বৎসকে প্রসব করল।

পঞ্চমত—বেদবাণী হচ্ছে গাভী। বেদবাণীর রহস্যার্থ বা মর্মার্থ হচ্ছে তার বৎস। যিনি বেদবাণী কণ্ঠস্থ করেন কিন্তু বেদের মর্মার্থ বোঝেন না, তিনি বেদবাণীরূপ গাভীর দুগ্ধ প্রাপ্ত হন না। যিনি বেদ অধ্যয়নের সাথে বেদের মর্মার্থ বিশেষরূপে জ্ঞাত হন, তাঁর কাছে বেদবাণীরূপ গাভী রহস্যার্থ রূপ বৎসকে প্রসব করেন। অর্থাৎ তিনিই বেদবাণীরূপ গাভীর প্রকৃত ফল বা দুধ প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠত—প্রকৃতি হচ্ছে গাভী। পৃথিবী হচ্ছে এই গাভীর বৎস। সৃষ্টির আদিতে তিনগুণের সাম্যাবস্থার কারণে পৃথিবী প্রকৃতির গর্ভে বিলীন ছিল। প্রকৃতির মধ্যে তিনগুণের ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার ফলে পৃথিবীরূপ বৎসের জন্ম হল।

কিছু কিছু পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি যাঁরা নিজেদের অতিবোদ্ধা বা বিজ্ঞ বলে মনে করেন, তাঁরা অভিযোগ করেন যে বেদ-পুরাণে অনেক অশ্লীলতাপূর্ণ এবং ঘৃণিত কথার বা কাহিনীর উল্লেখ আছে। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে ২৮-৩৩ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কামাতুর হয়ে ব্রহ্মা আপন কন্যা সরস্বতীর সাথে ব্যভিচার করার জন্য তাঁর পিছন পিছন দৌড়েছিলেন। ব্রহ্মার এরূপ কর্ম দেখে মরীচি-আদি পুত্রগণ ব্রহ্মাকে বাধা দেন এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করেন। অনন্তর ব্রহ্মা লজ্জিত হয়ে নিজ শরীর ত্যাগ করেন। পৌরাণিক কথার মূল আধার হচ্ছে বেদ। পুরাণে যা কিছু লেখা আছে তা বেদ-কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। যদি পুরাণে কিছু নতুনত্ব থাকে তবে তা হচ্ছে, বেদে যেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পিতা দ্বারা কন্যা গর্ভবতী হয়েছে। সেখানে পুরাণে একটু রেখে-ঢেকে বলা হয়েছে। পিতা কন্যাকে কামাতুর হয়ে কামনা করেছিলেন। যথা, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে, ৭ মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"পিতা যৎস্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ ক্ষ্ময়া রেতঃ সঞ্জজমানো নিষিঞ্চৎ।
স্বাধ্যো অজনয়ন্ ব্রহ্মদেবা বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষণ্।।

অনুবাদ ঃ যে সময় পিতা আপন পুত্রীকে সম্ভোগ করলেন। সেই সময় তিনি পৃথিবীর সাথে মিলিত হয়ে রেত ত্যাগ করলেন। সৎকর্মপরায়ণ দেবগণ ওই রেত হতে ব্রতরক্ষক দেব বাস্তোষ্পতিকে (অন্তরিক্ষস্থিত বায়ু ইন্দ্র) সৃজন করলেন।

যজুর্বেদে নবম কাণ্ডে, ১৫ সূক্তে, ১২ মন্ত্রেও বলা হয়েছে, "....পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ।।" অর্থাৎ পিতা পুত্রীতে গর্ভসঞ্চার করলেন। ঋগ্বেদে ১।১৬৪।৩৩-এ ওই একই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। এখন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের বক্তব্য হচ্ছে বেদ-পুরাণের এইরূপ অশ্লীল ও অরুচিকর কথা শ্রবণে সাধারণ মানুষের নৈতিক অধপতন হতে পারে—অতএব এইসব কথাকে প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ না করাই সমীচীন। পুরাণবেত্তা ও বেদবেত্তাদের দৃষ্টিতে ভাগবত-পুরাণাদি তথা বেদাদিতে উক্ত মন্ত্রগুলির রহস্যার্থ নিম্নে প্রকাশ করা হল। প্রথমে ভাগবতাদি পুরাণের কথাই আলোচনা করা যাক। শীতকালে অধিকাংশ সময় চারিদিক কুয়াশায় ঢেকে যায়। বেদমতে ব্রহ্মা শব্দের এক অর্থ সূর্য "প্রজাপতির্বৈ সবিতা" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।২।২৪)। সূর্য থেকে উৎপন্ন হওয়ার কারণে উষাকে সূর্যের পুত্রী বলা হয়। যখন উষারূপী পুত্রীর পিছনে পিছনে পিতৃস্থানীয় ব্রহ্মারূপী সূর্য গমন করেন (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে উষার আবির্ভাব হয়—আবির্ভাবের কারণ পশ্চাতে সূর্যের উপস্থিতি)। উষার পরে বা পশ্চাতে সূর্য যখন উদিত হয়ে চলেন, তখন পুত্ররূপ কিরণসমূহ কুয়াশার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, কিরণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ সূর্যের আলোর গতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, এটাই রূপকাকারে বলা হয়েছে যে পুত্ররা পিতাকে বাধা প্রদান করেন। পুত্ররা পিতাকে বোঝান, এর অভিপ্রায় কিরণরূপ পুত্ররা যেন পিতা সূর্যকে বলছে—আপনি আরও তেজ প্রকাশ করুন। শীতের বেলা বাড়ার সাথে সাথে সূর্যের কিরণ বা তাপ বৃদ্ধি পায় এর ফলে কুয়াশার অন্ধকারময় আবরণ চারিদিকে বিলীন হয়ে যায়। কুয়াশাও সূর্যের শরীরেরই অঙ্গ। কেন না সূর্যকিরণ বা তাপ দ্বারা আকৃষ্ট জলকণা বাষ্পে পরিণত হয়ে ভূমণ্ডলে পতিত হয়ে

কুয়াশারূপ ধারণ করে—পুত্রদের কথায় অর্থাৎ কিরণসমূহের তেজে বা প্রভাবে সূর্য লজ্জায় তাঁর কুয়াশারূপ অঙ্গ বা শরীর ত্যাগ করে আলোকময় উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ করেন। উষা সূর্যের পুত্রী, সূর্য উষার গর্ভে আপনার কিরণরূপ রেত নিক্ষেপ করেন—ফলে দিনরূপ পুত্রের জন্ম হয়। আবার বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে (গোপথ ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ) বলা হয়েছে যে "মন এব ব্রহ্মা।" "প্রজাপতির্বৈ মনঃ।" কৌষীতকী উপনিষদে—বলা হয়েছে "বাগ্‌বৈ সরস্বতী।" অর্থাৎ মনই প্রজাপতি অথবা ব্রহ্মা। বাণী বা বাক্যই সরস্বতী। প্রথমে মনে যা ভাবা হয় তাই বাক্য বা বাণী দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এইভাবে উক্ত মন্ত্রটির তাৎপর্য হচ্ছে এই—মনে যেরূপ ভাবনা বা বিচার উৎপন্ন হয়, তাই বাণীরূপে ব্যক্ত হয়। এই কারণে মন হচ্ছে পিতা এবং বাণী হচ্ছে পুত্রী বা কন্যা। মনরূপ ব্রহ্মার কন্যা বা পুত্রী হচ্ছে বাণীরূপা সরস্বতী। যখন মনরূপ ব্রহ্মা বা পিতা বাণীরূপা পুত্রী বা সরস্বতীতে প্রেরণা দ্বারা বিচার ভাবনারূপ বীর্যাধান বা রেত সংযোগ করেন তখন তাদের উভয়ের মিলনের ফলে শব্দরূপ পুত্র উৎপন্ন হয়।

যজুর্বেদে ৩৪।১১ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে—

"পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ।
সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশে অভবৎ সরিৎ।।

অনুবাদ ঃ সমান প্রবাহযুক্ত পাঁচটি নদী সরস্বতী নদীতে মিলিত হয়েছে যাদের উৎস স্থান একই। তারা পাঁচটি দেশে নিজেদের নাম ত্যাগ করে সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। বেদের কোনও কোনও ভাষ্যকার ভৌগোলিক সরস্বতী নদীতে কোনওভাবে পাঁচটি নদীর মিলন না খুঁজে পেয়ে সংগতিকরণের জন্য সরস্বতীর অর্থ করেছেন সিন্ধু নদী এবং এই নদীতে চন্দ্রভাগা, রাবী, শতদ্রু, ঝিলম ও বিপাশা এই পাঁচটি নদী এসে মিলেছে। এইরূপে ভাষ্যকাররা ওই মন্ত্রটির অর্থ করেছেন।

বস্তুত, মন্ত্রটি বেদের এক রহস্য। ওই মন্ত্রের পাঁচটি নদী অর্থাৎ যে নদীগুলো সরস্বতীতে এসে মিলেছে সেগুলি হল আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ জ্ঞানধারা। এদের সবার উদ্‌গম বা উৎপত্তিস্থল একই এবং তা হচ্ছে মন।

কেননা মন-রূপ আধার ছাড়া কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয়ই জ্ঞানধারাকে প্রবাহরূপে বহন করতে সমর্থ হয় না। এই পাঁচ জ্ঞানধারাই সরস্বতীতে গিয়ে মিলিত হয়। এই সরস্বতী নদীটি কে? বাণী বা বাক্যই হচ্ছে সরস্বতী নদী। বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় হতে যে জ্ঞানধারা নির্গত হয় তা বাণী বা বাক্য দ্বারা প্রকাশিত ও প্রতিপাদিত হয়। এই তত্ত্বটিই মন্ত্রটিতে রূপকের মাধ্যমে বলা হয়েছে। সাম বেদের আরণ্যক কাণ্ডে ৬২৬ মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"সহর্ষভাঃ সহবৎসা উদেত বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতীর্দ্ব্যূধ্নীঃ।
উরুঃ পৃথুরয়ং বো অস্তু লোক ইমা আপঃ সুপ্রপাণা ইহস্ত।।"

অনুবাদ ঃ অনেক রূপ ধারণকারী, হে গাভী। দুই উধস্ (পশুর স্তন বা পালান) যুক্তা, তুমি ঋষভ (বলদ) ও বৎসের সঙ্গে আমাদের কাছে এসো। বিশাল বিস্তীর্ণ এই মহান লোক তোমার নিবাসের জন্য। এই জল তৃপ্তিকর, তুমি একে সুচারুরূপে পান করতে থাকো। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য, এই মন্ত্রে গাভীকে পশুরূপেই ব্যাখ্যা করেন, গাভীর দুইটি উধস্-এর (পশু বা গাভীর স্তন) সমাধান করেছেন এইভাবে—গাভী প্রাত ও সন্ধ্যা দুই সময়ে দুধ প্রদান করে—অতএব গাভী দুই-উধস্ধারী। মন্ত্রটির আরও অর্থ বেদ-মনীষীগণ করেছেন। যথা—সূর্যরশ্মি সমূহ হচ্ছে গাভী। সূর্য হচ্ছে ঋষভ। গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ হচ্ছে বৎস। এই বৎস সূর্যরশ্মির প্রকাশরূপ দুগ্ধ পান করে। সূর্যরশ্মি সাতরঙা হওয়ার কারণে, সূর্যরশ্মিরূপ গাভীটিকে অনেক বা বিভিন্ন বর্ণধারী বলা হয়েছে। সাতরঙা হওয়ার কারণে গাভীরূপা সূর্যরশ্মি হচ্ছে বিশ্বরূপা। এর দুই উধস্ বা স্তন হল দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোক। গাভীটি দ্যুলোকরূপ উধস্ থেকে প্রকাশরূপ দুধ প্রদান করে এবং অন্তরিক্ষরূপ উধস্ থেকে বর্ষা বা বৃষ্টি-জল রূপ দুধ প্রদান করে। স্তোতা বা স্তুতিকারক গাভীটিকে ভূলোকের জল পান করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আবার গাভী হচ্ছে বেদের বাণীসমূহ। পরমাত্মা বা প্রাণ হচ্ছে ঋষভ (বৃষ)। মন হচ্ছে বৎস। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হচ্ছে বেদবাণীরূপ গাভীর দুই উধস্। বেদমন্ত্র সমূহে যে রহস্যার্থ নিহিত আছে—সেই রহস্যার্থ এই বেদমন্ত্র বা বাণীসমূহের দুধ। এর প্রচারই একে জলপান দ্বারা পুষ্ট করা।।

অথর্ব বেদে দশমকাণ্ডে অষ্টম সূক্তের ২০ মন্ত্রে (১০।৮।২০), উক্ত হয়েছে—

"যো বৈ তে বিদ্যাদরণী যাভ্যাং নির্মথ্যতেবসু।
স বিদ্বান্ জ্যেষ্ঠং মন্যেত স বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ।।"

অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞানরূপ ধনের মন্থনকারী সে ওই দুই অরণিকে (কাষ্ঠখণ্ড) জানে। ওই জ্ঞাতা জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে জানতে সমর্থ হয়। যজ্ঞে দুটি অরণি বা কাষ্ঠখণ্ডের প্রয়োজন হয়। একটি অধর-অরণি। অন্যটি উত্তর-অরণি। এই দুই অরণি বা কাষ্ঠের সংঘর্ষের ফলে যজ্ঞাগ্নিরূপ বসু (ধন বা দেব) উৎপন্ন হয়। যার ফলে যজ্ঞ শুরু হয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহ হচ্ছে অধর-অরণি, প্রণব বা ওঁকার হচ্ছে উত্তর-অরণি। ধ্যান বা জপ হচ্ছে উভয় অরণির সংঘর্ষ বা মন্থন-এর ফলে পরব্রহ্মরূপ জ্যেষ্ঠ বা মহান অগ্নির সাক্ষাৎ হয়। আবার শিষ্যের দেহ হচ্ছে অধর-অরণি, সদগুরুর দীক্ষামন্ত্র বা প্রণবমন্ত্র উত্তর-অরণি। সাধনা হচ্ছে উভয়ের সংঘর্ষ বা মন্থন। এর ফলে আত্মজ্ঞানরূপ মহান অগ্নি প্রকট হন।

চার বেদে এরূপ রহস্যময় অনেক মন্ত্র আছে। বেদ-অনুরাগীরা যদি এইসব মন্ত্র অধ্যয়ন ও মনন বা মন্থন করেন তাহলে স্বীয় জ্ঞান-পিপাসা নিবারণে সমর্থ হবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বেদে 'ওঁ'

সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে, যে একটি শব্দ পরমসত্তা বা পরমব্রহ্মের বর্ণনার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব বা মহত্ব পেয়েছে—তা হল ওঁ বা ওঙ্কার। ভারতের সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়, এমনকি বৌদ্ধ তথা জৈন সম্প্রদায় পর্যন্ত 'ওঙ্কার' শব্দের মহত্ব ও গুরুত্ব এক স্বরে স্বীকার করেছেন। যজুর্বেদ অনুসারে আকাশবৎ ব্যাপক 'ওম্'-ই হচ্ছে পরমব্রহ্ম। এইজন্য যজুর্বেদে, ৪০।১৭ মন্ত্রে ধ্বনিত হয়েছে "ওম্ খং ব্রহ্ম।"

ঈশোপনিষদের ১৭ মন্ত্রে ধ্বনিত হয়েছে—"ওঁ ক্রতোঃ স্মর"—ওঁকাররূপী যজ্ঞময় ভগবানকে স্মরণ করো। সমগ্র উপনিষদ সাহিত্যে ওঁকারের স্বরূপ ও মহিমা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আমার আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলতেন—"চারিবেদ তথা হিন্দুদের সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্র ওঁকারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এই ওঁকারের উৎপত্তি বা আবিষ্কার যে কবে হয়েছে তার কোনও সন্ধান বা নির্দেশ পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে 'ওঁ' কারের অভিব্যক্তি বা উৎপত্তির দিক থেকে একটি ব্যাখ্যার বিবরণ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোরসোঽপামোষধয়ো রস ঔষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্‌রসো বাচ ঋগ্ রস ঋচঃ সামরসঃ সাম্নঃ উদ্‌গীথো ভবতি।" অর্থাৎ ভূত বা বিষয়সমূহের রস বা সার হল পৃথিবী। পৃথিবীর সারভাগ হল আপ অর্থাৎ রস বা প্রাণ। এই রসের সারভাগই ঔষধি অর্থাৎ তৃণলতা প্রভৃতি। পৃথিবী থেকেই রস আহরণ করে এই তৃণ ও লতাসমূহ উৎপন্ন হয়। এই ঔষধির সার হল পুরুষ অর্থাৎ জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ।

পুরুষের রস বাক্য বা বাক্‌শক্তি। বাক্‌শক্তির সার হন ঋক্ অর্থাৎ poetry, ঋকের সার হল সাম অর্থাৎ সংগীত বা music। এই সাম বা সংগীতের সার হল উদ্‌গীথ বা ওঙ্কার।

কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর পঞ্চদশ মন্ত্রে দেখা যায় যে আচার্য যম নচিকেতাকে বলছেন—

"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সবাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেন ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।।

অর্থাৎ—সমস্ত বেদ যাঁকে নির্দেশ করছে—সমস্ত তপস্যার মূল লক্ষ্য যিনি, যাঁকে লাভ করবার জন্য সাধু সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন—আমি সংক্ষেপে তাঁকে নির্দেশ করছি তিনি ওম্।

প্রশ্নোপনিষদে ঋষি সত্যকামের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি পিপ্পলাদ বলছেন—"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ।" অর্থাৎ হে সত্যকাম, যা প্রণব বা ওঙ্কার তাই পর ও অপর, সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ। ধ্যান তন্ময় ঋষির দিব্যচেতনায় কোনও এক শুভক্ষণে এই ছন্দ ও মন্ত্র উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাই এই মন্ত্র দিব্য মহিমায় পূর্ণ ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। প্রণব বা ওঙ্কার একাধারে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ব্রহ্মতত্ত্বকেই নির্দেশ করে। 'ওঁ' কারের উপরিস্থিত অর্ধমাত্রাটিই (ঁ) নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক চিহ্ন। অ+উ+ম্—এই তিনটি অক্ষরের সমষ্টিই ওম্।

'অ'—জাগ্রত অবস্থা, 'উ'—স্বপ্নাবস্থা, 'ম'—সুষুপ্তি অবস্থা। 'অ'—সত্ব, 'উ'—রজঃ, 'ম'—তমঃ। পুরাণে—'অ'—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, 'উ'—পালনকর্তা বিষ্ণু। 'ম'—সংহার কর্তা শিব। 'অ'—সৃষ্টি, 'উ'—স্থিতি, 'ম'—প্রলয়। সৃষ্টির স্থূল বা ব্যাক্তাবস্থা—'অ', সূক্ষ্ম অবস্থা—'উ', প্রলয় বা অব্যক্ত অবস্থা—'ম'। 'অ'—অজ বা পরব্রহ্ম, 'উ'—সদগুরু, 'ম'—জীব। 'অ'—অব্যয় পুরুষ, 'উ'—অক্ষর পুরুষ, 'ম'—ক্ষর পুরুষ।

'অ'—একমাত্রা, 'উ'—দ্বিতীয় মাত্রা এবং 'ম'—তিনমাত্রা। এই তিনমাত্রার সমষ্টিই প্রণব বা ওঙ্কার। এই তিনমাত্রা ছাড়াও প্রণবের এক চতুর্থ মাত্রাও

আছে। এই মাত্রাকে তুরীয় মাত্রা বলা হয়। ওঁকার ব্রহ্মের চতুষ্পাদের অর্থাৎ স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চতুষ্পাদের সূচক। ঐতয়ের আরণ্যকে বলা হয়েছে—''অকারো বৈ সর্বা বাক্''—অর্থাৎ 'অ' থেকেই সব শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। 'অ' কারের এই মহিমার কারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার বিভূতিযোগ অধ্যায়ে, নিজেকে 'অ' কার বলেছেন, যথা—''অক্ষরানাম্ অকারোঽস্মি।'' 'অ' বর্ণ অসংগ এই জন্য একে অব্যয় পুরুষ রূপে মানা হয়। 'উ' কার উচ্চারণের সময় মুখের বা দুই ওষ্ঠের সংকোচন হয়। এই জন্য 'উ' কার 'অ' কারের মতো সম্পূর্ণ অসংগ নয় আবার 'ম' কারের মতো সম্পূর্ণ সসংগও নয়। এই জন্য 'উ' কার অক্ষর পুরুষবাচক বলে রহস্যবিদরা মনে করেন। 'ম' কারকে ক্ষর পুরুষ রূপে মনে করেন রহস্যবিদ্‌গণ। কারণ এই বর্ণটির উচ্চারণের সময় উভয় ওষ্ঠ সর্বদাই সংকুচিত হয়। এছাড়া অর্ধমাত্রা (ঁ) পরাৎপর ব্রহ্মের সূচক বলে রহস্যবিদ্‌রা মনে করেন। পরব্রহ্মের বাচক ওঙ্কারের ব্যাখ্যায় শাস্ত্র বলছেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে,
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অর্থাৎ—এই অদৃশ্য অসীম অতীন্দ্রীয় জগৎ আর এই দৃশ্য মর্ত্যলোক উভয় ওঁকার বা ব্রহ্মদ্বারা পূর্ণ, পূর্ণ হতেই পূর্ণ উপচিয়ে পড়ছে। পূর্ণ হতে পূর্ণ গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। মন্ত্রে পূর্ণমদঃ—'অদঃ' শব্দের অর্থ উহা বা ওই অর্থাৎ অতীন্দ্রীয় বা চিন্ময় বোধির জগৎ। এই অতীন্দ্রীয় বা চিন্ময় বোধির জগৎ-এর উর্ধ্বে রয়েছে অসীম মহাশূন্য। এই অসীম মহাশূন্যকে ধারণ করে আছে অমৃতস্বরূপ ওঁকার বা পরব্রহ্ম। 'পূর্ণমিদং'— 'ইদং' শব্দের অর্থ ইহা বা এই, অর্থাৎ এই পৃথিবী বা মৃন্ময় জগৎ, এই মৃন্ময় জগৎও ওঁকার বা ব্রহ্ম দ্বারাই পরিপূর্ণ। আবার 'অদঃ' শব্দ পরোক্ষকে বোঝায়, এবং 'ইদং' শব্দ বোঝায় প্রত্যক্ষকে। ঈশ্বর পরোক্ষ। জীব-জগৎ প্রত্যক্ষ। ঈশ্বরের পূর্ণতা নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু জীবও পূর্ণ কারণ জীব ঈশ্বরের অংশ। ঈশ্বর পূর্ণ হলে তাঁর অংশ জীব বা জগৎ কখনও অপূর্ণ হতে পারে না। কারণ পূর্ণ থেকে যা কিছু

উৎপন্ন হয় তা পূর্ণই হয়। অতএব 'ওঁ' শব্দ ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। বেদের যে-কোনও মন্ত্র উচ্চারণের প্রারম্ভে 'ওঁ' উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ওঁকার সংযুক্ত হওয়ায় ওই মন্ত্রও পূর্ণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'ওঁ' প্রবন্ধে বলেছেন ''যেখানে আমাদের আত্মা 'হাঁ' কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ। ....এর মধ্যে যে কেবল একটা 'হাঁ' এবং অন্যটা 'না' হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় 'হাঁ' হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলাম ওঁ।''

তৈত্তিরীয় উপনিষদ মতে—''ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতিদং সর্বম।'' অর্থাৎ 'ওম্'-ই ব্রহ্ম। 'ওম্'ই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ। মুণ্ডকোপনিষদে ২/২/৪ মন্ত্রে বলা হয়েছে ওঁকার হচ্ছে ধনুষ বা ধনুক। আত্মা হচ্ছে বাণ, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হচ্ছে তার লক্ষ্য। গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে এয়োদশ মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

''ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরণ্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহ স যাতি পরমাং গতিম্।।''—অর্থাৎ ওঁকারই অক্ষর ব্রহ্ম। যিনি এই এক অক্ষর রূপ ব্রহ্মের উচ্চারণ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। ওঁকারকে শব্দ বা নাদ ব্রহ্মও বলা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রণবের তিনটি মাত্রা আছে। এই তিন মাত্রায় প্রণবের তিনরকম গতি বিদ্যমান আছে। মন-বুদ্ধি দ্বারা আমরা যতটুকু জ্ঞান ধারণা করতে পারি তাই ঋগ্বেদিক জ্ঞান, প্রণবের প্রথম মাত্রা। এই জ্ঞান দ্বারা সাধক সমৃদ্ধি লাভ করেন। সদাচার, সৎকর্ম দ্বারা সাধক অন্তরিক্ষলোক জয় করেন। মৃত্যুর পর এই লোকে উপনীত হয়ে কামনানুযায়ী ভোগ-সুখ উপভোগ করেন। এটাই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা বা যজুর্বেদিক জ্ঞান। জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় সাধকের চিত্ত যখন নিষ্কাম হয়, তখন ব্রহ্মলোকে তাঁর গতি হয়। এই লোক জন্ম-জরা-মরণের উর্ধ্বে। এই লোকে গতি হলে আর তাঁকে মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয় না। সাধকের এই উর্ধ্বগতিই প্রণবের তৃতীয়াতীত অবস্থা। এককথায় ওঁকার হচ্ছে সামগ্রিকভাবে পারমার্থিক চিন্তার আত্মস্বরূপ। অব্ ধাতু মন্ প্রত্যয় যোগে ওঁ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অব্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। ওঁ অর্থাৎ যিনি আমাদের রক্ষা করেন। ওঁ অবিনাশী ধ্বনি। শুধু ধ্বনি নয় নীরবতাও। এই মহাধ্বনির গভীরে এক নীরবতাও বিদ্যমান আছে। ওই

নীরবতার মাঝে নীরবে বিলীন হওয়াই সাধনার অন্তিম লক্ষ্য ও পরম প্রাপ্তি। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে তাই ওঁকারের বন্দনায় মুখর শ্রীচৈতন্যদেব এবং অনেকে ওঁকারকে বেদের অন্যতম প্রধান মহাবাক্য বলে অভিহিত করেছেন।

চার বেদের চার মহাবাক্য

"প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম" ঃ অধ্যাত্ম পথের যাত্রী অথবা আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু সাধক, সাধন পথের অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য, চার বেদের চার মহাবাক্যের মধ্যে যে কোনও একটিকে অবলম্বন করে সাধন পথের যাত্রা শুরু করতে পারেন। বেদের প্রতিটি মহাবাক্য, উপনিষদ প্রতিপাদিত পরম জ্ঞান তথা গভীর সত্যকে দ্রষ্টা ঋষির অনুভব বা উপলব্ধিকে মরমী ভাষায় ব্যক্ত করেছে। এক-একটি মহাবাক্য যেন এক-একটি বেদকে হৃদয়ঙ্গম করার মহাসূত্র বিশেষ। প্রথমেই গ্রহণ করা যাক ঋগ্বেদের মহাবাক্যটিকে—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" এই প্রথম মহাবাক্যটি ঋগ্বেদ অন্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদে দৃষ্ট হয়। মহাবাক্যটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাক্যটির মর্মার্থ। এই মহাবাক্যটির মননে রয়েছে চিরন্তন সত্যের প্রতি মহা ইঙ্গিত। বাইরে আলোর সাহায্যে চোখ দিয়ে আমরা যা কিছু দেখি তা হল সেই সব কিছুর বাহ্যিক বা আপাত রূপ। ঋগ্বেদের মহাবাক্যটি অবলম্বন করে যখন আমরা ধ্যানের গভীরে ডুবে যাই, তখন আমাদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়, অনুভূতির আলোয় তখন আমরা দেখি এই বাহ্যিক বা আপাতরূপের অন্তরালে রয়েছে এক অরূপ—এই অরূপই আমাদের সকলের যথার্থ স্বরূপ। এই স্বরূপে অবস্থিত হওয়াই আমাদের বা অধ্যাত্মপথের সাধকের অন্তিম লক্ষ্য। বৈদিক ঋষির অনুভব এই লক্ষ্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ওই মহাবাক্যটি দ্বারা " প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম"। অর্থাৎ পরমচেতনা বা জ্ঞানই ব্রহ্ম। গুরুমুখে ওই মহাবাক্যটি শ্রবণ করে নেতি নেতি বিচার পথে, নিদিধ্যাসনের (গভীর ধ্যান) মাধ্যমে শরণাগত শিষ্য বা সাধক অনুভব করে—আমার অন্তস্থিত পরমচেতনা বা পরমজ্ঞানই আমার যথার্থ স্বরূপ। স্বরূপের এই স্থিতিতেই মহাবাক্যের জ্ঞান জীবন্ত বা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সাধকের জীবনে, এই মহাবাক্যটিতে প্রতিটি জীবের প্রকৃতরূপ বা স্বরূপ কী তা নিহিত

আছে—সাধক বা জীব সাধনার মাধ্যমে ওই মহাবাক্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সত্যকে জীবন্ত রূপ দান করবে। অনুভূতির আলোয় সাধক দর্শন করবে ওই পরমচেতনাই সকল চেতনার উৎস। উনিই পরম ব্রহ্ম, সকল চেতনার চেতনা, জ্ঞানের জ্ঞান, সকল জ্যোতির জ্যোতি। উনিই বেদ কথিত—ইন্দ্র, বরুণ-বায়ু, অগ্নি, সূর্য, ঊষা, অদিতি, এককথায় সবার উৎস বা মূল। উনিই পঞ্চভূত তথা পঞ্চভূতাত্মক জগৎ। উনিই অন্তজ, স্বেদজ, উদ্ভিদজ-আদি সকল প্রাণীর আদি কারণ। যেখানেই প্রাণের প্রকাশ সেখানেই উনি চেতনা বা প্রজ্ঞানরূপে বিদ্যমান। সমগ্র সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রাণীকুল এই প্রজ্ঞান বা চেতনা দ্বারা পরিচালিত বা প্রতিপালিত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তিই হল চেতনা—আর এই চেতনাই ব্রহ্ম। এই চেতনা, বিশুদ্ধ, শান্ত, আত্মতৃপ্ত বা আত্মার, উপাধিরহিত, অদ্বৈত, ইন্দ্রিয়াতীত শুদ্ধসত্ব ব্রহ্ম। নামরূপের সীমায় সীমিত হয়ে ইনিই ঈশ্বরে পরিণত হন। ইনিই সর্বভূতের তথা সর্বজীবের অন্তরে অবস্থিত থেকে, সবার মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন—তাই ইনি অন্তর্যামী। ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু তথা সর্বভূত এঁর প্রকাশেই প্রকাশিত হয়। এইভাবে সেই এক "অদ্বিতীয়ম" বিভিন্ন জনের কাছে তাদের মানসিক ধারণানুযায়ী বিভিন্ন রূপে বা বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মকে স্বয়ং দ্যুতিশীল ও শাশ্বত রূপে বর্ণনা করেছেন রাজর্ষি জনকের কাছে। [দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়।। তৃতীয় ব্রাহ্মণ বৃহদারণ্যক উপনিষদ]। সেই পরম সত্তার আলো ছাড়া জগৎ হত অন্ধকারময়। সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি সেই পরমের আলোতেই আলোকিত। মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতেও এই আলো সদা প্রজ্বলিত থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজর্ষি জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি?"—অর্থাৎ সেই পুরুষের জ্যোতি কী? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—"আদিত্য জ্যোতি সম্রাড়িতি হোবাচাদিত্যেনৈব জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে, কর্ম কুরুতে, বিপল্যেতীতি।" —অর্থাৎ সম্রাট, আদিত্যই তাঁর জ্যোতি। তেজস্বরূপ এই আদিত্য জ্যোতির পথ ধরেই তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে যান, কাজ করেন। আবার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরেও আসেন। হে রাজর্ষি মানুষের কাছেও আলোর উৎস এই সূর্য। কারণ এর আলোতেই মানুষ তার সমস্ত কর্ম

করে। জনকের প্রশ্ন—"তাহলে ঋষিবর সূর্যাস্তের পর সেই পরমপুরুষের আলোরূপে কে কাজ করে?" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর—"চাঁদের আলো। এই আলোতেই তিনি তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন।

জনকঃ—সূর্য-চন্দ্র অস্ত গেলে, সেই পুরুষের আলোর উৎসরূপে কে কাজ করেন?

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অগ্নি, অগ্নির আলোই তখন তাঁর সকল কর্মের উৎস হয়।

জনকঃ—সূর্য-চন্দ্র-অগ্নির অবর্তমানে এই পুরুষের জ্যোতি বা আলোর সহায়ক কে?

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অগ্নিই তখন তাঁর জ্যোতি বা আলোর সহায়ক হন।

জনক এরপর জিজ্ঞাসা করলেন—"সূর্যদেব অস্তাচলে, চন্দ্র অস্তমিত, অগ্নিও নির্বাপিত। সেই অবস্থায় এই পুরুষের জ্যোতির সহায়ক কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—"সম্রাট, বাক্‌ই তখন সেই পুরুষের জ্যোতি। সেই পুরুষ তখন বাক-এই অবস্থান করেন। গভীর অন্ধকারে যখন নিজের হাতও দেখা যায় না, তখন মানুষ কোনও দিক থেকে কোনও বাক্ বা কথা শুনতে পেলে, সেই বাক্ বা কথাকে অনুসরণ করে যেতে পারে।" এরপর জনক জিজ্ঞাসা করেন-"সূর্য-চন্দ্র অস্তাচলে, অগ্নি নির্বাপিত, বাক্ স্তব্ধ বা মৌন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই অবস্থায় সেই পুরুষের জ্যোতির স্বরূপ কী?" উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—"সম্রাট, আত্মাই তখন তাঁর জ্যোতি। আত্মরূপ জ্যোতিতেই তখন সেই পুরুষ অবস্থান করেন। আত্মার আলোকেই তিনি তখন তাঁর সমস্ত কর্ম সম্পন্ন করেন। স্বপ্ন-জাগ্রত-সুষুপ্তি সর্বাবস্থাতেই এই আত্মার আলো ক্রিয়া করে। এই দেহাতীত আত্মা দেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকলেও কারও আলো দ্বারা এই আত্মা আলোকিত নয় বরং বহির্জগতের সমস্ত আলোই আত্মার আলোকে আলোকিত।" তাই ঋগ্বেদীয় মহাবাক্যের অনুভবলব্ধ ঋষির উদাত্ত ঘোষণা—"প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম।"

"অহম্ ব্রহ্মাস্মি" ঃ এই মহাবাক্যটি যজুর্বেদ-এর অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে দৃষ্ট হয়। এই জন্য এই মহাবাক্যটি যজুর্বেদের অন্তর্গত। এই জগৎ আগে ব্রহ্মরূপেই বিদ্যমান ছিল—ছিল ব্রহ্মময়। সর্বশক্তিমান তিনি যে মুহূর্তে

নিজেকে নিজে জানলেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম, তখনই তিনি সবকিছু হয়ে সর্বাত্মক হলেন। দেবতাদের মধ্যেও যিনি নিজেকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন তিনিও সর্বাত্মক হয়েছিলেন। এইরূপে ঋষি ও মানুষের মধ্যেও যাঁরা নিজেকেই ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরাও সর্বাত্মক হয়েছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে বলেছিলেন—'আমি মনু হয়েছিলাম,' 'আমিই সূর্য হয়েছিলোম।' যিনি নিজেকে নিশ্চিতভাবে জানেন—'আমি ব্রহ্ম', তিনি এইরকমই হন। কারণ তাঁর আত্মা তখন সর্বব্যাপী। তাই দেবতারাও তাঁর বিরুদ্ধে যেতে সমর্থ হন না। আর যেভাবে আমার উপাস্য দেবতা অন্য এবং আমি অন্য, সে নিতান্তই মন্দমতি বা হীনবুদ্ধি সম্পন্ন। মানুষের কাছে যেমন পশু, দেবতাদের কাছেও সে ঠিক তাই। পশুরা তো আর জ্ঞানী নয়। বুদ্ধিমান মানুষ তাই তাদের দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেয়; নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন মানুষও দেবতাদের কাছে পশুসদৃশ। এক-এক দেবতার উপাসনা করেই তারা নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করে। মানুষ যেমন পশুসম্পদে খুশি থাকে, দেবতারাও তেমনি এইরকম ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন মানুষ-পশু পেয়ে খুশি থাকেন। একটি পশু চুরি গেলে বা নষ্ট হলে মানুষের যেমন ক্ষতিবোধ হয়, দেবতাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। কোনও দেবতার উপাসনাকারী মানুষ-পশু যদি নিজেকে একবার পশুত্বের পাশ থেকে মুক্ত করে তত্ত্বজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে ওঠে, তাহলে দেবতা আর তার বা সেই মানুষটির সেবা পায় না। তাই দেবতাদের অভিপ্রেত নয় যে, মানুষ ব্রহ্মজ্ঞ হোক বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুক। এই মহাবাক্যটির তাৎপর্য হল—স্বীয় ব্রহ্ম স্বরূপ বা আত্মস্বরূপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বোধ বা জ্ঞান লাভ করা। এই মহাবাক্যটিতে যে 'অহম' শব্দ রয়েছে, তার অর্থ হল—আমার অন্তরতম আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মই আত্মারূপে আমার বা আমাদের হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে বিদ্যমান আছেন। আত্মারূপে এই ব্রহ্মই আঁখির আঁখি, শ্রোত্রের শ্রোত্র, বাক্যের বাক্য ও মনের মন। ব্রহ্ম ও আত্মা নামেই পৃথক, স্বরূপত এক ও অভিন্ন। ধ্যান বা সাধনার লক্ষ্য হল এই ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতাকে উপলব্ধি করা।

"অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—এই মহাবাক্যটির ধ্যান-তন্ময়তায় সাধক উপলব্ধি করেন তাঁর আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মাই তাঁর যথার্থ 'অহম্'। এইভাবে ধ্যানের গভীরে

উপনীত হয়ে সাধক ব্রহ্মই হয়ে যান। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলেছেন ‘‘পতি পত্নীর কাছে প্রিয় কেন? কিংবা পত্নী পতির কাছে প্রিয় কেন? পতির পত্নীকে, কিংবা পত্নীর পতিকে ভালো লাগে বলেই কি প্রিয়? না, পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে ভালোবাসা তার মূল উৎস আত্মপ্রীতি বা আত্মার প্রতি ভালোবাসা।’’ জগতের সকল ভালোবাসার মূলেই এই আত্মপ্রীতি। আত্মজ্ঞান যার হয়, সবকিছুর সঙ্গে যে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, তার কাছে কি অমৃত দূরে থাকতে পারে? কোন ব্যক্তি বা বস্তু আমাদের কাছে প্রিয়। সেই প্রিয়ত্ব ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য নয়। বরং সেই এক অখণ্ড মহান আত্মার জন্য, যা সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে বিরাজ করছে। ব্রহ্মই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। ‘কো-অহম্’—অর্থাৎ আমি কি? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হল ‘সো-অহম্’—আমিই সে (ব্রহ্ম)। আমরা নিজেকে বা নিজেদেরকে যতক্ষণ জানতে না পারি ততক্ষণ অপরের বা অন্যদের পরিচয় ও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ব্যক্তিগত সত্ত্বার উপর নির্ভর করে। কারণ জগৎকে আমরা আমাদের মনের সীমিত গণ্ডীর মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করি। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞানের থেকে পৃথক। দ্বৈতজ্ঞান বিশ্লেষণধর্মী। অদ্বৈত জ্ঞান সংশ্লেষণধর্মী। আত্মরূপে ব্রহ্মদ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সবকিছুর উপভোগকর্তা। আমাদের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থারও সাক্ষী বা দ্রষ্টা। উপনিষদের ভাষায় এই আত্ম বা ব্রহ্ম নামহীন, রূপহীন, আকারহীন, অপরিবর্তনীয়, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, বাক্য মনের অতীত, সচ্চিদানন্দময় সনাতন অনন্ত সত্তাস্বরূপ। যাঁরা একে প্রাণরূপে উপাসনা করেন, তাঁরা একে প্রাণ বলেন। যাঁরা একে ভূতরূপে উপাসনা করেন, তাঁরা এই আত্মাকে ভূত বলেই জানেন। কেউ কেউ এই আত্মাকে গুণ, তত্ত্ব, পদ, লোক, দেবতারূপে জেনে, এর উপাসনা করেন। আবার কেউ কেউ এই আত্মাকে বেদরূপে বা শাস্ত্ররূপে, যজ্ঞরূপে, আনন্দময় রূপে, স্থূলরূপে, সূক্ষ্মরূপে, ব্যক্তিরূপে, শূন্যরূপে, স্থানরূপে, কালরূপে, জগৎরূপে, তর্কের বিষয় বা সমস্যারূপে, মনরূপে, বুদ্ধিরূপে, চিত্তরূপে, ধর্মরূপে, আশ্রমরূপে, সংসাররূপে, পুরুষরূপে, স্ত্রীরূপে, ক্লীবরূপে, সৃষ্টিরূপে, ধ্বংসরূপে কল্পনা করে থাকেন। বস্তুত এই

সমস্ত ধারণা বা কল্পনার মূল আত্মা বা ব্রহ্মই। আমরা পরস্পর পরস্পরের থেকে দেহ ও মনে ভিন্ন হলেও আত্ম অনুভবের চেতনায় আমরা সকলেই সকলেরই সঙ্গে সংযুক্ত তথা অভিন্ন।

আমাদের অন্তরস্থিত ব্রহ্ম বা আত্মাই আমাদের পূজা গ্রহণ করেন। আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন ও আমাদের ইচ্ছা পূরণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—‘‘কোন গ্রন্থ, কোন শাস্ত্র, কোন বিজ্ঞান ও এই আত্মার—যা মানুষরূপে প্রতিভাত হয়, তার গৌরব কল্পনাও করতে পারবে না। আত্মারূপী এই মানুষই হল সেই মহান ঈশ্বর যা আগেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।’’ অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের গগনচুম্বী ঘোষণা—আমি এই বিশ্বের কার কাছে মাথা নত করবো? আমি আমার আত্মাকেই প্রাণের অর্ঘ্য প্রদান করবো। কারণ আমিই এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অনন্ত সত্তা। জগৎগুরু শংকরাচার্য বলেছেন—‘‘মানুষ শাস্ত্র পড়তে পারে, যজ্ঞ করতে পারে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে পারে কিন্তু আত্মার সাথে নিজের একত্ব বা অভিন্ন বোধ না হলে অনন্ত কালেও তাঁর মুক্তি হবে না। এই জগতে অনন্ত আনন্দের অধিকারী তাঁরাই—যাঁরা নিজেদের মধ্যে সেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রহ্মই শাশ্বতের শাশ্বত, চেতনার চেতনা। আনন্দের আনন্দ।’’

‘‘অহম্ ব্রহ্মাস্মি’’ এই মহাবাক্যটির অর্থ করতে গিয়ে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন—‘‘অহম্ ব্রহ্মাস্মি—অর্থাৎ আমি ব্রহ্মাস্থ আছি।’’ যুক্তি হিসাবে তিনি একটি বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। বাক্যটি হল—‘‘মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি’’—অর্থাৎ মঞ্চগুলি ডাকিতেছে। জড় পদার্থ মঞ্চের কি কাউকে ডাকার বা আহ্বান করার ক্ষমতা আছে? তবু যখন ডাকছে তখন বুঝতে হবে মঞ্চস্থ মানুষ ডাকছে বা আহ্বান করছে। এখানেও সেইরকম। জীবের সঙ্গেই ব্রহ্মের সম্মিলন হয়ে থাকে। কেননা তাঁর (দয়ানন্দ সরস্বতী) মতে—‘‘জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে থাকে এবং মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে। জীব ব্রহ্মের সহচারী—জীব এবং ব্রহ্ম কিন্তু এক নয়।’’ ‘‘অহম্ ব্রহ্মাস্মি’’— এই মহাবাক্যের সাধনায় সাধক মৃন্ময়ী পৃথিবীকে দেখে চিন্ময়ীরূপে। এই মহাবাক্যের সাধনায় সিদ্ধ মানুষ বা সাধক হয় জ্ঞান ও প্রেমের চলন্ত

বিগ্রহ। সাধক অনুভব করে মানুষের অন্তর্নিহিত অদ্বয় অখণ্ড সর্বব্যাপী পরমাত্ম চেতনাই সত্য—এই মহাসত্যেরই অনুভবী ঘোষণা অহম্ ব্রহ্মাস্মি।

"তৎ ত্বম অসি [তত্ত্বমসি]" ঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদকরূপে গৃহীত চার বেদের চারটি মহাবাক্যের মধ্যে এটি অন্যতম মহাবাক্য। এই মহাবাক্যটি সাম বেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়। এই উপনিষদে ঋষি উদ্দালক-আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে কতিপয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে আত্মার অবস্থান কোথায় এবং এই আত্মার স্বরূপ কী তা আপন অনুভবলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে বিবৃত করে পুত্রকে বলছেন— "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—অর্থাৎ, "তুমিই তিনি"—তুমিই সেই সৎ-স্বরূপ আত্মা। এই আত্মা "একমেবদ্বিতীয়ম্"। এক চন্দ্র বা সূর্য যেমন অসংখ্য জলধারে প্রতিবিম্বিত হয়ে অসংখ্যরূপে দৃষ্ট হয়, সেরূপ একই আত্মা সর্ব আধারে বা জীব আধারে প্রতিবিম্বিত হন। এই আত্মা এক ও অদ্বৈত। নাম ও রূপ যা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে—তা আত্মার যথার্থ স্বরূপ নয়। নাম ও রূপ আত্মার উপর আরোপ করা হয় ব্যবহারিক জীবনের অভীষ্ট পূরণের জন্য। এই আত্মা কঠোপনিষদের ভাষায় "অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" অর্থাৎ আত্মা অণু হতেও অণু, সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর, আবার এই আত্মাই মহৎ থেকেও মহীয়ান, আকাশাদি বিরাট পদার্থ থেকেও বিরাটতর। এই আত্মাই প্রাণীদের হৃদয়গুহায় নিহিত আছেন। তিনিই বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তিনি আছেন "সবার মাঝে নানান সাজে।" তিনিই সত্য-সৎস্বরূপ। কে তিনি? তিনি হলেন আত্মা। ঋষিদের মতে আত্মা সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সত্তা। আত্মা শব্দের ধাতুগত অর্থই তাই, অত্ ধাতু—অততে বা গমনে—সর্বত্র যা গমন করে, সবকিছুর মাঝেই যা রয়েছে—That is involved in everything তা-ই আত্মা। ঋষিদের মতে স্থাবরের, অচেতনের মাঝেও আত্মা রয়েছে। স্থাবরের মাঝে বুদ্ধি না থাকতে পারে কিন্তু এই আত্মা রয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা জড় বস্তুরও অবসাদ বা বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। একটা ইঞ্জিনকে বিশ্রাম না দিয়ে যদি অনবরত চালানো যায় তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন আর ইঞ্জিন কিছুতেই চলবে না। ইঞ্জিনকে তখন বিশ্রাম দিতে হয়। বিশ্রামের পর আবার

সে পূর্ববৎ ছুটতে পারবে। জড়ের মূলেও যে চেতনা রয়েছে, জড়ের এই অবসাদ তারই লক্ষণ। এই জগৎ কার্য-কারণের নিয়ম দ্বারা বিধৃত। কার্যেই কারণ নিহিত থাকে। কারণকে জানলেই কার্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। তাই আত্মাকে জানলেই সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। সমুদ্রের জলে যেমন লবণ অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় থাকে সেইভাবে আত্মা প্রত্যেক দেহে অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এই আত্মাই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। একে জানলেই সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়। আত্মস্বরূপে স্থিত হয়ে বা আত্মাকে জেনেই মানুষ মুক্তির আনন্দ আস্বাদনে সমর্থ হয়। দেহে আত্মবুদ্ধি হওয়ার ফলেই জীব কষ্ট পায় এবং নিজেকে নাম-রূপধারী জন্মমৃত্যুর অধীনস্থ এক দৈহিক সত্তা বলে মনে করে।

জগৎগুরু শংকরাচার্য বলেছেন—অজ্ঞ ব্যক্তি ভাবে সে দেহ, গ্রন্থজ্ঞানী বা পণ্ডিতগণ নিজেদের দেহ ও আত্মার মিশ্রণ বলে মনে করেন বা ভাবেন। আর অনুভূতিসম্পন্ন তত্ত্বদর্শী সন্তরা শাশ্বত আত্মাকে নিজ আত্মারূপে জানেন বা ভাবেন। তাই ব্রহ্ম অনুভূতির পর তাঁরা যখন অন্যকে উপদেশ করেন তখন বলেন—"ত্বৎ-ত্বম-অসি"-অর্থাৎ তুমি হও সেই আত্মা বা ব্রহ্ম।

সামবেদীয় এই মহাবাক্যটি ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অদ্বৈততা নির্দেশ করে। এই অদ্বৈত বা একত্ব জ্ঞানই আমাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই মহাবাক্যে 'তৎ' এবং 'ত্বম্' শব্দদ্বয়ের দুটি অর্থ আছে। একটি প্রত্যক্ষ অপরটি অন্তর্নিহিত। যেমন যখন বলা হয় যে, একটি অগ্নি তপ্ত লাল টকটকে লৌহখণ্ড কোনও বস্তুকে দহন করছে তখন প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ তপ্ত লৌহখণ্ডটি বস্তুটিকে দহন করছে কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থটি হল, লৌহখণ্ডে যে অগ্নি আছে তা বস্তুটিকে দহন করছে—লৌহখণ্ডটি নয়। ঠিক সেইরূপ 'ত্বম্' শব্দটির অর্থ ব্যক্তিগত আত্মা বা ব্যষ্টি আত্মা এবং এই আত্মাতে নিহিত সেই শুদ্ধ সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা—যা 'তৎ' শব্দে অভিহিত। মহাবাক্যস্থিত 'অসি' শব্দটি 'তৎ' ও 'ত্বম' উভয়েরই পরিচয় জ্ঞাপক। কিন্তু 'তৎ' ও 'ত্বম' বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ায় আক্ষরিক অর্থে এক হতে পারে না। ব্রহ্ম ও ব্যক্তি বা ব্যষ্টি আত্মা যেন—সিন্ধু এবং বিন্দু। এরা কখনও এক হতে পারে না। এখানে

উভয়কে এক বলা হচ্ছে সেই অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। যেমন রামবাবু নামক জনৈক ব্যক্তিকে আমি ১৯৯০ এবং ২০১৪ সালে দেখেছিলাম এবং ২০১৪ সালে যখন তাঁকে দেখেছিলাম তখন বলেছিলাম—এই রামবাবুই সেই রামবাবু। কিন্তু ১৯৯০ এবং ২০১৪-র মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল—কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল—ওই ব্যক্তির পরিচয় একই। সেইরূপ 'তৎ' ও 'ত্বম' এর নামরূপ আলাদা হলেও পরিচয় একই। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঋষি উদ্দালক-অরুণির পুত্র শ্বেতকেতুকে মাধ্যম করে যেন আমাদের সকলকেই বললেন—"তৎ-ত্বম-অসি" (তত্ত্বমসি) অর্থাৎ তুমি বা তোমরা সকলেই সেই আত্মা। যে আত্মা একই সঙ্গে বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতিগ। দুধের মধ্যে ঘৃতের মতো বিশ্বের মধ্যে তিনিই নিগূঢ়াত্মা থেকেই সবকিছু প্রকাশ করছেন। এই আত্মাই সত্য এবং নিত্য। 'তৎ-ত্বম্-অসি'—তুমিই তিনি। তিনিই তুমি।

"অয়মাত্মা ব্রহ্মঃ" ঃ এই মহাবাক্যটি অথর্ব বেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদের। মন্ত্রটির অর্থ—"এই আত্মা ব্রহ্ম"। কোন আত্মা ব্রহ্ম? যিনি বিশ্ব জুড়ে রয়েছেন। আবার জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে দ্বিতীয় মন্ত্রে ঋষি বলছেন—"সর্বম্ হেতদ্ ব্রহ্ম,অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।।" অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম এই আত্মা বা ব্রহ্মের চারটি অংশ জীবদেহে থেকে তাকে চালনা করছেন। সেই চারটি অংশকে বলা হয়েছে চতুষ্পাদ—অর্থাৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদ বিশিষ্ট। মনে প্রশ্ন জাগে—আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আত্মা—তিনি এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। একটি অখণ্ড আনন্দময় সত্তা। তাঁর আবার চার অংশ হয় কী করে! উত্তরে বলা হয় সেই একমেব অদ্বিতীয়কে ধরার জন্য, তাঁকে জ্ঞানের নাগালের মধ্যে আনার জন্যই সত্যদর্শী ঋষি নিজের বুদ্ধি বা উপলব্ধি অনুযায়ী ব্রহ্ম বা আত্মাকে চারটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম তর, সূক্ষ্মতম। মুণ্ডক উপনিষদের ঋষি অঙ্গিরা যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সুবিধার জন্য চারটি ধাপ অতিক্রম করার উপদেশ দিয়েছেন। এই চারটি ধাপ হল—সত্য, তপস্যা, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য। এখন প্রশ্ন, ব্রহ্মের এই চতুষ্পাদ বা চারটি অংশ কী কী? জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়—এই চারটি নিয়ে ব্রহ্ম

চতুষ্পাদবিশিষ্ট। আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের এই চার অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান থেকে সকল কর্ম সম্পন্ন করেন। জীব যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকে তখন প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান নিয়ে আত্মা হল বৈশ্বানর। সর্বব্যাপী আত্মার এটি হল প্রথম পাদ বা অবস্থা।

আত্মার দ্বিতীয়পাদ বা অবস্থাটি হল তৈজস। বাইরের জগৎ তখন তাঁর পুষ্টিসাধন করে না—এই সময় পুষ্টি যোগায় অন্তর্জগৎ। তাই তৈজস আত্মাকে বলা হয় প্রবিবিক্তভুক—অর্থাৎ সূক্ষ্মবস্তুকে আশ্রয় করে আত্মা তখন অন্তরে থেকে অন্তরপ্রজ্ঞ বা অন্তর জগতের জ্ঞানে জ্ঞানী। জাগ্রত অবস্থায় আত্মা বাইরের বিষয়জ্ঞানে মত্ত—এই অবস্থায় তিনি জাগ্রত পুরুষ—তাই তিনি বিষয়ভুক্। ঘুমের মাঝে স্বপ্নের মধ্যে যিনি জাগ্রত থেকে স্বপ্নের বিষয়সমূহ ভোগ করেন—তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই স্বপ্নের পুরুষ বা প্রবিবিক্তভুক্ (Projection)। মানুষ যখন গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে থাকে তখন তার সেই অবস্থাকে বলা হয় সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞান ও আনন্দকে উপভোগ করে আত্মা প্রাজ্ঞ হয়ে যান—এই প্রাজ্ঞ আত্মাই হল তাঁর তৃতীয় পাদ বা অবস্থা। এই অবস্থায় আনন্দই হয় আত্মার ভোগ্য বিষয়। সুষুপ্তির সময় বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় এমন নিস্তেজ হয়ে যায় যে, তারা তখন নিজেদের ইচ্ছেমতো আর কিছুই করতে পারে না। দ্বিতীয় কোনও বস্তু এই সময় দেহ আর আত্মার মাঝে উপস্থিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রকট করেন না, স্বপ্নাবস্থায় যেমন করে থাকে। দেহ এখানে কেবলমাত্র আত্মাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত। আত্মাও এখানে নিজের মধ্যে মহানন্দে মগ্ন। আনন্দ ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই—আত্মা এখানে জ্ঞানমুখ দিয়ে বা চেতোমুখ হয়ে আনন্দ পান করে আনন্দেই থাকেন। সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মা এই আনন্দকে আশ্রয় করে আনন্দময় হয়ে থাকেন। তাই সুষুপ্তির মাঝে তিনি আনন্দভুক্।

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ—এই তিন নিয়ে জগৎ। এই তিন অবস্থাকেই দেখা যায়, জানা যায়, উপভোগ করা যায়। ঋষি একটি উপমা দিয়ে তা বুঝিয়েছেন। মানুষ জাগ্রত অবস্থায় তার এই নশ্বর স্থূল দেহ দিয়ে স্থূল বস্তু দেখে। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্ম বস্তু দেখে।

সুষুপ্তি দেখে কারণশরীর। সূক্ষ্ম শরীর থেকে কারণশরীরে সূক্ষ্ম আত্মমগ্ন বা সাধনসিদ্ধ না হলে তা দেখা যায় না। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ—এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করার পরই সেই চতুর্থ ধাপ—যেখানে নাম-গোত্র-পরিচয়হীন সেই এক অদ্বৈত বিশ্বসত্তা ব্রহ্ম—যিনি সকল কারণেরও কারণ, পরমসত্তা! এই পরমসত্তার ভূমিতে চেতনার উত্তরণে আত্মার যথার্থ স্বরূপটির বোধ বা জ্ঞান হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এ অবস্থা মৃত্যুর নামান্তর। সাধকের এই অবস্থা হল তুরীয় অবস্থা (প্রকাশাতীত, সীমাতীত, মানব-অভিজ্ঞতা বহির্ভূত অবস্থা)। এটিই আত্মা-ব্রহ্মের চতুর্থপাদ বা অবস্থা।

এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাণ্ডুক্যোপনিষদের সপ্তম মন্ত্রে ঋষি বলছেন— "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং ন উভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্। অদৃশ্যম্, অব্যবহার্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্ম প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।।"—অর্থাৎ অন্তপ্রজ্ঞ, বহিপ্রজ্ঞ, প্রজ্ঞানঘনপ্রজ্ঞ—এসবের কোনও মাত্রাই সেখানে নেই। তাঁকে দেখা যায় না, ব্যবহার করা যায় না, কোনও ভাবে তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না—তিনি অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়, কোনও বিশেষণ তাঁর নেই, কোনও গুণও তাঁর নেই। তিনি শিবস্বরূপ—শান্তস্বরূপ, এক ও অদ্বৈত—তিনিই আত্মা বা ব্রহ্ম। তিনি জ্ঞাতব্য। বস্তুত এই চতুর্থ পাদে বা তুরীয় অবস্থাতে উপনীত হয়ে সাধক সমাধিস্থ হন। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনে জীব তখন শিবস্বারূপ্য প্রাপ্ত হন। এই অবস্থা জীব ও শিবের এক অভিন্ন অবস্থা। এখানে সাধক ও সাধনার ধন মিলেমিশে একাকার। এখানে আমি তুমি নেই। সাধকের সেখানে একটাই অনুভূতি— 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এই আত্মাই আমার মধ্যে বিদ্যমান যে আত্মা সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, অতএব আমিই পরমাত্মা, অথবা পরমাত্মাই আমি। এই ব্রহ্ম যখন মাত্রাযুক্ত বা নাম-রূপ-গুণ ইত্যাদি উপাধিযুক্ত তখন তিনি সগুণ, সবিশেষ। তিনি (ব্রহ্ম বা পরমাত্মা) যখন মাত্রাহীন উপাধিহীন, গুণহীন, তখন তিনি নির্গুণ বা নির্বিশেষ পরমব্রহ্ম। সাধকের সাধনার লক্ষ্য এই পরমব্রহ্মকে পাওয়া, পরমব্রহ্মের সাথে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া। সাধনার অন্তিম লক্ষ্যই হল—নির্গুণ-নির্বিশেষ

পরমব্রহ্ম। সমাধি অবস্থায় অসীমের ব্যাপ্ত চেতনা যখন সাধকের চেতনায় ঘনীভূত হয়—তখন চিৎকণা রূপে একটা আলোর আবির্ভাব হয়। অসীমের আলোর মাঝে যেন আরও একটা আলোর কণিকা—এই হল সাধকের সত্তা বা আমাদের সকলের সত্তা।

সেই আলোর কণিকায় সাধক যেন জেগে উঠল। যে আলোয় সে ছিল এবং যে আলোয় সে জেগে উঠল—সব আলোই তিনি (ব্রহ্ম বা আত্মা)। অহং লয় হচ্ছে কিন্তু ব্যক্তিত্ব যাচ্ছে না। ব্যক্তিত্ব শাশ্বত, আত্মা শাশ্বত, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, নিজেকে আস্বাদন করার জন্যই তিনি 'আমি' হয়েছেন। এই 'আমি'টা আমার নয়—এটা তাঁরই ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিরন্তন বা সনাতন ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি মাত্র, যা বিরোধ তা অহং-এর বিরোধ। বৈদিক ঋষির মতো সাধন পথের সিঁড়ি বেয়ে সমাধিস্থ হয়ে যখন অন্তিম কেন্দ্রে (ব্রহ্মকেন্দ্র) পৌঁছাবো তখন দেখব সব Person বা ব্যক্তি একই। এক তিনি—বহু হয়েছেন, এভাবে তিনি আজও আছেন, অতীতেও ছিলেন, আগামীতেও থাকবেন। বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ অথবা জাগ্রত-স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এসব সগুণ মাত্রার স্তর একসময় সাধককে অতিক্রম করেই যেতে হয়—নির্গুণ-নির্বিশেষ পরমব্রহ্মকে লাভ করার জন্য। সমাধিতে সাধক যখন এই নির্বিশেষ পরমব্রহ্মের সাথে মিলেমিশে এক ও অভিন্ন হন—তখন শুধুমাত্র অনুভব বা অনুভূতিই হয় প্রধান। অদ্বৈত অনুভূতির আলোকেই সাধক অনুভব করে—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বৈদিক শান্তিপাঠ

ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠ ঃ

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠাতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্,
আবিরাবীর্ম এধি।
বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ,
অনেন অধীতেন অহোরাত্রান্ সংদধামি।
ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু,
অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অনুবাদ ঃ আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট কৃপাপূর্বক প্রকাশিত হও।

হে বাক্য ও মন, তোমরা আমার নিকট বেদার্থের আনয়নে সমর্থ হও। আমার শ্রুত বিষয় যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে। এই অধ্যয়নের দ্বারা আমি দিবারাত্র সংযোজিত করিব।

আমি মানসিক সত্য বলিব। আমি বাচনিক সত্য বলিব। ব্রহ্ম আমায় রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আচার্য্যকে (গুরুদেবকে) রক্ষা করুন।

আমাকে রক্ষা করুন, আচার্য্যকে রক্ষা করুন; আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

শুক্ল যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ— [১]

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অনুবাদ ঃ উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ, ইহা অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎও পূর্ণ। পূর্ণব্রহ্ম হইতে পূর্ণ সৃষ্টি উৎপত্তি (উদ্‌গত) হন।

পূর্ণব্রহ্ম হইতে পূর্ণসৃষ্টি উৎপত্তি হইলেও পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণত্ব-ই অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণত্বের কোনরূপ হানি বা ক্ষয় হয় না।

আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখ [শারীরিক ও মানসিক দুঃখ], আধিদৈবিক দুঃখ [দৈব দুর্ঘটনাজনিত দুঃখ] এবং আধিভৌতিক দুঃখ [মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে দুঃখ]—এই ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

শুক্ল যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ— [২]

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ,
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিঃ, ওষধয় শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ,
ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ,
শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অনুবাদ ঃ দ্যুলোকে [স্বর্গলোকে] যে শান্তি, অন্তরিক্ষলোকে যে শান্তি, পৃথিবীতে যে শান্তি, জলে যে শান্তি, ওষধিতে যে শান্তি, বনস্পতিতে যে শান্তি, সকল দেবতাতে যে শান্তি, পরব্রহ্মে যে শান্তি, সর্বজগতে যে শান্তি বিরাজমান এবং স্বরূপতঃ যাহা শান্তি,সে সমস্তই শ্রীভগবৎ কৃপায় আমাকে প্রাপ্ত হউক।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ— [১]

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বী নাবধীতমস্তু,
মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান্ আমাদেরে উভয়কে [গুরু ও শিষ্য—এই উভয়কে] সমভাবে রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কে সমানভাবে বিদ্যা [ফল] দান করুন।

আমরা উভয়েই যেন সমভাবে বিদ্যালাভের সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি। আমাদের উভয়ের লব্ধ বিদ্যা সফল হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ— [২]

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বাক্তারমবতু। অবতু মাম্।
অবতু বক্তারম্।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অনুবাদ ঃ মিত্রদেব আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন। বরুণদেব সুখপ্রদ হউন। অর্য্যমা সুখকর হউন। দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের প্রতি আনন্দপ্রদ হউন, বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপকারী বিষ্ণু আমাদের সুখদায়ক হউন।

ব্রহ্মরূপী [পরোক্ষ] বায়ুকে নমস্কার, হে [প্রত্যক্ষ] বায়ু, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে বলিব, তোমাকে ঋত স্বরূপে—[যথার্থ বস্তুরূপে] বলিব, তোমাকে সত্য স্বরূপে—বলিব।

সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, সেই ব্রহ্ম আচার্য্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন।

আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নে শান্তি হউক।

সামবেদীয় শান্তিপাঠ—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণচক্ষুঃ,
শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।
সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্।
মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ;
অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেহস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু

ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অনুবাদ ঃ আমার অঙ্গসমূহ, বাক্-প্রাণ-চক্ষু-কর্ণ-বল ও ইন্দ্রিয়সকল পুষ্টিলাভ করুক। সর্ববস্তুই স্বরূপতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম।

আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হউক।

সেই পরমাত্মায় সতত নিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ধর্ম-সমূহ প্রতিভাত হউক, আমাতে উহা প্রতিভাত হউক।

আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

অথর্ববেদীয় শান্তিপাঠ—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা,
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভিঃ যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ-স্তুষ্টুবাংস-স্তনূভিঃ,
ব্যশেম দেবহিতঃ যদায়ুঃ।।
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ,
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্ট-নেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতি-র্দধাতু।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অনুবাদ ঃ হে দেবগণ, আমরা যেন আমাদের কর্ণের দ্বারা কল্যাণ বচন শ্রবণ করি। হে পূজনীয় দেবগণ, আমরা যেন আমাদের চক্ষু দ্বারা সুন্দর বস্তু দর্শন করি। দৃঢ় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত হইয়া আমরা যেন তোমাদের স্তবগান পূর্বক দেবকর্মে নিয়োজিত আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হই।

বৃদ্ধাশ্রবাঃ ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন; সর্বজ্ঞানাধার পূষা (অর্থাৎ জগৎ পোষক দেবতা) আমাদের মঙ্গল করুন। হিংসা নিবারক গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন; দেবগুরু বৃহস্পতিও আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

।। ঋণ-স্বীকার ।।

উপনিষদ সংগ্রহ—গ্রন্থিক, ঋক্‌বেদ সংহিতা—শ্রীরামশর্মা আচার্য, যজুর্বেদ সংহিতা—শ্রীরামশর্মা আচার্য, সাম বেদ সংহিতা—শ্রীরামশর্মা আচার্য, অথর্ব বেদ সংহিতা—শ্রীরামশর্মা আচার্য, বেদ-বিচিন্তন—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, বেদ ও বিজ্ঞান—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, বেদরহস্য—শ্রীঅরবিন্দ, বেদের পরিচয়—যোগীরাজ বসু, বেদমন্ত্র-মঞ্জরী—শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য, মর্ত্যেষু অমৃত—শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য, বেদ-মীমাংসা (১-৩)—শ্রীঅনির্বাণ, বেদরহস্য—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, বৈদিক ইতিহাস বিমর্শ—ডঃ রঘুবীর বেদালংকার, বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা—শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থাবলী—উমাচল প্রকাশনী, বৈদিক ভাবনায় সোম—ডঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বেদামৃতম্ (১-৪০)—ডঃ কপিলদেব দ্বিবেদী, The Vedic Goods, as figures of Biology—প্রোঃ ভি.জি. রেলে, বেদসার—সংগ্রহ—স্বামী অরুণানন্দ, বেদোঁ কী বর্ণন শৈলিয়াঁ—ডাঃ রামনাথ বেদালংকার, বেদ ও কোরাণ—শ্রীতপনকুমার দাস, যজ্ঞকথা—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঋগ্বেদ সন্দেশ—ডাঃ সোমদেব শাস্ত্রী, বেদালোক—স্বামী বিদ্যানন্দ 'বিদেহ', বৈদিক বাঙ্‌ময় কা ইতিহাস (১-৩)—পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত, বৈদিক কোশ (১-৩)—পণ্ডিত চন্দ্রশেখর উপাধ্যায় এবং শ্রীঅনিল কুমার উপাধ্যায়, বেদমন্ত্র—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি সরবরাহ করে যারা আমাকে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে, তাদের মধ্যে দিল্লী নিবাসী শ্রীমান দেবেন্দ্র নন্দী এবং কাটোয়া নিবাসী শ্রীমান প্রীতমকুমার রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এরা দু-জনেই আমার ছাত্র। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এদের মঙ্গল হোক।

এছাড়াও গ্রন্থ রচনার জন্য যিনি আমাকে সব সময় প্রেরণা দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন, তিনি আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী চন্দনা দে। ভগবানের কাছে তাঁর সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

—গ্রন্থকার

যোগাচার্য শ্রীমৎ রামানন্দ সরস্বতী

জন্ম বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার করুই গ্রামে। শিক্ষাগত যোগ্যতা-বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ.। কামাখ্যার উমাচল যোগ মহাবিদ্যালয় থেকে যোগ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি শিক্ষালাভ। শিক্ষান্তে দীক্ষাগুরু বিশ্ববন্দিত যোগী শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ কর্তৃক যোগাচার্য উপাধি প্রাপ্তি। বেদ ও বেদান্ত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ গুরু মহারাজ, বেদের মরমী ভাষ্যকার শ্রীঅনির্বাণ ও বেদান্ত-আচার্য শ্রীমৎ স্বামী সহজানন্দ মহারাজের কাছে। বর্তমানে শ্রীগুরুর নির্দেশে যোগ ও বেদ প্রচারে রত।